বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১
পঞ্চম মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৪

উপদেষ্টা পরিষদ :
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর স্থকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীস্থমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অজিত বাকচি কর্তৃক পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	...	ডঃ সুকুমার সেন	/০
দৃষ্টি-প্রদীপ	...	...	১
কিন্নর দল			
মণি ডাক্তার	...	...	১৫৫
পুরোনো কথা	...	...	১৬৩
খোসগল্প	...	...	১৬৮
একটি দিনের কথা	...	...	১৭৩
বাটি-চচ্চড়ি	...	...	১৭৯
তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প		...	১৮২
ডাইনী	...	...	১৯৫
বুধীর বাড়ি ফেরা	...	...	১৯৮
বিধু মাস্টার	...	...	২০৯
উন্নতি	...	...	২১৩
কিন্নর দল	...	...	২১৯
রূপহলুদ			
ননীবালা	...	...	২৩৫
বিরজা হোম ও তার বাধা		...	২৪১
বুড়ো হাজরা কথা কয়	...	...	২৪৬
কাশী কবিরাজের গল্প	...	...	২৫৫
ছোটনাগপুরের জঙ্গলে	...	...	২৫৯
মারা	...	...	২৬২
আমার ডাক্তারি	...	...	২৬৯
বর্শেলের বিড়ম্বনা	...	...	২৭৬
কাদা	...	...	২৮১
ভৌতিক পালঙ্ক	...	...	২৮৬
উৎকর্ণ	...	...	২৯৩

ভূমিকা

বিভূতিভূষণের প্রথম দুখানি উপন্যাস, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত', যে ধারাবাহিক রচনা অর্থাৎ বই দুটি যে একই নায়কের প্রথম ও দ্বিতীয় বয়সের কাহিনী সে কথা পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'দৃষ্টি-প্রদীপ' যে প্রথম বই দুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত সে কথা হয়ত সাধারণ পাঠকের কাছে নতুন সংবাদ হতে পারে। 'দৃষ্টি-প্রদীপ' যে অপরাজিতের পরে লেখা হয়েছিল তাতে সংশয় নেই, তবে সন্দেহ করি এই বিষয়ে যে পথের পাঁচালী প্রথমে যে-ভাবে লেখা হয়েছিল তার কিছু প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টি-প্রদীপে মাঝে মাঝে রয়ে গেছে।

এখানে দেখা যাক্ পথের পাঁচালী অপরাজিতর সঙ্গে দৃষ্টি-প্রদীপের মিল কোথায় ও কিসে।

নায়কের নামে যে পার্থক্য আছে সে কথা বলা বাহুল্য কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এক রকম মিল, এমন কি স্পষ্ট মিল, খুঁজে পাওয়া যায়। আগেকার উপন্যাস দুটিতে নায়কের নাম "অপু"। ভাল নাম যদিচ তার অপূর্বকুমার, কিন্তু বলতে পারি তার রাশ-নাম যে অপরাজিত তাতে সন্দেহ কি। তৃতীয় উপন্যাসে নায়কের নাম "জিতু"। সম্ভবত তার ভালো নাম, লেখক ভেবেছিলেন, জিতেন্দ্র। কল্পনা করতে বাধা কি যে তার রাশ-নাম একই—অপরাজিত। অপু আর জিতু অপরাজিত নামটি যথাক্রমে পূর্ব পরার্ধ ভেঙে তৈরি ডাকনাম। নাম দুটির সঙ্গতি আছে। পথের পাঁচালী ও অপরাজিতের নায়ক অপূর্ব সুন্দর দেখতে—"কি গায়ের রং কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্নমাখা চোখ দুটি!" দৃষ্টি-প্রদীপের নায়ক জিতুর গায়ের রং ভালো নয়, তবে তার দাদা ও বোন ফরসা ছিল বটে।

পথের পাঁচালীতে অপুরা এক ভাই বোন, দৃষ্টি-প্রদীপে তারা দু ভাই এক বোন। মায়ের ভূমিকায় বিশেষ পরিবর্তন নেই, তবে দৃষ্টি-প্রদীপে ভূমিকাটি অধিকতর বাস্তব। (একথা দৃষ্টি-প্রদীপের প্রায় সকলের ভূমিকা সম্বন্ধেই বলা চলে।) জিতুর পিতা খুব স্নেহপরায়ণ নন। তিনি ভালমানুষ তবে মদ্যাসক্ত। "বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী করে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়।" তাঁর পরিণামও অনুরূপ বাস্তব তবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। পথের পাঁচালীর পোশাকে তিনি অকৃতার্থ—পাড়াগাঁয়ে ভালোমানুষের রোমান্টিক আদর্শ এবং ঝাপসা। দৃষ্টি-প্রদীপের জ্যাঠাইমা অত্যন্ত নিষ্ঠুর চরিত্র। অপরাজিতয় তাঁর প্রকৃতি বদল হয় নি তবে উগ্রতার ঝাঁজ কমে স্বভাবসঙ্গত হয়েছে। দৃষ্টি-প্রদীপে নায়কের অল্পবয়স সুন্দরী মেয়ের উপর দৃষ্টিপাত অনেক কম, তার ফলে তেমন ভূমিকার সংখ্যাও বেশি নয়। তবে একটি চরিত্র দুটি উপন্যাসেই রয়েছে। অপরাজিতয় যে পটেশ্বরী দৃষ্টি-প্রদীপে সেইই হিরণ্ময়ী। তবে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জিতুর বিয়ে ঘটেছে।

এখন 'দৃষ্টি-প্রদীপ' নামকরণের সার্থকতা বিচার করি। তিনটি উপন্যাস যিনি একসঙ্গে পড়বেন তিনি বুঝবেন যে 'পথের পাচালী' নামটি তৃতীয় বইটির পক্ষে বোধ করি সর্বাধিক সঙ্গত হত। প্রথম বইটিতে পথ চলার ব্যাপারের চেয়ে পথের ডাকেরই জোর বেশী। অপুর 'পা-চালি'র সেখানে তো সবে শুরু। অন্যদিকে 'দৃষ্টি-প্রদীপ' নামটিতে অসঙ্গতি নেই। অপু ভাবুক ছেলে কিন্তু তার চোখের ঘোর খুব বেশি। আশেপাশে যা কিছু তার চোখে পড়ে—গাছপালা, নদীখাল, রোদ-মেঘ—সবই তার আঁখি মজায়, তার মন টানে। তার অজ্ঞানতে মনে সর্বদা যেন গুঞ্জরিত ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের এই ছত্রটির ভাব—

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে।

দৃষ্টি-প্রদীপে জিতু কতকটা যেন epileptic, মাঝে মাঝে তার মনের খেই হারিয়ে যায়, সে অন্যের অদৃশ্য নানা দৃশ্য দেখে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। এক কথায় তার অধ্যাত্মদৃষ্টির টর্চ যেন মাঝে মাঝে হঠাৎ জ্বলে ওঠে। এই রকম বলেই তাই বইটির নাম হয়েছে 'দৃষ্টি-প্রদীপ'। অপরাজিতয় অপুর এ দৃষ্টিশক্তি যেন বিলুপ্ত। তবে পথের পাঁচালীতে অবশ্যই এ দৃষ্টির ইঙ্গিত আছে। "হঠাৎ এক এক দিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সে দিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি-দিদি স্থাপ্ স্থাপ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পেছনে? কেমন অনেক দূর, না? দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দুর, তুই একটা পাগল!"

পথের পাঁচালী আত্মকথার ভঙ্গিতে যেন পরহস্তের রচনা, অপরাজিত যেন পুরোপুরি পরহস্তের রচনা, দৃষ্টি-প্রদীপ কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মকথার ভঙ্গিতে রচিত। এ ভঙ্গি উপন্যাসের বিষয়ের পক্ষে ঠিকই হয়েছে।

মোট কথা তিনটি উপন্যাসই লেখকের আত্মকথামূলক এবং আত্মভাবনাসন্দীপিত। তবে লেখকের অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে দৃষ্টি-প্রদীপ বোধ করি বই তিনটির মধ্যে সব চেয়ে সত্য ঘেঁষা রচনা।[১] জীবনের পারিপার্শ্বিকের প্রতি ঝোঁক এবং টান আছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই, বর্ণনার ঘনঘটাও নেই। দৃষ্টি-প্রদীপের জিতু পথের-পাঁচালীর অপুর মতো আত্মভোলা এবং অপরাজিতর অপুর মতো আত্মবিলাসী নয়। দৃষ্টি-প্রদীপে জিতুর দৃষ্টি অপুর দৃষ্টির তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছ।

পরলোক আর ধর্ম আমাদের কাছে প্রায় একই বিষয়। জিতুর দৃষ্টির প্রদীপে যেমন পরলোকের ছবি মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তেমনি তার চিন্তার পাকে পাকে ঠাকুর-দেবতার ভাবনাও মাথা তুলেছে। একটি মাত্র, এবং সেটি গুরুতর, ছাড়া জিতুর অধ্যাত্ম এষণা দৃষ্টি-প্রদীপ উপন্যাসের কাহিনীর পক্ষে নেহাৎ পাদপূরকের মতো। ব্যতিক্রমটি হল মালতীর বাবার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-আখড়ায় প্রায় বর্ষাকাল যাপন। এই মালতী হল দৃষ্টি-প্রদীপ উপন্যাসের নায়িকাস্থানীয় যদিচ সে গল্পের শেষের দিকে দেখা দিয়ে সমাপ্তির বেশ কিছুকাল আগেই পরলোকের নেপথ্যে চলে গেছে। অপরাজিতর লীলাও অনেকটা তাই, তবে কাহিনীর আস্তস্ত সে বোপে আছে। লীলাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবেসেও অপুর হঠাৎ-পাওয়া কিশোরী বধূ অপর্ণাকে ভালোবেসে তাকে নিয়ে ঘর করতে কিছু বাধে নি। দৃষ্টি-প্রদীপের মালতীকে সে ছেড়ে এসেছিল কিন্তু তাকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে নি। তথাচ হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করতে জিতু খুব ইতস্ততঃ করে নি। আসল কথা অপু-জিতুর মনে প্রবল টান ছিল তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ের দিকে। উদ্ভিন্ন-যৌবন তরুণীদের সে অবশ্যই খুব ভালোবাসত, তবে সে ভালোবাসা সৌন্দর্যের আসক্তি, যেন ভক্তের আরতি ও প্রদক্ষিণ। বেদীর দিকে হাত বাড়াবার মতো ভরসা হত না।

১। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন তবে কোন কোন ব্যাপার প্রথমকার বই দুটিতে বেশি সত্যঘেঁষা। যেমন অপু-জিতুর কলেজে পড়া। অপু পড়েছিল কলকাতার রিপন কলেজে, জিতু পড়েছিল শ্রীরামপুরে পাদরিদের কলেজে। বিভূতিবাবু রিপন কলেজে পড়েছিলেন।

অপু যে লেখক হবার চেষ্টায় আছে তার উল্লেখ অপরাজিতর স্থানে স্থানে আছে, এবং সে ইচ্ছা যে তার শিশু-কালের থেকে তারও ইঙ্গিত আছে। অপরাজিতর নায়িকা লীলার খাতায় সে গল্প লিখত; অপরাজিতর কাহিনী যার কথায় শেষ হয়েছে, সেই অন্যতম শৈশবসঙ্গিনী রানীর (রাণুদির) খাতায় শৈশবে লেখা আধখানা গল্প এখন শেষ করে দিয়ে তার হাতে পুত্রকে সমর্পণ করে অপু নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্চিন্দিপুর থেকে ছুটি নিচ্ছে।

নিজের প্রথম লেখা বইখানি সম্বন্ধে অপরাজিতয় বিভূতিবাবু যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি।

"বই লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বই-এর কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইএ লেখা থাকিবে ?···কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরণের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আমপাড়ানি, ফেরীওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলে-মেয়ে—এদের কথা।"

(২)

যে মানুষ মাটির কাছাকাছি থেকে গাছপালার সঙ্গে সহসংবর্ধিত হয়, যাদের জীবনের সুখদুঃখের পালা রাত্রি-দিবার আলো-অন্ধকারের দোলার মতোই সুস্পষ্ট এবং চিরন্তন, এমন মানুষের এক-জন ছিলেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশব থেকে প্রৌঢ় যৌবন পর্যন্ত বিভূতিবাবু যে বাস্তব ও কল্পনা সঞ্জীবিত যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে প্রাণরস পান করেছিলেন সেই পারিপার্শ্বিকের উপর তাঁর যে টান ছিল তা সাহিত্যিকের ভাবকল্পনা নয়, ভাব-উচ্ছ্বাসও নয়, তা হল ব্যাকুল ভালো লাগার "মন কেমনের হাওয়ার পাক"। তাঁর লেখার এ ভালো লাগার প্রকাশ হয়েছে সকরুণ nostalgia-য়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা "যেতে নাহি দিব" (১৮৯২) এবং গান "এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" (১৯১৬) বিভূতিবাবুর গল্প-উপন্যাসের যে বিশিষ্ট রস—romantic nostalgia—তার মর্মের ইঙ্গিত ধ্বনিত করে।

যে জীবনের স্পন্দন বিভূতিবাবু পল্লীতে-শহরে হাটে-বাজারে, ঝোপে-ঝাড়ে, অরণ্যে-পর্বতে, জঙ্গমে ও স্থাবরে অনুভব করে তার সঙ্গে মনের গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছিলেন সেই সহজ সরল জীবনস্রোতের ক্ষণভঙ্গুর প্রবাহ তাঁর রচনায়—গল্পে এবং গল্পের মালা উপন্যাসে—প্রতিফলিত হয়েছে। বিভূতিবাবুর গল্পে আমরা profundity অর্থাৎ অগাধ-উত্তুঙ্গ ভাব এমন কিছু পাব না, কিন্তু যা প্রচুর পাব তা হল fundamentality অর্থাৎ তার সাধারণ পাঠকের মনে থই মেলা গভীরতা। "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি রচনার অল্প কয়েক মাস আগে লেখা "বর্ষা-যাপন" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্প লেখার প্রেরণা উপলক্ষ্যে এক ধরণের ছোটগল্পের মোটামুটি যে লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন বিভূতিবাবুর অধিকাংশ গল্পের লক্ষণও তাই। অধিকন্তু মন কেমনের মোচড় একটু বেশীমাত্রায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধূলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—

বিভূতিবাবু সেই কয়েকটি অসমাপ্ত কথার সেই দু'চারটি অশ্রুজলের মুক্তামালা গেঁথে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের গ্রন্থাবলীর প্রস্তুত খণ্ডে দুটি গল্পের বই স্থান পেয়েছে। এতে সবসুদ্ধ বাইশটি গল্প আছে। কিন্নর দলের অন্তর্ভুক্ত এগারটি গল্পের মধ্যে আটটি গল্প—অর্থাৎ 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প', 'বুধীর বাড়ি ফেরা' ও 'বিধু মাস্টার' ছাড়া—সব গল্পই নারীহৃদয়ের ট্রাজিক কাহিনী এবং সে গল্পগুলি পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও দৃষ্টি-প্রদীপের মধ্যে থাকলে অসঙ্গত হত না। কোন কোন গল্পের প্রতিফলনও আছে উপন্যাস তিনটিতে। যেমন কিন্নর দলের প্রথম গল্প 'মণি ডাক্তার'। গল্পটি পড়লে অপরাজিতর নির্মলার এবং পটেশ্বরীর কথা মনে পড়ায়, দৃষ্টি-প্রদীপের হিরণ্ময়ীর কথাও মনে পড়ায়। 'একটি দিনের কথা'র রানীর সঙ্গে তুলনা করা যায় অপরাজিতর রানীদির। গল্পটিকে রাণীদির পূর্বকথা বলেও ধরতে পারি। 'খোস গল্প' বিভূতি-বাবুর শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যতম। গল্পের নেপথ্যচারিণী পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির বৃথা আশাহত প্রতীক্ষার প্রতিকারহীন নিষ্ফল বেদনা বুকে 'বাজে'। অত্যন্ত নিষ্ঠুর গল্প। 'বিধু মাস্টার'ও ভালো গল্প। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' ভালো পশু-গল্প। বাংলা সাহিত্যে এমন ছোটগল্প খুব কমই আছে। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' অলৌকিক কাহিনী বলে স্বতন্ত্র আলোচনা করছি। তবে এটিও এক হিসাবে নারীট্রাজেডি, তবে সে নারী মানবী নয়, দেবযোনি। দেবযোনিরও প্রেমের ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধা মেটে মানবের সঙ্গসুধায়। কিন্তু সে সঙ্গ ক্ষণিকের জন্য। ক্ষণিক মিলনের পরে যে চিরন্তন বিচ্ছেদ তা মানবকে উন্মাদ করে দেয়, দেবযোনি ফিরে যায় সঙ্গীহারা, নিপ্প্রেম সৌন্দর্য-দীপ্তির অতৃপ্তিলোকে। কিন্নর দলের আট-নটি গল্পকে যদি একটি বইয়ে স্থান দেওয়া যেত তবে সে বইয়ের কিছু মিল হত রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র সঙ্গে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত যে এগারোটি গল্প বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পরে 'রূপহলুদ' নামে প্রকাশিত হয়েছে তার সম্বন্ধে আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে তা পাঠকের কাছে নিবেদন করি। কেন এই নাম? 'রূপহলুদ' মানে কী? 'রূপতরাসী' জানি, 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি'তে আছে, 'রূপসোনা' জানি—গাঁয়ের নাম। 'রূপহলুদ' কি রূপ বাড়াবার জন্যে হরিদ্রালেপ? না 'গায়ে-হলুদ'এর আঞ্চলিক রূপান্তর? কিন্তু নামটির সঙ্গতি কোথায়? অবশ্য যদি 'হলুদ' বলতে 'সোনা' ধরা যায় তবে আপত্তি করব না।

যাই হোক, নামে কিছু যায় আসে না। রূপহলুদে সংকলিত একটি রচনা গল্প নয় ('ছোটনাগপুরের জঙ্গলে'), আর একটি রচনাও প্রায় তাই ('বর্শেল')। বাকি নটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি অলৌকিক বা ভৌতিক। সেগুলি পরে আলোচনা করছি। 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' মনে হয় যেন দৃষ্টি-প্রদীপ থেকে সরিয়ে আনা।

'আমার ডাক্তারি' কিন্নর দলের অন্তর্ভুক্ত 'মণি ডাক্তার' গল্পেরই রূপান্তর। সেই সঙ্গে দৃষ্টি-প্রদীপের নিমচাঁদের বৌয়ের কথাও মনে পড়ায়।

(৩)

বিভূতিবাবু অলৌকিকে আস্থাবান ছিলেন। তার পর্যাপ্ত পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়। এমন লেখক যে ভূতের গল্প লিখবেন এবং ভালো গল্প লিখবেন তা প্রত্যাশিত নয়। অথচ বিভূতিবাবু ভালো ভূতের গল্প লিখেছেন। এ গল্পগুলি তাঁর অন্যান্য অতিলৌকিক গল্প থেকে কিছু স্বতন্ত্র রকমের।

এই গ্রন্থাবলীর সংকলনের মধ্যে বিশুদ্ধ ভূতের গল্প আছে তিনটি। তার মধ্যে একটি "ভৌতিক পালঙ্ক", কিছু নিরেস রচনা। মনে হয় কাহিনীবস্তু অনুত্রলব্ধ। আর দুটি "বিরজাহোম ও তার বাধা" এবং "কাশী কবিরাজের গল্প" লেখকের শ্রুত ট্রাডিশনাল ধারার গল্প। সেই কারণেই ভূত-বিশ্বাসী লেখকের হাতে গল্প দুটি অমন উৎরেছে। 'মায়া' গল্পটির প্রারম্ভ অপরাজিতর অপুদের মনসাপোতায় যাওয়ার মতো। এটির মূলও ট্রাডিশনাল হতে পারে, তবে এতে অপু-জিতুর Projection কিছু পড়েছে মনে হয়। 'কাদা' গল্পটি ভৌতিক নয়, তবে ভৌতিক গল্পের কৌতূহল জাগায়।

তারানাথ কবিরাজ তান্ত্রিকের অভিজ্ঞতা রূপে বিভূতিবাবু দুটি অলৌকিক গল্প লিখেছিলেন তার মধ্যে একটি কিন্নর দলের অন্তর্গত। এই তান্ত্রিক-জ্যোতিষী চরিত্রের আভাস অপরাজিতর আছে। সেখানে তিনি কবিরাজ, থাকেন উত্তর কলকাতায়, তাঁর পত্নী অভাবের সংসারে সর্বদা কর্মব্যস্ত, নিপুণ এবং সহৃদয়। তাঁর কথা অপু বহুদিন ভুলতে পারে নি। গল্পটিতে জ্যোতিষী থাকেন ধর্মতলার কাছে। এঁরও সংসার অসচ্ছল। জ্যোতিষীর বৌটি গল্পের নেপথ্যে রয়ে গেছেন, তবুও বোঝা কঠিন নয় যে তিনিই কবিরাজ বধূর সাজে দেখা দিয়েছিলেন একদা। গল্পে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছে তাঁদের বড় মেয়ে চারি, বয়স দশ বছর। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বিদ্যাধরী সাধনার কাহিনীর চেয়ে তারানাথ জ্যোতিষী ও তাঁর সংসারের ছবিটিই আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে।

(৪)

'উৎকর্ণ' পাঁচ বছরের (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৬-৪১) ডায়রি থেকে সঙ্কলিত। প্রথম তিনটি উপন্যাস তখন লেখা হয়ে গেছে, 'আরণ্যক' লেখা চলছে। বিভূতিভূষণের লেখকমর্যাদা তখন প্রতিষ্ঠিত। তিনি নানাস্থানে যাচ্ছেন বেড়াতে ও সভাসমিতি করতে, অভ্যর্থনা কুড়োতে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এ সব বর্ণনা কৌতূহল জাগায়। ব্যাপার বেশিদিনের নয়, কিন্তু দেশের ভাবগতিক সব দিক দিয়ে হঠাৎ এমন বদলে গেছে যে, মনে হয় কবেকার এ সব কথা। বিভূতিবাবুর ভাব-জীবনের কিছু কিছু নির্দেশও তাঁর ডায়রিতে আছে। তাঁর সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সে সব কথা মূল্যহীন নয়। তবে আপত্তি করছি গ্রন্থনামটি অতিরিক্ত কবিত্বময় বলে। কাব্যগ্রন্থ হলে নামটি মানাত।

শ্রীসুকুমার সেন

দৃষ্টি-প্রদীপ

॥ ১ ॥

জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু'জনে ভাত প্রায় শেষ ক'রে এনেছি এমন সময় ছোট কাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই ?

আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি! আমার অনুমানই ঠিক হ'ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো ?

দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, দাদা যেন হতাশ হয়েচে। মাছ খাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ'ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না—দেখছে এখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি, পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু মুঠো ভাতে কটি ভাইবোন কোনরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্চি, এখানে আমাদের না আছে জোর, না আছে কোন দাবি—তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা ক'রে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময়ে ভাগের মাছ পাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়—এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেও আসল অবস্থাটা খুলে বলতে পারিনে তাতেও কষ্ট হয়।

দাদা বাইরে এসে বললে—মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল—এত মাছ সব হারু আর ভুন্টিয়া খেয়ে ফেলেচে! বাবারে, রাক্কোস্ সব এক-একটি! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।

দাদাকে ভগবান এমন বোকা ক'রে গড়েছিলেন কেন তাই ভাবি।

সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেচি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে—সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এক কাঁসি মাছের তরকারি দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট-দশখানা তাতে—আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমত একটুকরো—জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটা কাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভাগ্নে-বৌ বসবে। সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাত থেকে দিতে পারতেন! কিন্তু কই, তা নিয়ে সীতা তো কখনো কিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না! আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে, আমি সে-সময় নিতাইকাকার জন্যে আগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম—সীতা কোন কথা আমায় বলেনি। এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরের ওপর তো দেখে আসচি। অবিশ্যি নিজের জন্য আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।

মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোন কালে। এই শীতকালে মাকে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা'কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোন

কালেই, চারিধারে বড় বড় আম আর সুপুরির বাগান। একটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কন্‌কনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন ক'রে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগ থাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি! ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?

সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পুজো-আচ্চার দিনে—এ বাড়িতে বারো মাসের বারোটা পূর্ণিমাতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা মাসে একটা লেগেই থাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পুজোর বাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্ত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার—পুজো-আচ্চার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সে ব্যাপারের দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুরঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয়, মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে ও-সব কাজ তার অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমা বলবেন,—কোঁৎকুষি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজোবৌ? কতদিন ব'লে দিইচি তামার পাত্তরে তেঁতুল নেবু না দিলে ম্যাড়ম্যাড় করবেই—শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কি আর—ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু ছেদ্দা ক'রে লোকে করে? সবতাতেই খিরিস্টানি—

মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বলতে যান—"না বড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুর-ঘরের তামার বাসন বরাবরই—"

জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বলবেন,—আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরোয়নি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের? কা'কে শেখাতে এসেচ? কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন-মাজা কা'কে বলে—

জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কর্ত্রী, এ বাড়ির সর্ব্বেসর্ব্বা, পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভাগ্নেবৌ, মাসীর দল, পিসির দল, সবাই যখন মেনে চলে—ভয় করে।

আমার ইস্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তা'হলে।

ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বলল, জিতু, তুমি যখন ইস্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না? ওর লেখাপড়া তো হ'ল না কিচ্ছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনে দিতে পারি, জিজ্ঞেস করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয় কিনা?

আমি বললাম—দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওর তো নিচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।

ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের ক'রে আমায় দিতে গেল। বললে—তাহ'লে নিয়ে রেখে দাও, আর আজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকে ডেকে খেতে বসিও। ও আমার কথা শোনে না—তুমি একবার ইস্কুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তারপর

থেকে ভয়ে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠচে দিন দিন।

তারপর আমার হাত দুখানা খপ করে ধরে ফেলে মিনতির সুরে বললে, এই উব্‌গারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু—আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারি নে, বৌ মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি ব'লে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা? ব'লো একটু ভুবনকে বুঝিয়ে।

এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখে সে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর এক সতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে, এই ভয়ে জ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া ক'রে দেয়। কথা থাকে, এরা ওদের দুজনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। কিন্তু এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরানীরও অধম হয়ে। রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরানীকে চাকরানী। আর এত হেনস্থাও সবাই মিলে করে ওকে!

ভুবনের মা হয়েচে এ সংসারে অমঙ্গলের থার্মোমিটার। অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়ের দোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন—যেদিন থেকে ও আমার বাড়ি ঢুকেচে, সেইদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর ভাগ্যি নেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর—তখুনি কর্ত্তাকে বলেছিলাম ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, তা কাঙালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে!

আমি নিজের কানে কতদিন এ ধরনের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেননি।

চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিল বললে—জানো জিতুদা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন? ও-পাড়ায় মেজ-জ্যাঠামশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারে আসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরের বৃন্দাবন মুখুয্যের বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরে এই দু-মাস আমাদের পালা।

দাদাও সেখানে ছিল, বললে,—খুব খাওয়ান-দাওয়ান হবে?

সলিল বললে—যে-দিন আসবেন, সে-দিন তো গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন, তা ছাড়াও রোজ বিকেলে শেতল হবে, রাত্তিরে ভোগ—সে ভারি খাওয়ার মজা।

দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়িতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেল, ঠাকুরঘর ধোওয়া শুরু হ'ল, বাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষা চলচে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেচে, পাড়ার অনেক ঝি-বৌ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজে সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারি কুটচে একরাশ।

কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারকেলের নাড়ু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটকিপোতার গোলাবাড়ি থেকে গাড়িখানেক আখ, শশা, কলা, নারকোল এসেচে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানো ব্যাপারে বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে ধোওয়া কাপড় পরিয়ে লাগানো হয়েচে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়া ধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্ত্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় পরে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে

দিতে দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ঠাকুরঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি—আমার ভারি আনন্দ হ'ল, ইচ্ছে হ'ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু ভয় হ'ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি কাপড়ে আছিস্ তার নেই ঠিক, যা সরে যা।

এমন অনেকবার বলেচেন—তাই ভয় হয়।

বেলা একটা পর্য্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র—তাদেরই বাড়ি, তাদেরই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিন ভাই-বোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়েও খেতে পারিনে। মা ব্যস্ত আছেন নানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয় না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই! বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনদিনই আমাদের খাওয়াদাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ তো সকলেই মহাব্যস্ত।

বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণে ছেঁচ্‌তলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বকচেন—ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবে তোমাদের? এখনো বামুন-ভোজন হ'ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে,—দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগ্‌গে ঘণ্টা বাজবে যে! বুড়ো দামড়া কোথাকার—ও-সব খিরিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে না বোলে দিচ্ছি, মুড়ো ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও সব অনাচার হবার জো নেই, যখন করেচ তখন করেচ।

মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুনতে পান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম—ওখানে কি কচ্ছিলে?

দাদা বললে—কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দুখানা তিলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম—বড্ড খিদে পেয়েচে তাই। জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়ে কি বকুনিটাই—

ব'লেই লজ্জা ও অপমান ঢাকবার চেষ্টায় কেমন এক ধরনের হাসলে। হয়তো বাড়ির কোন ছেলেই এখনো খায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতেও ভাত নামতে-না-নামতে সকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হ'লে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ।

আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ'ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পুজোর ধুমধাম, এর যেন কোথায় গলদ আছে। কোথায়—তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমন মনের সঙ্গে খাপ খেলো না আদৌ।

আর কিছুদিন পরে একটু বয়স হলে আমি বুঝেছিলাম যে, এদের ভক্তির উৎসের মূলে এদের বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এদের উন্নতি করেচেন, ফসল বাড়াচ্চেন, মান খাতির বাড়াচ্চেন—এঁরাও ভগবানকে তোয়াজ করচেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতি পূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পূজো হয়, সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে দুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, শুধু তাই নয়—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বই কেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা

হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকো বোঝাই হয়ে আসতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁরা প্রতিবার এই সময় পাঁঠাবলি দিয়ে মনসা পূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পুজো ঘরের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মীপুজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতার পূজো, গোপীনাথ জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।

বাবার মুখে শুনেচি, এ সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদা গোবিন্দলাল• মুখুয্যের তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলাল মুখুয্যে নায়েবী কাজে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ অঞ্চলে একশো বিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি, আমি এতদিনেও জানতাম না, এই সেদিন জ্যাঠামশাইদের আড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছি।

জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা ক'রে খুব উন্নতি করেছে। এঁদের বর্ত্তমান উন্নতির মূলেই এঁদের পাটের ও ধানের কারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই—সবাই এই আড়তের কাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুত ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনো কালেই এ-গাঁয়ে বাস করেননি, জমিজমা যা ছিল তাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে জ্যাঠামশায়কে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস্ নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেছি যে, এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই এবং জ্যাঠামশাইদের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।

জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যও আমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেননি—আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরত জ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়ে আমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেচে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছু তেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়ের কাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে আসবে—পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে উঠে আসছিলেন, ও সে-সময় ঝাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুন জল ছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্যে মার খাবে—বাসি কাপড়ে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সে-দিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েচে। কেন বাপু যাওয়া?

কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়ি ঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ'লেই আর রক্ষে নেই।

জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলছি—এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিণ্টু, বাদল, উষা, কাতু—ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন, আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে—আমি আর ভুবন যে সেখানে আছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বলতে ব'লে মায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে দু'জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম—ভাই, এক ঘটি জল নিয়ে আয় না খাবো! খাবার খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করচি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটিটার দিকে চেয়ে বললেন—এ বাটিতে হাত ধুয়েচে কে?

এ ঠিক জিতুর কাজ, নইলে এমন মেলেচ্ছো এ বাড়ির মধ্যে তো আর কেউ নেই।

কি ক'রে ফেলেচি না জানি। ভয়ে ভয়ে বললাম—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা মারমুখী হয়ে বললেন—কি হয়েচে দেখতে পাচ্চো না ? দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিঁটিয়ে এঁটো ক'রে বসে আছো ?

মেজকাকীমার এক পিসি না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমার খোশামুদে। বয়স পঞ্চাশ ষাট হবে, কালো, একহারা দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমি আড়ালে বলি—তাড়কা রাক্ষসী। নানা ছুতোনাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।—কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েচে ?

জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আহ্নিক ক'রবো বলে কাপড়খানা কেচে আল্নায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়ো ধাড়ী ছোঁড়া করেচে কি, এখেনে মুড়ি খেয়ে সেই বাটিতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই তো কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে ?

বুড়ী অবাক হয়ে ভান ক'রে বললে—ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে! এতে আর হয়েচে কি ? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বই তো নয় ? জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েচে, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোন কথা ; ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই—একেবারেই মেলেচ্ছো—ওর মাও তাই। হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েচেন, আর এই সব অনাচার কি ক'রে বরদাস্ত করি বল তো তুমি ? আমার কোনো ছেলেমেয়ে ওরকম করবে ? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটিতে জল ঢাললে যে সকড়ি হয় সেও জানে না! শুনবে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিস্টানের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেচে, ভালো শিক্ষে দিয়েচে কে ? হিঁদুর বাড়িতে কি এ সব পোষায় ? বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তো ও জানবে কোথা থেকে ? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুরঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুর এলেন (বুড়ী দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ ? ভাগ্যিস দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক, বা আমাকে আগের ওই-সব কথা বলাতেই হোক, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটিতে জল ঢালার দরুনে মুড়ির বাটি অপবিত্র হবে কেন ? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেননি। বললাম—ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিস, জলও খাবার জিনিস—দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন ?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলেন—তোর কাছে শাস্তর শুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তো খিরিস্টান, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস কি, তোর মা-ই বা

জানে কি? ওইটুকু ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন! শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিস্টানি কোরে—

বুড়ী বললে—মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যে কম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও-পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো—

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। তাঁর মরণের পরে এখন তাঁর কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম—ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরি কি দিদিমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলীমশায় মারা গেলেন, তিনি তো খুব ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেন্সন্ আনতে গিয়ে ও-রকম ক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েচে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন?

আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরনের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। সে যুক্তির পথে গেলই না।

—মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধ-পোড়া ক'রে ফেলে রেখে আসেনি! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাসনে, অনেক আস্তিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি, খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনেচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলে এখনও ভূত হয়ে—

কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম—মিথ্যে কথা, বাবা কখ্খনো,—তার যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরীয়া না হয়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম—জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেচি, বাবাকে তা হলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—

এই পর্য্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিল খিল ক'রে হেসেই খুন।—হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি—কি বলে শুনেচো একবার—

জ্যাঠাইমা বললেন—যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে এখানটা গাড়ুর জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে ব'লে দিচ্ছি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনো এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যেও তো—

দিদিমা বললেন—ওমা; বুলু, হাবু, সতীশের কথা ব'লো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সে দিন সতীশকে বলচি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো

তো? তো বলচে—আমার বিছানার কাপড়, আমি তো ওঁাড় ছোঁব না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, ভাখো শিক্ষের গুণ স্থাখো—কেমন ঘরে মানুষ তারা। আহা বেঁচে থাক্—সব বেঁচে থাক্—

মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেচে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প'রে তেল বেচতে এসেছিল? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্তে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে?

॥ ২ ॥

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমান-নগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন) সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কন্‌কনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্‌প্লাঙের ডাক-বানার খড়্গা সিং যে আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসতো—তার কথা, মিস নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচের সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের শুরু হয়েচে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্তে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগলো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, শেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উম্‌প্লাঙের মিশন হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আনতে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো, ভালবাসতো মিস নর্টন। ভাবতে বসলে এক একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে!···

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াশা

নেই ; বরফ পড়বার দিন বটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, থাপা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিস আনতে দেবো।

আমি বললাম—কি জিনিস রে?

সীতা দুষ্টুমের হাসি হেসে বললে, বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিস আনাও, আমায় বলো?

একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তরকারি আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম জিনিসটা একপাতা সেফটিপিন্। এরই জন্যে এতো!

একটু বেলায় বরফ পড়তে শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোকা থোকা পেঁজা কার্পাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গনগনে আগুন—হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি দাদা ও সীতা লুডো খেলতে শুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা-ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী, থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে—আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস নইলে সে আগেই খাবে।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে—মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।

সীতার কথা শেষ না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হতেন, যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন সেটা হ'ল না।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুকরো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনো সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে

ফিরে খেতে বসেচেন। মাংসের বাটি থেকে চর্ব্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেই সীতা বললে—বাবা আমি খাবো—

দাদা বললে—তুই সব খাস্‌নে, আমাকে দু'খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্ব্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক এক টুকরো দিয়ে বাকি টুকরোগুলো বেড়ালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন—জিতু, গায়ের মাপটা দিস তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জ্জি আসবে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো—

সীতা বললে—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না। আমি সব দেখে-শুনে দেবো—আরও করবার জিনিস রয়েচে—নিতুর মোটে দুটো জামা, ওর ওভারকোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে—যেমন শীত পড়েছে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও—

বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল দুই দূরে মিশনারীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফ্‌রির বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানে ও বড় সাহেবের বাংলোতে ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরনের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনোয় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়েছিল—একটা গল্পের বই—'সুবর্ণবণিক পুত্র'। এ কথায় আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভালো। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, তারই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা ভালো লাগতো।···

মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্পবয়সী মেমটির নাম মিস্ নর্টন—একে আমার খুব ভালো লাগতো—নীল চোখ, সোনালী চুল, আমার কাছে মিস্ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার বার ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ'ত—ভালো করে চাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ'ত হয়ত সীতা দেখছে—সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো যেন কাটতে চাইতো না, দিন গুনতাম কবে বুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস্ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগারো-বারো বছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ'তে হ'ত। দিন গুনে গুনে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি হয়তো সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস্ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিস্বাদ হয়ে যেতো, মিস্ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ'ত, অথচ কেন আজ মিস্ নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হ'ত।

মেমেরা এক-একদিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন

থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু'—সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতাম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল-খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্ততঃ করি—ও তা নির্ব্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনোই ওখানে একা যেতে পারবো না। আমি ভেবে উত্তর দেওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হয়ে চ'লে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জ্জন ঠাকুরতলার দিকে।...ওই রকম ওর মেজাজ।...

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশন বাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট কত কি দেয়—ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে—মথি-লিখিত সুসমাচার, লূক-লিখিত সুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরো অনেক সব। যীশু একটুকরো মাছ ও আধখানা রুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটি খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না; আমার শখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্যে এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে—কি ক'রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালোই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জ্জন চা-বাগানের একপাশে পড়ে থাকে—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সে বাংলোতে থাকে, বলে—মারবে বাবা?... না হয় মরে যাবো—তা কি হবে? রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্ত উপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেয়েদের ধর্ম্মের এই বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেয়েরা মদ্যপানের কুফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতে—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চারবার চা-ঝোপের আড়ালে লুকনো বন্ধ হয়নি।

প্রায়ই আমি আর সীতা কার্ট রোড ধরে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোস্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—উম্‌প্রাঙের ডাক-রানার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উম্‌প্রাং পর্য্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো শ ফুট নেমে গিয়েচে, মিস্ নর্টনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝি নে তার মানে কি। আমাদের অত দূরে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোস্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম—দু-ধারে ঘন নির্জ্জন বন। আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরল গাছ নেই—বনের তলা আর পরিষ্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনে ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোডেণ্ড্রন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জ্জন বনানী গানে মুখরিত ক'রে তোলে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো, তবে সাধারণত সে আমাদের এই সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি। দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জায়গায় জায়গায়—কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা—মাথার ওপরে আকাশটা যেন নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকম নির্জ্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিস দেখেচি।…

হয়তো দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলে যেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উম্‌প্রাঙের সেই পোড়ো পোস্ট আপিস ছাড়িয়েও চলে যেতাম—পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বনজঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতার জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বন শুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত—সেই ধরনের একটা

নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে দেখেছি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ—আর একটা পাহাড়শ্রেণী—সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গিয়েছে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেছি, তারা আমাদের মত মানুষ না—তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না—কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্ব্বত, সত্যি—আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগে আমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায়ে ও-সব কি দেখা যায়?···

মা বললেন—কোথায় রে?

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী নয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা?

—দূর পাগ্‌লা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেছি যে—তুমি দেখনি কখনও?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরকন্না তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসর নেই—ও-সব তুমি দেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনো কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে—সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমার সয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি—ও সবাই দেখে না—যারা দেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্‌চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে ব'লে মনে হ'ত—তখনো পর্য্যন্ত বুঝিনি যে ও-গুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়। সেবার বাবা আমাদের সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জ্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার

মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হ'ল যে ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন গার্টার, উল আর উল বুনবার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।···

সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিণ্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েচেন সোনাদা স্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জলে ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কার কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরনের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভূটানের দিকে গিয়েছে। তার কূলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বলত আকাশ ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বলত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি, তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরনের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন্‌সন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল, এ আমি দেখেছি, জানি—আরও ছেলেবেলার কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরনের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কূলকিনারা নেই, অপার···ভূটানের দিকে চলে গিয়েছে···

মিস নর্টনকে এ-সব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন মিস্ নর্টন আমার কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে, হয়তো অনেক সময়—তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেকবার ভেবেছি এইবার বলব—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও আমার সে গোপন কথা মিস্ নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি সে-সময়ে মিস্ নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত···সারা শরীরের সঙ্গে জীবও যেন অবশ হয়ে থাকত···চেষ্টা করেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হ'ত এবং এখনো মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্ নর্টনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিল। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনিই বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা স্টেশনে যাবার পথে আমাদের

বাসায় আসে। সে একবেলা আমাদের এখানে ছিল, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হ'ল, কাছে ডেকে তার পাশে বসালে, আমার মুখের পানে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর সে আমার হাত দেখলে, কপাল দেখলে, ঘাড়ে কি দাগ দেখলে। দেখা শেষ ক'রে সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায়?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন?

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিল না, ফিরলও না, চলে গেল।

আমি কিছু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যে নানা অদ্ভুত জিনিস দেখি সন্ন্যাসী সেই সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জানতাম। সেই জন্যেই তো আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিওনে।

পচাং চা-বাগানের কেরানীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাকতাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা স্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতেদেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনই সবাই চলে আসছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরি করে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাকবার জন্যেও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে না বলে আসা হয়েছে—বাড়ি না ফিরলে বাবা আমাদেরও বকবেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হ'লেও আরো অনেকবার আমরা মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেচি গিয়েচি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আসছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওক্ আর পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরনের, আরো নিবিড় গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলছে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত-প্রেত ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশির সুরে বললে—দাদা, যদি আমাদের সামনে ভালুক পড়ে?···হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ'ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল? বাহাদুরি দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল—তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। গাছের ডালে শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এক ধরনের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার বার জোর ক'রে বলতে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।—দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি—হঠাৎ দাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা ঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেমনি। পার হ'তে

সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু !···চল পচাওে মাসিমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে—বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো।

দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি ? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়ে লিণ্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি ?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয় !

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বন জঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছলে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই আল্‌গা হয়ে খসে পড়লে আটশ' কি হাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পাশের ছোট ফার্নের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই শুরু করলাম—অন্ত কোনো উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল—রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়ে উঠল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দুজন মানুষে কোনোগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খাদ, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বারোশ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই উঠচি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাটো গাছ-পালার জঙ্গল খুব বেশী। ডাইনের পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপ্‌সি করে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনেই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জানতাম ভালুক যে পথে আসে পথের ছোটখাটো গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাটকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেছি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়···আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল—স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আসছে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল—তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরনের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া গেল—আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছে না·· কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য—একটু পরেই আর স্তূপটাকে দেখতে পেলাম না—যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্ছে। আরো দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিণ্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উদ্‌গ্রামের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জানতাম—দাদা তার দোকানটাও চিনত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে—আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার ও ময়দা মাখতে বসল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাব না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের

ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই, তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন; ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাডে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে! এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড় পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান—ছোট সাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি!

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানীর কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়ে ছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরো কি ব্যাপার হয়েছিল না হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনিনি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালোবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জ্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো গোলমাল বা এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মাকে বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়তো আমায় বললেন—এক্সারসাইজ করিস্ নে কেন? বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি—হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ বার ক'রে ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গেল—বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সাম্‌লাতেন। সেইজন্যে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই—কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে?

এই সবের দরুন আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি ততটা ভালোবাসিনে।

দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চলল, কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপিচুপি আমায় বললে—শোনো দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কিনা—তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগির যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না?···দেশে চিঠি লেখা হয়েছে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক—সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্ব্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াশা, বরফ-পড়া দেখে আসছি—কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোনো দিন মানুষ হইনি ব'লে আমরা কোনো বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন একদিকে যেমন

অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল, অন্যদিকে মনটা যেন একটু দমেও গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ ক'রে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি স্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব যোগাড় ক'রে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্ব্বত-প্রাচীর, ওক্-পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী; মেঘ-রোদ-কুয়াশার খেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ।...তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রডোডেণ্ড্রন ফুলের বন্যা এসেছে—সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা নাহ'লে তো আর চাকরি যেত না—বাবারই তো দোষ!

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনো—রেলে আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতল ভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়ীটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরনের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ? এমন রঙ আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েছে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রঙ নাকি 'দুধে-আলতা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা এই আমরা শুনলাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাকবার ঘর দেখে তো আমরা অবাক্। এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে! নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে ব'লে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলার তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো! অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিসপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা।

গর্ব্বের সুরে বললাম—আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো।

জ্যাঠাইমা বললেন—তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের?

আমি বাহাদুরি ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক্ দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা-টানা সুরে বললেন—মাগো মা! কি হবে, আমাদের ঘরে-দোরে তো যখন-তখন উঠছে, হিঁদুর ঘরের জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলছেন। কিন্তু শুধু এ কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে-ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্ত্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরো জানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন ব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েকবার এখানে এসে চাল দেখিয়ে গিয়েছিলেন, এরা সে-কথা ভোলেনি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনো দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগতো, বিশেষ ক'রে সীতার। সীতা আজ এসে হয়তো বলে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা!

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক এক পাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনো দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই—পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনি নে, নামও জানি নে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি ব'লে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারি এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল—এর পাতা তুলে গায়ে ঘষতে পারিস?···বেচারী সীতা জানত না কিছু, সে বাহাদুরি দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আচ্ছা ক'রে ঘষেছিল—তারপর আর যায় কোথা!

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফে মোড়া পর্ব্বত-পাহাড় নেই—আরো কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপিচুপি বললে—এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা—জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুরবেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচের নেই, যখন-তখন বিছানা ছোঁয়! যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন, বুঝলে?

ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব্ব সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম—যা যা, তোঁকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছুই বলেননি, আমায় ডেকে তার পরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস তা?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যিই করতে পারে! কি ক'রে জানবই বা এ সব?

মুশকিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা জ্যাঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। আমরা লোকালয়ে কখনো বসবাস করিনি বলেই হোক্ বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আল্‌না ছুঁতে নেই, তার দরুন আল্‌নাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই—এ-সব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি—যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কিতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি—কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেছ সব? ভাগ্যিস চোখে পড়ল! এক্ষুনি তো ওই সব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে!···মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খেলা হচ্ছে গ্যাখো!

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অস্ত কোনো লক্ষণ তো নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক হয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে তো কিছু নোংরা নেই? এসে দেখুন বরং কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেননি। তারপর বললেন—চোখে কি চ্যালা বেরিয়েছে নাকি? এঁটো হাঁড়িকলসী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে?···কাচা কাপড় প'রে কোন্ ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না? আবার সমানে তক্কো!

তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুনি নাইতে হবে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম—নাইতে হবে কেন?

সামনে হাত তিন-চার দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনে কেউ। বিশেষ ক'রে এটা আরো বুঝতে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রে যেতে দোষটা কিসের! চা-বাগানে থাকতে তো কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড, পচাঙের বাজার; এখানেই বা কি বন, সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জ্জন, আধ-অন্ধকার—কতদূরে, যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় প'রেই তো গিয়েছি—

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাইবো না, কখ্খনো না।

আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাইবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্য্যাতনের কোনো ত্রুটি করলেন না। বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানে তক্কো তো করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুঁয়েমি!

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছেন, ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগচীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে তাদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাক্ষণ আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আনলে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলছি—ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান!—যেখানে হয় যাক্, এত বড় আস্পদ্দা সব—

মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ! বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-একদিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশাই, দিদিরা কেউ একটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল, আলো নিবল, মা চুপিচুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন—জিতু, খুড়ীমার কথা শুনলি নে কেন? ছি—

আমি বললাম—উনি যে কথা বলেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কখ্খনো শুনব না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সামলাচ্চেন মনে হ'ল। বললেন—তুই যদি এরকম করিস তা হ'লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাকতে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বলবার জো আছে এখানে? ছি বাবা জিতু, ওরা যা বলে শুনবি। ওরা লোক ভাল না—আগে জানলে ভিক্ষে ক'রে খেতাম তবুও এখানে আসতাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লে হয়।

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড়-জামা এত ময়লা কখনো বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন—শোন্ জিতু, এই পুঁটলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচাষ্যিদের নস্যির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসব'খন, তুমি বসে চা-টা খাও। বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যেজন্তে গিয়েছেন তার কোনো যোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হ'লেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গোরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেছি তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলব না। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তাঁরা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাইনে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনোই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধ লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হ'লেন খুড়তুত-জাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভালো—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোশামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কতবার শুনেছি—তোমার মত ভাগ্যিমানী ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে! সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হক্ কথা।

মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভালো লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুকনো মুখে কতবার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—চা হয়েছে সীতা?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেছে চা-চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে?

কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এইরকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি!

চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চা হচ্চে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্চে না, মা বলছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!···আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্ত্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এ সবেও নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চল্ শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে—

আমি শিমুল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশির সুরে বললুম—শিমুল তুলো? কোথায় বাবা?···চলো যাই—সীতাকে ডাকবো?

বাবা বললেন—ডাক ডাক, সবাইকে ডাক—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্মবার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ যোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে কি জন্যে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা করগে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম, মা, বাবা যে শিমুল তুলো কুড়োবার—, কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেননি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল?

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।

এখানকার স্কুলে আমি ভর্ত্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইতে না ব'লে তাকে ভর্ত্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাস্টার মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকি দু-মাসের—আমার ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এসো খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না পাবে, ছোট মুখ

ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক্ হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে কিতে-ঘুন্সির দোকানটাও নেই, তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হতে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনো তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু মিনিট···পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম, আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুনতে পারি, পাখিদের ডানার সব রঙ বেশ ধরতে পারি।

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই কিতে-ঘুন্সির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি? কাউকে এ কথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক'রে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে, কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটাচচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ ক'রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভালো খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্ত্তমান অক্ষমতার দরুন মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্ত্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাকতে মিস্ নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক্ তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি ময়দা কিশমিশ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পরদিন মিস্ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন! তার পর অবিশ্যি মিস্ নর্টন ভাল ক'রে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না—অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম্ পূজো আচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল

ঠাট্টা, বিদ্রূপ, স্নেষের ব্যাপার—জংলীপনা খিরিস্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনোদিন কথাটিও বলেননি। . ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। সেই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিওনি কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের যোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে আমাদের চা-বাগানের শৌখিন জিনিসপত্র, দেরাজ, বাক্স—এই সব বেচে চলছিল—সব সময়ে তার খদ্দের জুটত না। মা বৌমানুষ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ও সব মানতেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যেদিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিস বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ার মেয়েদের কাছে। প্রায়ই শৌখীন জিনিস, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা এই সব—সেলাইয়ের কলটা ছোট কাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভার-কোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরি করেছিলেন।

চাল না হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেছে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা! কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করলেই ছিঁড়ে যেত, মা অমনি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমনি কথাবার্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্য্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস-দুই একটা গোলদারি দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই—সেজ জ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা একদিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখছি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভাল মানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্ত্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেণ্টা গুলে রঙ তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেণ্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচেন—সীতা বিছানার সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ

মুছছে। আমার জাঠতুতো ভাই হেসে বললে—ঐ ত্যাখ্ তোর বাবা কি করচে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েচে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেচে; সকালের গাড়িতে যাব কিনা তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—কটা বাজল রে খোকা?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হননি। এ অন্য জিনিস। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের মতো একটা ছাপ দিয়ে গিয়েছিলে—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে-রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে কানে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিশের লালচে পুরানো বিচিওয়ালা তুলো, মেঝেতে বসে মা কাঁদচেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমারা জড় হয়েচেন—খুড়তুতো ভাই-বোনেরা হাসচে।…দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পরদিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগ্ড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে, অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্ত্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে—চোখের কোণে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরেই বসে আপন মনে কত কি বকছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শান্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক্ দিয়ে উঠলেন। সে ভান-করা ভয়ের সুরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে নাকি? বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

একজন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলছে ত্যাখ্—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোন কথা বলচি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ করে বললেন—বৌমা, সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেছেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না…তা তোমার একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না—কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেল না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে! আহা, কি কষে কষেই বাঁধলে। অস্ত দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না যা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কি-পুকুর ধারের গোয়াল-বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেছে যে। সেজ কাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত ক'রে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বলতে তাঁরা বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?…তা হলে পা খুলতে কতক্ষণ—তার পরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতরে যাও—নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েছে বাবার হাতে। সেই রকম তুলোমাখা অদ্ভুত মূর্ত্তি!…

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চ'লে গেলুম—একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দিন কতক এই ভাবে কাটল। তারপর পাড়ার দু-পাঁচজন লোক এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম, বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। শীগ্‌গীরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করচি, এমন সময় সীতা বললে—ঐ যে বাবা!…দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন, ভাত আছে? কাল ঐ দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাই নি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসচি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিনরাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল যোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার জো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের

ওপর বিদ্রূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল, ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাদের। ছ-বছর বয়স পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।

সেদিন সকালে সেজ খুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজ খুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবি নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যে সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে···এসে দেখুন—

শেষ পর্য্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলে যে নেবু আমাদের ঘরে আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়াঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিল না।

জ্যাঠাইমা এ বাড়ির কর্ত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও, নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বলল—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন-দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির যোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ও পাড়ার সবাই বললে পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলে-জঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না···গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব! মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাই-ফরমাশ করেন—জল দাও পান দাও আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও ক্ষেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত ক'রে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয় নি। নিজেও ঘুমুবেন না; কাউকে ঘুমুতেও দেবেন না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরেজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে, ঘুমুলে নাকি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন,—তোমরা যা ভাল বোঝ করো

বাঁপ্। ঘোটের ওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—, আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ের জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই, আমি, নিতাই, সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদচেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌঁছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি—বসে বসে টানচে। চল্ ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়িতে পৌঁছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে তাকানো যায় না—কাদামাখা ধুলোমাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েছেন—সারা মুখে, গালে বেলের আঠা ও শাঁস মাখানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, দু' দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠেন না—তার কি হয়েছে—এ কথা কেউ কোনদিন জিজ্ঞেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোন লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার যোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি যোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবি নি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটায় টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা, ভাত হয়েচে খাবে এসো।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে

আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন।

মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখচি—আমার বুঝি আর খিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেছে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বইদপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলছে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে—বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যায় নি। মা একা কি করবে?…জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোট কাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজ কাকা পাড়ার লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখানে।

কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিতে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় নি মৃত্যুর পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই—মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আনতে হয়, কি আর করবে?

দাদাকে মা ও-পাড়ার কাছে পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক বণ্ডামত লোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকছে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনো দেখি নি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ'লে মড়া কি সারা দিনরাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত ছোটলোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।

আমি উত্তেজনায় মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি একজনকে কেবল চিনি। মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল—দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল।

সেজ খুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন বছর আগেকার কথা এসব। তার পর থেকে এ বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজি হন নি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদিখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মশলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রী করচে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো, সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্তির কারখানার একটা সাত টাকা মাইনের চাকরিও পেল—কিন্তু বেশীদিন রইল না, মাস-দুই পরে তারা বললে—ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নিচু, আঁটাসাঁটা, ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই, একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়ের যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরনের ছোট ছোট গাছ, এর নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রঙ দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিস্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ারের সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন তা নয়—এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরনের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই-তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধ'রে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম! সে গরমের ধারণা ছিল না কোন কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক-একদিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এঁদের আয় বাড়বে, দেশে খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাই-মাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন যুগিয়ে চলবে। পাশাপাশি অমনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্ত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোন চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত আমাদের বাসায় না খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সে-ই মা এখানে এঁদের সংসারের দাসী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ করতে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুষ দিতে পারেন না ব'লে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পূজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অন্য সকলের উপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নন্দ, সীতা, সেজ কাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা করে রূপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর দুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেনী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটচে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জেলে আরতি করছে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরো অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না। জ্বর আসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হটে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন ক'রে সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন-ধারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে···অনেক দূরে সরে যেতে লাগল···কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল···কতকগুলো বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছে···সারি সারি বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকায় খুব

লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে—তারপর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেরও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ—এপারেও অনেক ঝোপ বন—কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিসটা আমি ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখছি—নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রঙ—ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে—গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে···আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল···হঠাৎ সেই নদীর একপাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশায়ের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলছে···ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে···মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল···কান্না আসতে চাইল···কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে—আমার ঘোর কাটল একটা চেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বলচে—চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুলকো লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কষিয়ে দিলেন—মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়—

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায় নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে—এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি তো ইচ্ছে ক'রে ছুঁই নি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয় নি। কিন্তু মিশনারী মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বললাম—হে প্রভু যীশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন্।

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে কি পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস সীতা? সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে ত্থাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বই পড়তে পারিস!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, প'ড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচায্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল

হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রঙ, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রঙ দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখে নি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া আবার শৌখীন—সর্ব্বদা ঘ'ষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ানো তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশবার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখছে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দ্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বই পড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌ-ঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, "ও-সব অলুক্ষণে কাণ্ড বাপু—মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার শখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।"

সীতার বুদ্ধি খুব। 'শতগল্প' ব'লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে 'সোনামুখী ও ছাইমুখী' ব'লে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ'ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা, আমি পালাই—

আমি বললাম—বোস্, হীরুঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ্।

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্য্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, "তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।" মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসেন।

আমার কথাই ঠিক হ'ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—"শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।" সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন। আমি বললাম, "হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে। জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই, বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।"

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল।

সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, "তোমার দাদা কোথায়?" দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক'রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে নাকি আজ অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরু ঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে একদিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই-সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায় নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) "খুকী শোন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস কর তো ডালের বাটিতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।" সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ওরকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন— "সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মিশিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।"

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এর পর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে—গালাগাল দেওয়া ভাল হয় নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিজ্ঞেস করলে—হীরুজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে জিতু? আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই-তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি—এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা।

হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উসকোখুসকো, মুখ প্যাঁডাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাশচে। শুনলাম আজ না-কি চার পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ার ভট্টাচায্যিদের পুজোর দালানে শুয়ে ছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্ব্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশি করা চলবে? কোন্

ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল গ্যাখো তো ?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধ'রে বাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুদ্‌বেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন—"না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে ? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে ?" কিন্তু ততক্ষণে জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু শুয়ে ধুঁকছে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপ্‌টা তাকে পেতে দিয়েছে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায় ? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্যেই বলচি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দুজনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেরিয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাথালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপ-কাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে ? তোমার বাবার বাড়ি এটা ? এতটুকু জ্ঞান হয় নি তোমার ? সাহসও তো বলিহারি, জিজ্ঞেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে ? নবাব হয়েছ না ধিঙ্গী হয়েছ ? না তোমার চা-বাগান পেয়েছ ?

এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, "যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।"

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে ? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপিচুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন-দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্লি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন রাতে দাদা বললে—"চল্ জিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি ? রাম-পণ্ডিতকাকা দেখে বলেছে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।"

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দুজনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, "কি রকম আছে রে হীরুকাকা ?" তারপর সে চলে গেল। নারকোলের

মালা দু'তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশ থুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায়? দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "জিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোও গে যাও।"

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁক্‌ড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিভে জল হয়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েছে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, "ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ'ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি নাকি এখানে?"

হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলে নি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আম-কাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুন জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নিলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপসে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হন নি। কেবল বলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয় নি, বলেছিল, সব যে পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দান-ধ্যান-ধর্ম্মানুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকা আসে নানা জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিস। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁচেছে এবং তার জিনিসপত্র নির্ব্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁঠা বলি দিয়ে মনসাপুজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউর পুজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় প'রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে

সাহস হ'ল না। মাকে মেয়ে পড়াত সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওঁদের চোখে—আমরা খৃষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফল-মিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেন নি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশি। ফর্সা মোটা-সোটা এক-গা গহনা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাও গে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ, ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোট কাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোট কাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশি খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটিতে বাটিতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আম দুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে, মা আমায় একটু মধু দিতে বল না সদুর মাকে। কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয়তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিসের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সব চেয়ে ভাল!

একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা ভাল ভাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাত্তির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে খাও।

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। একদিন ও-পাড়ার মুখুজ্জেবাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধ'রে

পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

ওদের রান্নাবাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসানো ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। ওই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিসপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—"ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে?" মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম, "আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে'না। খেতে দিয়েছ কি?"

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—"ওই পুঁটলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা—", মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

বীরুর ছোট বৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগলো। আমি বললাম—"ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখে কিশমিশ এনেছি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—"

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—"ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা, উঃ—আর হেসে পারিনে!"

বীরুর ছোট বৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—"ওঃ মা, আমি যাব কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব শখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অমনি সংসার করে—উঃ মা রে!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয় নি। আমি বললাম—"চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশি করে দিও।"

বীরুর কাকীমা বললেন, "হাঁ রে তুই কি কেবল খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?" কিন্তু আর কি ধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথা সকলকে বলতে শুনেছি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম—"খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো। আর জিজ্ঞেস করো কি রঙ ওর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকালেই—" খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশি হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরি নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—"আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।"

মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, "তাও জানিস নাকি? বা রে! তা তো তুই বলিস নি কোনো দিন? দেখি—দেখি—"

"কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হলেও হয়।"

এ কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা

বীরুর মেজ বোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরিটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখনাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছে চা-বাগানে। একটিমাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গড়ে উঠেছিল মিস্ নর্টনের দরুন। মিস্ নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেঁশি তিনখানা কাপড় জোটেনি কোন সময়—জামা তো নেই-ই। (জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের!) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি প'রে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ প'রে—এ গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিস সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্য্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিসই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে,—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা-রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, স্বর্ণবণিকপুত্রের কাহিনী আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনারি মেয়েরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেম তাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা 'ভূগোল-পরিচয়' ব'লে বই আর একখানা 'ঠাকুর-দাদার ঝুলি'। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভালো লাগে যীশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্ব্বতে যীশুর উপদেশ, যীশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন। এ সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও সব বই পাওয়া যায় না ব'লে পড়িনে। যীশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোন মূর্ত্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যা পূজো করেন, তা গোল-মত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এর মধ্যে। চৌধুরীপাড়ায় বড় পুকুরের ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্ত্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি একদিন দুপুরে পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি. বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্ত্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জ্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ,

মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা—একটা হাত ভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্ত্তিটার, কি অপূর্ব্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ'ল ওই পাথরের মূর্ত্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখেনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্ত্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তারপরে শুনেছি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্ত্তিটা হাতভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়। সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক'রে কেন যে ফেলে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা পড়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে, এঁটো হাঁড়ি-কুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক'রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?

চৈতন্যদেবের সে কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ'রে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব'লে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শাস্তর শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আমাকে শাস্তর শেখাতে! হিঁদুর আচার-ব্যবহার তোরা জানবি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে কিছু বলেছি কি?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচী-দেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

খুব তর্কোবাজ হয়েচ? থাক্, আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরু-মন্তর নিতে যাচ্ছিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে যদু অধিকারীর

বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে দেখতে এল চার-পাঁচজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিজ্ঞেস করেছে—শোন্ সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দিই, তোর পছন্দ হয় কা'কে বল্ তো?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে নাকি, চোখে-চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া, বোকা, বদ্‌মাইশ, জ্যাঠা মেয়ে, যা তা বলে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনি। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাস্ কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা বলিসই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস?

সীতার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।

॥ ৫ ॥

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল—শুনলাম ওঁদের গুরুদেব আসবেন ব'লে চিঠি লিখেচেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে অনেক শুনেচি—জ্যাঠামশায়ের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দুজন দু-দিকে মাটিতে ব'সে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্চেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল—কিরকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

স্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—পেছনে ব্যাগ হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমু গোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসচেন, রং কালো, মাথার সামনের দিকে টাক—গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধুলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমারা বাতাস করতে লাগলেন—ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি মেজ-খুড়ীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৌমা, ছেলের তোতলামিটা সেরেচে? মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজকাকার নাম) আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না?...কতদিন আগে এসেছিল বললে?

বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে ওকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, দুএকটা কথা জিজ্ঞেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আনলে স্টেশন থেকে, সে-ও

সেইখানে দাঁড়িয়ে—তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'ল, তিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এই জন্যে যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখকে আকৃষ্ট করে—এ গাঁয়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তো দূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাও তো বলতে হয় তার সঙ্গে?

গুরুদেবের জন্যে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি হ'ল—মেজখুড়ীমা, সত্যর মা, জ্যাঠাইমা—সবাই মিলে ক্ষীরের, নারিকেলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হ'লাম সত্যর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন! মা আর সত্যর মার ওপর যত উঞ্ছ কাজের ভার এ বাড়ির। সত্যর মা'র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে দেখচি।

গুরুদেব সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন খাবার দেওয়া হ'ল, তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণদিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন—কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক্ না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চারদিন রইলেন। তাঁর জন্যে সকালে বিকালে নিত্যনূতন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ'ল! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো খেতে পারতেন না—আমরা বাদে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ পেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবিতে বা থালায় যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সেখানে থাকতাম না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা বকতেন—তার পর গুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছে কাছেই থাকতো ব'লে তারাই যেত—আমি কারুর পাতের জিনিস খেতে পারিনে, এই জন্যে আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিস আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েচে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলচৌকিতে কম্বল পেতে বসে আছেন। পায়ে সবুজ পাড়-বসানো বালাপোশ—ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে আছে, যেমন সর্ব্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সত্যর মা, হিরণদিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাইনি—আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরনের লোক, তাঁর অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এসবের দরুন গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েচে যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্ব্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাইনে!

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্ম্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল ক'রে শোনবার জন্য। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্ব্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে

স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে ? শিব বললেন, তা নয় পার্ব্বতী। চলো তোমায় দেখাব।

দুজনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্ব্বতী তাঁর স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েচেন, এর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস ক'রে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে ? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েচে জিজ্ঞাসা করলে। পার্ব্বতী সকলকে যা ব'লে এসেচেন তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্ত ভাবনা কি মা ? আজ গঙ্গা-স্নান করলে তো নিষ্পাপ হবোই, এত বড় যোগ যখন, এ জন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে পাঁজিতে লিখেচে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ করে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্ব্বতীকে বললেন—পার্ব্বতী দেখলে ? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগল। সে-দিনকার চৈতন্যচরিতামৃতে পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিঁদুয়ানি তো খুব দেখান! আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিস্টান।

আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন ? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ'ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েচি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্ব্বতীকে প্রত্যক্ষ করেচি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনারী মেয়েরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বই দিয়েছিল। তা'তে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় ক'রে লেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আহ্নিক করতে গেলেন, আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—ও ছেলেটি কে ? রোজ রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এস, এস বাবা, এদিকে এস।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটা আনন্দও হ'ল। একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললেন—ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানে থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো। এখানে এসে অসুখ হয়ে মারা গেল ; আর তো কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতে থাকে।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি, সরে এস।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুব লক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত ?

আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষতঃ অত ছেলের মাঝ থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হননি। জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকি পনেরো বছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের বড়। আসলে আমার বয়স তেরো—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা বলে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার বয়েস লেখানো আছে, তাই ধরে বলচি।

তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি পড় বাবা?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ? লুঙ, লিট্ বোঝ? এই শোনো একটি শ্লোক—

সোঽধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানযষ্ট
পিতৃনতার্প্সীৎ সমমংস্ত বন্ধূন্
ব্যজেষ্ট ষড়্‌বর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতংন্যবধীদরীংশ্চ।

হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ? এ হল ভট্টিকাব্যের শ্লোক।

আমার বেশ ভাল লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর শ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশি শুনিনি। চা-বাগানে কেউ বলতো না। শ্লোকটা আমি মুখস্থ ক'রে নিলাম।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম—কি করবেন আগুন জ্বেলে?···

—তামাক পোড়াবো—

আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্চি।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন। কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন্ পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতের সোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কালো মেঘ নামল—এই রকম একটা, শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃত পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে এমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেন আমি কত বুঝি!

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ পর্য্যন্ত—তাঁর কাছে খুলে বলি, আমার মনের সন্দেহ, আমার ঐসব অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস—এসব খুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আমার! যেন মনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথা জানেন।

কিন্তু সুবিধে হ'ল না। বলি-বলি করেও বলতে আমার কেমন লজ্জা হ'ল। তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপর তিনি চলে গেলেন।

আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হ'ত। একজন ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমন কোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—কারুর ওপর আমার ভক্তি হয় না।

আমি আজকাল নির্জ্জনে বসলেই অদ্ভুত সব জিনিস দেখি। যখন তখন, তার সময় নেই

অসময় নেই, রাত নেই দিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের পুকুরধারের বাগানে একলাটি—হঠাৎ দেখি পুকুরপাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চূড়ো—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝক্‌মক্ করচে—সোনা না কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব্ব দেখতে—ঠিক যেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোটা নীল অর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চকচকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেছি। তারপর রোদ চক্‌চক্ করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ—না চোখ খারাপ হয়ে গিয়েচে, না কি?

আমার কারুর সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এইজন্যে যে, হয়ত কোন্ সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর কে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দিই—

ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল। একদিন দু'দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত-আট, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গার ওপারে ভদ্রেশ্বরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলছে—বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি ক'রে স্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মশলার কৌটো বের ক'রে মশলা খেলে, ভাজা মশলার গন্ধে দালান ভুর ভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তার পর ওষুধ লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না দেখেই পকেটে পুরলে—তার পর রোগীকে বার বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ি ক'রে চলে গেল।

একটু একটু অন্ধকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি, কি আলো জ্বালা হয়নি—হয়ত ডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে আধঘোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—এইমাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি ব'লে গেল তাই জানতে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে, এমন

সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্ম্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কে নির্ম্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন —কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোটকাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্চেন, এমন কোনো ভাব দেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বল এইবার—আমি চলে যাচ্ছি।

আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম—নির্ম্মলা কে?

ছোট কাকীমা আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললে—কেন, সে খোঁজে কি দরকার? তিনি ভাবলেন আমি বুঝি তাঁকেই জিজ্ঞেস করচি। অজ্ঞ মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চ'লে গেলেন, যাবার সময় আমাকে বললেন—এই তো নির্ম্মলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে?

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। বললেন—কি বকচিস পাগলের মত? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলচিস? নির্ম্মলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার শুনি?

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন, কি হয়েচে, কি বলচে ও?

ছোটকাকীমা বললেন—আপন মনে কি বকচে ত্থাখো না দিদি—ও এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম ক'রে কি বলচে।

জ্যাঠাইমা বললেন—কি বলছিলি কাকীমার নাম করে?

আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি—আমি তখন কেমন হয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্ম্মলা আমি তা কখনও শুনিনি—ঐ মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুনতে পেলেন না এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, আমার মাথা ঘুরে উঠল। তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।

জ্ঞান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদচেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েচে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ বলে। আমার বড় ভয় হ'ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগল হয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেছি আমরাও পাগল হ'তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছে অনেক।

সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয়নি—এই ভেবে ভয় হ'ল যে আমার সত্যিই কোন কঠিন রোগ হয়েচে। কিন্তু কাউকে বলবার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েচে, নয়তো বাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত—না, কি হবে!

যে রাত্রে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের

টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাতদুপুরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাখা মূর্ত্তি বার বার মনে আসতে লাগল—আমার মনে সে-রাত্রি, সে-মূর্ত্তি চিরদিনের জন্ত আঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে!

মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রভু যীশু, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমায় পাগল হ'তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক ক'রে দেবেন—এ বাড়িতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না—এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছে ভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্তে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান ক'রে গরদের কাপড় প'রে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন—সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্য্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা একরাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বালতি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্চেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুক্ষ চুল; বেলা বারোটার কম নয়; সকাল থেকে মার মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেচি ছোট জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী ক'রে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?

ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেননি, মায়ের হাতের জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল ওঁরা খাবেন কি ক'রে?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গোয়াল-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েচেন, কেন ওঁরা জল খেতে যাবেন মার হাতের?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড়মানুষের, পুণ্যিও বড়মানুষের জন্তে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারতাম না। এক-একবার ভেবেচি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েচে অন্তভাবে, অন্ত ধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া মমতা পেয়েছি, আর কোথাও তা পাইনি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃষ্টের কথা পড়ে আসচি, তাঁর করুণার কথা শুনেচি, তাঁর কত ছবি দেখেচি। আমার কাছে একখানা ছবি

আছে খৃষ্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকের পালকের মত ধবধবে শাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখাল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারিধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেচে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করচে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্চেন নিচু হয়ে—মুখে কি অপূর্ব জ্যোতি, কি সুন্দর চাউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতর রেখে দিই, রোজ একবার দেখি—এত ভালো লাগে!

কিন্তু যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে—আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খান-কতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েচে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্য্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়েনি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্ত্তি হয়েচে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদ্‌গোপ, রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েচে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনে এক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায় মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করার জো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন ঠাকুরকে ছুটি দেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্য্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরনের ছেলে ব'লে তাকে সকলে ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সামনে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' বলে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়ে মাস্টারেরা পর্য্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যালজেব্রার আঁক না পারার দরুন আমাদের সামনে সেকেণ্ড মাস্টার ওকে বললে—তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলে কেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার শখ কেন? এ-সব তোমার হবে না বাপু।

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে একমনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করচে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিলে, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিল ও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপর।

বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কিনা। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বলল—কি দেখবো?

তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,—সে কিছু দেখে না।

তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওখানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি?

বনমালীর গলার সুর বদলে গেল, চোখের চাউনি অন্য রকম হয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব,

আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর সবারই ঠাকুর—

বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থামলে গর্ব্বের সুরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি। বললাম—আমার ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখ্রীষ্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপর অপ্রতিভভাবে বললে—ও তোমরা খৃষ্টান?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তাঁর কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তাঁর কাছে কি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃষ্টান আছে? তিনি যে পতিতপাবন—অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করেচে। যীশুখৃষ্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান? মথিলিখিত সুসমাচারে লিখেচে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাইরে আমার আর কিছু জানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি ক'রে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে—এ আমার মনে হ'ল। কিন্তু বনমালী আমার খ্রীষ্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেচে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েচি সেখানে হিন্দুধর্ম্মের কথা কিছু শুনিনি কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেচি, তাই বিশ্বাস করেচি—তা মনে লেগেচে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েচে ভাই?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সে পড়চি, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড়মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্‌কালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেননি—বিশেষ ক'রে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোনো কালে—বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, ছোট কাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোনো দিন শুনিওনি। আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদা এখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে থতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বললেন—তোর সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন?

কাকীমা বললেন—পানী যে-রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বলছিলি মনে আছে ?

আমার ভয় হ'ল,—বললাম—না, কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—বল্ বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলিনি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল্ জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে-রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েচেন। আমি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই ?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস্ জিতু ? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল্ না জিতু বাবা, পানীকে দেখিস্ ?

আমার চোখেও জল এল। ছোট কাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও—তা ছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বললাম—না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম তবে ? সে যেই হোক্, পানীর দিদিমাই হোক, মরাই হোক্ বা জীবন্তই হোক্! এটা তা হ'লে আমার রোগ নয় ? আর কেউ তবে দেখে না কেন ?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বলচেন না-বলচেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার উপর বিশ্বাস কি ?

॥ ৬ ॥

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে তত বেশি কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এরা খুব ঘটা ক'রে যেটা ধর্ম ব'লে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা তো আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলি, বাইরে তাই করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাই-

মায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধ হয় আমার মধ্যেই কোনো দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন ওদের ধর্ম্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাইনি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলতে পারে এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধা-বিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ'ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েচে, আর একটি আমার বয়েসী, ফার্স্ট ইয়ারেই ভর্ত্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এ বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন একজনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন একজনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকী-মার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোনো কথা ফেলতে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্ব্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না—কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েচে বুঝতে পেরেচি, আটঘরার যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরি করবে সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে—কিন্তু চাকুরি পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরি করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকুরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেয়ে পরে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম।

মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন-বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিনি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনোদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ'ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইন বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোনো দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয়নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ'ত না, মনে হ'ত যা দেখেচি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা তো আর দেখেনি?

ওপারে ব্যারাকপুরে সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই তো রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপ্ নিয়ে পাস করেচে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়।

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ—রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃষ্টান ধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবী গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্ম্মের উপদেশ নিতে। ওরা তো তোমাকে খৃষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আমাদের সবার কর্ত্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেছ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই; খৃষ্টান ধর্ম্ম কি জিনিস আমি জানিনে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে চাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি তো বুঝি নে।

—ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, এঁরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃষ্ট হ'ল তোমার দেবতা! এঁরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি?

—কে বলেছে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা তো উঠছে না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ একজনকে বেশি ভালবাসে আর একজনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে? একশোবার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গস্পেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি

বলতে যাব কেন ?

ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাটা ভাবলাম। খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু ? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে ?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে। ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাকে ছোটদিদি ব'লে ডাকিনে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল কেন জানিনে, অন্য কারুর বেলা আমার তো এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না ? পান দেবার সময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল, পান আর কখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেইদিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি।

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষচি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিতু এস, তোমার গুরা ডাকচে।

আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি ?

সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে।

তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল তো দেখি কেমন বাহাদুরি।

বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে একজন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোল তো লেপটা!

আমি হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি ?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোটবৌঠাকরুন,

মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে।

সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া— ছিঃ—না, ওকি কাণ্ড? ছোটবৌঠাক্রুন স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন-দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট-বৌঠাক্রুনকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেননি এ পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথার—

"সেদিন যা ক'রে ফেলেচি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দলে পড়ে করেচি, ক'দিন ধ'রে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারিনি! আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।"

পত্রে কোন নাম নেই। আমি সেখানা বার বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মনি-ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোটবৌঠাকরুনের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তাঁর চিন্তা ছাড়াতে পারিনে। দু-পাঁচদিন ক'রে হপ্তাখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে—অজ্ঞাত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাক্রুনের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বললেন,—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে তো বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না, কোথাও থেকে খেয়ে আস বুঝি?

আমি জানি বিকেলের চা-খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন—আর সে সময় বড় একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানলার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাক্রুন কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুন রূপে দেখলাম—আরো কতবার দেখেচি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে অমন সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ-সব আগে তো লক্ষ্য করিনি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরনের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন

বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।

সেই রাত্রে আমি তাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। আমার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিপি আর ছিঁড়ে ফেলি।

দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না; সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি না এভাবে বসিয়ে রেখেচি!

আমাকে দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুশকিল, চুপচাপ খেতে বসলাম—শৈলদি বললে—না খেয়ে টন্ টন্ করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস্ নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না···থাকিস্ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি, ডাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দেবো? পায়েস তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেললি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েচি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ওপরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকরুনের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিণ্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকরুন আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকরুন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর নিচু ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না তো! চলে গেলেন কেন?

মরীয়া হয়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দেবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয়নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসিনে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর মৃদুস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ও রকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত্র আর ঘুমুতে পারিনে। আমার জন্যে একজন ভাবে এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন। নতুন নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত ক'রে তুললে।

কি অপূর্ব্ব ধরনের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোটবৌঠাকুরুনের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ'ল। চাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এ সব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাইনি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা'-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন-দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা'-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকুরুনের হাতে লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে···

"আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম। অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেচেন যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন্—কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারিনে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর-একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না?"

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়েছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতি ওদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা ওদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশিদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন।

মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্য। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতি কষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল— তারই বা কি করা যায়? দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললেন—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে কি দোষ আছে সাহেব? তাছাড়া আমি তো খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকাতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরেজী ভাষা ভাল ক'রে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশি দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল।—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, precious is the flow.
That can make me white as snow,
No other fount I know
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্ম্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্ব্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস্ পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবু বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্ম্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয় জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্ম্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট ধরনে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষবিচারের দিন পর্য্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল, কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না জানে—সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃষ্টান ও অখৃষ্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তার প্রতি তাঁর অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃষ্টের ছবি খাপ খায়। তিনি

প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্ম্মের দলাদলি থাকে কখনো ? যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে জাতিরই হোক তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তাঁর, যে না জানে, তিনি তারও।

একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপরে বসে জনকতক লোক গল্প করচে—শুনলাম বরানগরে কুঠির ঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্চে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠির ঘাটের বাগান-বাড়ি খোঁজ করে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকের কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্তেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারি কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্চে,—যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন ?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিজ্ঞেস করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায় ?

—কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?

—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক।

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মা-লক্ষ্মী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে ! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, রং কর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী বলেচেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের ? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামীজী বলেন—এ একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন ? তিনি বললেন, জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম ?

—ছুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজে তো কত কি দেখি! এরা তো সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না। এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামীজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ তো বাবা—এই তোমরাও তো ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েচে। এখানে তো এই খাওয়া এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটার হাড়ির হাল হয়েচে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায়নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা কোথায় খাচ্চে, কি হচ্চে—এদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। এই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি, তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্চে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে,-বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সার চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমায় এই মারে তো এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের গাদারিপুরে। খুব কীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষে ক'রে শিষ্য-সেবক তৈরি ক'রে বেড়াল ক'দিন। সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুসলে নিয়ে এসেচে। পয়সা হাতে থাকত আমার তো ব্যাটারা খ্যাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি; তাও দু-বেলা বলচে —বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। দেখার ইচ্ছেও আর ছিল না।

সন্ধ্যার পরে স্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেছি, হীরুঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেচি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোটবৌঠাকুরুনের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়িতে জিনিসপত্র ওঠানো হচ্চে, আমি নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখচি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা ক'রে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকুরুন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখে, হাতায় লালপাড় বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরনে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম —আপনি! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব তো এলেন দেখা করতে!

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন তাই, নইলে—

ছোটবৌঠাকুরুন ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি. এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেছি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ও-সব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমায় খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না।

॥ ৭ ॥

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে যোলটা টাকা দিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে টাকাটা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায়নি। বাঁশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকো আসতে দেরি হচ্চে, আমি প্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করচি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্য্যের আলোয় মনে হচ্চে যেন সোনার। ভারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত এই সন্ধ্যায়, বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত, তবে আমার আরও ভাল লাগত। কথাটা ভাবচি, এমন সময় আমার শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠল, কানের পাশটা শির্‌শির্ করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না বুঝে ঘাটের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।

এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলে জিজ্ঞেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়া নৌকো এল—অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করিনি।

দাদা আমায় দেখে খুব খুশী হ'ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুধে-আলতা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে চাকরি ক'রে বেড়ায়—চেহারার, বেশ-

ভূষায়, কথাবার্ত্তায় দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন! তেমনি ধরনের লোকের সমাজে সর্ব্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় নটা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর—ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাত গন্‌গনে আগুন—বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আগুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে!

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে—খিচুড়ি খাবি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক' ভাইবোন ময়লা জিনিসপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারি নে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে খবরের কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা বার-হওয়া আর্শি, আর একখানা শিঙের চিরুনি।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্ছে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্মে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করে দিই—

টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতুবাবু কন্‌ট্রাক্টর আসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতু পড়বে—

পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি স্টীল কোম্পানীর মূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িবরগার ছবিতে ভর্ত্তি। দাদার ওপরে দুঃখ হ'ল, বেচারি এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না—ভেবেচে কি অপূর্ব্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না বলে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেঁধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার ক'রে বললে—আর এই দ্যাখ্ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প—আমি খেয়েদেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—'খোঁড়া শিকারী'র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?

এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েচি, আমার কাছে এর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়িতে কাঠি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব'সে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হ'ল! এ-সব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে। আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কত কষ্টে রোজগার করা পয়সা; একটা আধটা নয়, ষোলটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়—ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে ও? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক'রে হয় শোধ দেবো।

দাদা নিজেই বললে—বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটা দশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড্ড ইচ্ছে সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দিই—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকার যদি

দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্য কুড়িটা টাকা তোলা আছে—তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন। হার এর পর দেখব।—সাত-পাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মত ক'জন আপনার লোকই বা দেখে? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজে লাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা ব'লে ডাকে। মতিলাল আমায় দেখে বললে—তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই? বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে—আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সে-সব বই আছে? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা!

কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার। ভাষার জ্ঞান হ'ত কত পড়লে! বলো দিকি ন্যুব্জদেহ মানে কি? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোক্তার হ'ত, দারোগা হ'ত। এখন হয়েচে তো সব ছেলেখেলা।

আমি এসেছি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বললে। আমায় দেখে বললে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রেঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন?

মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলেমিশে সংসার করা। আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল।

—এই ত্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাক। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েচে। তা যদি আসে! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে তো হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব—তা এমুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালে বলে, সৎমায়ের আর অত আত্তিযত্তো দেখাতে হবে না। শোন কথা। আমায় মা বলে কেউ ডাকেও না। ডাকলে তাদের মান যাবে।

মাসীমাকে খুশী করবার জন্যে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা' 'মাসীমা' ব'লে ডাকতে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন—ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোট বড় আছে বাবা?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল; আমি তো এঁদের এসব মানিনে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করিনে, সে কথা তো ইনি জানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আসবার সময় সীতার জন্তে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব'লে দু-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম। সীতা বড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েচে, দেখতে সুন্দর হয়েচে আরও।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখি দাদা কেমন সাবান···আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিল না। একখানা সানলাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে—সে আধখানা হয়ে গিয়েচে।

সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরনও সেকেলে। আজকাল শহরে দেখে এসেচি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েচে। ও-ধরনের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শেখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি ক'রেই ওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোন সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনারী মেয়েরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস্ নর্টন। কিন্তু কি হ'ল ওর? এখন, সেই কত কাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বললে—দাদা পাস করেচ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয় নি। পাস করবো ঠিকই।

—পাস হ'লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রাইজ দেবো!

—কি জিনিস রে?

—একটা মনিব্যাগ বুনাচ লাল উলের। তোমার জন্তে একটা, বড়দার জন্তে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস্ নর্টন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ—না?

—মিস্ নর্টনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিস আমার বাক্সে এখনও রয়েচে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমায় ডেকে বললেন—জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ'ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ তো শহর-বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষা গেরস্ত, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো—তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বললাম—লেখাপড়া কতদূর করেচে?

—লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেচে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েচে, দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,—অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েচে—তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ও-পক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে, আপনি বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশাই নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি এ অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেনই বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয্যে কি জন্যে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল—সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয্যে ছিল জ্যাঠামশায়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরে বললেন—কি হয়েচে রাম? রাম বাঁড়ুয্যে তখন কথা বলতে পারচে না—জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারল না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয্যে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্চে না। বললেন—ভাল ক'রে কথার উত্তর দাও—কার সামনে কথা বলচ জান না? সঙ্গের সব লোক বললে—হাঁ, কর্ত্তা যা বলচেন, জবাব দাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয্যে জ্যাঠামশায়ের চোখরাঙানির চৌহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই—কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না—তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে নিয়ে নিলেন—তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই তো হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন—তাঁর কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেচে। এখানে এলেই বুঝি, এদের মন নানা দিক থেকে কত ভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েচে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠোনের কোন জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না—মেজকাকার কাজ হচ্চে এতটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা। প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব'লে দেখেচি এরা তা বোঝে না। সামনের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা—প্রত্যেক জায়গাটুকুতেই তরকারি লাগিয়েচে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বললাম—আমি শ্রীরামপুর থেকে ভাল সূর্য্যমুখী বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালে ফি বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্ তা?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই—মেজকাকার আবার একলা শুতে ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হ'ল—কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতে লাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করচেন।

আমি বললাম—বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আসচে—

মেজকাকা বললেন—উঁহু, উঁহু—ঠাণ্ডা লাগবে—শেষরাত্তের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দ্দি ধরবে—আমার ধাতই একে সর্দ্দির।

দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতে তাঁর কোন কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাও চাকরি খুঁজে নিই মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।

মা বললেন—শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করে পড়ে থাকি। নিতুর তো কিছু হ'ল না, তুই বি-এটা পাস্ কর্। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন্, এ নিয়ে কোন কথা যেন বলিস নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেচেন। সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দু-জনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে, আমার লেখাপড়া না হয়, সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ আমার থাকলে হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জ্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বসলেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারি নে। প্যালেস্টাইনের ঊষর, পর্ব্বতময় মরুদেশের রৌদ্র—সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী ক্রুশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে। পিছনের অন্ধ জনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রের নোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুফান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে?—ঐ বজ্র-বিদ্যুতের মত শক্তিমান তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েচি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখচি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্য্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েচি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েচি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে—স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কতবার তাদের দেখেচি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে, ওরও পাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলায় চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা এই পৃথিবীর মত নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না—উঠে দেখি গাছে ঠেস্ দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েচি—উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল, স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলুম—

বটগাছের নীচে একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্ত্তি, আমার বড় ভাল লাগে—জ্যাঠাইমারা পুজো করেন না কেন? ঘুম কি সত্যি, কিছুই বুঝতে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠামশায়রা কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায় নি কস্মিন-কালেও—সে-সব ঘটনা দেখেও নি—এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি একটা দখলের মামলা।

একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই—মহাসমারোহে পুজো হ'ল, সপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ ক'রে খাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ান কেন?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা—ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে?

জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হয়ে গরদের শাড়ি প'রে পুজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মত ভয়ও করি না আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হবে—কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ ক'রে রইলুম।

॥ ৮ ॥

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্যেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। যাদের বাড়ি চাকরি করি, এরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্ত্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটা গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্ত্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনে একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেচে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অন্য জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েচে—তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড় হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পুজা, মানত শোধ দেয়, তা ছাড়া বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাম্বরবাবুর তিন ছেলেই ঘোর শৌখিন ও উগ্র ধরনের শহুরে বাবু। বড় ছেলে অজয়-বাবু এঞ্জিনিয়ারীং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি—মেজ ছেলে নবীনবাবু এম-এ পাস, ছোট ছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র—প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হার মানে তাঁর শৌখিনতার কাছে—নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর

দিয়ে সাদা বার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোশাক থাকে। বাঙালী পোশাক পরলে পরেন হাত-গিলে-করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এ্যাল্‌বার্ট জুতো।

কর্ত্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশী দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া-বালিশ, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়া দরকার হয়। বড় ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন—তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অজয়বাবু লোক মন্দ নন—কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাম্ভিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ পর্য্যন্ত আসি নি—কি জানি আমার কোন্ ব্যবহারে এঁরা কি দোষ ধ'রে ফেলেন—সেই চিন্তা আমায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ক'রে তুললে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের স্ট্রীটে; বাড়িটার পূর্ব্ব দিকে একটা ছোট গলি—কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের স্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা—বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ঘরটাতেই আমার থাকবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এই ঘরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তাপোশের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপরে রাত্রে যে কত লোক শোয় তার হিসেব রাখা শক্ত; এদের দেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মুহুরী আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দুজন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী ব'লে একজন গানের মাস্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়ম বাজাতে শেখায়—সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখ মনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করচি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, তুমি নজর রাখো না?

মেজবাবুর সামনাসামনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ'ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ত আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন—দৈতারী—

দৈতারী সেরেস্তার কালির বোতল গুনে গুনে আলমারিতে তুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—হুজুর—

—এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

দৈতারী ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন—স্টুপিড পাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েচে শুধু ফাঁকি দেবার জন্যে? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক'রে—পাড়ো আমার সামনে—

দৈতারীর সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারীকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম। আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি—মেজবাবু আমাকেও

ঠেস্ দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি ও দৈত্যারী তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস ক'রে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না ক'রে প্রকাণ্ড অপরাধ ক'রে ফেলেচি।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এঁদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোট বৌঠাকুরুনের কথা এই সময় মনে হ'ল—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে! অমরনাথবাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব শৌখীন জিনিস-পত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন শৌখীন জিনিস কেনা লেগেই আছে। সে-ঘরে রোজ সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়—কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হারমোনিয়ম বাজায়—গান-বাজনায় অমরবাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ'ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?

আমি প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা চাইতে এসেচেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলে টাকা বার ক'রে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি—দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম—তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশ টাকা নিলেন—বাড়ির ও আমার হাতখরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার। পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা তো দেওয়ার কথা এতদিনে—দিচ্চেন না কেন! বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু কিছু ক'রে নেওয়া, সে ওর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।

মেজবাবু বললেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না, এত কম দিনের লোককে এ্যাডভান্স দেওয়া স্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি—এখনও প্রোবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে ঢোকবার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বাহাল হচ্চি বা কিছু। যাই হোক্ দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম; দাদাকে টাকা পাঠানো হ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েচেন দেখচি সে-কথা। প্রথমে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়েত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্ম্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে—কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখন তা বুঝচি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্নির বাড়ি পাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ

থেকে আপীলের কেস্ আনচেন। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বল্‌ছিল।

অপরে কি ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। এক জায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ-মত, অনেক মেয়েরা জড় হয়েচে, কি পূজো হচ্চে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতার স্থানে পূজা-অর্চ্চনা হ'তে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্তে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট্ট মন্দিরটা, বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর-মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্ত্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যি সাজিয়ে এনেচে, পুরুত ঠাকুর পুজো ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নির্ম্মাল্য দিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যির খালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্ট গ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জ্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা—শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ন—অনেক দিন পরে এই পুজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পুজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় একজন ভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী—বৃদ্ধা না হ'লেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটা পয়সাও নেই—গোটা-দুই টিনের কালো তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বলচে—তুই অমন ক'রে মারবি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি—আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? ভাখ দেখি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—

মেয়েটা হি-হি ক'রে হাসচে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলো বালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিসে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেঁদো না বাছা—আমি কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—

এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়া-পুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত

করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন ? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমার, তোমার আশীর্ব্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে, অথচ কেউ এদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটি তরুণী বধূ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটির হাত ধরে তুলুন—। কাদামাখা কাপড়ে বধূটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে খুঁজে বার করলাম—ভিড়ের দ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময় ফিরে এসে আমার হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি দুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুশকিলের ব্যাপার, আবার মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ত চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন—তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায় ?

আমি বললাম—তামাকওয়ালা ভাউচার দেয়নি। খুচরো দোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কেন, নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো ?

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করচেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার পেতো না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না। বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্য্যন্ত তো দেখছি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড় জানালা—তার ঠিক ওপরে—মেজবাবুর অফিসের সামনাসামনি একটা শানবাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় ব'লে জানলায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল, অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটি খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ'ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবচি, বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? এ ওখানে এল কার সঙ্গে?

মেজবাবু বললেন—এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ ?

আমি বললাম—কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েচে ওখানে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্চে না বোধ হয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই ? কোথায় কে ?

ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠতে-

নামতে দেখেছি) বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন—কোথায় তোমার খোকা না কি ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—বা রে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন !

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েচেন। মেজবাবু বললেন—কে নিয়ে গেলেন ? উনি মানে কি ? কি বকচ পাগলের মত !···

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে নাকি ? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলুম একথা ভেবে যে এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন ? পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেই পুরানো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হ'লে কোন কথা কি বলতাম ? এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বলতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চলবে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্চে, তাকে জিজ্ঞেস করলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড়-বছর দু'বছরের খোকা কার আছে বল তো ? ঝি বললে—এত ছোট খোকা তো কারুর নেই !

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ-চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটলো ডাক্তার আনতে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েচে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝিনে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেকবার হয়—তার পর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এইবার বেশী ক'রে শুরু হ'লে আমার চাকুরি ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্ঝাট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিসটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসচি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখবো ওদের

সাম্প্রদায়িক ধর্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই নাকি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পুজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইঁট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পুজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহন্তের গদিতে বসেন—কর্ত্তা নীলাম্বর রায় আসেননি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রুপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত ও পুজোর প্রণামী।

নবীন মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকার মানত থাকল গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারিধার। সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্ম-মতটা ভাল ক'রে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞেস করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে চট, শতরঞ্জি, হোগলা, মাদুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউ বা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজ্‌নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন্ গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতি বছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোসাঁই। মোর মাল্‌সি গাছে ক্যাটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বম্ম্ বাবার থানে ক্যাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর ক্যাঁটাল যেন হয়। বললে না পেত্যয় যাবে ছোটর-বড়র এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাঁইয়ের কিবৃপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে

একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেনলাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্ত্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাঁই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে ততদূর পর্য্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাঁই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ
মোর দশা কি হবে গোসাঁই ?
ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে
থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীলাখেলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড্ড নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাঁই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর ?

—কেন বল তো ?

—এই যে বলচে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।

—কত দূর আর, তা আধ ক্রোশ, বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্‌গো ছেড়ে বিলির ঘোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর ? কি বলিস্ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে, অপরিচিত পুরুষ মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে ক'রে ?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অমনি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্য ভাবিনে। ওরে শোন্, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস—

জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্ণা দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্চে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে ? তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের

জন্তি। মোহন্ত বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকেলে নিমচাঁদ ও তার বৌ পুজো দিতে এল গদীতে। নবীন মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পুজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্য্যের ঘটাতেই সম্ভবত অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝকঝকে রূপোর থালাটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোসাঁইয়ের থানে এসেচে, সব দেখেশুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝম্‌ঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্ছে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে একজন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিশুদ্ধ দৃষ্টি আমারও মুগ্ধ করেচে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমা-মণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েচে, বয়সে গলার স্বর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠা-কু-রে-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-ণা-মী—

নবীন মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পুজো নেই—পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুনতে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই, মা-দু-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আর—

নবীন মুহুরী আধুলি ফেরত দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দু আনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে, বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অম্লানবদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি, সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট ওড়াবেন, সেই জন্যে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে

ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পালিয়েচে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে—মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ ছটফট করচে, খুব ঘামচে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে—তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প করা হয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরি যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখা-শুনা করলুম একা। সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়মমত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার ক'রে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয়নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেছে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদচে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোনো দিকে চায় না।

মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এঁদেরই তো। ওঁরাই রইলেন নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখতে দেখতে নবীন মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেন মিলিয়ে গেল—আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েচি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয়নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাসচে।··· আরও সব কি কি···ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখচি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে দেখি নবীন মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্চে। বললে—কি হয়েচে তোমার, মাঝে মাঝে কিছু হয় নাকি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগচে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।

নবীন মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে শৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এতকাল কিছু গ্রাহ্য করিনি। বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

॥ ৯ ॥

এখান থেকে কলকাতায় যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ ধরা দেখচি, নবীন মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাকচেন মেজবাবু।

ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেননি। এ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেচি। লোকটার মুখের উগ্র দাম্ভিকতা আমাকে ওঁর সামনে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোন এদিকে। কলকাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েচে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বলচে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। স্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়!

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সামনেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্ভ্রমের চোখেও দেখতাম—বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলচি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েচে। কিন্তু এখন

বুঝেচি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুনছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে চেয়ে হাসলেন। নবীন মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। স্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কতদূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুশকিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ? যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেকবার দেখেচি—ও-সব সত্যি হয়েচে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেই জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করচি। আমি সেন্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির লাইফ-এ পড়েচি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে—তুমি সেন্ট হয়ে গিয়েচ দেখচি? পাগল কি আর গাছে ফলে?

নবীন ও কুঞ্জ দুজনেই মেজবাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানাদিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেচি, তাদের দেখতে পেরেচি।

নবীন মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে, একে আর এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেলবে এক্ষুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন তাতে যে-জিনিস সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয়, আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেননি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েচে, সে এ-সব বুঝতে পারবে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেচি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায় তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক যার সামনে—ওখানে আমি একজন বড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়স অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম?

কুঞ্জ নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সিম্পল্ ভেবেছিলাম তুমি তা নও দেখচি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোননি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তা শুনিনি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিন্ ?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েছে, শোননি এ-কথা ?

—না আমি শুনিনি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতার আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে ? বলেছিলুম একটি খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কিনা ? মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যে আমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা ছিল ? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটান্‌রা ও-রকম বুজরুকি করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ ?

—বুজরুকি কিসের বলুন ? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম ? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম ? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জ্জিলিঙের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে ? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিড্‌ল্‌স্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায় আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার ট্রিক্‌স্ উইথ্ আস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথ্যাবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্য্যন্ত কেউ করেনি। না! যা হোক্, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম—দেখ নবীন-দা, চাকুরির ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরি করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকুরি করলেও হয় না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগ্‌গির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেঁয়ে গরীব চাষীলোক এখানে পুজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মূর্খ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোসাঁইকে। কে বটতলার গোসাঁই ? হয়ত একজন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থগৃধ্নুতা দুটোতে মিলে বটতলাকে করেচে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম্ম ? ধর্ম্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদের ত্যাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূল্যহীন, ভিত্তিহীন, জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান ? এ রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখানো দেবার্চ্চনার চেয়ে এ আমার ভাল

লেগেচে। ঘুমুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরের মত।

কোন্ দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছুলো, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোন কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে—মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিসকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মূর্খ এখানে সমান—ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অন্তত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি তা কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

কলকাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অস্টিন্ গাড়ি যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ মণ্ডপের মেরাপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আটশ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে আট-দশজন লোক হিমসিম খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের একদিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন শখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষি করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারি, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরনের তত্ত্বের জিনিস—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয় ব্যাপার।

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্চে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোসাঁই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরীব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েছে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে পারে না। কাউকে জানানো হয়নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে দেয়নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমায় লিখেচে, সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নববধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভর্ত্তি।

"জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারিনি। তুই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্। মায়ের সম্বন্ধে কি করি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বউদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান, কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবে না ..."

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে, সেজন্যে অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েচে ওর মত স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েছে, ভালবাসার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

•

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনিনি, বুঝিনি—তার সঙ্গে যে ধর্ম্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম্ম নয়।

অথচ চারদিকে দেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্য্যকে চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বদ্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্চে গরুর মত—তার বাইরে ঊর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কতবার ভেবেচি একটা চাকরি দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমার যেতেই হবে, এমন হয়েছিল।

কাল্‌নার পথে গঙ্গার ধারে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী-কৈবর্ত্তের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকানো পুছোনো, উঠোন পর্য্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুর পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সাম্‌নে-পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে সাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়ালঘরে গরু বাঁধছিলো। তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে? আপনারা?

'ব্রাহ্মণ' শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্বি থাকার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠোনের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্ত্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময় একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েছেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাঢ় দেশের টান। মেয়েটি তারপর এসে দাওয়ার দাঁড়াল। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতে টেমির আলোয় কপালের উল্কি দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটি বললে—রান্নার কি যোগাড় ক'রে দেবো ঠাকুর?

আমি বললাম—আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরে অধিকারী মশাই এল। পেছনে জনতিনেক লোক, একজনের পিঠে একটা খোল বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেচি বলে।

বিকেলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—এমন যদি করবি মিন্সে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে? একটা পেট চলে যাবে ঢের, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখ ভেবেচিস্ তুই!

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্ত্তনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল; আসরসুদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুনই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্যেই হোক, তারা কীর্ত্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় যেতে দেয় না। কি যত্ন সে করলে! আরো একটা দেখলাম, অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই অধিকারীর।

যাবার সময়ে মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমার খাওয়ার কষ্ট হচ্চে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কী সুন্দর লাগল ওর স্নেহ!

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্চে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটিবার জিনিসটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরে আসতে হচ্চে। সেদিন দুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করচি—ডাক্তারবাবু জাতিতে মাহিষ্য, সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে ব'লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—আমি ধর্ম্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রা-মত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্চি, যার হাতে দিচ্চি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদানা নিচ্চে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্চি নে, ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে স্টীমার ধরে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌঁছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেচে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেয়ালদ' স্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুনচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের সামনে

দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকৃরুন। আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোথেকে আসচেন? এমন চেহারা?

আমি বললুম—আপনি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম যোগবাণীর গাড়িতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্চি। ইনি মেজদা, এঁকে দেখেন কি কখনও?

যুবকটি আমায় বললে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—এখানে দরে বনচে না—

সে চলে গেল। ছোট বৌঠাকরুন বললেন—মাগো কি কালীমূর্ত্তি চেহারা হয়েচে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্চি।

ছোট বৌঠাকরুন হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখে থাকি! আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পর বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি বুঝি?

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম?

ছোট বৌঠাকৃরুন নত মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোট বৌঠাকৃরুন নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক্। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্চেন কেন? পড়াশুনো করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব একদিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আসুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্চি, খুব সম্ভব মায়ের বড় অসুখ—

ছোট বৌঠাকৃরুন বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই, সে কথা তো এতক্ষণ বলেননি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ?

একটু হেসে বললাম—না, চিঠি পাইনি। আমার ঠিকানা কেউ জানতো না। স্বপ্নে দেখেছি—

ছোট বৌঠাকৃরুন একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরে বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখন তো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?—

ছোট বৌঠাকৃরুন আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েছেন, আর চোখে সে বালিকা-সুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যাক্সিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌঁছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেঝের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিনতে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললে—কে ওখানে, হারু ?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর ? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, এ কি হয়ে গিয়েছিস্ রে ! রোগা কালো চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো !

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এমনিই বাড়ি বটে ! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, একজন কাছে থাকতে নেই ? অথচ—, কিন্তু পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই বা কোথায় ছিলুম এতদিন ?

বললাম—মা, দাদা কোথায় ? সীতা আসেনি ?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েচে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েচে তোমার, মা ? ওরা কেউ দেখে না ? জ্যাঠাইমা কাকীমারা আসে না ?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েচে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যাঁরে জিতু, তুই নাকি সন্নিসী হয়ে গিয়েচিস—দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি ? বলে সে আর আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েচে, তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলে যাবে এমনি হবে ? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ, নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কেঁদো না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেচে সন্নিসী হয়ে গেছি ! এই ত্যাখ না সাদা কাপড় পরনে, সন্নিসী কি সাদা কাপড় পরে ?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরল মানুষ, সকলের কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদার কাছে। নিশ্চিন্ত ছিলুম অনেকটা সেজন্যে। জিজ্ঞেস করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায়নি ?

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বট্‌ঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখচি—তারাও বট্‌ঠাকুরের হাতের লোক ; বললে, তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখিনি, এমনি আমার কপাল। বট্‌ঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা, এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান

থেকে। এই তো নিতু ও মাসেও এসেছিল। আহা, বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে। আমার কপালে কেবল চারদিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্চি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েচে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা করে এসেচি এতদিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যি করেচে—কিন্তু আমি কিছুই করিনি। কেন আমার এমনধারা মতিগতি হ'ল? কোথায় আমার কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম কেন?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত স্বরে বললাম—মা, আঙুর খাবে?···আঙুর এনেছি, ভাল আঙুর শেয়ালদ' থেকে—

—ভূতোকে বললাম, একটা আলো দিয়ে আয়, তা দেয় নি দেখচি—বলতে বলতে ছোট-কাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে, নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোথেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের? তারপর, কি মনে ক'রে?

আমি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলাম, কি আর বলব।

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে এ-কটা বছর নিরুদ্দেশ নির্খোঁজ।—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে! তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে স্থাখে তোমার মাকে? সবই তো জান—বয়েস হয়েচে, এখনও বুদ্ধি হ'ল না? বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতে হয়—টাকাকড়ি কি আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝিচি—নেই। আচ্ছা, টাকা আমি দেব এখন, ভেবো না, ডাক্তার আনো।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ বাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ-চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাতবিচার মানি নে, বাগ্‌দি দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়েচে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিনতে পারেন না—ভুল বকতেও লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেঝেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময় বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা? মা কেমন আছেন ছোড়দা?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েচে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েচে—ওকে চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা

এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—ছোড়দা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্চি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরি ডাক্তার তো? তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বকবে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস্! বক্‌বে কিসের জন্তে, বালা কি ওদের? মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তারপর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকম চেহারা কল্পনা করছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলেমানুষের মত ছিটের জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো। আমায় দেখে দাঁত বার করে হেসে বললে—এই যে, ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসুৎ পাননি—তার পর অসুখটা কি?··· এখন কেমন আছেন?

তারপর সে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে—বসো তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি—একটু চায়ের চেষ্টাও দেখা যাক্, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী। সীতার মত মেয়ের! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেচি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' স্টেশনে ছোট বৌঠাকুরুন বলেছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেব না—ওকে তার জন্তে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে। ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখের পরে যে ক'রে হোক্ দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুঁকো হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বৌয়েরা সকলেই ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসী-ঠাকুর, ফিরে এসেচ দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, সাবিত্রীসমান হও, কখন এলে ভাই? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে-দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্যি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলেছিলাম, তার দরকার নেই, তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হলে ডাকব রাত্রে।

শৈলদিদিও রাত্রে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতে লোকের দরকার। তোরা দুটিতে মোটে বসে আছিস। আমি খেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দুজন আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো ?

ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিকে দেখে বললেন—জিতুর মাকে নিয়ে বেজায় মুশকিল হয়েচে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে—নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমাও এসে খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাত্রে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি ধরনের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাইরে কোথাও বেরোয়নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গরম জলের বোতল পায়ে সেঁক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরনও অগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেন বনে-ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিস নয়। আর একেবারে অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বের কমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদি হয়েচে, ছোড়দা। আহা, মা যদি একটি-বারও চোখ মেলে দেখতেন। আমাদের কপাল !

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথা তেমন ক'রে কোন দিন ভাবি নি, আমাদের কাজকর্ম্মে, উত্তমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থান ছিল না, সবাই মিলে যাকে উপেক্ষা ক'রে ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্ব্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ একদিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরের পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, একদিন সে ঘরের নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গা জুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। সে ছোট মেয়ের মত কেঁদে আবদার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দুজনে মিলে এই সংসারে সকালে-সন্ধ্যায় দু-বেলা খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশী ঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরি হয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝেনি।

দিন দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলা ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হুট্ ক'রে ঘরে ঢুকলে যে?

বৌদিদি অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন, জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলেনি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথা আছে, শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক'রে অন্ত জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয়নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিইনি। এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। বলো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এঁরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রাদ্ধ করলে তাতে কোন দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা শুনলে না; এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সইল না। বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক্ আর ওদের পরামর্শেই হোক্।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমায় আড়ালে বললে—ছোড়দা, আমায় বনবাসে ফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আসবে বল? আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্তেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্চে না ওরা। এ কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রাদ্ধ করতে খরচ বেশী পড়বে, কারণ জেঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচ হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবিটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নেই, নইলে নিতুর বৌকে এ বাড়ি থেকে আজকে অন্ত জায়গায় যেতে বলে?

আমি বললুম—সে কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ও কি কথা বলচিস জিতু? এ তোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দুখানা ইট থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? এ ভিটেতে হারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্ত্তি। এই একজনই এ-বাড়ির মধ্যে বদলে গিয়েচে একেবারে। গাড়িতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার বার মনে হলচ্ছি।

॥ ১০ ॥

মাস পাঁচ-ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে বললে—এস এস ঠাকুরপো, রদ্দুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো! তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে শরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো, তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আসতে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকেলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমার বড় মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরী ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন আর মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েছে। বৌদিদির বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, এক ঘরে পুরানো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো বেরুনো, ওয়াড়-হীন ময়লা লেপ টানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিসই সকলের, নিজের বলে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েচে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েছে যাকে সে বলতে পারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতি বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই ছাখো এই হচ্ছে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্দেবেলা ও হয়, ওই সজনেগাছতলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তারপর এই নতুন গোয়াল হয়েচে এই বোশেখ মাসে—বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললে—বড্ড পয়মন্ত বাছুর, যে-মাসে হ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ি পাঠিয়ে দিলে, ওর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোকরা কোথা থেকে একখানা ভাঙা খোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের ঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি একদিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি,

দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আট দিন পর ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরো আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, এক হাতে কচি ছেলে মানুষ করা থেকে শুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন ব্যাজার হ'তে দেখলাম না সেজন্যে বৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চা-বাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রে ফিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখলাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—স্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এ চা-বাগানে ও চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না-হয় কিছুদিন উমপ্রাং বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বসতে না বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর, নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিস আমাদের ছিল না। তার অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিকে। আমি বৌদিদির ধরনের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিস দিয়ে বৌদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিস বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরনে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকে সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তোমায় মানতেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো—কড়া কথা ব'লে নয়, মিনতি অনুরোধ ক'রে মানাব। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ঝাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময়ে দাদা বললে —শোন্ জিতু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ও বাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন্, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দু-ভায়ে মিলে ঘরবাড়ি করি আয়, দুজনে মিলে টাকা আনলে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার? সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আর ছাখ্, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাকলে কি কেউ মানে? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি? লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্তালী-ধরনের কথাবার্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে। নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

একদিন রবিবারে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহুদিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেণ্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাঙা ঘরের বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখে লোকটা উঠে বসল—এসো, বসো বাবা। বেশ ভিজেচ দেখচি বৃষ্টিতে। বসো।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও।

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারপর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।...

আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়ে ছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাত-খানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি, আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তারপর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি না এইমাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আনতে দেখতুম। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটা চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগ্‌ড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকরি-বাকরি খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন ? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতি কষ্টে মত করালুম। তারপর মেসে ফিরে জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন ? আমার কাছে টাকা আছে, দু'জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখবার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট স্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌছেছি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দোকানের সামনে বট-তলায় আমি আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে। আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো ?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো হাজার হোক্, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম—কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সবচেয়ে সেফ্—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটো টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুশকিল। ঘণ্টাখানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নেই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থাটা দেখেশুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্র-লোকের ছেলে, এমন জুয়াচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে ? দামের জন্যে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখলে চিনতে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস আপনার স্যুটকেস্‌টা নিয়ে যায় নি!

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিমমুখে চললাম। আমার স্যুটকেসে একটা ভাল টর্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলে না।

পথে হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে জনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চারজন পুরুষমানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারা গাছতলায় উনুন জেলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

একজন বললে—কনে থেকে আসছেন বাবু ?

—খাগড়াঘাট থেকে—তোমরা আসচ কোথা থেকে ?

—আমরা আসতেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলির মেলায়।

একজন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে।

—আমি তামাক খাইনে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়েচ কতদিন ?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পুষ্যিয়েতে বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি! তিনদিন ধরে আর থামে না, জিনিসপত্তর ভিজে একশা, প্রায় পঞ্চাশ ষাট কোশ এখান থেকে—নওদা চেনেন ? সেই

নওদার সন্নিপত্য আমাদের বাড়ি, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—দাদাঠাকুরের খাওয়াদাওয়ার কি হবে? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাত কোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগছিল, ওই রাত্রে তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুন ছাড়াতে বসলো। ওদের মধ্যে একজনের নাম বাবুরাম—সে পুকুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুকনো কাঠকুঠো কুড়িয়ে আনতে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন, জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জ্জন মাঠে জ্যোৎস্নার অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবল মনে হয় আমি আর সে সব জিনিস দেখি নে। কতদিন দেখি নি। যখন চিনতে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দুর্ব্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবলে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষ প্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে থাকলে অনন্তপথের যাত্রীদের দেখা যায়···ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভিত হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা মুক্তা হয়, বিল-বাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধু সৃষ্টি করে···আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে জীবনের মধ্যে সে আছে, সে জীবনের জন্যে সে তৈরী হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকম রাঁধছে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ—যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোনো আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার মনে না এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশ্যি দেখিয়ে দিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলার চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইচে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রে কি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বললে—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখছেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বললে, অমুক জায়গায় মালসায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পানচালার কোণে ভাঙা উনুনের মধ্যি মালসা পোঁতা ছিল —কেউ জানতো না। মরবার সময় ভাই টাকার মাল্‌সা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখতি দেখতি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই রটালে মাল্‌সাসুদ্ধ টাকা সেই রাত্তি

গোলমালে চুরি হয়েচে। এমন কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদ্দটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাণিজ্য ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে তো লাগলোই না—একটিমাত্তর মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগেও হ'ল না। টাকার মাল্‌গা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেলল—

কাপাসীর মা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাগো হ্যাঁ, সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক! যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে, না বুঝি নে? ধম্ম আছেন মাথার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর দোর ঘুরিচি ছুটো ভাতের জন্তি—আমার যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্নি করো না বাপু। তোমার অদেষ্টে থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্‌কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর একজন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কাল দুপুরের আগে পৌঁছানো যাবে না?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ড়ী কোশ, তার আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবার কেঁদুলির মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো···সে-বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও সুখী হয়? আর সুখ জিনিসটা কি অনির্দ্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জ্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্ন দেখছে—কিন্তু একজনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর একজনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য!

সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা। কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে গন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাঁটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদের ও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর তেমন লোক দেখি নি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধূ-ধূ সীমাহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্তের কি মূর্ত্তি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র শ্বাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ব্ব নাম-না-জানা অনুভূতির

অভিজ্ঞতা। মুখে সে কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে যার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন ; তার স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাঁর গালবাক্যের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি, তিনি দোরের আড়াল থেকে স্বামীর উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্তুরতা কিসের বল দিকি ? রান্নাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে ? গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বললে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললে হাওয়া আসবে তো, ও ড্যাক্‌রা ? ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমার পিণ্ডি রাঁধবো খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তো দাঁতের বাদ্যি—ওই রকম সদাসর্ব্বদা চলছে। আর ঘোর শুচিবাই, দুনিয়ার সব জিনিস সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে তক্তপোশ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিস সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কি শোয়া যায় ? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মরে গিয়ে অব্‌দি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশতিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। দু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটাঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রিযাপন করবো বলে মাটির ওপর ছোট শতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুক্‌নো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটি তারা—আমি একবার তারাটির দিকে চাইছি, একবার চারদিকের নিস্তব্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি। হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলক চোখে জল এনে দিল, মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎ নয়।

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জ্জনে ঝড়ে-পড়ার জগৎ···অজানা কত বনপ্রান্তের কত অশ্রুভরা আনন্দ-তীর্থের জগৎ···কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া···কত আশার হাসি মিলিয়ে যাওয়া···

শুধু নির্জ্জনে চূতবীথির তালীবনরেখার মাথার ওপর শ্যামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক···শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ব্ব, হাসি, দৃষ্টি-ক্ষমতার বাহাদুরি কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত প্রিয়কে নির্ম্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে···

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়···

আবার নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবার হাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্ন-জাল বোনা···অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে

চলে, পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গান পুরোনো হয়ে যায়। গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য-অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীবজগতেও এরকম বেদনা, দীনতা দুঃখ। দূরের সে-সব অজানালোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী দীর্ঘ বটগাছের ছায়ার বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে···যে অনন্ত তার চারধার ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিটমিটে তারার আলোর। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষ-রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, কূলে কূলে অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলস শেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে। সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্ত্তের জন্তে জগৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হবে না জানি—কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

॥ ১১ ॥

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়াবাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেকগুলো গাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, ঊষর ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুরপাড়ে বকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিম গাছের ছায়াভরা ঘনকুঞ্জ, দু-চারটে পাখীর সান্ধ্যকাকলি—মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্বীপের মত মনে হ'ল। এ অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তসরের বহির্ব্বাস, উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে,—কোত্থেকে আসা হচ্চে বাবুর? তারপর তালপাতার ছোট চাটাই পেতে দিলে বসতে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটির দেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটি বৈষ্ণব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চাটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজনা ও গান শুনচি—এমন সময় একটি মেয়ে আমার উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন—?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন?

মেয়েটি শান্ত স্বরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, তাতই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে নয়—এখানে আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বলবেন। চা খান কি আপনি?

এ পর্য্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনি নি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কি না দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বা দাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেকচি নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সামনে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়ে সকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্যামাকাকা, নাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান। ওবেলা তো খাওয়াই হয় নি!

সে সসম্ভ্রমে বললে—না দিদিঠাকুরুন, আমাকে বলতে হবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চলবে কেন? দুধ দিচ্ছি—

তারপর আমার সামনে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি? আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিনজনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিশেষে এবং তার বিচারকর্ত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি তো! দেখতে সুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম মুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, না ওর মুখের একটি বিশিষ্ট ধরনের লাবণ্যময় গড়নের জন্যে, রাত্রে তা ভাল বুঝতে পারি নি। মেয়েটি কে? নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেচে পরিপূর্ণ ভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন। আখড়ার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন না হয় সেদিকে দেখলাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধমণ চাল ঝাড়লে। বেলা ন'টার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুঁটলিতে থাকে তো দিন, কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে, খুলে দিন। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিজ্ঞেস করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। একজন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখড়াতে ময়লা-কাপড়ে থাকবার জো নেই।

এখানে দিন দুই কাটাবার পরে আর একটা জিনিস আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে, মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই, সহজ সিধে ব্যবহার, কি কাজে, কি কথাবার্ত্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা, যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা

যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন ? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্য্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, দেখবার জিনিস ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিনলাম। এক কোণে একটা বড় তমাল গাছের তলায় ইটের তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায় ?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—বাবা তো নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর এই বকুল-গাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞেস করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া ?

—কি, লোচনদাসের আখড়া ? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন' বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না ?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে রাজী আছি। পুকুরপাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি তো, হঠাৎ বাবা—তাইতে আদ্ধেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেচে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে তো, কি লতা এটা ?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন ? আমার নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতী-লতা ? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি বলে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

দু'জনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরনের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখ-মুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগল্‌ভ কৌতুক-প্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাবণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেচি ও সব মিথ্যে, মায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরও

মিথ্যে, ও দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে। মালতী এইখানেই আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আসবে তো?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোনো কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটিই মালতীর অভিভাবক, কার্যাতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে শুনলুম। উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিজ্ঞেস করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা শ্রীধর মুখুটি বেশ নামকরা কীর্ত্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্চেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচতুর্দ্দশীর রাত, ভাদ্র মাস···যেমন বাইরে পা দিতে গিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারে লেগে বুড়ো তা টের পায় নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। চেঁচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগ্‌গির আলো জ্বালো, আমায় একগাছা দড়ি দাও শীগ্‌গির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসলো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোররাত্রে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা লবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথিসেবার বাতিক আমি কখনও কারও দেখি নি। দোকান তো ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত বড় অতিথিশালা। যত লোকই বাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত-দুপুরের সময় পঁচিশজন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্ছে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিসপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্ত্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের কানের মাকড়ী আর ফাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—আর আর সংসারে থাকবো না। স্ত্রীও বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানে ওই হাঁড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। লবণ-কলাইয়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ্। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে এই লোচনদাস বাবাজীর আখড়ায় উঠলো। বাবাজী তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাঁকে সমাধি

দেওয়া হ'ল।

ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। গোসাঁইজী বলতো সবাই। গোসাঁইজীকে দেবতা ব'লে জানতো এ-দেশের লোক। এমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়মগণ্ডীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্তপুরুষ ছিল। হারবাসিনী কামারদের গাড়ির কাজ আছে কলকাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালীভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্তা রতনবাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোসাঁইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গোসাঁইজী, আমাদের অকল্যাণ হবে যে! লোকটা এত সরল—কোনো লম্বা চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কত লোক মন্ত্র নিয়ে আসতো। বলতো—মন্ত্র কি দেবো? আপনাকে ভাববে সবাইয়ের চাকর, ব্যস, এই মন্ত্র। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোসাঁইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টি মাথায় ভিজে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর-মত হয়েছে; আজ আর ভাত খাব না, কি বলো? দু-দিন পর জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। বুঝতে পেরেছিলেন বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে বলে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইলো যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অসহায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অত বড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে—ওই নিয়েই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে কত বদ্নাম রটত—গোসাঁইজীর মেয়ে বলে সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

দিন পনেরো কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'রে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে উঠছে, চলে যাওয়া তার চেয়েও অসম্ভব যে! মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্য্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধানে কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ নির্ম্মৎসর লোক পরস্পরের সগোত্র—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুন কিংবা দেখুন কপিলাবস্তু বা প্যালেস্টাইন বা আসিসির ওপরকার ইতালীয় ইস্রনীল

আকাশের তলে।

মালতীকে কত কথা বলবার আছে, ভাবি কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার তেমন নির্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছে আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আল্‌নাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী—

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই ?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। সকলকে যেমন যত্ন করে, আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠোনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটা ? আপনি সারাচ্ছেন নাকি ? কি জানেন আপনি একতারা সারানোর ?

আমি অপ্রতিভ না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছে এতে ? খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, রিক্ত অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে ? একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গেঁয়ো বৈষ্ণবের মেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে ? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিরাগী আপন-ভোলা বাপের আশীর্ব্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জা'নি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবচি। উদ্ধব বাবাজীকে ব'লে আমায় এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার ? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ার পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে, একটা সুকুমার লাবণ্য যেন ওর মুখের চারিপাশ ঘিরে আছে—এক ধরনের সুন্দর মুখ আছে, মনে হয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য্যজালের বেষ্টনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরনের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। বারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতায় গাড়ির কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পুজোর সময় দেশে।—তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে

পারবেন ? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। না:, সে-সব আপনার কাজ নয়। তা আপনি তো এখানে জলে পড়ে নেই ? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না ? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী ?

—কেন, বলুন না কি বলবেন ?

—এখন থাক্, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন ? শুনুন। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি !

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে, আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না ?—এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জ্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী !

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দুটো কথা না ব'লে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন ? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুকরো টুকরো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখন-বা শুধু চাহনি···এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এত ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা হিসেবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমনভাবে সকৌতূহল ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা যোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এইখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিজ্ঞেস করতেই মালতী বললে—এখন আর ওসব চর্চ্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলিনি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। উদ্ধব-

জ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যাঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোনও পূজা-অর্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার যোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতে দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কার-মুক্তও নয়। ছোটখাটো বাছ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়া-ছুঁয়ির বালাই বড়-একটা নেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাওড়া পাড়ায় অসুখ হলে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনে মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিস দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শাল-পলাশের বন – টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটা ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খৃষ্টান হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী দু'খানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিনজনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহান্তি কাকা, বলুন তো এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এঁকে। ইনি আবার খৃষ্টান কিনা, ওসব মানেন না।

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বকছ মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—

মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাগান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিষুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হয়ে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গ দেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘ মাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্ব্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রিমশাই? মানেন না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এ-রকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলার নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাদেবী, কালিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনের প্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পুজো দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক

পাড়াগাঁয়ের বোষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভে যাত্রীদের বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী পল্লীবধূকে চোখের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথার লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছল ওর প্রণাম। কোন্ উর্দ্ধমূল অধোশাখ দেবতা ওর সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন মেঘলোকে পিঙ্গলবর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি।···পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলে নি এখনও। প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খৃষ্টান বল, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বাল্যজীবন, মিসনারী মেমদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখন হারিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম যা মনে ছিল—যেমন চা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যু-দিনের ব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কি জাত আছে মালতী? কর আদায় করতো লেভি, ইহুদীসমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেললে। সমাজের যত হেয় লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলতো পাগল, ধর্ম্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানতো না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোধূলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্ব্বত্র—তালের সারিতে, তমাল-নিকুঞ্জে, পুকুরে-ফোটা মৃণালদলে, দুঃখে শোকে, মানুষের মুখের লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে···সে এক অদ্ভুত দেবতা! কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!···

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম! চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম কি শুধু যীশুখৃষ্টের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ার লোচনদাস

বাবাজী ছিলেন, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকে বুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক্ থুক্ করছে, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। লোচনজ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়ে ফেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়ে দিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলার দরকার করে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো ধর্ম্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দানসামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিতে দিতে পৈতৃক আমলের বাসনের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সব দেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, আর যার কান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখে জল ভরে এল। অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দেখেছি মালতী শুষ্ক চোখে কখনও ওর বাপের কথা শুনতে পারে না। সন্ধ্যা হয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়েছি —তার পর কতদিন সেদিকে যাই নি, কি জানি মূর্ত্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেইখানে আছে কিনা? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি একটা কথা বললে তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বা রে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্ত্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু'জনে যখন ফিরছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্ত-প্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতি-দিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ একজন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি সুস্বরে গাইলে—আমার মানসবৃন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখালবালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম।

আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জলজ্বলে শুকতারার আলোয়। কে জানে হয়ত ওই শুকতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নামাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন জরাহীন দেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন ছায়ায় প্রণয়ীজনের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়···তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তের আলোয় করুণ সুর বহুদূরের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সান্ধ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানে না···কেউ বলে বহু দূরের কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা একা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুর ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায় ···ঠিক কেউ বলতে পারে না···কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে সুখী

প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে···তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে···অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে একজন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে —এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথায় যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্ধেবেলা শুনেচ যে। এত শীগ্‌গির ভুলে যাও কেন হে ছোক্‌রা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া চাই।

—আপনি তো মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

—পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর মলেই কি আমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো···এসো—আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তা তো দেখতে পাচ্ছি, পাগলের আর বাকী কি? আপনি যান, আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তাছাড়া মালতীকে ফেলে এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে যেতে যেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল···অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আসছে···

মধু রিপুরূপমুদারম্
মধু রিপুরূপমুদারম্
সুখদং সুখদং ভবসারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসা হবার আর দেরি নেই।

॥ ১২ ॥

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। একদিন মালতী আমার বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উদ্ধব-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া তো এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও তো নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক'রে হয় মালতী, আমি এমনি খেতে পারি নে। আর আমি তো খাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্তে দিই। এতে দোষ কি?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া তো হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার তো টাকার দরকার আছে। আমি তাকে

বুঝিয়ে বলি, টাকা না দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে।

সেদিন থেকে মালতী এ নিয়ে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে।—দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে এক-রকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগ্‌দীদের মেয়েরা হাঁটু পর্যান্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওঠে—তালের দীর্ঘসারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান, দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুরবাড়ি, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ, শৈলদি।...

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারও ওপর রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বত্থ-চারা আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাকে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। একদিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমার উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারিপাশে ঘোরার মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুরবে না; সবাই তো আর আপনার মত নাস্তিক না। অশ্বত্থগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু?

আমি বললুম—তা'হলে তুমিও সেবাটা শুরু ক'রে পুণ্যি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে?

মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, থাক্। আপনি ও-রকম পরের জিনিস নিয়ে টিটকিরি দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁত ওর খুঁত—ছিঃ, আপনার এ স্বভাব সারবে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তাহ'লে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রে আমার সামনে থেকে উঠে গেল।

বিকেলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল তো আর চলে না। কাল্‌না থেকে ভাল বাজিয়ে এনেছিলাম—ঢোলকে যখন হাত দেবে, আঃ, যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী! তা আপনাদের আখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর-খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক্।

মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে।

আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারব না।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না পেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আসরের ভার নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় রাগ।

—রাগ জিনিসটা তোমার একচেটে যে! আর কারও কি রাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের, কেমন তো ?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না ? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, রাগ জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয় ?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দু'জনে পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্তার ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধানো সিঁড়ির ওপর আমগাছের ছায়ার একখানা খাতা পড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না দেখে পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

*   *   *

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—"পাষণ্ডদলন-গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।"

দেখছি এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি ? ও দেখছেন কেন ? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না, দিন—ও দেখবার জো নেই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি ! এ শ্লোকটা কিসের ?

মালতী সলজ্জ সুরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন, দিন—

—শোনো মালতী—লিখেছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকেলে ধরনের। পাষণ্ডদলনের অনুকরণে বই লিখলে একালে কে পড়বে ? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয় ?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে ! আমি তো জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিয়ে দেবেন। আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার ঢেউ এসে পৌঁছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরের শৈলদিরা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি তো আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না। আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেব এখন।

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান ক'রে বাঁধা চুল ও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সে-রূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নেই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিসপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে —দৌড়ে আলোটা জেলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি ··

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্র নিপুণতার সঙ্গে অর্দ্ধেক জিনিস তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পরে সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড! অন্ধকারে দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জেলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরনের উঁচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জ্বল গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি—দুজনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্ত্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী। —কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সে রূপ। আলো জেলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিস আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনে জড় করলে।···

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতার জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম —চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতি কষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল

খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলুম। মালতী তখন অর্দ্ধ-অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যেন মায়া পড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হতে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্বত্ব আখড়াসুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। ও সকলের ময়লা জামাকাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেঁধে খাওয়াবে—সর্ব্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখদুঃখ কেউ দেখছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হলে—আমি যদি না থাকতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকাল-বেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ তো আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশেপাশে বালিশ। উদ্ধবদাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ করে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়। সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁশ ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি বলে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধবদাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধবদাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে বিদায় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চলে বলে সেটা অনেকের চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

॥ ১৩ ॥

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধু-হাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে একদিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন?

—কতদিন এসেছি ভাবো তো এখানে? প্রায় দশ মাস হ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—ঘুরে আবার আসবেন কবে?

—ভগবান জানেন। না-ও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না? আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই?

ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল,—ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে···ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বারবাসিনীর চারিধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবন-শোভা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় রোজ···আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো···আমরা দুজনে এমনি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব। ওকে রাঁধতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, সাধু-মোহন্তের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বোঝাবে, আমি ওকে বোঝাবো।···কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে ওর মনের এ ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'রে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল ক'রে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয্যে চার-পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজের কাছে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকে গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয্যে একঘরে হন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার? শম্ভু বাঁড়ুয্যেকে এখনও বের করা হয় নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে একজন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা তো বাতে পঙ্গু, উঠতে পারে না। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া তো দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপর জাতে ছুঁলে ওদের কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন তো?

তিনজনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ, সে এক কাণ্ড আর কি! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয্যের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্য দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরনের; মালতী খুব

ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমন শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে দিয়ে ঘড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি তো আছেই, আপনাকে অন্ত কিছু খাটাবো না, ভাঁড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটলে! মালতী, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোন জিনিস অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্ত ডালের গামলা, লুচির ধামা, ডাল্‌নার বাল্‌তির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনিই খেটেছে সে! চর্‌কির পাক ঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়াব ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর ; ক-জন লোক? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির শরবৎ তোমায় বরং দিতে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে ?

তারপর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত ? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্ত্তায় রাঢ় দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেশ এনেছি, খান—নীরদা-দিদি জোর ক'রে দিলে। ভাল সন্দেশ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, সিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরনের ভঙ্গি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই ক'রে দিই আপনাকে। ও-বেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীরদাদিদি একরাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে!

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখি নি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ও-বেলায় আপনার, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ! আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর!

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'রে মেঘ ঝুপ্‌সি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এইসব দিনে মালতীকে সর্ব্বদা কাছে পেতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচরো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

দু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, আস না কেন?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্তে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আর না এসে পারত? ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই বিকেলের দিকে, এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টান ক'রে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখি নি, আর, এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আর, কেন আস না—এই-সব বাজে কথা। আসি কখন? দেখছেন তো। খেয়ে উঠেছি এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানিনে মালতী? উদ্ধব-বাবাজীর কোণের ঘরে মেঝেতে চাটাই পেতে ব'সে তোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি?

—বেশ, দেখেছেন তো দেখেছেন। আসুন বিষ্ণুমন্দিরে সন্দে দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষণ্ডদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেই বই লিখছে! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীর এই এক গুণ, ও যখন মেশে তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব নিয়ে সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সেই গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুনগুন করে!

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিনবার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী।

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি আস না কেন? তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলুম ঘরের দাওয়াতে, এমন বর্ষা গেল—তুমি চৌষট্টিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার তো এলে পারতে? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আর আমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমাদের এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে বলে তাই? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না খেতে পেয়ে এখানে আছেন? আমি আপনাকে বলেছি নাকি?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষি আরম্ভ করল। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে শানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—যে উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপর সূর্য্যাস্ত সেদিন নতুন রঙে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়িগুলো দ্বারবাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখড়ার বাবাজীরা নিম-গাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সে-ই যেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভাল ক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমার এমন জালেও জড়িয়ে ফেলেছে!

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ পর্য্যন্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে তার পরদিনই দুপুরের পরে উদ্ধব-বাবাজী আমায় ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ্-বোষ্টমের থাকবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম, কারণ ওর মুখ দেখেই আমার মনে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব বললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার ভগ্নির সঙ্গে এই মেলামেশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে ও গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেয়ে-মানুষের নামে দুর্নাম রটতে দেরি লাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব যাতে না হয়

আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুণি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে তো—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে—সেটা আমার উচিত হতে না দেওয়া—নয় কি ?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই ; আপনি তো বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছা হয়—ওর বাবার ওর ওপর আদেশ আছে—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃষ্টানী মতের লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হ'তে পারে ? ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে, আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জ্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী ? তুমি অভয় দেবে ?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রার দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না ?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে ? না, হাসিখুশী না—দরকারী কথা। সবতাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ ? এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন—

মালতী কথা শেষ না ক'রেই ছেলেমানুষি হাসি শুরু করলে। আমি বললাম—না মালতী, লক্ষীটি ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি ?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তার মুখেচোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওর এ ধরনের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাইনে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অন্যদিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন ?

—ছেড়ে যেতে হবে এই জন্যে মালতী যে, আমি তো তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পারি নে।

মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিরকাল এই আখড়াতেই থেকে যাব ? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমি কথাটা যতদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক'রে বললাম—তুমি এখনও ছেলেমানুষ ! নিজের সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখতে পাবার ক্ষমতা এখনও হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল ? উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাবে একা একা ?

মালতী মুখ নীচু ক'রেই আস্তে আস্তে নরম সুরে বললে—বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দির আমার শেষ ক'রে

তুলতে হবে। উদ্ধব বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই তো আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচজনে লুটেপুটে খাবে অথচ আখড়ার দোর থেকে অতিথ্-বোষ্টম গরীব লোকে ফিরে যাবে খেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শান্তি হবে?

মালতীর মুখে এ ধরনের গম্ভীর কথা—বিশেষ করে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিস নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ ধরনের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা? জীবনটা এই ক'রে কাটাবে? এতেই শান্তি পাবে? আমি যে প্রস্তাব করেছি, তাতে তুমি তা'হলে রাজী নও? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেকক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেকক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে।

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা? বেশ মালতী।

মালতী সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল মাথা নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিম্বা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম।

মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল···আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

আমার ওপর কিসের দাবিতে এ কথা বলেছিল ও?

সে দাবি অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহন্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই রকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে, তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়···যে দেবতা সকল ধর্ম্মের অতীত, দেশকালের অতীত ···যার বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে অনন্ত নক্ষত্র-দলের মধ্যে···মর্ত্তে ও অমর্ত্তে তাঁর বীণার দুই তার···আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে···শাশ্বত সময় ব্যেপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ

থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবুদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্ দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্মল, শরতের সাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! খানিকটা রেলে খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জ্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। স্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে যে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলো—এখানে একটা রাত কাটালাম। ডাক-বাংলোর কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে তার সুগন্ধে ডাক-বাংলোর বারান্দা আমোদ ক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরনের বুনো গাছ, এক ধরনের হলদে-পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানিনে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় ঝুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটি খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা ক'রে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহর বাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুরা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, কথা বলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নেই বর্ত্তমানে—সারাদিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এতদিন কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, একদিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢালুটাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি—গবর্ণমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্ত্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্য্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্ত্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্ত্তির নাক ভাঙা, কোনটার নাক নেই, বেশীর ভাগ মূর্ত্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধূলির রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষিণী যেন জীবন্ত

হয়ে উঠল ; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুমূলে শায়িতা আসন্নপ্রসবা মায়াদেবীর চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে, তারপর চামেলীর বন কালো হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর করা বড় বড় কিস্তির মাঝিরা হনুমানজীর ভজন গাইতে শুরু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে ছোট্ট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।···রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অদ্ভুত ধরনের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই ? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা বলে কি কিছু বোঝানো যায় ? যার না হয়েছে, সে কি পরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো ? মনে হ'ল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন···চলেছেন কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশ হাজার বছরে তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে ? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটী যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে আসছে···আসছে···তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে···হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌছবার। এই তো আমার মনে আসল র‍্যাড্‌ভেঞ্চার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো···এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিভে যেতে না দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদাসের আখড়াতেই সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন ? ঈশ্বরের নাম দিতে পেরেছে কে ? শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধব-বাবাজী আমাকে আখড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

একদিন বৈকালে গঙ্গার নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিক্‌চক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারে চরের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও কত নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্ত্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক

ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, বহুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রে শুকনো মকাইঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দুজনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে···কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখাচোখি হ'লেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্যে দিয়ে। ওই একটার মধ্যেই সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নুয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্যে করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্যে জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্ত্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন ছন্নছাড়া মূর্ত্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে, তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাসার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভরে উঠল—কি জানি সে মুহূর্ত্ত কি ক'রে এল, সেই মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্ত্তে আমার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঙ্কোচহীন বিপুল আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের সহানুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে-ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা joy of life···আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বলত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজী সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্ম্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি—সাধুজী, আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে তলোয়ার খেলতে। শুকনো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আস্বাদ করেছে, ও-রস কি জিনিস যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?···এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বন-শ্রেণী পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্য্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুকরো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষি ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্য্যে আপ্লুত, নিরাশায়

যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন ? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটার একটা বকাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শান্তিময় নিভৃত গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমার প্রদীপ-জ্বালানো শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের একপাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়···এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য্য চলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখীর গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজীর চেলা বর্ষানারায়ণ আমাকে খুঁজতে আসে চা খাবার জন্যে···তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয়···গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সামনে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমান-চরিত শুনতে হয়।

সাধুজী আমাকে ভালবাসেন। এই জন্যে ওঁর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বারোটা টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান নি—আমি পীড়াপীড়ি ক'রে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারি। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসব করবার হবার জো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না ? কিন্তু কি ক'রে হবে তা তো বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো ? উদ্ধবদাস-বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন দু-একবার আমায় এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন থাকলে ভাল হবে না। ও-সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে মালতীকে আমি ছিনিয়ে আনতে পারি, যদি আমি জানতাম যে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই যত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা! কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনের খবর পুরো এক বছরেও পাই নি।

এক-একবার কিন্তু আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে ? তোমার চোখ ছিল কোথায় ? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও ?

মালতী—কি মাধুর্য্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অস্ত-আকাশের অপরূপ শোভায় পাহাড়ের ধূসর ছায়ায় গঙ্গার কলতানের মধ্যে ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালী মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন ফেরে, যখন সাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়···কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকোতে বসে বিকট চীৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব ঝড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তার মনে পড়ে না ? আমার তো পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তার কি মনে পড়ে না ?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায় দুজনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়ে সারারাত

কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসার করি—সে বলে—ভেবো না লক্ষীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক ক'রে দেবেন। তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁত আছে, মালতীর খুঁত নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁত রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-একবার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত উদয় হয়। তখন সবই সুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি করে ওর জ্যাঠতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার সুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা কি সে-সব অপূর্ব্ব দিন! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু-মুহূর্ত্তগুলির ছায়াপাতে তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী-কুরচি-ফুলের শয্যায় ব'সে চারি দিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর রূপ ও শরতের আকাশের সাদা সাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙার মাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দ্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরে সুনীল ও সাদা মেঘস্তূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শ্রান্ত, শান্ত পদসঞ্চার ধীর!

আগে প্রেম কা'কে বলে তা জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোন দিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয়তো কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তৃত অধিত্যকায়, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখায়!

দিনে রাতে মালতী আমায় ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে, নয় তো মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরনে চুলটি বেঁধে, হাস্যাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে

উপবাস ক'রে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনানো, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনানো—সকলের ওপরে তার হাসি, তরে মুখের সে অপূর্ব্ব হাসি! কত কথাই মনে এসে নির্জ্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কুটজ-কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলার এই নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহবার্ত্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলুম অমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই করেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই-ই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের ঘাটের কত জ্যোৎস্নারাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্নারাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

॥ ১৪ ॥

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলাম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। সামান্য ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে—এখানে বেশ খেতে দেয় জিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সের করে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটি একখানা?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোর পর্য্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন্।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমার বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমি দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকেলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হ'ল দাদা তো বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্টে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রীর ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বলতে পারেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কমল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটার একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—সৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তারপর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেকক্ষণ ধরে আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থামছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। সামনের ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেড্ লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়াল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখলেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দিলে।

রাত আড়াইটে। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দার ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে —অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জ্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্ট রোড ধ'রে উদ্‌প্লাণ্ডের মিশন-হাউস্ পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরি চুরি ক'রে শরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে। বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টি-পতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও সেই আর্ত্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টন্‌সিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে

রোগীদের ফাইফরমাশ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ…দাদাকে বাঁচাবার জন্তে সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমার।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হ'ল যেন স্বর্গ। আর্ত্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্ত গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্তদেবের সংকীর্ত্তনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। …রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশ্বত্থতলার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটি, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক্, যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পর্ব্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্ত হোক্, নির্ভয় হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না!

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারি নে। মধ্যে নার্স দুবার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা, দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্তালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট কাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না,

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যে হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেও বলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে। আমি চোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবে মারা গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি? তাকে কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না? এই তো সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ তো হয়ে গিয়েচে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।…

তার পর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এ-রকম আগে দেখতাম, তখনই এ-রকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিসটা পেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয়!

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। পথে দাদার শ্বশুরবাড়ির এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখে খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রেঁধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুরপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোক-প্রকাশের ঘটা কি! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সান্ত্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল, সঙ্গে একজন যাওয়া দরকার নিয়মমত—তখন—এক একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে চলে গেল। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে এরা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি খানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে

বললে শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো? সেই তো মরেই গেল—হাসপাতালে না নিয়ে গেলেই হ'ত! তবু আপনার জন কাছে থাকত!

আমি বললাম—বৌদিদি, তুমি ভেবো না, এখানে যে রকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমার তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আর বছর। এ কথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভায়ের মুখে শুনেছিলাম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরীব, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়সও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরির চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই না নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার উপর দাদার অসুখের সময় কিছু দেনাও হয়েছে।

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্য স্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরাতে এদের নিয়ে যাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না হওয়া পর্যান্ত বাড়ি-ভাড়া দিই কি ক'রে?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিক কুণ্ডু মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনো করি নি, করবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন-যাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথে চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে, পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকুরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কানাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সবতাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু মহাশয়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ যোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকুরির সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টাকা আসে? বৌদিদির মত গৃহিণী, তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুর গাড়ি ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুন পটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আর তন্থু চৌধুরী ব'সে। তন্থু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহেবের পাটের গদির গোমস্তা গাংনাপুরে খরিদ্দারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তন্থু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজরার উপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশে মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র।

শেষরাত্রে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে উর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্ম্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্র-জগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিকে চেয়ে দেখবে চলতে চলতে, সে-ই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজী হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, স্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম —কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে তো একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন ক'রে!

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায়—এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে যেতে থাকি —কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময়ে যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধু-পারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত একদিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জ্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল-দিগ্বলয়ে-ঘেরা মাঠের মধ্যে যে দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছিলেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আজও ঠিক তাই হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। তন্থু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তন্থু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এসব সময়ে, কারও সাহচর্য্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানা-

গুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষ-ভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরব-সমৃদ্ধ পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্যে, ওদের আমি তো ফেলে দিতে পারব না! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকে ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ও-রকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ঐ পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘপর্ব্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও! আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন এই মুহূর্ত্তে—আমি আছি তাই তিনি আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করি, পরের জন্য খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্য্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবাব্রত সূর্য্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ ততক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিসই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্ত্তী যে মহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্ব্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য শুকতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখি উইয়ের ঢিবিতে নতুন পাখা ওঠা উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলাকার সূর্য্যের আলোর সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, দুঃখকে

জয় ক'রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।

॥ ১৫ ॥

দাদার মৃত্যুর মাস তিনেক পরে বাতাসার কারখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না আসা পর্য্যন্ত ছেলেরা বৌয়েরা সৎশাশুড়ীকে খুব সেবাযত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মূর্ত্তি গেল বদলে। যা দুর্দ্দশা তার শুরু করলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চুকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি! আগের টাকাগুলো ওদের হাতে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চু অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চু আরও ক্ষেপে উঠল। বেচারীর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীর বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল করেই মেটালে! একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূর-সম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অসাক্ষাতে মাসীমা আবার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'লে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল, আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যত দিন অন্য কিছু না হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে সুখ যদি পাই, তা থেকে আমায় নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চু কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুন কালীগঞ্জে কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চুদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ি গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটিটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুঠুরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা,

চুনবালি-খসা দেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাচ দিয়ে বন্ধ, কার্ত্তিক মাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুলিতে টাট্‌কা খেজুররস জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাঁড়ুয্যেবাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই।

সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি?

সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থায় বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি তুই? পাগল! ধার্ম্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি কি ছিলাম, না-ছিলাম তুই তো সব জানিস সীতা। আমার ধাতে ধার্ম্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন্।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে। ওর বড়-জা বললে—এই তো ভাই মনের মত মানুষ তো পেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়।

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস তো?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওই শান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা রয়েছে। ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। এক ধরনের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা মনের আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রসূত ভয় থেকে পূজা-আচ্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পুজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে—রবিবারে আদা খেতে নেই। দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকেল চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুবে—এত ঘুমুতেও পারে! এদিকে আবার ন'টা বাজতে না বাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে!

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ম্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখৃষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অভদ্র ভাবে বলে উঠল—ওসব ম্লেচ্ছ ঠাকুর দেবতার নাম ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে চলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে এ কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না। সীতা ওবেলা পায়েস পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি,

তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না। কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বা চিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা! দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি-হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেকো না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছের ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উমপ্রাঙের মিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেয়েরা সীতাকে কত কি ছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে! কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায় কি হয়ে গেল সব! মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে। সীতার দশা যখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।

মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা কথায়। সে আমায় লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চ্চি রাঁধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য, আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে, দেবদেবীর পুজো-আচ্চা করি নে ওর মত। ওই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চ্চির হাতে-রাঁধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্ত্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি—যে যা বলে বলুক, আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে,—আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকম রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্ম্মই আমার ভাল।

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি রাঁধি আবার বৌদিদির সেবা-শুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি

অচৈতন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করচে, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে—এখানে নোংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিস কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি, ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দারিদ্র এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলাম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলুম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাকরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখা-শুনো করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈয়ারী করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে, কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে। খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ স্বরে বললাম—খুকী, এদিকে এস—

আমার গলার স্বর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়াস নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারল না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আথালি-পাথালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আর কখনও এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে দুটো মুড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার, খিদে পেয়েছিল ব'লে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে!

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়ি ক'টা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছি, এ কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনি ক'রে নির্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্ প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। এদিকে এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদি বৌদিদি না-ই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট্ট খুকী যোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন,

মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অযত্নের একশেষ হচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকে রোদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এই দেড় মাস—হর্লিক্‌স্ খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাত্রে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাত্রে উঠে এমন কান্না শুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাত্রে তো প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বলে না খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনাস্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র, আমার কাছে কারুর কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিকে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়! স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে তো পারি নে!

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুশকিল এই হ'ল যে স্তন্যদুগ্ধ তো দূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কলকাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। একজন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী ক্ষিদেতে ছট্‌ফট্ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা ধরে তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, সে আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসে, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠোনের নারকোলতলায় চট পেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপার্থিব হাসি কি অপূর্ব্ব অর্থহীন খুশিতে ভরা! ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম—একটু দুধ দে তো গরম ক'রে, হয়ত খিদেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাত্রে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুষিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীর সেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আধসের দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে

এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোশামোদ করেও বেলা বারোটার আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্ব্বোধ হয়, তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালা-বাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি, যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুয্যের বাড়িতে দেড় সের ক'রে দুধ হ'ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি, ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে মায়ে-ঝিয়ের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হ'ত, মেয়েটা নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথাও হয়েছে অনেকবার। আমার অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিজ্ঞেসও করেছেন আমি দুধের কোন সুবিধে করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চা-ও খাইয়েছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি, এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হয়েছে, এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছুতো তুলে দুধ দেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—"ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।"

ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্‌টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাঁচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মানুষ করব? স্তন্যদুগ্ধ একে কেউ দেবে না এই পাড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতে ছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশীপদ ভট্চাজ্জের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল:

এই সোনার খুকীকে সেই রকম বিলিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্য্যন্ত ক'রে আসি নি আসার সময়—আর তার পর এতদিন কোন খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময় সে আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে।

কিন্তু খুকী আমার সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল

কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্যে, তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন ভেবে। আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত সঙ্গত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র অস্ফুটবাক্ শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

॥ ১৬ ॥

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন। কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায়, জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে, তখন বুঝি এটা দিন। বিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহুদূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌছনো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখন যাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ, আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে গেলাম যেন, আটঘরার বাড়িও বাদ গেলো না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি দ্বারবাসিনীতে যাচ্ছি খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙামাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পরে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তারপর আমায় চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানিনে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তারপর আমার রুক্ষ চুল ও উদ্ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকে আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তারপর?

আমি বললাম—তারপর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন ?

—নানা দেশে। তারপর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি !

তার পর সে বললে—আপনি বসুন, খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আজই ?

আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন তুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব ? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায় নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী ? তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? তোমার এই আখড়া ?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল —ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে বললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে, মালতী কে ঠাকুরপো ?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম ? কত দিন বলেছি ?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা তো গেলই, বৌদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তা-ও গেল। নতুন চাকুরিটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার দু-একজন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরির স্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেকদিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা আম-কাঁঠালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, সংসার একরকমে চলে যায়।

সময় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে শুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে। ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি, একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাস্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাত আঁচড়ে দিয়েছে তার নাম হিরণ্ময়ী, বয়স হবে বছর চৌদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে

খুব কমই আসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চলা। সকলের চেয়ে সে বয়সে বড, সকলের চেয়ে সভ্য ও শৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম —তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ ?

অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ক্ষেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্যই ও রাগের স্বরে বললে—কোথায় ভুল ? কিসের ভুল ব'লে দিন না ?

আমি বললাম—কাছে এস, অত দূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায় ?

আমি দেখে আসছি যে কদিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন ওখান থেকেই বলুন না ? আপনার কাছে কেন যাব ?

আমার মনে হ'ল ও বড মেয়ে ব'লে আমার কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত স্বর কেন ? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু ?

ও বললে—সে-সব কথার কি দরকার আছে ? আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে তো ? মাস্টারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার এই কি ধরন ? আর আমায় যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে না এলেই তো হয় ? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুন না ?

আমি ওর পড়াটা নিয়ে তারপর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য অবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বললে—কেন ?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধে হবে না।

ও বললে—রাগ করছেন নাকি ? কি করেছি আমি ?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমার বলা উচিত হয়েছে, হিরণ ? কি ব'লে তুমি বললে, আপনার কাছে কেন যাব ?···ওখান থেকেই বলুন না ? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন ?

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই ! তা কি এমন বলেছি আমি ? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম ? তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ও কথা বলার জন্যে, তা জান ?

হিরণ্ময়ী বললে—হাঁ, হয়েছি। হ'ল তো ? এখন নিন।

তারপর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ, আপনার এত রাগ ?···আগে তো কখনও রাগ দেখি নি এরকম ?···তখনও সে আমার মুখের দিকে সেইরকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলাম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত

ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছ থেকে তত দূরে আর বসে না—আর না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাস্টার মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক্ হয়ে বললুম—কারা ?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা। আমার কথা না শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন ?

—এমনি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে দিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও তো তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়!

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ! এস, এস, কি মনে ক'রে ?

হিরণ্ময়ীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে ?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এ রকম অবস্থায় আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর ? এসব জায়গার গতিক আমি জানি তো।

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড় গে।

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ? আমি যাব না—এই বসলাম।

বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি তো জানি ওকে। বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন ? না—থাক, একটা গল্প বলুন না!···ও, আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন! সরুন, সরুন দিকি। আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে, রুটি না লুচি ?···আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্ময়ীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতে হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি-পরোটা তৈরী ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আর বলি নে। ওর মায়ের বারণও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে—কেন, যাই তাই কি ? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্ময়ীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না, যখন তোমার মা বকেন। মার কথাটা অন্ততঃ তোমার মানা উচিত। বুঝলে ?

পরদিন হিরণ্ময়ী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্ময়ী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল ও গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন তো হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাকলো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায় ?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলা মত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্ময়ী এসে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি ? ব'সো।

হিরণ্ময়ী বললে—কেমন আছেন আপনি ? তার পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্ ক'রে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়ালো।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবে পাইনে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন ?

হিরণ্ময়ী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাজার হোক নিতান্ত ছেলেমানুষ তো—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বসল। আমার মুখের দিয়ে চেয়ে বললে—কি সেই শিখিয়ে দিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি ? সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি।—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্ময়ী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে, এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্ময়ী বললে—আজ আলো জেলে একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাস্টারের কাছে গেলিনে বড় ? তাই এলুম মাস্টার মশায়।

আমি বললাম—তা বেশ তো, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না ব'লে দিলে তো আজ আসতে না ?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্ময়ী

সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে! বললে—নিন্, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনি না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

দুঃখিত ভাবে বললাম—ছিঃ, ও-কথা ব'লো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্ময়ী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষি হাসির বন্যা এনে দিলে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল—না—না দেন নি? বটে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—। পরে আমার সুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি! হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ ফেরাতে পারি নে—কি অপূর্ব্ব হাসি! কি অপূর্ব্ব চোখমুখের শ্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে রুটি বেলতে ব'সে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ওকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ। না, সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'রে নিয়ে কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্ করে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলছি—কি বোধ হয় দোষ করে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগ ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে। না বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন তো? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলব? ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?

ডাকলুম শেষটা না পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলে না। হন্ হন্ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে ব'সে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?

—এস এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা তখন নিজমূর্ত্তি ধরলে। বললে—আমি কি কুকুর নাকি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসব? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমার শরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না।—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—

ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো সে বললে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না, ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চেঁচিও না বেশী, কেউ শুন্‌লে কি ভাববে। আমার কথা শোন—রাগ করে না, ছিঃ।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত্তও। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে

বলা আমার আদৌ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণ্ময়ীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকি আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

যাবার দু-দিন আগে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

আমি বললাম—যাবই তো। তার পর, এত দিন পরে কি মনে করে?

হিরণ্ময়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবার বিকেলে গাড়ি ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠবো।

হিরণ্ময়ী একবার ঘরের চারিধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই?

সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুশকিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী ঝপ্ ক'রে মেজেতে বসে পড়ল—কর্ত্তৃত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না, আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি তো আর এতদিন উঁকি মেরেও দেখতে আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালা পর্য্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বই কি?

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না হিরণ, আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমায় আটকাতে পারবে না। কারুর জন্যে কারুর আটকায় না—এ তুমি নিজেই আমার একদিন বলেছিলে।

হিরণ্ময়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে বললে—ওই! কথা যদি একবার শুরু ক'রে দিলেন তো কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কারুর জন্যে কারুর আটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে!

—সে যাই হোক, আমি যাবই।

—কক্‌খনো না। ইঃ, বললেই হ'ল যাব!

আমি চুপ করে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্ময়ী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে বলে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাঁদু, মাস্টার মশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন আন নি ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাঁদু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে।

হিরণ্ময়ী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা যা বলছি তা শোন্। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকছ হিরণ, ছেলেমানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

হিরণ্ময়ী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা হবে। যাবেন তো যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত খানিকটা গুড় ওই বাটিতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্য দিনের মত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও সরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না,—কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক্, এ দৃশ্য তো কখনও দেখি নি! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না মাস্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহ'লে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় দুষ্টু!

তারপর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখনও দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা তো তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই-সব মুহূর্ত্তেই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন্' কবিতার সেই সর্ব্বহারা লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল :—I believe in God and Truth and Love!…

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার ক'রে এনে আস্তে আস্তে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরী করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমন কর্ত্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ানো সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিস প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না যেটা অনেক সময় মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধন্না দিয়ে বসে থাকে—

এবং নাকাল তার জন্তে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবু খেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিস এসেছে শুনলাম। পুলিস কিসের? একে ওকে জিজ্ঞেস করি কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলেছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিত্র বড় কেউ নেই। আমি আগেও যে একথা না জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কানাঘুষোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায় ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই তো ওকে শিখিয়েছে। নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি,—কিন্তু মাগী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। সাতকড়ি আরও বলল—কালীনাথ গাঙ্গুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে? এইজন্তেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম। আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অন্ত বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখুয্যের ওপর নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্তে পয়সা খরচই বা কে করে?

এদিকে আর এক মুশকিল। ওর মা আর দিদিকে যখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সেরাত্রে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস তো মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত না থাকে—তবে না থাকল তেমন জাত!

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচার্য্যি-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধল তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেকক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না? মুখ খুললেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ করে থাকি মুখ বুজে—বলি মাথার ওপর একজন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—খা কর ন-বৌ, আবার এ মেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচার্য্যি-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন—ধর্ম

দেখিও না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয্যেরা, ভট্‌চাযিরা, জিজ্ঞেস কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাস্টার-ছোকরার কাছে রাত বারোটা অব্‌ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিনশ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক গে, যার আঁস্তাকুড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে যাবে?

আমি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচার্যি-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যেবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না জড়ানোই ভাল। মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উল্‌টো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাঠার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়সেও তাঁর জ্ঞান যদি না হয় তবে আর কবে হবে···তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা করতে যান—ইত্যাদি।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন মাস্টার মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা?

বেচারী মুখরা হিরণ্ময়ী!

শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেবো না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তাহ'লে তোমার রাত্রে একা থাকবার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও; চাল-ডাল সব আছে তো?

কাওরাপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবার জন্য রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্ময়ী হাপুস নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাস্টার মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না তো?

হেসে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়াদাওয়া কর। কিছু ভেবো না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব, ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও এখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক

তো ?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিজ্ঞেস করে, মা আর দিদির কি হবে !

রান্না হয়ে গেল, ঠাঁই ক'রে আমায় ভাত বেড়ে দিলে। এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, আনাজের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে ! ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেকো। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রেঁধে খেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব।

মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্ত্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্ময়ীর জন্যে দু-একটা জিনিস কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকের মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন ? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি এসে পৌছলেও তো বাঁচি। নইলে হিরণ্ময়ীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে রেখে আসব। কারণ, এসে শুনলুম মোহিনী বুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকে দেখে এলেন মাস্টার মশাই ? তারা কেমন আছে ? খালাস পেলে না ?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণ্ময়ীর জন্যে যেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সেকথা।

তার পর হিরণ্ময়ী আমাকে বালতি ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জ্বেলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্দ্ধেক আমায় রেকাবি ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে সুখ নেই, কেমন যেন মুষড়ে পড়েচে, ছেলেমানুষ, নইলে ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এতক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিজ্ঞেস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে ? দেখেছেন আপনি ? এত দুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষি মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ রাত্রে মোহিনী বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলাম। বারান্দায় বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি বাইরে শোবেন কেন ?

কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে আমার বাধল। বললাম —দেখছ না কি রকম গরম আজ ? বাইরে শোওয়াই আমার অভ্যেস, তা ছাড়া—।

সারারাত দু-জনে গল্প ক'রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই।—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না ? মা, দিদি কবে আসবে ? সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে ? কলকাতায় কখনও যাই নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতায় থিয়েটার দেখতে কেমন ? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী বুড়ীকে বারণ ক'রে দিয়েছে এখানে

আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবো? আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কতদূর শেখা যায়? বিস্তার শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিস থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ'ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে নিলেন এবং যে মুখুয্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যেবেলা হিরণ্ময়ীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি, তাদেরই বাড়িতে খোশামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম, তিনি হিরণ্ময়ীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই তো তাকে তাড়না, তর্জ্জন-গর্জ্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে যে সেরাত্রে চৌধুরী-গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ, তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা বুঝল না যে হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরনের কথা বলে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রে হিরণ্ময়ীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্ময়ীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্ময়ীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। হিরণ্ময়ীর সেই শুকনো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্ময়ীর ব্যথা,··· হিরণ্ময়ীর দুঃখ,···ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্ময়ীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কে-ই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জ্জয় অভিমান করেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এতদিনে ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে তো দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? একসময় যার ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর তো তাকে চোখে দেখলুম না? ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কত বড় ট্র্যাজেডি এটা মানুষের জীবনের? শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়!

॥ ১৭ ॥

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি, সেখানে আমার বাসায় জিনিসপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো

করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগের মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে যাবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালো-বাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে যে-কোন বড় সৃজনী-প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ কথা সবাই জানে না, তাই যার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কতদিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঁঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ, মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ?

—এতদিন কোথায় ছিলেন? বেশ তো লোক। সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই?

হয়ত দু-বছর আগেও এ কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম, আহা, দ্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এ-রকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম। হিরণ্ময়ী একথা ভাবে নি যে, আমি আমার জিনিসপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলেমানুষি যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়?

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেঁসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য, শিরীষগাছের কাঁচা শুঁটি ঝুলছে। বাসুদেবপুরের মরগাঙের ভাগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে গুড়ের গাড়ির সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয় এক, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাঙা রোদমাখানো মটর-মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুঙ্গেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—ফাঁকা, দু-দিনের জিনিস। এখানে ফল পাকে না। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা, মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরীব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুষো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষি করলে মানায়? সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিরণ্ময়ীর আশাভাঙা চোখের চাউনি আর তার শুকনো মুখ, সেদিন যখন জিনিসপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হ'ল। তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্তসমুদ্র পারের কোন্ দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে···পুকুরপাড়ের তমালবনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'রে তো চাই না? যেন কত দূর-জন্মে তার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা?

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলো বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়িতে। তাদের মধ্যে একজনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীবগোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি তো অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি? আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়, আখড়া আর সে আখড়া নেই। দিদিঠাকরুণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জানেন না? মালতী দিদিঠাকৃরুণ তো আজ বছর চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে-ই এখন কর্তা। উদ্ধবদাস তো বুড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথি-বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না। মালতী দিদিঠাকৃরুণ তো মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটা সেখানে যাই নে।

ওরা চলে গেলে আমি স্টেশনের বাইরে সেগুনবাগানে গিয়ে কতক্ষণ ব'সে রইলাম। কতক্ষণ···কতক্ষণ। হিসেব ক'রে দেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবার এক বছর পরেই।

আজ হঠাৎ মনে হ'ল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম? অভিমান ভাঙবার সুযোগও তাকে আর একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মরে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটা আজ পেলাম! আমার মন অলক্ষিতে আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শামুক যেমন আত্মরক্ষার জন্যে খোলা তৈরি করে। আজ সে খোলা হয়ে পড়েছে শক্ত অনুভূতিহীন—অন্ততঃ এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণের তলার ব্যথার জায়গাটা আজ মনে হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে—আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন? বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে কখনো একদিনও কি অন্যমনস্ক হয় নি? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন 'পাষণ্ড-দলনের অনুকরণে' বই লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার সেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনে পড়ে নি?···কত ঠাট্টা যে করতুম তার সেই বই লেখা নিয়ে! আমার যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলেই সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায় কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না—করি নি কোনদিন। এই খবরের বদলে আমি কি না দিতে পারি!

পাগলের মত কি ভাবছি যাঁতা বসে! লাভ কি আজ এ-সব ভাবনার? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে পল্লীপ্রান্তের বনে ময়ূচে-লতার ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে কিন্তু কতদিন তার আয়ু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধার পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্পসুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশার চাপা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষার বারিধারায় ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ'তে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃতা হয়! তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

সেগুনবাগান থেকে উঠে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ে একটা হাতভাঙা বিষ্ণুমূর্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব।

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।···

আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব

দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্তগুলোর জন্তে এখনও মাঝে মাঝে মন কেমন ক'রে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্তে আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে··· তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ'ল, পৃথিবী ছেড়ে কোন্ প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে ব'সে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি, সে গাইছে :—

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে
ধেনু চরায় রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী খায় সে ননীচোর।

সেই আমার প্রিয় গানটা···যা ওর মুখে শুনতে ভালবাসতুম।

চোখোচোখি হ'লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের মত তার সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলছে—পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছো? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাছে পেয়েছি। দ্বারবাসিনীর পুকুরপাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতে তাকে যেমনটি পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যেই তন্দ্রাঘোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলি নি মালতী। তোমার ব্যথা দিয়ে, ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। সে কি ভোলবার?

কিন্নর দল

মণি ডাক্তার

আষাঢ় মাসের প্রথমে জ্যৈষ্ঠের গরমটা কাটিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা, যে কষ্ট পাইয়াছিলাম গত-মাসে! এই বাগানঘেরা হাটতলায় কি একটু বাতাস আছে?

কিছু করিতে পারিলাম না এখানেও। আছি তো আজ দেড় বছর। শুধু এখানে কেন, বয়স তো প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত কি করিলাম জীবনে? কত জায়গায় ঘুরিলাম, কোথাও না হইল পসার, না জমিল প্র্যাকটিস্। বাগ-আঁচড়া, কলারোয়া, শিমুলতলী, সত্রাজিৎপুর, বাগান গাঁ, কত গ্রামের নামই বা করিব। কোথাও মাস কয়েকের বেশী চলে না। এই পলাশপাড়ায় যখন প্রথম আসি, বেশ চলিয়াছিল কয়েক মাস। ভাবিয়াছিলাম ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন বুঝি। কিন্তু তার পরেই কি ঘটিল, আজ কয়েক মাস একটি পয়সারও মুখ দেখিতে পাই না।

এখন মনে হয় কুণ্ডু বাবুদের আড়তে যখন চাকুরি করিতাম শ্যামবাজারে, সেই সময়টাই আমার খুব ভাল গিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন লোক চাকুরিটা জুটাইয়া দিয়াছিল; খাতাপত্র লিখিতাম, হাতের লেখা দেখিয়া বাবুরা খুশী হইয়াছিল। আট নয় মাসের বেশী সেখানে ছিলাম; তার মধ্যে কলিকাতায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়াছি। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের কালীমন্দির। কি জায়গাই কলিকাতা!

চাকুরিটা যাইবার পরে পরের দাসত্বের উপর বিতৃষ্ণা হইল। ভাবিলাম, ডাক্তারী ব্যবসার বেশ চমৎকার স্বাধীন ব্যবসা। কুণ্ডুবাবুদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ধরিয়া তাঁহার ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া মাস দুই কাজ শিখিলাম। কিছু বাংলা ডাক্তারী বই কিনিয়া পড়াশুনাও করিলাম। তারপর হইতেই নিজের দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর যশোহর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস নাই, হিন্দুর মধ্যে কয়েক ঘর গোয়ালা ও কলু আছে, বাকী সব মুসলমান। পলাশপুরে কারো কোঠা বাড়ি নাই, সকলে নিতান্ত গরীব, সকলেরই খড়ের ঘর। খুব বেশী লোকের বাসও যে এখানে আছে, তাও নয়। যদি বলেন, এখানে কেন ডাক্তারী করিতে আসিয়াছি, তার একটা কারণ নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে এখানেই হাট বসে। এমন কিছু বড় হাট নয়, তবুও বুধবারে ও শনিবারে অনেকগুলি গ্রামের লোক জড়ো হয়।

হাটতলায় ক'খানা খড়ের আটচালা ও সবাইপুরের গাঙ্গুলীদের ছ'আনি তরফের কাছারী-ঘর আছে। কাছারী-ঘরখানা দেওয়াল-বিহীন খড়ের ঘর। বছরের মধ্যে কিস্তির সময় জমিদারের তহশীলদার আসিয়া মাস দুই থাকিয়া খাজনাপত্র আদায় করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং ঘরখানা ভাল করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সারা মেঝেতে ইঁদুরের গর্ত্ত, মটকা দিয়া বর্ষার জল পড়ে, ঝড়-ঝাপ্টা হইলে ঘরের মধ্যে বসিয়াও জলে ভিজিতে হয়! ছ'আনির বাবুদের এহেন কাছারী-ঘরে নায়েবকে বলিয়া কহিয়া আশ্রয় লইয়া আছি।

একাই থাকি। এ দিকের সব গাঁয়ের মত এ গাঁয়েও বনজঙ্গল, বাঁশবন, প্রাচীন আমের বাগান বড় বেশী। হাটতলার তিনদিক ঘিরিয়া নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান, একদিকে নুড়ি

জঙ্গলের গা ধরিয়া আধপোয়া পথ গেলে বেত্রবতী নদী—স্থানীয় নাম বেতনা। বনজঙ্গলের দরুন দিনের বেলাও হাটতলাটা যেন খানিকটা অন্ধকার দেখায়, রাত হইলে হাটতলায় লোক-জন থাকে না, দু'একখানা যা দোকানপত্র আছে, দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে হাটতলা একেবারে নির্জন হইয়া পড়ে, বনে, ঝোপেঝাড়ে বাঁশবাগানে জোনাকী জ্বলে, কচিৎ ফুটন্ত ঘেঁটুকোল ফুলের দুর্গন্ধ বাহির হয়, উত্তর দিকের শিমুলগাছটায় পেঁচা ডাকে, আমি একা বসিয়া ভাত রাঁধি, কোন কোন দিন ভাত চড়াইয়া দিয়া একতারাটা হাতে লইয়া আপন মনে গান করি।

আজ ছয় সাত মাস একটা পয়সা আয় নাই। হাটে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিয়াছি, চার আনা ভিজিট লইব, ওষুধের দাম দাগপিছু এক আনা। তবুও রোগীর দেখা নাই। ভাগ্যে মুজিবর রহমান লোকটা ভাল, নিজের দোকান হইতে আজ চার পাঁচ মাস ধারে চাল ডাল দেয়, তাই কোন রকমে চলিতেছে।

গোয়াল-পাড়ায় দামু ঘোষের বাড়ি একটা নিউমনিয়া কেস ছিল গত মাসে। মুজিবর এদিকের মধ্যে মাতব্বর লোক, সবাই তার কথা মানে, তাকে ধরিয়া সুপারিশ করাইয়াছিলাম দামু ঘোষের কাছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমায় না ডাকিয়া ডাকিল গিয়া বলরামপুরের অবিনাশ সেক্‌রা কবিরাজকে। অবিনাশ কবিরাজের ওপর তাদের নাকি অশেষ বিশ্বাস।

সুবাসিনীকে লইয়া হইয়াছে মুশকিল। বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত তাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছি। একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত কোন দিন দিতে পারি নাই, ছেলেটির দুধের দাম সাত আট টাকা বাকী, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ তাগাদা করিয়া চিঠি দেন; কোথায় পাইব সাত আট টাকা, নিজেই পাই না পেটে খাইতে। টাকা দিতে পারি না বলিয়া শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ মহা অসন্তুষ্ট, তিনি ভাবেন কত টাকাই না রোজগার করিতেছি ডাক্তারীতে!

কেহ বলিলে হয়তো বিশ্বাস করিবে না, আজ চার পাঁচ মাস এক রকম শুধু ভাত খাই। পাড়াগাঁ হইলেও এখানে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া অতিরিক্ত আক্রা—পটল দুই আনা সের, আলু ছয় পয়সা। মাছ চার আনা ছয় আনার কম নয়। কেহ দেখিতে পাইবে বলিয়া খুব ভোরে নদীর ধার হইতে শুশুনি আর কাঁচড়াদাম শাক তুলিয়া আনি মাঝে মাঝে। আজ-কাল আমের সময়, শুধু আম ভাতে আর ভাত; কতদিন শুধু নুন দিয়াই ভাত খাইয়াছি।

পাসকরা ডাক্তার নই, কিন্তু তাতে কি? বাড়ি বসিয়া বই পড়িয়া কি আর ডাক্তারী শেখা যায় না? আজ সাত আট বছর তো ডাক্তারী করিতেছি, অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে! পাসকরা ডাক্তারের হাতে কি আর রোগী মরে না? ধোপাখালির ইন্দু ডাক্তার আসিয়া বিধু গোয়ালিনীর মেয়েটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল?

তবে কেন যে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, মণি ডাক্তারের ওষুধ খাইলে জ্যান্ত মানুষ মরিয়া ভূত হয়, ইহার কারণ কে বলিবে? আমি গরীব বলিয়া আমার দিকে কেউ হয় না, এক মুজিবর ছাড়া—ঐ লোকটা আজ তিন চার মাস বিনা আপত্তিতে নিজের দোকান হইতে চাল ডাল না দিলে আমাকে উপবাস করিতে হইত। সে আমার জন্ত যত করিয়াছে, এ অঞ্চলের কেহ তাহার সিকিও কোনদিন করে নাই। তাহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এ সব অজ-পাড়াগাঁ। রেলস্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে। কাছে কোন বড় বাজার কি গঞ্জ নাই, লোকজন নিতান্ত অশিক্ষিত; রোগ হইলে ডাক্তার ডাকার বদলে জল-পড়া, তেল-পড়া দিয়া কাজ সারে। ফকির ডাকাইয়া ঝাড়ফুঁক করে, বলে অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিবার রেওয়াজই নাই।

বাড়ি যাই নাই আজ দেড় বছর। পলাশপাড়া আসিবার আগে কিছুদিন ছিলাম সত্রাজিৎপুরে, তখন হইতেই যাই নাই। বাড়ি মানে শ্বশুরবাড়ি—নিজের বাড়িঘর বলিয়া কিছু নাই অনেক দিন হইতেই। শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইলে আট ক্রোশ হাঁটিয়া নাভারণ স্টেশনে রেলে চাপিতে হইবে। সেখান হইতে মসলন্দপুর স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে যাইতে হইবে খোলাপোতা। সেখানে মার্টিন লাইনের ছোট রেলে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া ইছামতীতে নৌকায় ছয় সাত ঘণ্টা গেলে তবে শ্বশুরবাড়ি। সবসুদ্ধ তিন চার টাকা খরচ পড়ে—যখনই হাতে টাকা আসিয়াছে, তখনই মনি-অর্ডার করিয়া সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—তিন চার টাকার মুখ একসঙ্গে কমই দেখিয়াছি আজ দু'বছরের মধ্যে। টাকা পাঠাইলে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের আর আমার বিধবা শালীর গঞ্জনার চোটে বেচারীকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

তাই এবার যখন আসি, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকাতে চড়িব, সুবাসিনী কোণের ঘরে ডাকিয়া বলিল—শোন, এবার আমায় এখানে বেশীদিন ফেলে রেখো না—তুমি যেখানেই থাক, আমায় নিয়ে যেয়ো শীগ্‌গীর।

—সেই সব পাড়াগাঁয়ে কি আর থাকতে পারবে ?

—এই বা এমন কি শহর ? তা ছাড়া তুমি যেখানে থাকবে, সেইখানেই আমার শহর। এখানে দিদির বাক্যির জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় গলায় দড়ি দিই, কি গাঙে ডুবে মরি।

—সবই বুঝি সুবি, আমার যদি একটুকু সংস্থান হয় কোথাও, তবে তোমাকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাবো। আমিই কি তোমাকে আর কোথাও ফেলে মনের সুখে থাকি ভাবো ? তবে কি করি বল—

দরজার বাহিরে পা দিয়াছি শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ওৎ পাতিয়া ছিলেন, বলিলেন—তুমি বাপু অমনি নিউদ্দিশ হয়ে থেকো না গিয়ে। আমার এই অবস্থা, সংসারে একপাল কুপুষ্যি, কোথা থেকে কি করি বল তো ? এক কাঁড়ি দুধের দেনা গোয়ালার কাছে, ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন কাটায়, যা হয়ে চোখের সামনে দেখতে পারিনে বলে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিয়েছিলাম, তার দাম এখনও বাকী—তোমার তো বাপু এখান থেকে চলে গেলে আর চুলের টিকি দেখা যায় না—কি যে আমি করি, এমন পুরুষমানুষ বাপের জন্মে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অবস্থায় আসিয়া আজ দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ি-মুখো হই নাই। অবশ্য এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে যখন যা আসিয়াছে, সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—কিন্তু সবশুদ্ধ ধরিলে খরচের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী তো নয়। কিন্তু আমি কি করিব, চুরি-ডাকাতি তো করিতে পারি না।

সত্যই সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত বেশী দিন তাহার সঙ্গে একত্র থাকিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, একটা কিছু সুবিধা হইলেই তাহাকে লইয়া গিয়া কাছে রাখিব। কিন্তু বিবাহ করিয়াছি আজ ছয় সাত বছর, তার মধ্যে এ সুযোগ কখনও হইল না। শ্বশুরবাড়িতেই বা গিয়া কয়দিন থাকা যায়, একে তো মেয়ে এতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তার উপর জামাই গিয়া দুদিনের বেশী দশদিন থাকিলেই শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ স্পষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন বেশ বুঝিতে পারি, কাজেই বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়া পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।

একদিন শুনিলাম পানখোলার পাঠশালায় একজন মাস্টারের পোস্ট খালি আছে। মুজিবর রহমানের দোকানে সকালে বিকালে বসিয়া দুই একটা সুখ-দুঃখের কথা বলি, সে আমায় পরামর্শ দিল, মাস্টারির জন্যে চেষ্টা দেখিতে।

বাড়ি আসিয়া কথাটা ভাবিলাম। সাত আট বছর ডাক্তারী করিয়া তো দেখা গেল পেটের ভাত জুটানো দায়—তবুও একটা বাঁধা চাকুরি করিলে, মাস গেলে যত কমই হোক, কিছু হাতে আসিবে।

খবর লইয়া জানিলাম, মকরন্দপুরের শ্রীনাথ দাস ঐ পাঠশালার সেক্রেটারী। পরদিন সকালে রওনা হইলাম মকরন্দপুরে।

মকরন্দপুর এখান হইতে সাত আট ক্রোশের কম নয়। সকালে স্নান সারিয়া দুটি চাল গালে দিয়া জল খাইয়া বাহির হইলাম। মকরন্দপুর কোন্ দিকে আমার ঠিকমত জানা ছিল না, পলাশপুর ছাড়াইয়া অম্বিকাপুরের কলুবাড়ির কাছে যাইতে কলুরা বলিয়া দিল ঝিটকিপোতার খেয়া পার হইয়া নকফুলের মধ্য দিয়া গেলে, দেড় ক্রোশ রাস্তা কম হইতে পারে।

সকাল আটটার মধ্যে খেয়া পার হইলাম। একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে এক নৌকায় পার হইল। মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়া সে একটা বটগাছের তলা দেখাইয়া বলিয়া দিল—ঐ গাছতলা দিয়ে চলে যান বাবু, বাঁ দিকে নকফুলের রাস্তা।

রোদ বেশ চড়িয়াছে। ছোট একটা খাল হাঁটিয়া পার হইয়া বড় একটা আমবাগানের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এ সব অঞ্চলের আমবাগান মানে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে অতি কষ্টে পথ খুঁজিয়া লইয়া বাগানটা পার হইয়া যাইতেই একটা কোঠাবাড়ি দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি দালান কোঠা পথের ধারে দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশই পুরাতন, প্রাচীন কার্ণিসে দেওয়ালে বট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। গ্রামখানা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পিপাসা পাইয়াছে। ভাবিলাম, নকফুলে কাহারও বাড়ি জল চাহিয়া খাইলেই হইত। এদিকে শুধুই মাঠ, নিকটে আর কোন গ্রামও তো নজরে পড়ে না।

পুনরায় পথ হাঁটিতে লাগিলাম। পথে সবই চাষাদের গাঁ পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মানুষ, যেখানে সেখানে তো জল খাইতে পারি না!

সুঁদরপুর, চাতরা, নলদি, মামুদপুর···

তারপরেই পড়িল আর একটা মাঠ। বেলা তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছু খাইতে পাইলে ভালই হইত—পেট জ্বলিয়া উঠিল। আপাততঃ জল খাইলেও চলিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কি ছাই এ দিকে কোথাও একটা টিউব-ওয়েলও দেয় নাই কোন গ্রামে? মাঠের মধ্যে কোথাও কি একটা পুকুর নাই?

মেটে রাস্তায় হাঁটিয়া যখন নদীর ধারে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পৌঁছিয়া দেখি খেয়াঘাট কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, খেয়ার নৌকাখানি ডুবানো অবস্থায় এপারে বাঁধা। কোনও জনপ্রাণী নাই।

কি বিপদ! এখন পার হওয়ার কি করি? নিকটে একটা চাষা গাঁ। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কচুরিপানায় ঘাট বুজিয়া যাওয়ায় সেখানকার খেয়া আজ মাসখানেক যাবৎ বন্ধ। আরও ক্রোশখানেক উজানে খালিশপুরের ঘাটে খেয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থায় মাঠ ভাঙিয়া এক ক্রোশ নদীর ধারে ধারে খালিশপুর পর্য্যন্ত যাওয়া তো দেখিতেছি বড় কষ্ট! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পোয়াটাক পথ গিয়া একটা বড় শিমুলগাছের নীচে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অন্ধকারে আধ মাইল হাঁটিয়া নদীর পারে একটা শিমুল গাছ দেখা গেল বটে, কিন্তু জল সেখানে বিশেষ কম বলিয়া মনে হইল না। জলে তো নামিলাম, জল ক্রমে হাঁটুর উপর

ছাড়াইয়া কোমরে উঠিল। কোমর হইতে বুক, বুক হইতে গলা। কাপড়-জামা ভিজিয়া জ্যাতা হইয়া গেল—তখনও জল উঠিতেছে—নাকে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া ডিঙি মারিয়া চলিতেছি। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে,—ভয় হইল একা এই অন্ধকারে অজানা নদী পার হইতে কুমীর না ধরে! বড় কুমীর না আসুক, দুই একটা মেছো কুমীরেও তো গুঁতাটা-আসটা দিতে পারে!

কোন রকমে ওপারে গিয়া উঠিলাম। কোন দিকে লোকালয় নাই, একটা আলোও জ্বলে না এই অন্ধকারে। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে দুই দিকে রাস্তা গিয়াছে। মকরন্দপুরের রাস্তা কোন্ দিকে—ডাইনে না বাঁয়ে? কে বলিয়া দিবে, জনমানবের চিহ্ন নাই কোথাও। ভাগ্য আবার এমনি, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি ধরিলাম, সেইটিই কি ঠিক ভুল পথ! আধক্রোশ তিনপোয়া পথ হাঁটার পরে এক বাগ্‌দীবাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আমি তিনপোয়া পথ উল্টোদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাওয়া উচিত ছিল ডাইনের পথে, আসিয়াছি বাঁয়ের পথে।

আবার তখন ফিরিয়া গিয়া সেই পথের মোড়ে আসিলাম। সেখান হইতে ডাইনের পথ ধরিলাম। এইবার পথে বিষম জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান, বাঁশবন আর ভয়ানক আগাছার জঙ্গল। আমি জানিতাম, এখানে খুব বাঘের ভয়। দিনমানে গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যায়—একবার আমি একটা রোগীর চিকিৎসা করি, তাহার কাঁধে গোবাঘায় থাবা মারিয়াছিল।

ভীষণ অন্ধকার—রাস্তা হাঁটা বেজায় কষ্ট, পাকা আম পড়িয়া পথ ছাইয়া আছে—এ সব অঞ্চলে এত আম যে আমের দর নাই, তলায় পড়া আম কেউ একটা কুড়ায় না। অন্ধকারে আমের উপর দিয়া পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আম তো ভাল, সাপের ঘাড়ে পা দিলেই আমার ডাক্তারলীলা অচিরাৎ সাঙ্গ করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।

অতি কষ্টে মকরন্দপুর পৌঁছিলাম, রাত নয়টার সময়। সেক্রেটারী শ্রীনাথ দাসের বাড়িতে রাত্রে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু চাকুরি মিলিল না, যাতায়াতই সার। পরদিন সকালে শ্রীনাথ দাস বলিল—এ মাসে নয়, আশ্বিন মাস থেকে ভাবছি লোক নেব। ইস্কুলের অবস্থা ভাল নয়। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য আসে মাসে দশ টাকা চার আনা, সেইটিই ভরসা। ছাত্রদত্ত বেতন মাসে ওঠে মোট তের সিকে। দুজন মাস্টার কি করে রাখি? তা আপনি আশ্বিন মাসের দিকে একবার খোঁজ করবেন।

গেল মিটিয়া। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাই কি যে পানখোলা ইউ. পি. পাঠশালার দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদের জন্য বসিয়া থাকিব! বেতন শুনিলাম পাঁচ টাকা। হেড পণ্ডিত পান নয় টাকা।

সারাদিন হাঁটিয়া আবার ফিরিলাম পলাশপুরে। সন্ধ্যা হইয়া গেল ফিরিতে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, পা টন্ টন্ করিতেছে। মুজিবর জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ডাক্তারবাবু? তাহাকে সব বলিলাম, তারপর নিজের অন্ধকার খড়ের ঘরে ঢুকিয়া ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বালিলাম। নদীর ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, কিন্তু উঠিয়া রাঁধিবার উৎসাহ মোটেই ছিল না। গোটাকতক আম খাইয়া রাত্রি কাটিল।

অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবি। একা একা কাটাইতে হয়, কথা বলিবার মানুষ পাই না, এই হইয়াছে সকলের চেয়ে কষ্ট। ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে আনিয়া কাছে রাখিতে। কত কাল তাহাকে দেখি নাই, তাহার একটু সেবা পাইতে সাধ হয়। এই সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া আসিলাম, ইচ্ছা হয় কাছে বসিয়া একটু গল্প করুক, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুখে থাকিব। কিন্তু আনি কোথা হইতে? খাওয়াই কি?

হাটতলার কি ভীষণ অন্ধকার। মাত্র দুখানি দোকান, তাও দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া

গিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গাছপালার অন্ধকারে জোনাকী জ্বলিতেছে, বিলাতী আমড়া গাছটার বাদুড়ে ডানা ঝটপট্‌ করিতেছে।

গভীর রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু গরমে ঘুম আসে না চোখে। কি বিশ্রী গুমোট! সারারাত্রি টুব্‌ টাব্‌ শব্দে পাকা আম পড়িতেছে চারিদিকের আমবাগানে, শুইয়া শুইয়া শুনিতেছি।

উঃ, কি একঘেয়েই হইয়া উঠিয়াছে এখানকার জীবন, সকালে উঠিয়া নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সেই হাটতলায় ফিরিয়া আসি, বেশীদূর কোথাও যাইতে পারি না, কি জানি রোগী আসিয়া যদি ফিরিয়া যায়? সারাদিন ডিস্‌পেন্‌সারি আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় আশায় আশায়।

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব
পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি—

আর তা ছাড়া যাই বা কোথায়? চাষা গাঁ, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী নাই যে বসিয়া গল্পগুজব করি। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আমার ফুটা খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্সারি আর মুজিবরের দোকান, দোকান আর ডিস্‌পেন্সারি। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে পিপিলিপাড়ার বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি বাগ্দীরা কি করিয়া ডোঙায় উঠিয়া কোঁচ ছুঁড়িয়া কই মাছ মারিতেছে। অন্ধকার দেখিয়া দুটো হয়তো শাক তুলিয়াও আনি কোন কোন দিন। একঘেয়ে আম-ভাতে ভাত অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য চালাইতেছে তো বৈশাখ মাস হইতেই—কতদিন আর ভাল লাগে?

আমার নামের কপাল নয়। কাল ওপাড়ার বিষ্ণু কলুর বড় ছেলেকে সন্ধ্যার পরে ঘানি-ঘরের দরজায় সাপে কামড়াইল, আমি শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম, আমার কেহ ডাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কানে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি কি করিয়া? গিয়াই শক্ত করিয়া গোটাকতক বাঁধন দিলাম, দষ্টস্থান চিরিয়া পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেট টিপিয়া দিলাম—এমন সময় পাড়ার লোকে ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা আসিয়াই আমার বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। আমার নিষেধ কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাঁধন খুলিয়া ঝাড়-ফুঁক করিতে করিতে রোগী সারিয়া উঠিল। ঝাড়-ফুঁক সব বাজে, আমার বাঁধনে আর পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেটে কাজ হইয়াছিল—নাম হইল সেই ওঝার। যাক্‌, সে জন্য আমি দুঃখিত নই, একজনের জীবন বাঁচিয়া গেল, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

না খাওয়ার কষ্টও সহ্য করিতে পারি। একঘেয়ে জীবনের কষ্টে একেবারে মারা যাইতে বসিয়াছি। তবুও বসিয়া বসিয়া দিবা-স্বপ্নে কাটাইয়া মনের কষ্ট মন হইতে তাড়াই।

টাকা পয়সা হাতে হইলে কি করিব বসিয়া তাহাও ভাবি।

সুবাসিনীকে লইয়া আসিব, খোকাকে লইয়া আসিব। নদীর ধারে মুজিবর জমি দিতে চাহিয়াছে, সেখানে দুখানা খড়ের ঘর তুলিব আপাততঃ। বাড়ির চারিধারে ছোট একখানা ফুলবাগান করিব, সন্ধ্যাবেলা আধফুটন্ত বেলকুঁড়ি এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রেকাবি করিয়া তুলিয়া আনিয়া কিছু ঘরে কিছু সুবাসিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিব। এখানকার তহশিলদারকে বলিয়া কিছু ধানের জমি লইয়া চাষবাস করিব, ঘরে ধান হইলে সচ্ছলতা আপনিই দেখা দিবে।

ভাদ্র মাসে একদিন ডিস্‌পেন্সারি ঘরে বসিয়া আছি, দেখি যে একটি মেয়ে হাটতলার বনের মধ্যে জামতলায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—কি খুঁজছ ওখানে খুকী?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—ঘেঁটকোলের ডগা—

—কি হবে ঘেঁটকোলের ডগা ?

—ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়—

কথাটা জানতাম না। ঘেঁটকোলের ডগা যদি খাওয়া যায়, তবে তো আমার তরকারী কিনিবার সমস্যা ঘুচিয়া যায়। হাটতলার চারিদিকে বন-জঙ্গলেই দেখিতেছি বহু ঘেঁটকোল আছে! কিন্তু গাছটি চিনিতাম না, নাম শুনিয়া আসিয়াছি বটে।

বলিলাম—কৈ, কি রকম গাছ দেখি ?

মেয়েটি বলিল—এই দেখুন, কচুগাছের মত দেখতে। কিন্তু একটা পাতা তিনটে ভাঁজ করা।

—কি করে খায় ?

—যেমন ইচ্ছে। ছেঁচ্‌কি করে খায়, চচ্চড়ি করেও খায়। খাবেন, দেব তুলে ?

মেয়েটির কাছে একটু চাল দেখাইলাম। ডাক্তারবাবু হইয়া বুনো ঘেঁটকোলের ডগা কি করিয়া খাইব, তবে যদি নিতান্তই খাইতে হয়, সে এই অবজ্ঞাত বন্য উদ্ভিদের প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়াই খাইব,—এই ভাবটা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

বলিলাম—ও সব কচু-ঘেঁচুর ডগা কে রাঁধবে ? কি করে রাঁধতে হয় ?

মেয়েটি শিখাইয়া দিল, ঘেঁটকোলের ডগার ছেঁচকি রাঁধিবার প্রণালী, এক আঁটি ডগা তুলিয়া দিয়াও গেল।

যাইবার সময় আমার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে কে থাকে ?

—আমিই থাকি।

—সে কথা নয়, আপনার সঙ্গে থাকে কে ? রেঁধেবেড়ে দেয় কে ?

—কেউ না, নিজেই।

সেই হইতে মেয়েটি আমায় কেমন একটু কৃপার চক্ষে দেখিল বোধ হয়। যখনই সে হাটতলায় ঘেঁটকোলের ডগা সংগ্রহ করিতে আসিত—আমায় এক আঁটি দিয়া যাইত।

সকালের দিকেও আসিত, আবার বৈকালেও আসিত। একদিন বৈকালে আপন মনে বসিয়া আছি, মেয়েটি আসিয়া দাওয়ার ধারে কোঁচড় হইতে কিছু ডুমুর বাহির করিয়া রাখিয়া বলিল—এ বেলা হরে কলুদের পুকুরপাড় থেকে ডুমুর পেড়েছিলাম, তাই আপনাকে দুটো দিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটি কে তা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। মেয়েটি দেখিতে ভাল, বেশ বড় বড় চোখ, বয়েস আঠারো উনিশ হইবে। গায়ের রং যতটা ফর্সা, এ সব পাড়াগাঁয়ে তত সুন্দর গায়ের রং প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরের মেয়ে নয়—দেখিলেই বোঝা যায়। সেদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম সে সেই গ্রামেরই বিধু গোয়ালিনীর মেয়ে, তার ভাল নাম সম্ভবতঃ প্রেমলতা বা ঐ রকম কিছু, সবাই 'প্রমো' বলিয়া ডাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, যেমন সাধারণতঃ আমাদের দেশে গোয়ালার ঘরে হয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আপনার বিয়ে হয় নি ?

—কেন হবে না ?

—তবে বৌকে নিয়ে আসেন না কেন ? এখানে তো আপনার রান্নাবান্নার খুব কষ্ট।

—হাঁ, তা বটে। এইবার আনব ভাবছি।

—মা বাবা আছেন ?

—নাঃ।

—কোথায় আপনার বাড়ি ?

—সে তুমি চিনতে পারবে না, সে অনেক দূর।

এইভাবে আলাপের সূত্রপাত। তারপর কতদিন সকালে বিকালে প্রমো আসিত, কোন দিন ওলের ডাঁটা, কোন দিন ডুমুর, কোন দিন বা একটা চাল্‌তা, নিজে যা বনে জঙ্গলে সংগ্রহ করিত, তার কিছু ভাগ আমার না দিয়া তার যেন তৃপ্তি হইত না। মাঝে মাঝে ওইখানটায় দাঁড়াইয়া চালের বাতা ধরিয়া কত গল্প করিত। সরলা বালিকা কাঠ কুড়াইয়া, শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া তার দরিদ্র মায়ের গৃহস্থালীর অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিত, তেমনই এই দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি গভীর অনুকম্পাবশতঃ তার ভাতের থালার উপকরণও জুটাইয়া দিত। বড় ভাল লাগিত তাকে। একটা অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্রে সে আমাকে বাঁধিয়াছিল এবং বোধ হয় আমিও তাকে বাঁধিয়াছিলাম। পলাশপুরের হাটতলায় নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মমতাময়ী নারীর সঙ্গ বোধ হয় খুব ভালই লাগিয়াছিল। তাই সে আসিলে মনটা খুশী হইয়া উঠিত। ইদানীং সে আসিতও ঘন ঘন, নানা ছলছুতায়, কারণে অকারণে। আসিয়া থেইহারা কথাবার্তায় থাকিয়া যাইতও অনেকক্ষণ।

একদিন লক্ষ্য করিলাম, প্রমো তার বেশভূষার দিকে নজর দিয়াছে। প্রথম সেদিন তার যত্ন করিয়া বাঁধা খোঁপাটির দিকে চাহিয়া আমার এ কথা মনে হইল। ফর্সা শাড়িখানা পরিপাটী করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। মুখের হাসির মধ্যে একদিন সলজ্জ সঙ্কোচের ভাব দেখিলাম, যে ধরণের হাসি তার মুখে নতুন। আর কত ভাবেই সেবা করিতে সে চেষ্টা করিত, শাক তুলিয়া, তরকারী কুটিয়া দিয়া। আগে আগে আসিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ইদানীং দাওয়ার কোণে ওইখানটায় বসিত। তার মুখের ভাব দিন দিন যেন আরও সুশ্রী হইয়া উঠিতেছিল।

পলাশপুরে তো কত লোক আছে, হাটতলায় তো কত লোক যাতায়াত করে, এই দরিদ্র ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি কেহই তো অমন দরদ দেখায় নাই—তাই বলি পুরুষমানুষের মেয়েমানুষের মত বন্ধু কোথায় ?

গত ফাল্গুন মাসে উপরি উপরি কয়েকদিন সে আসিল না। মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন তো কখনও হয় না। দু-তিন দিন পরে কানে গেল বিধু গোয়ালিনীর মেয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। কেহ ডাকিতে না আসিলেও দেখিতে গেলাম। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, এ বয়সে টাইফয়েড, শিবের অসাধ্য রোগ। প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—উহারা সাতদিন পরে আমার উপরে আস্থা হারাইয়া ডাকিল ইন্দু ডাক্তারকে। আমাকে রোগশয্যার পাশে দেখিয়া প্রমোর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল প্রথম দিন। শুনিলাম ইন্দু ডাক্তার যেদিন দেখিতে আসিয়াছিল, সেদিন সে ইন্দু ডাক্তারের ঔষধ খাইতে চায় নাই। মরণের ছয় সাত দিন পূর্ব্ব হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

আজ কয়েক মাস হইল আমি আবার যে একা, সেই একা। কে আর আমার জন্ত শাক, ডুমুর, ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া দিবে, এখন আবার সেই আম-ভাতে ভাত!

বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে বেজায় কাদা, মশার উৎপাত বাড়িয়াছে। হাটতলার চারিপাশের বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় সারাদিন ধরিয়া মেঘ জমিতেছে, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িয়া আকাশ একটুখানি ফরসা হইতেছে···আবার মেঘ উড়িয়া আসিতেছে, আবার বৃষ্টি। জলে ভিজিয়া গাছের গুঁড়িগুলির রং আবলুসের মত কালো দেখাইতেছে!

চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। মনে হয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছি। যখন নিতান্ত অসহ্

হয়, মুজিবরের দোকানে গিয়া বসি। নীচু চালাঘরের দোকান, রেড়ির তেল, কেরোসিন তেল, জিরেমরিচ, খড়িমাটি, কড়া তামাক, আলকাতরা, পচা সর্ষের তেল, সবে মিলিয়া কেমন একটা গন্ধ ঘরটায়। গন্ধটায় মন হু হু করে, মনে হয় এ কোথায় পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছি! কবে বেড়াজালের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইব? আদৌ মুক্তি পাইব কি না তাই বা কে জানে? জীবনটা যেন কেমনধারা হইয়া গেল। তবুও যদি—এত কষ্টেও এই একঘেয়ে অজ পাড়াগাঁয়েও, আমার মনে হয়, সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম, যদি সুবাসিনী ও খোকা কাছে থাকিত।

একবার যখন কলিকাতায় থাকিতাম, ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি, দেখি একটা বড় বাড়ি হইতে দলে দলে মেয়েরা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। নানা বয়সের মেয়ে আছে তার মধ্যে।

ভাবিলাম—এ কি? এত মেয়ে আসে কোথা হইতে? ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইতেছে তো।

তারপর জানিলাম—সেটা একটা মেয়েদের কলেজ।

কি চমৎকার সব মেয়ে ছিল তার মধ্যে। কেমন সব পরনে, কেমন চশমা, কি রূপ! আর একবার দেবেন্দ্র ঘোষ স্ট্রীট দিয়ে যাইতেছিলাম, একটি বড়লোকের বাড়ির দোতলায় কোন এক মেয়ে গান গাহিতেছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম। অমন সুন্দর গান তারপর আর কখনো শুনি নাই। কোথায়ই বা শুনিব? গানের কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রিয় তুমি আস নাই আজ ভোরে
মধুমালতীর নয়নে শিশির দোলে।

সে সব গান আমাদের মত মাটির মানুষের জন্যে নয়।

সারাদিন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির পরে সন্ধ্যার সময়টা একটু বাদল থামিয়াছে। গাছপালার অন্ধকারের সঙ্গে আকাশের অন্ধকার মিলিয়া হাটতলা যেমন নির্জ্জন, তেমনি অন্ধকার। ডোবার জলে মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে, প্রমো যেখানে ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া বেড়াইত, সেই সব বনে ঝিঁঝিঁ পোকার দল একঘেয়ে ডাক জুড়িয়া দিয়াছে। জাম গাছের উঁচু ডালটা হইতে দমকা হাওয়ায় ছড়্ ছড়্ করিয়া পাকা জাম বনের মধ্যে অন্ধকালে জলেভেজা শেওড়াবনের মাথায় পড়িতেছে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় একা বসিয়া ভাবি…

পুরোনো কথা

বাল্যে সর্ব্বদাই দেখতুম, বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়াবিবাদ চলেছে।

এর কারণ কিছু বুঝতুম না, আমার বয়স তখন সাত বছর। ঠাকুরমা যে বাবার মা এটা অনেকদিনই বুঝেছিলুম, কিন্তু মা ছেলেকে অমনি ক'রে যে দিন নেই রাত নেই বকে, তার কোনো নজীর আমার নিজের মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে খুঁজে পাই নি।

বুড়ো মানুষেই যে অমনি করে, তাও তো নয়; কারণ আমার দিদিমা ছিলেন ঠাকুরমার চেয়েও বেশী বয়সের। দিদিমার মাথার চুল পেকেছিল, ঠাকুরমার মাথার চুল তখনও অনেক কাঁচা। কিন্তু কই দিদিমা তো আমায় খুব ভালবাসতেন, কাউকে তো কখনও বকতে শুনি নি তাঁর মুখে। তবে কেন ঠাকুরমা এরকম করেন আমার বাবাকে? মাঝে মাঝে একথা

ভেবেছি। কিন্তু সাত বছরের ছেলে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারতুম না, বা বেশীক্ষণ এসব কথা আমার মনে দাঁড়াতও না।

দিদিমার কাছে আমি অনেক সময় থাকতুম। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে নৌকায় যেতে হয়। অনেকখানি সময় লাগত সেখানে পৌঁছতে। সকালে খেয়ে বার হ'লে সেখানে পৌঁছাবার আগে রোদ রাঙা হয়ে আসত; বাদুড়ের দল ডানা ঝটপট্ ক'রে আকাশ দিয়ে উড়ে বাসায় যেত, নদীর জলে নৌকার ধারে ভুস্‌ভুস্ ক'রে শুশুকেরা ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিত।

এসব অনেক ছেলেবেলাকার কথা। তখন আমরা থাকতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। সেখান থেকে অনেকদিন আমরা চলে এসেছিলুম, আর কখনও যাই নি। দেশে এখন আর আমাদের বাড়িঘর নেই, ম্যালেরিয়ায় জনহীন শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে শুনেছি। বহুদিন কলকাতার বাসিন্দা, এখন সেসব জায়গায় যেতে ভয় করে, বিশেষ করে এখন যখন বয়স হয়েছে, সাবধানে থাকাই ভাল।

দেশের বাড়ির সঙ্গে মায়ের স্মৃতি জড়ানো। যখনই দেশের বাড়ির ডালিম গাছটা, তার পাশে লম্বা পেঁপে গাছটা, তার পাশে পুরোনো পাতকুয়ো ও গোয়ালঘরটার ছবি মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে আসে আমার মায়ের খুব অস্পষ্ট একটি ছবি। ওদের সঙ্গে মা যেন জড়ানো আছেন।

কি ভালোই বাসতুম মাকে! জীবনে অত ভালো কাউকে বাসিনি, বাসতে পারবও না।

মায়ের সম্বন্ধে আমার অতি শৈশবকালের যে ছবিটি জাগে, তাতেও দেখি ঠাকুরমা মাকে অনেক কষ্ট দিতেন, মাকে শক্ত কথা বলতেন অকারণে। ছেলেমানুষ হ'লেও আমি তা বুঝতুম; বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও শিশুর 'ইন্সটিংক্ট' দিয়ে বুঝতুম; তার একটা মস্ত কারণ, মার প্রতি ছিল আমার গভীর দরদ ও সহানুভূতি, একই রক্ত একই মাংস আমার গায়ে। আমার চেয়ে মায়ের দুঃখ বুঝবে কে?

একদিনের কথা আমার মনে হয় অস্পষ্ট একখানা ছবির মত।

আমাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে কিছু দূরে আর একজন কাদের বাড়ি ছিল। একটা খুব বড় ঝাঁকড়া লিচু গাছ ছিল তাদের বাড়ির বাইরের উঠানে। বিকেলবেলাটায় আমি ও আরও অনেক ছেলে লিচুতলায় খেলছিলুম।

এমন সময়ে আমাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা ডাক দিলেন, ভানু খাবার খাবি আয়।

খেলা ফেলে ছুটে গেলুম খেতে।

সদর দরজার ফ্রেমে মার ছবিটা আজও বেশ মনে হয়। দুদিকের কাঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পরনে সাদা শাড়ি, মুখে হাসি। দরজার কবাট জোড়া সেকেলে ধরনের মোটা পেরেকের গুল-বসানো। পাশেই ছোট একটি চালাঘরে খড়-বিচালি থাকত।

মা খেতে দিলেন মুড়ি মেখে। বেতের ছোট্ট ধামিতে মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছি, এমন সময় নদীর ঘাট থেকে ঠাকুরমা ফিরলেন জল নিয়ে, এবং আমার হাতে মুড়ির ধামি দেখেই মাকে বকুনি ও গালাগালি শুরু করলেন।

ঠিক কথাগুলো মনে নেই, কিন্তু তার মোট মর্ম এই যে, বাড়িতে ওবেলা পুরুতঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল একাদশী ব'লে, তিনি রুটি খেয়েছিলেন, তাঁর পাতে রুটি তরকারি রয়েছে। সেই পাতের রুটি তরকারি আমার জন্যেই ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছেন ঠাকুরমা। ঘাট থেকে আসতেও এমন কিছু দেরি হবে না, তখন এরই মধ্যে মুড়ির ঘড়া পেড়ে ছেলেকে সোহাগ ক'রে

মুড়ি খেতে দেওয়ার মানে কি ?

আমায় বললেন, রাখ মুড়ি, পাঁচ-ছখানা রুটি পড়ে রয়েছে পাতে, ওগুলো উঠবে কি ক'রে ?

পরের পাতের ঘাঁটা জিনিস খেতে আমার ঘেন্না করে। কিন্তু ঠাকুরমার ভয়ে কিছু বলতে পারলুম না। ঠাকুরমা ঢাকা খুলে পাতের খাবার আমায় খেতে দিলেন। খাবার সময়েই আমার কান্না এল মায়ের কথা ভেবে। মিথ্যে মিথ্যে ঠাকুরমা মাকে বকলেন কেন ? মা হয়তো জানত না পাতের খাবার ঢাকা আছে। ভাবলুম, মায়ের প্রতি এমন একটা কিছু দেখাব, যাতে মায়ের মনের কষ্ট দূর হয়, কিন্তু চার বছর তখন আমার বয়স, না পারি কথা গুছিয়ে বলতে, না পারি কিছু বোঝাতে। হয়তো খুব শক্ত ক'রে মায়ের গলা জড়িয়ে রাত্রে শুয়েছিলুম, এ ছাড়া সহানুভূতি দেখানোর অন্য কোন উপায় আমার জানা ছিল না সে বয়সে।

মধ্যে কিছুদিনের কথা আমার তত মনে পড়ে না, আমার যখন মায়ের কথা মনে পড়ে তখন মার খুব অসুখ। কি অসুখ জানতুম না তখন। নীচের একটা ঘরে মা থাকতেন, আমাকে মার কাছে যেতে সবাই বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ধ'রে রাখা সোজা কথা নয়, ফাঁক পেলেই আমি মার ঘরে ঢুকতুম, খানিকক্ষণ ধ'রে মার সঙ্গে কি সব কথা কইতুম। তারপর সন্ধান পেয়ে ওরা এসে ধ'রে নিয়ে যেত। ঠাকুরমার কাছে বকুনি খেতে হ'ত ওঘরে যাওয়ার জন্যে।

এরকম চলল দু দশ দিন নয়, অনেক—অনেকদিন, কতদিন তা আমার জানবার বয়স হয়নি। মোটের ওপর অনেকদিন। এখন মনে হয় সাত আট মাসের কম নয়।

একদিন শুনলুম মায়ের অসুখ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়া হচ্ছে।

ঠাকুরমা বলছেন, আর ওর পেছনে পয়সা খরচ ক'রে কি হবে ? আমার ছেলেমেয়েগুলো কি পথে দাঁড়াবে ? সংসারের টাকা দিয়ে দামী দামী ওষুধ এল কত এই ক-মাসে, তাতে কিছু যখন হ'ল না, তখন আর আমি বেশি টাকা খরচ করতে দেব না।

বাবা বলছেন, তা বলে একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরবে চোখের সামনে ?

ঠাকুরমা বললেন, চিকিচ্ছে কম হয়নি কিছু। এখনও তো চিকিচ্ছের ত্রুটি নেই, কিন্তু আর আমি তোমায় টাকা দোব না। যে বাঁচবে না, তার পেছনে আর কেন টাকা খরচ ?

সেদিন বুঝলুম, মার অসুখ খুব গুরুতর। মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সমস্ত বাড়ির মধ্যে আমার মন টানে কেবল মায়ের ঘরে। যখন মন খারাপ হয়, মার কাছে গেলে সব দুঃখ চলে যায়। কিন্তু সেখানে যখন-তখন যাবার যো নেই। লুকিয়ে যেতে হবে, নইলে ঠাকুরমাকে পিসীমা ব'লে দেবেন। ছোটপিসীমা আমায় কোলে ক'রে পুকুরধারে নিয়ে যাবে চ'লে। ওদের সঙ্গে আমি তো জোরে পারি না!

পুকুরধারে বড় চাঁপাফুলের গাছ আছে। তার তলায় ছোটপিসীমা আমায় নিয়ে গিয়ে বলত, ওরকম যেও না যখন-তখন ও ঘরে ; যেতে নেই। এখানে ব'স।

মা ভিন্ন সংসারটা আমার কাছে ফাঁকা। মা ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর কাউকে ভাল লাগে না—কেবল দিদিমা ছাড়া। দিদিমা নিতান্ত গরীব, আমার মা তাঁর একমাত্র মেয়ে। মাঝে মাঝে তিনি যখন এসে আমাদের বাড়ি থাকতেন, রান্নাঘরের কাজকর্ম নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'ত সদাসর্ব্বদা। তিনি যেন এসে হতেন আমাদের বাড়ির রাঁধুনী। মায়ের অসুখের সময় তিনি এসেছিলেন, এবং রোগীর সেবা করবার জন্য তিনি ছাড়া আর লোক ছিল না।

মায়ের খাওয়ার আলাদা একখানা থালা, গেলাস ও বাটি ছিল। দিদিমা থালা বাটি

রান্নাঘরের দাওয়ায় পেতে দাঁড়িয়ে থাকতেন মায়ের ভাতের জন্যে। মায়ের ঘরে থাকতেন ব'লেই বোধ হয় ইদানীং তাঁকেও আমাদের ঘরে-দোরে উঠতে দেওয়া হ'ত না।

মায়ের ঘরে দিদিমা যা কিছু করবার সব করতেন, এজন্যে তাঁকে কেউ ছুঁতো না, তিনি ভাত খেতেন রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে, নয়তো উঠানের পেয়ারা-তলায় ব'সে। তিনি থাকতেন এ বাড়িতে চোর হয়ে। মায়ের অসুখের কি ওষুধপত্র নিয়ে কথা বলতে যেতে ঠাকুরমার কাছে তাঁকে কতবার বকুনি খেতে হয়েছে।

ঠাকুরমা বলতেন, অত যদি দরদ মেয়ের ওপর, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে-পত্তর করাও গে। জামাইকে তো দিনরাত্ত জপাচ্ছ, হুগলী থেকে ডাক্তার আনতে, পয়সা দেবে কে? তোমার কি? একটা মোটে মেয়ে, সস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ। আমার এখনও আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, তোমার মেয়ের জন্যে তাকে তো আমি জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না? যে ক'টা টাকা আছে, তা এখন তুলে রেখে দিতে হবে ওর ঘর-বর দেখে দিতে; এতে তোমার মেয়ের ভাগ্যে বাপু যা থাকে।

দিদিমাকে কতদিন পুকুরঘাটের চাঁপাতলায় ব'সে একা হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। এ রকম কতদিন যে কাটল! কতদিন যে মায়ের ঘরে যেতে পারলুম না! মা দিন দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন। মায়ের ঘরের দোর সর্ব্বদাই বন্ধ। আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতুম, মা একা ঘরের মধ্যে বিছানায় অঘোর হয়ে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে। দিদিমা হয়তো মায়ের ছাড়া কাপড় নিয়ে কাচতে গিয়েছেন।

আমি আস্তে আস্তে ডাকতুম, ও মা, মা! তারপর দোর ঠেলে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতুম। অমনি ছোটপিসীমা কোথা থেকে এসে আমায় ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন।

—বাবা কি দস্যি ছেলে! এক দণ্ড যদি চোখের আড় করবার জো আছে! ঘুরছেন সর্ব্বদা মার কাছে যাবার জন্যে। বারণ ক'রে দিইছি না তোমায়?

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে ব'লে উঠতেন, দে আচ্ছা ক'রে দু ঘা কষিয়ে। পরের হোলা যায় বন পানে ধায়; যত্তই কর, ছেলের সর্ব্বদাই মা, মা আর মা!

বড়পিসীমা মাকে সত্যিকার ভালবাসতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এই গাঁয়েই। পিসে-মশায়ের অবস্থা বোধ হয় ভাল ছিল না, বড়পিসীমাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে দেখি নি কোনও দিন। ঠাকুরমার সঙ্গেও বোধ হয় তাঁর তেমন ভাব ছিল না। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে ব'সে থাকতেন, দিদিমা বাদে তিনি আর বাবা ছাড়া মায়ের ঘরে আর কেউ ঢুকত না।

বাবার কোন কথা বলবার যো ছিল না। মায়ের অসুখের সম্বন্ধে কিছু বললেই ঠাকুরমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। একদিন সকালে উঠেই শুনলুম ঠাকুরমাতে আর বাবাতে তুমুল তর্ক চলছে।

ঠাকুরমা বলছেন, চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির না করলে আমার বাড়িতে অকল্যেণ হবে। তোমার বউ তো একা নয়, আমার আরও লোকজন নিয়ে ঘরকন্না করতে হয়। পুরুতঠাকুর ব'লে গিয়েছেন, প্রাচিত্তির করাতে হবে এই একাদশীর দিন।

বাবা বলছেন, বল কি মা? ও কালও বলেছে, হ্যাগো আমি বাঁচব তো? আমি বলেছি, কেন বাঁচবে না? এবার ডাক্তার বলেছে, সেরে উঠবে। চান্দ্রায়ণের নাম শুনলেই ও ভয়ে খুন হয়ে যাবে। যার এখনও এত বাঁচবার ইচ্ছে, তাকে কি ক'রে প্রাচিত্তির করানো যায় মা? ও তা হ'লে ভয়ে ম'রে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন, আর এমনিই যেন বাঁচবে। দুদিন আগে আর দুদিন পাছে। তোর লজ্জা করে না বোয়ের কথা বলতে আমার সামনে? মুখের লাগাম আলগা ক'রে দিয়েছ যে একেবারে! এক কড়ার মুরোদ নেই, আবার কথাবার্তা শোন গুণধর ছেলের? সোজা কথা ব'লে দিচ্ছি, প্রাচিত্তির না হ'লে ওই রোগের মড়া কেউ বার করতে আসবে ঘর থেকে?

বাবা বললেন, চুপ চুপ, শুনতে পাবে ও ঘর থেকে। আচ্ছা মা, তোমার কি একটু দয়াও হয় না! ও মরণের ভয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে, দুবেলা একে ওকে বলছে, আমি বাঁচব তো? আর তুমি কি ব'লে ওর কানের কাছে—

এর উত্তরে ঠাকুরমা চীৎকার ক'রে বিপরীত কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন।

যাই হোক, বাবার কোনও কথা বোধ হয় খাটল না, কারণ একদিন মায়ের ঘরে কি সব পুজো-আচ্চার যোগাড় হ'ল, পুরুতঠাকুর এলেন ওপাড়া থেকে। তিনি কালীর বাবা, আমি তাঁকে চিনি, কালী আমাদের সঙ্গে খিড়কী বাগানে কত খেলা করেছে, ভারি ছুটতে পারে, তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারি না আমরা। সে এখন এখানে নেই, তার মামার বাড়িতে গিয়েছে।

বড়পিসীমা বলছিলেন হরি গয়লানীর কাছে, সে আমাদের দুধ যোগান্ দেয়।

—আহা, বলছি পুরুত আসছেন, তোমার একটা স্বস্ত্যেন করাতে হবে কিনা; বউয়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে! বলছে, কেন ঠাকুরঝি, তবে কি আমি বাঁচব না? তখন আবার বোঝাই, বলি, তা কেন, স্বস্ত্যেন করলে তোমার অসুখ সারবে, ভয় কি? আহা, ছেলেমানুষ, এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে; ওর এখনও কত সাধ জীবনে, বাঁচবার কি ইচ্ছে পোড়া-কপালীর!

দিন দশ-বারো পরের কথা।

পাশেই এপাড়ার সন্তুদের বাড়ি। সন্তুর দাদা বিয়ে ক'রে নতুন বউ এনেছে। তাদের বাড়িতে সবাই গিয়েছে বউ দেখতে। খুব বাজি-বাজনা ক'রে বিয়ে করতে গিয়েছিল সন্তুর দাদা। এক-একটা হাউইবাজি যেন গিয়ে একেবারে আকাশে ঠেকে।

বাড়ির সবাই গিয়েছে। দিদিমা যান নি, রাত জাগেন ব'লে তিনি ও-বারান্দায় আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছেন।

আমি চুপিচুপি মায়ের ঘরে ঢুকে মায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। মায়ের কাছে আসবার লোভেই বউ দেখতে যাই নি, বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম; নইলে ছোটপিসীমা অনেক ডাকাডাকি করেছিল।

মা বেশি কথা বলতে পারেন না। আমি চুপ ক'রে মায়ের বিছানার শিয়রের পাশটিতে ব'সে আছি। বেলা বেশি নেই। পুকুরধারের চাঁপা গাছে রোদ রাঙা হয়ে এসেছে।

খানিকটা পরে মা বললেন, খোকা, আমি যদি মরে যাই, তুই কি করবি?

আমি কিছু বললুম না, চুপ ক'রে রইলুম। আমার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের বিষাদ!

আর কখনও এ ধরণের ভাব আমার মনে হয় নি। ভয়ানক মন-কেমন করছে কার জন্যে; কার জন্যে যে বুঝতেও পারি না।

মা যেন আপন মনেই বলছিলেন, খোকা, তোকে যে কার কাছে রেখে যাব সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কেই বা তোকে বুঝবে!

হঠাৎ মা তাঁর হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললেন, যা, এটা লুকিয়ে রেখে দিগে যা, ওরা তোকে কিছু দেবে না! এটা দিয়ে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাস, তুই ভালবাসিস পক্কান্ন মেঠাই, তাই খাস। কাউকে দেখাস নি।

এই সেই আংটি আমার হাতে এখনও রয়েছে।

আমার বন্ধু চুপ করল। আবার চোখে জল এল। বহুকাল আগেকার এক রোগজীর্ণ তরুণী মায়ের ছবি মনে এল—অসহায় বন্ধুহীন সংসারে যার একমাত্র অবলম্বন ছিল ছ বছরের ছেলেটি আর দুর্ভাগা স্বামী।

আমার বন্ধু এখন খুব বড়লোক, অনেকগুলো কয়লার খনির মালিক। তাঁর সার্কুলার রোডের বাড়িতে ব'সে চা-পানের পরে সন্ধ্যাবেলা আমরা কথা বলছিলুম।

তারপরে তিনি ওপরের গল্পটা বললেন।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমি বললুম, তারপর কি হ'ল?

রাত্রে কি হয়েছিল আর জানি না। ওরা এসে পড়বার পরেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে মাকে আর দেখি নি! আমার ছেলেবেলাকার মা রাত্রের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই রকম সন্ধ্যায় আবার সেই কতকাল আগের কথা—সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে আসে।

খোসগল্প

জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যা লিখিতে বসিলে যেন গল্পের মত শোনায়।

আমার জীবনে এমনি ধরণের ঘটনা একটি ঘটিয়াছিল, ঘটিয়াছিলই বা কি করিয়া বলি—ঘটিয়াছে বলাই সঙ্গত, কারণ তাহার জের এখনও চলিতেছে। যদিও বাহিরের দিক হইতে তাহার জের কিছুই নাই, যা কিছু ঘটিতেছে সবই আমার ও আর একজনের মনে।

প্রেমের কাহিনী এ নয়, কিসের কাহিনী বলা শক্ত। এত সূক্ষ্ম ও বস্তুবিহীন তার ঘটনা, যেন মাকড়সার জালে বোনা কাপড়—জোর করা চলে না তার উপর—একটু বেশী বা একটু কম কথা বলিলেই ঘটনার সূক্ষ্ম রহস্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটি বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

আর ভূমিকা করিব না, এখন গল্পটা বলি।

প্রথমেই আমার একটু পরিচয় দিয়া লই। যাঁহারা এ গল্প পড়িবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটা লাইনও যেন বাদ দিবেন না—মনে রাখিবেন, এর প্রতি লাইনের প্রয়োজনীয়তা আছে, গল্পটিকে সম্যক বুঝিতে হইলে।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেন কি বৃত্তান্ত সে-সব গল্পের পক্ষে অবান্তর। সুতরাং সে-কথার দরকার নাই।

বিবাহ করি নাই বলিয়া ভবঘুরেও ছিলাম না।

ছোট একটি ব্যবসা ছিল। তাহা হইতে দু-পয়সা রোজগারও হইত। এখন সে-ব্যবসা আরও বাড়িয়াছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে ঘুরিতে হইত, এখনও হয়। কলিকাতায় বাড়ি এখনও করি নাই তবে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে বাড়ি না করিলে আর চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ করিতে হইবে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে সুবিধামত জমি দেখিতেছি। এই হইতেই আমার মোটামুটি পরিচয় আপনারা পাইলেন।

বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশনে নামিয়া উত্তর দিকে বাঁধালো সড়ক ধরিয়া সাত-আট মাইল

গরুর গাড়ি করিয়া গেলে দিয়াখালি বলিয়া একটি গ্রাম পড়ে। এখানে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি।

এই অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে যাইতাম। অর্থাৎ আখের গুড় কিনিতে বনপাশ হইতে ছ-মাইল দূরবর্তী জগন্নাথপুরের হাটে আমাকে মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রতি-বৎসর যাইতে হইত।

যখনই গিয়াছি দিয়াখালি গ্রামে আমার সেই সহপাঠীর বাড়িতে গিয়া একবার করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। কলিকাতার কলেজে একসঙ্গে বি-এ পড়িয়াছিলাম, আমার সে বন্ধুটি বি-এ পাস করিতে পারে নাই, গ্রামেরই মাইনর স্কুলে অনেকদিন হইতেই সে হেডমাস্টারি করিতেছে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী পল্লীগ্রামের বধূ যদিও, আমার সামনে বাহির হইয়া থাকেন তো বটেই, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পরিবারেরই একজনের মত।

মেয়েমানুষের যেমন স্বভাব, যখনই যাই, আমার বন্ধুপত্নী আমায় বাঁধা নিয়মে অনুযোগ করিতেন, আমি কেন বিবাহ করিতেছি না। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম যতবার সেখানে গিয়াছি কখনও ঘটিতে দেখি নাই।

—শুনুন, এবার একটি বড়সড় দেখে, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে ক'রে ফেলুন। না —শুনুন আমার কথা—এর পরে কে দেখবে শুনবে, সেটাও তো ভাবতে হবে? বিয়ে ক'রে ফেলুন।

এ ধরণের কথা শুধু আমার বন্ধুপত্নীর মুখ হইতে যদি শুনতাম, হয়তো আমার মনে একটা কিছু রেখাপাত করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আমি তো এক দিয়াখালি গ্রামেই ঘুরি না—সারা বাংলা দেশের কত জেলায়, কত গ্রামে, কত শহরে কার্য্যোপলক্ষে ঘুরিতে হয় এবং প্রায় অনেক স্থানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে ঐ একই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম।

আমার মাসীমা, পিসীমা এবং অন্যান্য আত্মীয়া-কুটুম্বিনী সমস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—ঘরে বাহিরে এভাবে অবরুদ্ধ হওয়ার জিনিসটা আমার যথেষ্ট গা-সহা-গোছের হইয়া পড়ার দরুণ কোনো প্রস্তাবই তেমন গায়েও মাখিতাম না বা নূতন কিছু বলিয়া ভাবিতাম না।

একবার দিয়াখালি গিয়াছি মাঘ মাসে, আমার বন্ধুপত্নী সেবার যে-কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রীতিমত কৌতুক অনুভব করিলাম।

বলিলেন—আমি কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি।

একটু কৌতুক করিয়াই বলিলাম—কি রকম?

—আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগে আমাদের এখানে শিবতলায় বারোয়ারি শুনতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—তার দিদিমার সঙ্গে গরুর গাড়ি ক'রে পাশের গাঁ বারোদীঘি থেকে যাত্রা শুনতে এসেছিল। বেশ মেয়েটি, চমৎকার গড়নপিটন, লম্বা, একহারা চেহারা। কেবল রংটি ফর্সা নয়, কালো। খুব কালো না হলেও কালোই মোটের উপর। নামটা ভুলে গেচি—খুব সম্ভব মণিমালা।

উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—বেশ, তারপর?

—আমি তাকে বললুম আপনার কথা। আপনি কি করেন, কোথায় বাড়ি; সব বলবার পরে তাকে বললুম, এঁর সঙ্গে কিন্তু তোমার ভাই বিয়ের ঠিক করেছি।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। অবাক হইয়া বলিলাম—কি ক'রে বললেন? জানা নেই,

শোনা নেই, বললেন অমনি বিয়ের কথা ?

বন্ধুপত্নী পাড়াগাঁয়ের সহজ সারল্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই অদ্ভুত আচরণের অদ্ভুতত্ব একেবারেই ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—কেন বলব না ? আমার চেয়ে বয়সে যদিও ছোট, তবুও তার সঙ্গে সমবয়সীর মত ভাব হয়ে গেছল। বললুম, ওঁর একজন বন্ধু আছেন, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসেন—আমি তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের চেষ্টা করছি। এখন তুমি যদি মত দাও ভাই, তবে আমি ওঁর কাছে কথা পাড়ি।

—মেয়েটি কি বললে ? মত দিলে ?

—বললে, তিনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন ? আমি বললুম, খেয়ালী লোক তাই। এবার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। তার পরে মেয়েটি আপনার সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করলে। আপনার বয়েস কত, মুখুজ্যে না চাটুজ্যে—কি পাস। কি পাস, এই কথাটা দুবার করে জিজ্ঞেস করলে—যখন বললুম বি-এ পাস—সে তা তো আবার বোঝে না। বললুম—তিনটে পাস। তখন তার মুখ দেখে মনে হ'ল বেশ খুশীই হয়েছে। সুতরাং ও-পক্ষের মত আছে বোঝা গিয়েছে। এখন আপনি মত ক'রে ফেলুন তো ঠাকুরপো। আমি সব ঠিক করি। বাপের নাম-ঠিকানা আমি জেনে নিইছি। ওঁকে দিয়ে চিঠি লেখাই—কেমন তো ?

কোনো মতে সেবারের মত কথাটা চাপা দিয়া তো কলিকাতা ফিরিলাম। তাহার পর বছর-খানেক আমার সেখানে আর যাইবার দরকার হয় নাই। পুনরায় সেখানে গেলাম পরের বৎসর মাঘ মাসে।

সন্ধ্যায় বসিয়া গল্প করিতেছি, বন্ধুপত্নী বলিলেন কথায় কথায়—ঠাকুরপো, মনে আছে সেই মণিমালার কথা ? এবারও যে শিবতলার বারোয়ারির দিন তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

বলিলাম—বেশ কথা।

তিনি বলিলেন—তার বিয়ে এখনও হয় নি। গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ থেকেও নেই, কে বিয়ে দিচ্ছে ? ঐ দিদিমা ভরসা। ক-জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল, টাকার বহর শুনে এরা পিছিয়েছে। তার উপর মেয়েটি অন্য দিকে যদিও খুব সুশ্রী, কিন্তু রং তো তেমন ফর্সা নয়। আমি কিন্তু আবার তুলেছিলাম আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা। আহা, করুন না ঠাকুরপো, গরীবের মেয়ের দায় উদ্ধার ? এবার সে নিজেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম ?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে কিনা। আমরা যেখানে বসি সেখানটাতে ব'সে কথা বললে কারও কানে যাবার ভয় নেই।

পরে একটু থামিয়া হাসিমুখে একটু সুর নামাইয়া বলিলেন—এ-কথা সে-কথার পরে আপনার কথা তুললাম। তা বললে, বি-এ পাস তো চাকরি না ক'রে ব্যবসা করেন কেন ? আমি বললাম—স্বাধীন ব্যবসা ভালবাসেন, টাকাও বেশ রোজগার করেন। আর একটা কথা বলেছে, শুনলে আপনি হাসবেন।

—কি কথা ?

—বললে, আপনি দেখতে কেমন ; কালো না ফর্সা।

কৌতুকের সুরে বলিলাম—আপনি কি বললেন ?

—বললাম, না কালো, না ফর্সা, মাঝামাঝি।

—এঃ, আপনি আমার বিয়ের চান্সটা এভাবে মাটি ক'রে দিলেন ?

বন্ধুপত্নী কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি আছে? না, ও হবে না। এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করুন—সব ঠিক ক'রে ফেলি।

এ ধরণের কথা খোসগল্প হিসাবেই শুনিয়া থাকি, এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এ ধরণের কথায়। কাজেই যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম তখন বেমালুম সকল কথাই মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল কাজের হুড়াহুড়িতে।

বছর পার হইতেই জীবন অন্য পথে চলিল।

পূর্ব্বের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসা খুলিলাম কলিকাতায়। সুতরাং জগন্নাথপুরের হাটে গুড় কিনিতে আর যাই না। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিবাহও করিলাম। মেয়েটি পাইয়াছি ভালই, ভবানীপুর অঞ্চলে বাপের-বাড়ি, লেখাপড়া জানে, সুন্দরীও বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ—চমৎকার গান গায়।

বিবাহের পরও দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। গত মাঘ মাসের কথা, এক দিন ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ি হইতেই ফিরিতেছি। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, কোর্টের বেতারের মাস্তলে লাল আলো জ্বলিয়াছে। বৈদ্যুতিক সংবাদ-পত্রের উজ্জ্বল অক্ষরে জানাইয়া দিল যে আবিসিনিয়ার সম্রাট লীগ অব নেশন্সে পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং মোহনবাগান হকি না ক্রিকেট খেলিতে বোম্বে যাইতেছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস্ হইতে নামিতেই নজর পড়িল আমার সেই দিয়াখালির বন্ধুটি সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সম্ভবতঃ বাসের প্রত্যাশায়। খুশীর সহিত আগাইয়া গেলাম।

—আরে, তুমি কলকাতায় যে? কবে এলে? এই যে নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি—চিনতে পারেন?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—চিনতে কেন পারব না? আপনি ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন তার পর থেকে। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

বন্ধুপত্নীকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করিলাম। বন্ধুটির মুখে শুনিলাম তাহার ছোট শালী চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে আজ দিন পনর হইল—মধ্যে অবস্থা খারাপ হওয়াতে পত্র পাইয়া বন্ধুটি সস্ত্রীক শালীকে দেখিতে আসিয়া শ্যামবাজারে এক আত্মীয়বাড়ি উঠিয়াছে। এখন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন হইতেই ফিরিতেছে। মেট্রোয় বায়োস্কোপ দেখিবে বলিয়া এখানে নামিয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বলিল—চল না হে, তুমিও চল। এ তো কখনো ওসব দেখতে পায় না, তাই ভাবলাম ফিরবার পথে মেট্রোতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। আর এদিকে শালীটি তো সেরে উঠেছে, কাজেই মনও ভাল। এস আমাদের সঙ্গে।

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গেলাম মেট্রোতে। কয় বছর যাই নাই, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সেজন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী বলিলেন—বিয়ে করেছেন আপনি?

কথার কি উত্তর দিব ভাবিতে না-ভাবিতেই তিনি বলিলেন—করেন নি তা বেশ বুঝতে পারছি। উনিও বলেন, সে বিয়ে করলে কি আর আমাদের একখানা নেমন্তন্ন-পত্রও দিত না?...করেন নি—না?

এ-কথার পরে বিবাহ করিয়াছি কথাটা হঠাৎ বলা চলে না। সুতরাং তখনকার মত অর্থবিহীন হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তবে হাসিটি যত দূর সম্ভব ব্যর্থসূচক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মনে আছে।

ইন্টারভ্যাল হইল। বন্ধুটি পান কিনিবার জন্য বাহিরে গেল।

আমার বিবাহের কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, ভাবিলাম এইবার মোলায়েম করিয়া বলিয়া ফেলি বন্ধুপত্নীর নিকট।

কিন্তু বন্ধুপত্নীও যে আর একটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা বুঝি নাই। বলিলেন—জানেন একটা কথা বলি। সেই যে আমাদের দেশের মেয়েটির কথা বলেছিলুম, মনে আছে? সেই মণিমালা?

—হ্যাঁ, খুব আছে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

—এই গত পৌষ মাসে শিবতলায় আমার তার সঙ্গে দেখা। দু-বছর দেখা হয় নি, কথা আর ফুরুতে চায় না। তার বিয়ে হয় নি এখনও। কেন হয়নি সে কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি, তবে ভাবে বোঝা তো যাচ্ছে ও রকম গরীব-ঘরের মেয়ের কেন বিয়ে হ'তে দেরি হয়।

আমি কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—হ্যাঁ, তা বইকি।

—তারপর শুনুন, কথায় কথায় কলকাতার কথা উঠল। সে কখনও কলকাতা দেখে নি। আমি হেসে বললুম—আচ্ছা, তোমায় শীগ্‌গির কলকাতা দেখাচ্ছি। এ-কথায় মেয়েটি হাসলে। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও বুঝতে পেয়েছে আমি কি বলছি। একটু পরে নিজেই বললে—আপনাদের বাড়িতে সেই যে ভদ্রলোক আসতেন, তিনি আর আসেন না? আমি বললাম—অনেক দিন আসেন নি, তার পর হেসে বললাম—তবে একটা কথা জানি, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাহলে একখানা অন্তত নেমন্তন্নের চিঠি তো আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। মেয়েটি হেসে চুপ করে রইল। আমার বেশ মনে হয় সে এখনও মনে মনে ভাবে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। তার উপর আবার শুনুন, হয়তো আমার উচিত হয় নি এত কথা বলা—আসবার সময় আবার তাকে বললাম—তাহলে কিন্তু এবার কলকাতা দেখার ব্যবস্থা করছি। মেয়েটির লজ্জা হ'ল কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল ভারী খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল উঠে আসবার সময়। যেন তাচ্ছিল্যের সুরে হঠাৎ বললে—আমার আর অমত কি, তবে তুমি ভাই দিদিমাকে একবার ব'লো। সত্যই সে আপনার আশায় আশায় রয়েছে, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। যা বলেছে, মেয়েমানুষ তার চেয়ে আর কি বেশী বলবে? এ দোষ আমারই, সেজন্যে ওঁর সামনে বললাম না। উনি শুনলে রাগ করবেন। আমার অনুরোধ, ঠাকুরপো, দয়া করে গরীব-ঘরের মেয়েটাকে নিয়ে তাদের দায় উদ্ধার করুন। আপনি তাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবেন, একথা বলতে পারি। অমন সুশ্রী, সরলা, শান্ত মেয়ে পাবেন না—হ'লই বা গরীব?

আমার বন্ধু পান কিনিয়া ফিরিয়া আসাতে কথাটা চাপা পড়িল।

অতঃপর আর আমার বিবাহের কথা ইহাদের নিকট বলিতে পারিলাম না। হয়তো একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিতাম আমার স্ত্রী সত্যই সুন্দরী, এমন কি ইহাও ভাবিতেছিলাম এক দিন উভয়কে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিব—কিন্তু বন্ধুপত্নীর সহিত কথাবার্ত্তার পরে আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

কেন যে এমন সব ধরণের ব্যাপার ঘটে!

কোথায় কাহাকে কে গোসগল্পের ছলে কি বলিল, তাহাই শুনিয়া একটি সরলা পল্লীবালিকা মনে কি জানি সব স্বপ্নজাল বুনিতেছে এখনও, অথচ যাহাকে ঘিরিয়া এ স্বপ্ন রচনা—এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সে দিব্য আরামে চাল দিয়া কলিকাতায় বেড়াইতেছে, বিয়ে-থাওয়া করিয়া নববধূকে লইয়া মশগুল হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতেছে।

সেই হইতে এই কয়মাস সুদূর রাঢ় অঞ্চলের একটি অদেখা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কথা আমি ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি!

একটি দিনের কথা

একটিমাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার বটে, কিন্তু তার পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সেটা না বললে ব্যাপারটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতা নিয়ে প্রকাশ হবে না। তাই একটু আগে থেকেই বলি।

একবার কলকাতা থেকে অনেকদূর একটা পাড়াগাঁয়ে আমার এক বন্ধুর ভ্রাতার জন্যে মেয়ে দেখতে যাই। যাঁদের জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাঁরা এসে আমায় বড় ধরাধরি করলেন যে, আমায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে; কারণ ঐ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকায় সেখানকার অনেকেই আমার পরিচিত এবং আমি নিজে বারকতক সে গাঁয়ে গিয়েছি, এ খবর তাঁরা জানতেন।

অগত্যা তাঁদের সঙ্গে যেত হোল। জায়গাটা নিতান্তই পাড়াগাঁ। আমি সেখানে এর আগে দু-একবার গেলেও আমার সেই আত্মীয়ের পাড়াটি ছাড়া অন্য অন্য পাড়ার লোকদের ভাল চিনিনে, বিশেষ কারো নামও জানিনে। যাঁদের বাড়িতে মেয়ে দেখার কথা, তাঁরা এই অপরিচিত দলের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হোল এবং তাঁদের বাড়িতে এই আমি প্রথম গেলুম। মেয়ের বাপের নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, আগে কি একটা ভাল চাকুরি করতেন, এখন চোখের অসুখ হওয়াতে বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে পারেন না। ছেলেরা সব বড় বড়, মেয়েটিই ছোট। ভদ্রলোকের অবস্থা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের যেমনি হয়ে থাকে তেমনি। বাইরে একখানা খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ, একটা পুরানো কোঠাবাড়ি, উঠানের একধারে বাঁশের বেড়ার মধ্যে গোটাতকক জবাফুলের গাছ, নারিকেলের চারা, কুমড়োর মাচা ইত্যাদি। এক পাশে গোয়াল ও কাঠ-কুটো রাখবার আর একখানা ছোট চালা।

গোপাল চক্রবর্ত্তী আমাদের যত্ন আদর করলেন খুব। চা খাওয়ালেন, জলজোগ করালেন। মেয়ে দেখানোও হোল—মামুলী প্রশ্নাদি জিগ্যেস করা ও মেয়ের তৈরী মামুলী পশমের আসন, হাঁস, তুলোর বেড়াল ও মাছের আঁশের কাজ ইত্যাদি দেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা উঠবার উদ্যোগ করলাম।

কথায় কথায় আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—এই কি আপনার বড় মেয়ে?

গোপাল চক্রবর্ত্তী বললেন—না, এটি আমার দ্বিতীয় কন্যা। (বিবাহের ব্যাপারে পাড়াগাঁয়ে কথাবার্ত্তার সময় সাধুভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।)

আমি বললুম—বড় মেয়েটির কোথায় বিয়ে দিয়েছেন, চক্কত্তি মশায়?

—না, তার এখনও বিবাহ হয় নি।

মনে একটা খটকাও লাগলো। এই মেয়েটির বয়েস পনেরোর কম নয়। বড় মেয়েটির বয়েস সুতরাং কম হলেও সতেরো! অতবড় আইবুড়ো দিদি ঘরে থাকতে তার ছোট বোনের বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ—তবে কি বড় মেয়েটি কানা খোঁড়া বা ঐ রকম কিছু?

গোপাল চক্কত্তি তখনই আমাদের সন্দেহ দূর করলেন। তাঁর বড় মেয়েটির এক জায়গায়

সম্বন্ধ হয়েছে, পাত্রের বাড়ি আছে কলকাতায় হাতীবাগানে, পাত্র মার্চেন্ট অফিসে চাকুরি করে। চক্কত্তি মশায়ের ইচ্ছে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হন।

আমরা বিদায় নিলাম।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে বাঁ ধারে একটা পুকুর।

গ্রামের একটি ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ পুকুরের বাঁধা ঘাটের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বল্লেন—ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হোল গোপাল কাকার বড় মেয়ে রাণী—যার কথা হচ্ছিল—

কি ক্ষণে না জানি মেয়েটিকে যে দেখলুম! কত ছবি চোখের সামনে দিনরাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটি কি করে যে মনের মধ্যে সেদিন স্থায়ী দাগ রেখে গেল। চেয়ে দেখি একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে পুকুরঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামে নি, মোটামুটি সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটিও ফর্সা স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতে একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি আঙুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে—কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—অথচ আজও যখন ছবিটা কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে—

যাক্, ওসব কথা পরে বলবো—

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—মেয়েটি তো বেশ দেখতে, এই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ হলে খুব ভাল হোত। যে মেয়েটি দেখা গেল, তার চেয়ে এটি সত্যিই অনেক ভালো।

তারপর আমরা গ্রামের বাইরে মাঠে এসে পড়লুম—আমাদের সঙ্গের লোকটিও ফিরে গেলেন।

ওদের ব্যাপার আমি এই পর্যন্ত জানি। আমার বন্ধুর ভাইয়ের সেখানে বিয়ে হয় নি একথা আমি পরে অবিশ্যি শুনেছিলুম, কেন হয় নি সে খবর রাখবার আবশ্যক বিবেচনা করি নি। তবে শুনেছিলুম নাকি দেনা-পাওনা নিয়ে কি একটা গোলযোগই সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কারণ।

এর পরে বছরখানেক কেটে গিয়েচে।

একদিন সকালে আমার বাসায় জন কয়েক ছোক্‌রা এসে হাজির হোল। তাদের সকলের বাড়ি ঐ গ্রামে—তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়টির এক ভাইও আছে। সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত।

আমায় বল্লে—শীগ্‌গির নিন তৈরী হয়ে—চলুন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—

—কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

সকলেই সমস্বরে বল্লে—পথে বেরিয়ে শুনবেন, এখন বেরিয়ে পড়ুন চট্ করে—শ্মশানে যেতে হবে—কাশীমিত্তিরের ঘাটে—

খুব বিস্মিত হোলাম।

—কে মারা গিয়েচে? ব্যাপার কি?

আমার আত্মীয়ের ছেলেটি বল্লে—গোপাল কাকার মেয়ে রাণীর স্বামী আজ মারা গিয়েচে। এখানে বিয়ে হয়েছিল হাতীবাগানে—বিয়ের পর তিনমাস এখনও পোরে নি। আর একটি ছেলে বললে—তার চেয়েও বিপদ, রাণীর দেওর আর শাশুড়ীর ব্যবহার ভয়ানক খারাপ, তারা কেউ শ্মশানে যাবে না—মুখাগ্নি করতে হবে রাণীকেই—দেওর এখন চেষ্টায় আছে, নগদ টাকা,

গহনা সরাবে, দাদার বৌকে ফাঁকি দেবে। সে ভয়ানক ব্যাপার, চলুন না, গিয়ে শুনবেন সব।

—আমরা কি জানতাম কিছু, আজ সকালে রাণীর সেজদা ললিত আমাদের মেসে এসে খবর দিলে যে, একা সে কিছু করতে পারচে না—আমরা তো গাঁয়ের একদল ছেলে মেসে আছি—বললুম—আমরা থাকতে ভয় কি? চলো যাই। ললিতকে তো ওরা বাড়ি ঢুকতেই দেয় না—দেওরটা এমনি করেছিল।

কাশীমিত্রের ঘাটে পৌঁছে দেখি রাস্তার দিকের পাঁচিলের এক কোণে একটা খাট নাবানো—তাতে চাদর-ঢাকা একটি মৃতদেহ। খাটের পাশে সেই মেয়েটি বসে আছে, যাকে সেবার ওদের গাঁয়ের পথের ধারে পুকুরঘাটে নাইতে নামতে দেখেছিলুম সাবানের বাক্স হাতে। ওর পরনে রাঙাপাড় শাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো, চোখেমুখে একটি দিশাহারার ভাব—যেন সে বুঝতে পারচে না, যে কি হচ্ছে বা কেন সে এখানে এসেচে। কিন্তু তার চোখে জল দেখলাম না। সেও যেন একজন এই ব্যাপারের নিস্পৃহ উদাসীন দর্শক আরও পাঁচজন বাইরের লোকের মত, এই রকম ভাবটা তার মুখে। খাটখানা এবং মেয়েটির চারিধারে ঘিরে কতকগুলি ছোকরা।

আমায় দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল—এই যে এসেচেন? আপনাকে আনতেই বলে দিলুম আমরা। আমরা তো সব ছেলেছোকরা, একজন আপনাদের মত লোক উপস্থিত না থাকলে আমরা ভরসা পাইনে।

আর একটি ছোকরা বললে—দেখুন, এমন চামার রাণীর দেওরটা—ভাই মরে পড়ে আছে, সে সিন্দুক বাক্স সামলাতে ব্যস্ত। রাণীর তো দুর্দ্দশা যে কি করেচে এই ক'দিন, এর দাদা না থাকলে বোধ হয় ওকেও ওই সঙ্গে মেরে ফেলত। টাকার ভাগ, বাড়ির ভাগ ওকে দিতে হবে এই আপসোসে মা আর ছেলে মরে যাচ্ছে! সে যদি দেখতেন কাণ্ডটা! আপনি যদি বলেন, আমরা চিতায় চড়িয়ে দিই মড়া। দেখুন, মুখাগ্নি করতে পর্য্যন্ত এল না ভাই—এই ছোট মেয়েটাকে দিয়ে সব কাজ করাতে হবে—সঙ্গে অন্য একটি মেয়েমানুষ পর্য্যন্ত নেই—ওর শাশুড়ীকে কত করে বললাম—এলো না।

মৃতদেহ চিতায় তুলে দিতে পরামর্শ দিলাম।

রাণীর দাদা তার হাত ধরে তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে।

মুখাগ্নি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে তার দাদা তাকে একপাশে বসালে। দু'একটি কথায় নীচু স্বরে বোনকে কি বলছিল, বোধ হয় সান্ত্বনাসূচক কথা।

এমন সময় একটি কাণ্ড ঘটলো।

কোথা থেকে তিন জন লোক এসে উপস্থিত হোল। একজনের বয়েস তেইশ-চব্বিশ, বৃষকাষ্ঠের মত শুক্‌নো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সামনে পেছনে ঘাড়ের দিক চাঁচা। শখের থিয়েটার দলে ফ্লুট বাজায়—চেহারাখানা এমনি ধরণের। বাকী দু'জন বেশী বয়সের লোক—কিন্তু তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওদের বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কারো অক্ষরপরিচয় ঘটে নি, এমনি চাষাড়ে-চোয়াড়ে মুখ।

ছোকরাটি আসতেই মেয়ের দাদা বললে—এই যে আসুন ধীরেনবাবু—মাকে আনলেন না? ছোকরা সে কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চোয়াড়ে ধরণের একজন লোককে দেখিয়ে বললে—ইনি আমার মামা। এঁকে নিয়ে এলাম, নইলে আপনারা তো আমার কথা শুনবেন না!

—কি কথা?

এইবার সেই মামা নিজে এগিয়ে এসে মেয়ের ভাইকে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু এদিকে আসুন। মেয়ের ভাই তার সঙ্গে এক পাশে গেল। দুজনে কি কথা হল জানিনে, ভাই ফিরে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে—ইনি রাণীর মামাশ্বশুর। ইনি বলচেন রাণীর গায়ের গহনাগুলো দিতে ওঁর হাতে। আপনি কি বলেন? এই কথাতে মামাশ্বশুরের সঙ্গী সেই আর একজন চোয়াড়মত লোক চটে গেল। বল্লে—উনি কি বলবেন? মেয়ের মামাশ্বশুর আর দেওর নিজে এসে গহনা চাইছেন, উনি এর মধ্যে কি বলবেন?

কতকগুলো ছেলেছোকরা সমস্বরে কি একটা কথা বলতে গেল—আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে মামাশ্বশুরকে বললুম—আপনি গহনা এখন চান কেন?

মামাশ্বশুর বল্লে—গহনা বৌমার গা থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এমন গোলমাল আর ভিড়ের মধ্যে। আমাদের কাছে এখন রেখে দিই, এর পরে আবার দেবো—

বললুম—না, গহনা আমরা দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর মহা রুখে উঠলো।

—দিতে পারেন না? আপনি কে মশাই? আপনার কি অধিকার আছে দেবার—না দেবার? আমার বৌমার গহনা আমি নিতে এসেচি, আপনি যে বড়—

পেছন থেকে একজন ছোকরা বললে—ওঃ ভারী বৌমা বৌমা এখন, বড় দরদ দেখাতে এসেচেন বৌমার ওপর—এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই? কেশবের অসুখের সময় কোনদিন তো চুলের টিকিও দেখি নি—

মামাশ্বশুর বললে—মুখ সামলে কথা কও বলচি—

পেছনের সেই চোয়াড় লোকটা আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসে বললে—আলবৎ আমরা গহনা নিয়ে যাবো—আমাদের বৌয়ের গহনা আমরা নিয়ে যাবো তাতে কে কি করবে?

একটা হৈ হৈ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠলো, মামাশ্বশুরের ও তার সঙ্গীর এই কথায় আমি আমাদের দলের ছোকরাদের থামিয়ে দিয়ে বললুম—আপনাদের গহনা আপনারা নিয়ে যাবেন কি না সে তর্ক আমরা করতে আসি নি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনাদের ঘরেরই তো বৌ, ছেলেমানুষ, কাঁদচে, এই কি সময় ওর গা থেকে গহনা খুলে নেবার? এখন আমরা তা হতে দিতে পারিনে।

মামাশ্বশুর বল্লে—হতে দিতে পারেন না কি মশাই? আপনি যে বড্ড লম্বা লম্বা কথা বলচেন দেখতে পাই। হতে দিতে হবে—আমরা গহনা নিয়ে যাবোই, আপনি কি করবেন?

আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল লোকটার ইতরামি দেখে। বললুম—আপনারা বলচেন আপনাদের বৌমা, এই বুঝি তার ওপর আপনাদের দরদের পরিচয়? গহনা নিতে এসেচেন এ সময় গা থেকে খুলে? গহনা যদি আমরা না দিই, কি করবেন আপনারা?

ওরা তিনজনেই আস্ফালন করে বলে উঠলো—গহনা জোর করে নিয়ে যাবো, আপনাদের কি অধিকার আছে গহনা আটকাবার? কে আপনারা? আলবৎ গহনা আমরা নিয়ে যাবো—

এইবার আমাদের ছেলের দল ক্ষেপে উঠলো—তারা সবাই রাণীকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণ। তারা বললে—কারো সাধ্যি নেই, আমরা এখানে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়ের গা থেকে কেউ গহনা ছিনিয়ে খুলে নিয়ে যায়—আসুক কে এগিয়ে আসবে দেখি—

একটা তুমুল হৈ চৈ ও বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি হোল তারপরে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলো—লোক জমে গেল চারিধারে—সকলেই জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কি? ওরাও চীৎকার করে—

—দেখে নেবো, কার সাধ্যি—

—কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারটা কি মশাই?

—আলবৎ নিয়ে যাবো,—কত জোর গায়ে আছে দেখবে?

—হাঁ হাঁ মশাই, থামুন,—থামুন—

—ভদ্রলোক না ছোটলোক—চামার একেবারে—

—মুখ সাম্‌লে—খবরদার—

—আমাদের বোনের মত—আমাদের গাঁয়ের মেয়ে—

—পুলিস পুলিস—

সবাই মিলে যখন একটা দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত করে তুলেচে, তখন হঠাৎ আমার চোখ পড়লো রাণীর দিকে। সদ্য-বিধবা হতভাগিনী বালিকা ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে বড় বড় ভীতিপূর্ণ চোখে যুধ্যমান দল দুটির দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে—একে তো সে অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কলকাতাতেই বিয়ের আগে কখনো আসে নি, তার উপর আজই সে বিধবা হয়েচে। এত বেলা হয়েচে এক বিন্দু জল নিশ্চয়ই ওর মুখে যায় নি, এদিকে দেওর আর মামাশ্বশুরের এই কাণ্ডকারখানা···একপাল পুরুষমানুষের মধ্যে আজকার দিনে ওই বালিকা একা, এমন আর একজন মেয়েমানুষ নেই যে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, একটা সহানুভূতির কথা বলে। ওর সেই ছবিটা আমার মনে এল, ওদের গাঁয়ের পুকুরঘাটে সেই যে ওকে দেখেছিলুম—সহজ, সরল, নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর, লীলাময়ী, সুন্দরী কিশোরী। একটা সুকুমার সন্ধ্যামালতী ফুলের লতাকে ছায়াবৃক্ষের শীতল আশ্রয় থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনে কাশীমিত্রের ঘাটের চিতার আগুনের আঁচে বসানো হয়েচে—ওর চোখের জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েচে সেই আঁচে···

পুলিসের কথা শুনে ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের লোক, পুলিস সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বোন ভয়ে ভয়ে বললে—দাদা, তুমি ঝগড়া কোরো না ওদের সঙ্গে, গহনা আমি খুলে দিচ্চি, ওদের দ্যাও—এই ধরো—পুলিস আসবার আগেই দিয়ে দ্যাও দাদা—

দাদা আমার বললে—দেখুন, আমি বলছি কুটুম্বের সঙ্গে একটা মনান্তর করে কি হবে, রাণীও বলচে গহনাগুলো না হয় দিয়েই—

বললুম—কক্ষনো না। তা হতে পারে না। পুলিস আনবে আনুক না? ওদের সে সাহস হোলে তো? তুমি ভয় খেও না।

ছেলেরাও বললে—রাণী, তুই কিছু ভয় খাসনে। আমরা আছি এখানে, কারো সাধ্য নেই কিছু করে। ওরা তিনজন আর আমরা এগারজন—

আমাদের দলের প্রতুল বলে যে ছোকরা আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে বললে, আচ্ছা, দাঁড়ান আপনারা সবাই একটু—আমি রজনী ডাক্তারকে ডেকে আনি, তিনি নিকটেই থাকেন, প্রবীণ মানুষ, তিনি রাণীর বরের চিকিৎসা করেছিলেন এই অসুখে। তিনি যে রকম পরামর্শ দেন, তাই করা যাবে—কি বলেন?

মামাশ্বশুর আর তার সঙ্গী কি একটা পরামর্শ করলে নিজেদের মধ্যে। তারপর ওদের সঙ্গী সেই চোয়াড় লোকটা কোথায় চলে গেল।

আমাদের দলের একটা ছোকরা বল্লে—গেল কোথায়?

বললুম—যেখানে খুশি যাক গে। চিতার দিকে লক্ষ্য রেখো—রাণীকে বসতে বলো ওর

দাদার কাছে গিয়ে। রোদে দাঁড়িয়ে আছে কেন ?

দেওর আর মামাশ্বশুর আমাদের থেকে একটু দূরে বসেছে। কি একটা পরামর্শ আঁটছে দুজনে, বেশ বুঝতে পারা গেল। রাণীর ভাই একবার ভয়ে ভয়ে বললে—থানায় যায় নি তো ?

আমাদের দলের কেউ কেউ বল্লে—ওরা নইলে আরও লোক আনতে গিয়েচে। একটা মারামারি না করে দেখছি ছাড়বে না।

রাণীর দাদা বললে—সেটা কি ভাল হবে ? তার চেয়ে দিই না গহনা ওদের হাতে ?

আমি বুঝিয়ে বল্লুম—কেন তুমি গহনা দিতে যাবে ? এ গহনা ওরা দেয় নি, দিয়েছেন তোমার বাবা। ওদের কোন অধিকার নেই এতে। রাণীর শ্বশুরবাড়ির যেমন গতিক দেখচি, তাতে মনে হয়, সেখানে ওর স্থান হবে না। ওই গহনাগুলোই ওর সম্বল। গহনার মধ্যে তো দেখছি একছড়া হার, আর হাতের চুড়ি কগাছা, আর তো কিছু নেই। তাই বা কেন হাতছাড়া করবে ? গুণ্ডা আনে, আমরাও পুলিসে খবর দিতে পারি।

ওদের ফিরতে দেরি দেখে ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আর বোধ হয় গড়ালো না ; কিন্তু রাণীর অদৃষ্টে সেদিন আরও দুঃখ ছিল। একটু পরে সত্যিই ওরা একদল লোক নিয়ে ফিরে এল। আমাদের দেখিয়ে বললে—এরা কোথা থেকে এসেছে চিনি নে। উনি আমার বৌদিদি, মা আসতেন শ্মশানে, কিন্তু তিনি বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না। বৌদিদির ভাইয়ের মতলব গহনাগুলো হাতিয়ে নেওয়া, তাই বোধ হয় এই সব বন্ধুর দল এসেছে।

আবার একটা গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি শুরু হোল। তখন গোলমাল শুনে পুলিস এসে না পড়লে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হতে বাকী থাকত না। আমাদের দুই দলকেই থানায় যেতে হবে বল্লে।

ইতিমধ্যে দাহকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমরা রাণীকে স্নান করিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হোল। নানারকম জেরা জবানবন্দী চললো আমাদের উপর। রাণী তো ভয়েই সারা। সে ভাবলে গহনাগুলো খুলে না দেওয়ার অপরাধে পুলিস এখুনি তাকে হাজতে আটকে রাখবে। অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের সাচ্চা প্রতিপন্ন করতে আমাদের ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপালে, এমন কি রাণীর সম্বন্ধেও দু'একটা এমন কথা বল্লে, যা থানার বাইরে বললে আমাদের ছোকরারা ওদের হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

বেলা তিনটের সময় থানা থেকে আমাদের ছুটি হোল।

রাণীকে এখন কোথায় পাঠানো যায় ?...

ওর শ্বশুরবাড়িতে ওকে নিয়ে তোলা আমাদের কেউ সমীচীন মনে করলে না—বিশেষ করে এইমাত্র যখন তার দেওরের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আমরা ওর ভাইকে পরামর্শ দিলাম, ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে, নইলে একা শ্বশুর-বাড়ীতে ওকে রেখে গেলে দেওর আর শাশুড়ীতে মিলে ওর যা দুর্দ্দশা করবে, সে কল্পনা না করাই ভালো। ভাইয়ের কাছে আবার দু'জনের যাওয়ার মত ভাড়া নেই। আমাদের যার কাছে যা ছিল দিয়ে দু'জনের দু'খানা টিকিট কিনে ওদের শেয়ালদা' স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে এলাম।

শুনলুম ও বিয়ের পর জোড়ে একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল বরের সঙ্গে নববধূর সাজে, সেই যে এসেছিল, আর এই যাচ্ছে।

সেই কথা মনে হওয়ার দরুণ বা অন্য কিছু জানিনে, যাবার সময় রাণী খুব কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণ ও তেমন কাঁদে নি। সারাদিনে যে ঝড় ওই মেয়েটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে,

তারপরে ও যেন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইচে।

ওর সে কান্না শুনলে বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষের মত কান্না…চীনে মাটির সাধের পুতুলটা ভেঙে গেলে ছোট মেয়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি…স্বামীহীনা সদ্য বিধবার কান্নার মত নয় কান্নাটা…মনে হয় ছেলেমানুষই তো, খেলার ঘরের পুতুল-ভাঙার কান্নাটাই শিখে রেখেচে, বড় মেয়ের মত ট্র্যাজিক কান্না কাঁদতে শেখে নি এখনও।

এর পরে রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি বা তার খোঁজও রাখি নি। যদি বেঁচে থাকে, তার বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ, বাপের বাড়িতে ভাইয়ের স্ত্রীর দাসীবৃত্তি করে দুমুষ্টি অন্নসংস্থান করচে, অকালে বুড়ী হয়ে গিয়েচে, হয়তো বা এতদিন শুচিবাই রোগেও ধরেচে। এ ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু ওর সেই ছেলেবেলাকার পুকুরঘাটের সেই কুমারী দিনের ছবিটি আমার চিরকাল মনে রয়ে গেল…পুকুরের বাঁধা ঘাটে নামচে…দু'আঙুলে ধরে গামছাখানা খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে লীলাময়ী বালিকা…সেই ছবিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারি নে।

বাটি-চচ্চড়ি

সংসারটা এমন কিছু বড় নয়। মাত্র দুটো মেয়েমানুষ এবং একজন পুরুষের সমবায়ে গঠিত। ডাক্তার, ডাক্তারের বৌ এবং তাদের এক বিধবা পিসিমা, আবার এই পিসিমা ডাক্তারের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। সরকারী হাসপাতালের পুরোনো ডাক্তার। চক্রধরপুরে বদলী হয়েছে সম্প্রতি। ছোট্ট সংসার—আরও ছোট্ট একখানা বাড়িতে অবস্থিত—বেশ ভাল ভাবেই চলছিল সুখে, শান্তিতে, হাসিতে ও আনন্দে—উদয়াস্ত সুমহান্ কাল কেটে যাচ্ছিল মোহন ছন্দে।

এ হেন সময়ে ডাক্তার একখানা চিঠি পেল এই মর্মে, কলকাতা থেকে নাকি তার বাপের ছোট কাকার বড় ছেলের রুগ্ন বধূ আসছে তার শরীরের ক্ষতিপূরণ করতে এই পাহাড়ের দেশে। অলকার স্বামীই ডাক্তারের চেয়ে অনেক ছোট।

প্রস্তাবনাটা পিসিমার কাছে উত্থাপিত হলে তো সে প্রতিবাদ করলে, "বেশ, আসুক ছোট বৌদি। আমি কলকাতায় যাব—এখানে থাকতে পারবো না।"

ডাক্তার প্রতিবাদ করলে, "তা'হলে এখানে দিন চলবে কি করে?"

"সে আমি কি জানি ভাইপো।" পিসিমা ঐ বলেই ডাক্তারকে সম্বোধন করে।

"কিন্তু বৌমা আসছেন রোগা মানুষ। তাঁকে দিয়ে তো আর সংসারের কাজ করানো যাবে না। আর তোমাদের বৌ তখন হয়ে পড়বে একা—ছেলেপিলে নিয়ে আর ক'দিক সামলাবে বল? তা ছাড়া কলকাতায় তো দেখছি মানুষের অভাব তেমন নেই।"

সুতরাং পিসিমাকে থেকে যেতে হ'ল। অলকার সঙ্গে তার আজ প্রায় পাঁচ বছরের বিবাদ। সেই বিবাদের ঝাঁজেই সে প্রতিবাদ করেছিল। তবে সে প্রতিবাদ টিকলো না কিছুতেই ডাক্তারের প্রবল যুক্তির কাছে।

ওদিকে অলকা এল যথাসময়ে। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের সক্রিয় কলকব্জাগুলি অচলপ্রায় হয়ে গেছে। শরীরের সে কান্তি বা শোভা নেই। মুখশ্রী হয়েছে কালিমালিপ্ত। গায়ের হাড়গুলো এমনভাবে বার হয়ে পড়েছে যে, তাদের এক-একখানা করে গোনা যায় অক্লেশে।

আমার পরের দিন তো ডাক্তার পরীক্ষা করলে। দেখলে জীবনে আশা বড় কম। নিজের মৃত্যুর জন্তে সে নিজে দায়ী। কারণ সে মৃত্যু ডেকে এনেছে অযথা নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে এবং চিকিৎসার অভাবে। এমন কি, এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, সে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষের পানে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ নিছক ভাইটামিনের অভাবে বা খাদ্যপ্রাণের অকিঞ্চিৎ-করতায়। স্বামীর দীর্ঘ দিনের বেকার অবস্থা রোগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে।

যা হোক, বৌমার চিকিৎসা এবার চলতে লাগলো যথাসাধ্য। কিন্তু সে চিকিৎসার কোন সুফল ফললো না মাসখানেকের মধ্যেও। ডাক্তার হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। তবু অলকার রোগ কমলো না; পরন্তু বৃদ্ধি পেতে লাগলো একটু একটু করে দিন দিন, সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে।

অলকার নুন খাওয়া নিষেধ। কোন এক রাজার মেয়ে নাকি তার বাপকে নুনের মত ভালবাসতো। সুতরাং নুনের প্রয়োজনীয়তা কিংবা গুণ সামান্ত নয়। তাই অলকা সচরাচর নুনহীন তরকারী খেত না। ডাক্তারের বৌ আবার লোককে খাওয়াতে নাকি বড় ভালবাসতো। সুতরাং অলকার খাওয়ার কষ্ট দেখে তার করুণ মন ক্লিষ্ট হোত অত্যন্ত। অনেক ব'লে ক'য়ে সে স্বামীর কাছ থেকে বৌমার সামান্ত একটু বাটি-চচ্চড়ি খাবার অনুমতি পেয়েছিল এবং প্রতিদিন তার জন্তে একটা বাটি-চচ্চড়ি করে দিত সযত্নে।

সেদিন অনেকগুলো বিছানা পরিষ্কার করে উঠতেই ডাক্তারের বৌয়ের বেশ বেলা হয়ে গেল। পিসিমা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে রান্না করতে বসলো। আর বৌমা?—বাতায়ন-পাশে বসে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল অপরূপ মেঘের খেলা। দূরে অতিকায় ধূমের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পর্ব্বত। তার নীচে ইতস্ততঃ বৃক্ষলতাশোভিত কালো বর্ণের ছোট ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে লাল কাঁকরের বঙ্কিম পথরেখা—মনে হয় যেন কোন অচিন দেশে চলে গেছে পাহাড়ের বুক ব'য়ে। বৌমা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, এমন সময় ডাক্তারের বৌ ভিজে চুল মুছতে মুছতে এসে বললে, "বৌমা, আজ কি দিয়ে দুধ সাবু খাবে?"

—"যা হোক দিয়ে খাব অখন মা।"

—"কেন বাটি করতে দিলে না?"

—"থাকগে, কুটনো তো সব কোটা হয়ে গেছে!"

—"তা হোক, তুমি একটা বাটি করতে দাও মা।" কথা শেষ করে ডাক্তারের বৌ গৃহ-ত্যাগ করে আর বৌমা উঠে যায় বাটি-চচ্চড়ির কুটনো কুটতে।

পিসিমা কড়ার ওপর মাছ দিয়ে একবার বাটির পানে তাকিয়ে নিল, তারপর বললে, "বলি হ্যাগো বৌদি, আমার গতরে কি-এমন পোকা পড়েছে?"

বৌমা সবিস্ময়ে কয়, "কেন ঠাকুরঝি?"

মুখরা পিসিমা তখন ফেটে পড়লেন, "আমি কি বাটির কুটনো কুটতে পারি না, না কুটলে হাতে পক্ষাঘাত হোত। তেজ করে আমায় একবার বলা হোল না। রোগ তো বার মাস লেগেই আছে। তার আবার অত দেমাক্ কিসের?"

রুগ্ন বধূটির শুষ্ক নয়নদ্বয় বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে অঝোরে মুক্তার মত অশ্রুকণা নিদারুণ ঘৃণায় ও বেদনায়, ননদের এই বাক্যবাণের সুতীব্র আঘাতে। স্বামীর অর্থহীনতা এবং নিজের রোগের চিন্তায় তার সারা কোমল অন্তরাত্মা সহসা রী রী করে ওঠে। আর পিসিমার মুখে তখন যেন তুবড়ীতে আগুন লেগেছে। সমস্ত বারুদ না নিঃশেষিত হলে সে নীরব হবে না। বৌমা আস্তে আস্তে বাটিটা নিয়ে আসে সকলের অজ্ঞাতসারে।

ঘণ্টা দুয়েক পর পিসিমার বারুদ ফুরিয়ে যেতে ডাক্তারের বৌ এসে বললে, "বৌমা, বাটি আমায় দাও মা, আমি করে দিচ্ছি। ছিঃ ছিঃ, মানুষকে মানুষ অমন করে বলে ?"

বিশ বছরের রোগশীর্ণ বধূটি আজ সারা হৃদয় মথিত করে কেঁদে ফেলল বিপুল বেদনায়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে অকালে হারিয়ে সে আর বিধবা ননদের গঞ্জনা সহ্য করতে পারচে না। ডাক্তারের বৌ আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "কেঁদ না মা, বাটিটা আমায় দাও।"

—"না, থাক্ মা। বাটি আমি আর জীবনে খাব না।"

—"ছিঃ, সে কি হয় মা ?"

—"খুব হয়।"

ডাক্তারের বৌয়ের বহু অনুনয়বিনয় সত্ত্বেও বৌমা বাটি বার করে দিলে না। ডাক্তারের বৌ বেলা একটা পর্য্যন্ত বাটির খোঁজে সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন করে দেখলো, কিন্তু কোথাও সে বাটি পাওয়া গেল না, আর পাওয়া গেল না সে কোটা তরকারীগুলো।

সেদিন রাতে ডাক্তার গিয়েছে রিহার্সাল দিতে। এবার পূজায় নাকি ভারী ধুম করে থিয়েটার হবে। ডাক্তারের বৌ মুখের মধ্যে অনেকগুলো এলাচ পুরে ছারপোকা মারতে বিছানা পাতিপাতি করে খোঁজে—এ তার নিত্যকার অভ্যাস। রাতে সে বড় একটা ঘুমোয় না। এমন সময় পাশের ঘরে বৌমা উত্ত্যক্ত হয়ে বললে, "ভাল জ্বালা, দরজাটা যে কিছুতেই খুলছে না মা।"

ডাক্তারের বৌ আলো নিয়ে এগিয়ে এল, "কি হয়েছে বৌমা ?"

—"দেখ না মা, দরজার খিল কিছুতেই পাচ্ছি না।"

—"দরজা তো খোলা বৌমা ?"

—"তবে খিল কোথায় গেল ?"

ডাক্তারের বৌ জানে যে, তার জ্যাঠাইমা মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ রকম দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছিল। বৌমার এই রহস্যজনক আচরণে সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজে এসে দরজাটা খুলে দিলে।

সামান্য পরে বৌমা বাইরে থেকে ফিরে এসে আবার নিজের বিছানায় শোয় এবং ডাক্তারের বৌ মশা তাড়িয়ে পুনরায় মশারিটা গদির তলায় গুঁজে দেয়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে জানে না। ডাক্তারের ডাকে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল।

ডাক্তার বললে, "যেন মোষ একেবারে। ঘুমে অচেতন।"

—"থাক, খুব হয়েছে!"

—"আধঘণ্টা ধরে একজন ভদ্রলোক ডাকছে।"

—"সকালে অতগুলো কাঁথা তোশক কাচলে ও ভদ্রলোকেরও এই দশা হোত নিশ্চয়।"

ডাক্তার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ যে ঘুমঘোরে কেটেছিল দুজনের তা হয়তো তারা জানে না। ডাক্তারের বৌ সহসা সচেতন হ'ল স্বামীর আহ্বানে, "ওগো, ওগো, দেখ তো ও ঘরে বৌমা কি যেন বলছেন।"

ডাক্তারের বৌ শুনলে বৌমা পাশের ঘরে বলছে, "দূর ছাই! কিছুতেই তো আলো জ্বলছে না।"

রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অট্টহাসি হেসে ওঠে যেন কিসের ব্যাকুল প্রচেষ্টায়। ডাক্তারের বৌ গৃহে প্রবেশ করে দেখে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৌমা মশারির

মধ্যে হ্যারিকেনের ল্যাম্প নিয়ে গিয়ে অনবরত ফস্ ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে যাচ্ছে আর সেই প্রজ্জ্বলিত কাঠি চিমনিতে ঠুকে ঠুকে নিবিয়ে ফেলছে প্রতিবার। এমনি করে জ্বালাতন হচ্ছে ব্যর্থতার বেদনায়। ডাক্তারের বৌ স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মত স্থির হয়ে থাকলো মুহূর্ত্ত, তারপর বললে, "বৌমা, ওকি করছো মা!"

বৌ মৃদু ক্রন্দনের স্বরে বললে, "দেখ দিকিন্ মা, আলোটা কিছুতেই জ্বলছে না।"

বৌমার জ্ঞান সহসা ফিরে আসে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের বৌয়ের পানে। ডাক্তারও এগিয়ে আসে—তারপর ত্বরিতে বৌমাকে পরীক্ষা করে বলে, "শীগ্‌গীর আগুন করে ওঁর হাত-পা সেঁক কর।"

এতক্ষণে পিসিমার ঘুম ভাঙে। সে আলস্য ত্যাগ করে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার এসে তাড়াতাড়ি বৌমাকে একটা ইন্‌জেকশন্ করে দিলে, তারপর বাইরে গিয়ে বল্‌লে, "না, এত করেও বৌমাকে বাঁচাতে পারলুম না।"

নয়নকোণ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা। ডাক্তারের বৌয়েরও চক্ষু হয় বাদল দিনের সজল আকাশের ন্যায়।

মুহূর্ত্তে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয় বৌমার স্বামীর কাছে। তবুও যদি একবার শেষ দেখা করতে পারে পারের ঘাটে।

ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। স্বামী এল দূরান্তর থেকে আর এল তার মেজদি, গলার বোতাম বাঁধা দিয়ে একেবারে শেষক্ষণে। তবুও বৌমা বাঁচল না। ডাক্তার কাঁদলো আর কাঁদলো তার বৌ, মৃতার স্বামী ও মেজ ননদ। শুধু কাঁদে নি তার বিধবা ছোট ননদ; কারণ মৃতার সঙ্গে তার কথা বন্ধ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর-যাবৎ। আর সেই কারণেই সারারাত দিক্‌ভ্রান্ত একজনকে মশারির মধ্যে দেশলাই জ্বালাতে দেখেও নিবারণ করতে পারেনি কিছুতেই।

এই ঘটনার দিন-সাতেক পর ডাক্তারের বৌ কোন এক মধ্যাহ্নে ভাঁড়ার ঘর গোছাতে গোছাতে একটা খালি হাঁড়ির মধ্যে পেল সেই বাটিটা আর তার মধ্যেকার কতকগুলো শুক্‌নো তরকারী। পুরোনো ক্ষতে আবার যেন নতুন করে আঘাত লাগলো, একটা ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যেই চেপে ধর্‌লো। মর্ম্মন্তুদ বিচ্ছেদবেদনা লাঘব করলে না সশব্দ শোকার্ত্ত বাক্য-বিন্যাসে, কেবল সজল নয়নে তাকিয়ে রইলো সেই বাটির পানে আর শুক্‌নো তরকারীগুলোর পানে।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না-ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিবার পূর্ব্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত,

সর্বজনপরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন ?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়িটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস, এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার ?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরণের নির্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের ঘরে বসিয়াও সেদিন মনে হইল আমরা দু-জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টি-মুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল না, এ-কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথাবার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন ?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের

সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো ? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি ! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে। এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে !···দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলিনি।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরকে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ-চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না ? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নকশা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল :

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও-পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে এক-দিন আশ্রয় নিয়েছি, শীতকাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, শ্মশ্রু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুঁটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত ! কি চাস্ এখানে ? বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে কথাটি পাগলীও বলেছিল—

—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসারধর্ম্ম কর্ গে যা।

মন্দির থেকে কিছু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জ্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্নিসিদের বিশ্বাস করো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চ'লো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জ্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে ?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাতে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন ক'রে একা এই নির্জ্জন জায়গায় ?

যাই হোক আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সেদিন চলে এলুম। তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্য্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরণের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন্ দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ি, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেয়েদের গাউন।—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা

আব্‌ছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম—মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ-বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়িতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্তে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজী হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোশামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজী নন।

কিন্তু নিকটে কোঁথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড় ঘরের মেয়ে, যেমনি রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরণ-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টুবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্ট ছিল, এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কি না। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জ্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরনের কাজ কখনও করিনি, কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্ব্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হ'তে চলেছি তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তাও নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে-রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্তে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কাল রাত্রে—তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পূব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই-ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন শুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি!

অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাবিস্তৃত পাড় আর একদিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্য্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি—মাঠের দিকে। নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেণ্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেণ্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ। আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।···আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেণ্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়ে গিয়েছে। উঠে দেখি সারা-রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা-রাত পড়ে থাকার দরুণ গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারে অসম্ভব। অসামান্যা রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্ব্বে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ি থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে।

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিসগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?···অসুখ-বিসুখ নাকি?

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ির কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মনমরা ভাব কেন? বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলে-ছোকরা, এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধ হয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই ব'লেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?···আরে

বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!··· সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি একদিন বললুম—সাধুজী আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে বসে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ-পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ। তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা ক'রেছি।

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলী ও তার অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে, সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে! কি সর্ব্বনাশ! ওকে আমরা পর্য্যন্ত ভয় করে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখ্‌রো সাপকে ভয় করে, তেমনি। ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপন পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে।

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন।

শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি ?

সাধুজী বললেন—তোমায় একথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর-তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস—স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাই কি হয়, অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে ? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন ?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানাপ্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কিণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপারে ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরে প্রথম শ্লোকই হ'ল—

> অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্।
> সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্
> অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন ? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কীণী-সাধনার মন্ত্র ?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি ?

সাধু আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—বেশ, আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী-সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্য্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্য্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্য্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগীনি, সাধারণ মানবী নয়, এঁদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ ক'রে রাখবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ ক'রে ছেড়ে দেবে।

সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু-জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাই নে। আমার ভয় ছিল, হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা-তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্ত্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক সে কথা। তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জ্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম গ্রামের বারোয়ারী ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জ্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম।

এই রকমে এক মাস কেটে গেল, দু মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালাম—ছ মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম বলে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন ব'লে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্।
আমিষান্নৈঃ পুষ্পধূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরী

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আওটপাতার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্যি দিলাম। ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং ঋং ইং ক্ষং মধুসুন্দর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে ধ্যানে বসলাম—সারারাত কেটে গেল।

বলিলাম—কিছু দেখলেন?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফললো না। রাগ ক'রে টান মেরে সব নৈবিদ্যি ফেলে দিলাম নদীর জলে। বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্যলোককে ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেসমত ক'রেই যাই, ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয়নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলি নি। যা যা

হ'ল একটার পর একটা বলছি মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় বসে ছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাবো নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্ত্তি দেখলেন আপনি? '

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে। 'সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর আর না-কর সে আলাদা কথা—. কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারী রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হোল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে:

উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
নীলাম্বরপরিধানা মদবিহ্বললোচনা
নানালঙ্কারশোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।

অবিকল সেই মূর্ত্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি। পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেচে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।···

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্ত্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন। নদীতীরের সেই নির্জ্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা

দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলাম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান···সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, বলে, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল ক'রে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ ক'রে দিতে লাগলো। কিছু ভালো লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন। সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত। আকাশ, নক্ষত্র, দিকবিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুপ হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বনপ্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটি সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটেই বস্তীতে তার বাড়ি। অনেক দিন থেকে তাকে দেখচি, সেও আমায় দেখচে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্চে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বল্লে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধুবাবা?

এমন ভাবে করুণ সুরে বল্লে—আমার মনে দয়া হোল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলিনি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্ত্তিতে। কি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষকটাক্ষে যেমন লোলজিহ্বা, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্য্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ পূতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতি দিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে! তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হোল এরা দেবীও বটে, বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়, নিমেষে ধ্বংস ক'রতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হোল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বল্লে—ভয় কিসের?

বল্লুম—ভয় কই? তুমি রাগ করেছ কেন?

খল খল অট্টহাস্তে নির্জ্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বল্লে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দু'টি শবে জড়াজড়ি ক'রে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় করে বল্লুম—দেবি, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্ত্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বল্লেন—সেই সাঁওতালের

মেয়ের মূর্ত্তিতে আমায় দেখতে চাও ? সেই মূর্ত্তিতে এখনি দেখা দেবো।

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমনীয়।

বললুম—ও চাই না—তোমার মূর্ত্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করচি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে—আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এভাবে বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্ত্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরণের এদের মন। মানুষের বিবর্ত্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বল্লেন—আর কিছুদিন থাক্ তোমায় বহুদূর নিয়ে যাবো—

—কোথায় ?

—সে বলবো না এখন।

—কত দূরে ? কোন্ দিকে ?

—এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা ?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুক্তস্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম, মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বললেন—বিপদ আসচে তোমার, তৈরী হও।

—কি বিপদ ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ-সংশয়ের বিপদ ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের ?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসচে, তা আসবেই

কথা খেটে গেল শীগ্‌গির, খুব বেশী দেরি হয়নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়েস, বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উঠছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ি ধরে আনবার জন্তে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম ?

—ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল।

গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরী ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্তেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করি নি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ি আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—বাপ রে! এ কি ছেলেখেলা? মারা যাব শেষে! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন? সে-চেষ্টাও কখনো করিনি। সে কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

—ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিন মাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—এমনি কত রাত ধরে! এক-এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যিই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলবো ভেবেছ! আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয়, ভেবো না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্তে আমাদের মন সর্ব্বদা তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না, যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি; কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি না-কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেবো না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্তে যে আমার সারাজীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখ-ভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিন-কতক উন্মাদ হয়েই গিয়েছিলাম, বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় এক-রকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্ত উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিলাম। এত অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল ততক্ষণ ওর

চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম !*

ডাইনী

অফিস থেকে ফিরে দেখলুম স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে। চমকে গেলুম খুবই—ভয়ও পাইনি যে তা নয়। বিজুকে তো কখনও ভরসন্ধ্যেবেলা এমন করে সংসারের কাজকর্ম ফেলে শুতে দেখিনি। মেয়ের আবার কি বিপদ হোল ? ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপার কি বিজু ?"

বিজু কোন উত্তর দিলে না। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম জ্বর হয়েছে কি না। না, শরীরে উত্তাপ তো স্বাভাবিক। তবে ? স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, "বিজু !"

এতক্ষণ পর বিজু কথা বল্লে, "কদিন থেকে বলছি এ অলুক্ষণে বাড়িটা বদলে ফেলো, বদলে ফেলো। তা যদি কথা কানে করবে। কলকাতায় কি আর বাড়ি আছে !"

সত্যি বটে বিজু ক'দিন থেকে বাড়ি বদল করবার জন্য তাগাদা করছে ; কিন্তু বাড়ি বদল করা তো আর সোজা কথা নয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। সুতরাং কথাটা তেমন গ্রাহ্য করিনি। বললুম, "এ বাড়ি কি দোষ করেছে ?"

ব্যস্ ! বিজু যেন ফেটে পড়ল, "দোষ করেছে ?—চারিদিকে সব ডাইনী। একটা মেয়ে নিয়ে যাওবা ঘর কচ্ছি, তা যদি ওদের সহ্যি হয় !"

"ডাইনী !" আমি ওসব অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিই না কানেও।

"তা বিশ্বাস হবে কেন ? দেখ দিখি আজ দুপুরের থেকে শানি কিচ্ছু মুখে করছে না। যা খাচ্ছে তাই তুলে ফেলছে।"

আমার মাথা ঘুরে গেল। শানি আমার আড়াই বছরের মেয়ে। তার ওপর ডাইনী বুড়ীর কোপ গিয়ে পড়ল কোন্ দুঃখে ? বিজু তখনও বলে চলেছে, "আচ্ছা ওদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই একটুও ?"

আমি বল্লুম, "তা ডাইনীকে কোথায় দেখলে শুনি ?"

"ঐ ওখানে।" অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিজু পাশের বাড়ির একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। তার সন্দেহ দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রী রী করতে লাগলো। আমি অস্ফুট স্বরে বল্লুম, "কমলা ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! বিশ্বাস হয় না ?"

"আশ্চর্য্য !"

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কদিন থেকে দেখছি ওর ঐ সোহাগ আদর—পোড়াকপালীর কপাল যখন পোড়া তখন অপরের কাচ্চাবাচ্চার ওপর নজর দেওয়া কেন ?"

আমি বিজুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাসখানেকের কথা মনে পড়ল। একদিন ঐ পাশের বাড়ির ঘরটায় কমলা চীৎকার করে উঠলো, "ওরে শোভা রে, তুই কোথায় গেলি রে ? আমায় এমনি করে ফাঁকি দিলি কেন রে ?"

* তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, জন্ম ও মৃত্যু। বিভূতি-রচনাবলী ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য

রাত তখন প্রায় দশটা, আমি খেতে বসেছি। বিজু আমায় দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বল্লে, "পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।" আমি বল্লুম, "কমলা কাঁদছে না?"

"আগে পাতের গোড়ায় জল দাও দিকি।"

সত্যি কমলা কাঁদছে সারা মাতৃ-হৃদয় মথিত করে কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায়। দু'মাস আগে শোভা এসেছিল মর্ত্যালোকে আর আজ চলে গেল মায়ামমতার পাশ ছিন্ন করে। হয়ে পর্য্যন্ত মেয়েটা রোগে রোগে ভুগেছে। সর্ব্বাঙ্গে তার ঘা—বড় বড় দাগা দাগা। পুঁজের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু কমলা সমস্ত ঘৃণা তুচ্ছ করে শোভার সেবা করেছে দু'হাতে। তার ফলে নিজের গায়েও স্থানে স্থানে ঘা হয়েছে—সে সব গ্রাহ্য করেনি একটুও। সারা হৃদয় নিয়োজিত করেছে তার প্রাণসদৃশ শোভাকে আরোগ্য করবার প্রচেষ্টায়। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হোল—রোজা এসে ফোড়া কাটলো—অসংখ্য দেবতার কাছে মানত করা হোল। চেষ্টার কোন ত্রুটি রইলো না; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে রাত দশটায় শোভা মহানিদ্রায় আক্রান্ত হোল। মা বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে শতবার নাড়াচাড়া করে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করলে—বিনিয়ে বিনিয়ে তার প্রস্থানের জন্যে অনুশোচনা করলে সারারাত্রি প্রায়।

সে ঘটনার মাসখানেক পর কমলা নাকি শানিকে দেখে একদিন কেঁদে ফেলে—বুকের একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে পারেনি। তার নিঃশ্বাসের শব্দে আমার স্ত্রীর চিত্ত বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে খুকিকে নিয়ে সরে আসে পাশের ঘরে। আমি তখন অফিসের হিসেবপত্র মেলাচ্ছি। বিজু আমার পাশে এসে বসলো। আমি চশমাটা আস্তে আস্তে চোখ থেকে খুলে বলি, "কিছু বলবে নাকি?"

"না এমন কিছু নয়।"

আমি হাসি, বলি, "তা, ঐ এমন সামান্য কিছুই শুনি না কেন?"

"সত্যি, তোমার আবার এ সবে বিশ্বাস হয় না।"

"আঃ, কৌতূহলই তো বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল।"

"তুমি এ বাড়ি বদলাও।"

"কারণ?"

"কমলা রোজ রোজ শানির পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলবে আর কাঁদবে। বাছার আমার অকল্যাণ হবে তাও বুড়ো মাগী ভুলে যায়।"

"পাগল!" আমি হাসতে লাগলুম।

"ঐ তো! তুমি সব কথা উড়িয়ে দাও কেবল। কপাল যখন পোড়া তখন অপরের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর দেওয়া কেন বাপু?"

বিজু আমার কাছ থেকে চলে যায়—আমি ওসব বিশ্বাস করি না বলেই হয়তো। আমার মাথার মধ্যে বিজুর সেই শেষ কথা কেবল ভাসতে লাগলো, 'কপালপোড়া'। বাস্তবিকই কি কমলার কপাল পোড়া—বিধাতাপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন? এই রুগ্ন মেয়ে প্রসব করবার জন্যে দোষী কে? কমলা? একটুও নয়। আমি জানি কমলার স্বামীর দুরারোগ্য সিফিলিস্ রোগ বর্ত্তমান। একথাও জানি যে, সেই মহাপুরুষ প্রায়ই রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরেন না। বাপ-ঠাকুরদা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছে। তাই ব্যয় করে সে ফুরিয়ে উঠতে পারছে না। তবুও লোকে দোষ দেবে কমলাকে। আমার স্ত্রী অন্ধ-বধির, সে অকারণ পুরুষদের প্রতি সর্ব্বদাই সদয়, কমলার স্বামীর দোষ সে দেখে না। কারণ পুরুষ পুরুষের শত্রু,

আর নারী নারীর শত্রু।

এ হেন কমলা শানি হবার দিন সাতেক পরে প্রায় একটি প্রাণহীন মাংসপিণ্ড প্রসব করে। নিজের ব্যর্থতার বেদনায় মুষড়ে পড়ে কমলা কাঁদলো, চীৎকার করলো—দু'দিন বিছানা থেকে উঠলো না, খেল না—চোখ ফুলিয়ে ফেললো কেঁদে। তারপর একদিন নজর পড়ল শানির ওপর। শানির পানে তাকিয়ে ওর ব্যর্থতার কথা পুনরায় স্মরণ হোল, পুনরায় যেন কে ওর ক্ষতে আঘাত করলে, নিজের অজ্ঞাতসারে একটি ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আমার স্ত্রী শিউরে উঠলো। সে শানিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল। অযথা সেই দিন থেকে শানিকে কমলা ভালবাসলে।

এরপর অনেক মাদুলি ধারণ করে, অনেক গ্রহ উপগ্রহকে ঘুষ দিয়ে অনেক নির্দ্দিষ্ট গাছে ঢিল ঝুলিয়ে কমলা আবার অন্তঃসত্ত্বা হলো—আবার সে ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় দিয়ে অনুভব করল তার গর্ভস্থ ভ্রূণের সূক্ষ্ম সত্তা। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, "প্রভু ওকে আর বঞ্চিত করো না।" তিনি হয়তো আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। কমলার মেয়ে হোল। আবার সে তার পুরোনো হাসি ফিরিয়ে পেল। মেয়েকে মানুষ করতে লাগলো বহু প্রয়াসে।

কিন্তু এ খুকীও বাঁচলো না। তার এই পৃথিবীর আবহাওয়াটা সইল না। এ কথা আমি আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে আরও বলেছি যে কমলা তার শোক ভুলে আবার আমাদের শানির পানে ফিরে তাকাল, আবার তার বুকে আঘাত লাগলো। সে দু'হাত বিস্তার করে শানির দিকে ছুটে এল। আমার স্ত্রী ভাবতে লাগলো এর হাত থেকে রেহাই পাবার কথা। অগত্যা আমাকে বাড়ি বদল করবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো খুবই। যেহেতু আমি ওসব অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করি না—সেই জন্যে আমি তার কথা উপেক্ষা করেছিলুম।

যাই হোক, কমলা একদিন জিজ্ঞেস করলে, "শানি কই ভাই ?"

আমার স্ত্রী আজকাল বড় একটা শানিকে কমলার সামনে বার করে না। শানি তখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার স্ত্রী বললে, "শানির অসুখ করেছে।"

আমি পাশেই চেয়ারে বসেছিলাম। স্ত্রীর এই মিথ্যা কথা শুনে চমকে গেলুম। কমলা ভয়ার্ত্ত স্বরে বল্লে, "কি অসুখ ভাই ?"

"এই সামান্য জ্বর।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছো ?"

"না। দেখাবো।"

"না ভাই দেরি কোরো না একটুও। ভালো ডাক্তার দেখাও। যে দিনকাল পড়েছে। ফেলে রাখা একটুও উচিত নয়।"

ও চলে গেল। ওর গলার স্বর ঈষৎ কম্পিত হোল—আমি বেশ বুঝতে পারলুম। আমি স্ত্রীকে বল্লুম, "এ মিথ্যে বলে কি লাভ ?"

"তুমি থামো দিকি।" সুতরাং আমি নীরব হই আর স্ত্রী বলে চলে, "পঞ্চাশ দিন বলছি বাড়ি বদল কর, বাড়ি বদল কর। সে কথা যদি গ্রাহ্য হয়।"

তার পরের দিন দুপুর বেলা কমলা নাকি এসেছিল শানিকে দেখতে। শানির অসুখের খবর পেয়ে সে চুপ করে থাকতে পারেনি। সারাদিন সে খুকীকে কোলে করে ছিল, আমার স্ত্রীর সমস্ত বিপরীত চেষ্টা ব্যর্থ করে। আমি আসবার ঘণ্টা তিনেক আগে এখান থেকে চলে গেছে। আমি অফিস থেকে ফিরে বিজুকে আর শানিকে ঐ অবস্থায় দেখলুম। বিজু বললে, "কি ছাই বেদানা খাইয়ে গেল ! তারপর থেকে বাছা আমার কিছু মুখে করছে না।"

আমি বিজুর পানে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। সে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে করুণ সুরে বললে, "তুমি আজই বাড়ি বদল কর। নয় আমার বাপের বাড়ি রেখে এসো। ও রাক্ষুসী আবার কালই আসবে বলে গেছে।"

আমার কানের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে, ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই। সব কিছু নিথর নিস্তব্ধ। আমি বিচার করতে বসলুম। শানির অসুখের জন্যে বাস্তবিক দায়ী কে? কমলা না আমার স্ত্রী? মিথ্যা একজনের বুকে আঘাত করলে, বিধাতার বিচারালয়ে তার কি কোন শাস্তি নাই? বিধির বিধান কি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র? এমন অন্ধকারে নীড় হারিয়ে একটা কাক কা-কা-কা রবে ডেকে উঠলো। আমি শানির গায়ে কপালে হাত বুলাতে লাগলুম। আমার বেশ মনে পড়লো ক'দিন ধরে শানির অনবরত টক লেবু খাওয়ার কথা। শানির রোগের কারণ দিনের আলোয় প্রকাশিত হোল। ঐ কচি মেয়ে অত অ্যাসিড সহ্য করতে পারে? ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছাদের ওপর একটি বিড়াল করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলো। সম্প্রতি তার একটি সন্তান মারা গেছে। আমার স্ত্রী চমকে উঠে আমায় অনুরোধ করলে, "আগে বেড়ালটাকে দূর করে এস—আগে ওকে দূর করে দাও।"

আমি তার অনুরোধ শুনলুম না। বিজু কাঁদলো ফুলে ফুলে, "তবে আমায় দূর করে দাও। আমি পথের ধুলো—আমি কেউ নয়—আমায় গ্রাহ্য হয় না একটুও!"

একটু সুস্থ হয়ে শানিকে ডাক্তারবাড়ি নিয়ে গেলুম। ডাক্তার এক ডোজ ওষুধ দিলে। সেটা খাইয়ে দিলুম যথাসময়ে। বিজু সারারাত্রি মেয়েকে বুকে করে নিয়ে রইলো, আর আমার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ প্রকাশ করলে, "বললুম, পীরের কাছ থেকে জলপড়া নিয়ে এস। তা হোল না। ডাক্তার-বদ্যি কি এসব সারাতে পারে?"

কিন্তু বিজুর কথাই মিথ্যা হোল। ডাক্তার আশ্চর্য্য রকমে শানিকে নিরাময় করলে। সকাল বেলা শানি আবার তার সহজ সরল পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেল। আবার সে খেতে লাগলো, হাসতে লাগলো। অফিস যাবার সময় বিজুকে বললুম, "ডাইনীর হাত থেকে যখন শানি রেহাই পেল তখন কমলাকে ক্ষমা করো।"

বিজুর যেন অসহ্য হোল আমার কথা, বললে, "মাইরি বলছি, তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কালকের মধ্যে যদি না বাড়ি বদলাও, তা'হলে সত্যি সত্যি আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো।"

অগত্যা সেই শনিবার দিনই রাত্রে বাড়ি ঠিক করে ফিরলুম। পরের দিন জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেলুম নতুন বাসায়। পরের জন্যে—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সংসারের শান্তি নষ্ট করতে আমি নারাজ।

বুধীর বাড়ি ফেরা

ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে বুধী জাগিয়া উঠিল।

সে একটু ঘুমাইয়াছিল কি? হয়তো তার খেয়াল নাই।

এ কোন্ ভীষণ জায়গায় তাহাকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে? চারিদিকে বিশ্রী ইঁটের দেওয়াল ও ময়লা···ময়লা···অপরিষ্কার মেঝে। একটু আলো বা হাওয়া আসিবার উপায় নাই। আর কি ভিড়! এত ভিড়, এত ঠাসাঠাসি বুধীর জীবনে কখনো দেখে নাই—এত

ভিড়ে আর এই গুমট গরমে প্রাণ যে তার বাহির হইয়া গেল! এত ভিড়ে, এই ঠাসাঠাসির মধ্যে কি ঘুম হয়?

নতুন নতুন অপরিচিত মুখ। কাহাকেও সে দেখে নাই…নিষ্ঠুর, লোভার্ত্ত মুখ, বুধী দেখিলেই বুঝিতে পারে…বুঝিতে পারিয়া বুধীর গা শিহরিয়া ওঠে…মনে যে কি দুঃখ আর অশ্বস্তি বোধ হয়।

সে বেশ বোঝে এখানে কেহ তাহাকে ভালবাসে না, যেমন সেই ছোট খুকী তাহাকে ভালবাসিত, যত্ন করিয়া খাওয়াইত, গলা ধরিয়া কত আদরের কথা বলিত।…কোথায় গেল ছোট খুকীটা? কেন তাহাকে এখানে আনা হইয়াছে। কেন আনা হইয়াছে তাহা সে বুঝিতেই পারে না। কেবল সে এইটুকু জানে কতদিন ধরিয়া দীর্ঘ, কঠিন পথ বাহিয়া তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে—সঙ্গে বহু সঙ্গী ছিল, কিন্তু অপরিচিত, কারো সঙ্গে বুধীর আলাপ হয় নাই তেমন, আলাপ করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না।

কেহ যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়ায় নাই। এখানকার খাবার মুখে দেবার উপায় নাই। কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ, ভাল আস্বাদ তো নাই-ই ভাল গন্ধ পর্য্যন্ত নাই খাবারের। বুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। হয়তো সে ছোট খুকীর মত ভালবাসিত না অতটা—কিন্তু সন্ধ্যার সময় পেট পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে কখনও ত্রুটি করে নাই।

সত্যি, এ যে কোন্ জায়গায় আসিয়াছে, তাহার আদৌ কোনো ধারণাই নাই। এমন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জায়গা তার অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল এত দিন। কি হট্টগোল, নানারকম নতুন নতুন বিকট বিকট শব্দ জায়গাটাতে! তাহার মন আরও পাগল হইয়া উঠিল এ শব্দে ও আওয়াজে। জীবনে কখনো এত অদ্ভুত ধরনের সব আওয়াজ সে শুনে নাই। অথচ তাহার বয়স কম হয় নাই। বুধীর জীবন কাটিয়াছে এই বিশ্রী জায়গা হইতে বহু দূরে। কত দূর তাহার ঠিক ধারণা নাই, কিন্তু মোটের ওপর বহু বহু দূরে অন্য এক স্থানে, যেখানে অবারিত সবুজ মাঠ আছে, অপূর্ব্ব সুঘ্রাণে ভরা কোমল সরস ঘাসে ঢাকা। কি সুন্দর স্বাদ সে ঘাসের! মাঠের ধারে কলস্বনা নদী, নদীর কিনারায় জলের ধার পর্য্যন্ত নানা জাতীয় ঘাসের ও জলজ শাকের বন—ঠাণ্ডা, নরম, তাজা—কি অপূর্ব্ব তাদের সুগন্ধ। স্বাদ তো আছেই ভাল কিন্তু সেই নতুন-ওঠা বর্ষা-সতেজ কচি ঘাস ও কলমীলতার তাজা গন্ধের কথা যখনই মনে হয় তখন মনে পড়ে এক হাঁটু দীর্ঘ, ঘনশ্যাম তৃণরাজির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া পেট ভরিয়া সে তৃপ্তির ভোজ—হু হু উন্মুক্ত বাতাস ও দূরপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে সে মুক্তির আনন্দ—তখন বুধী সত্যই ক্ষেপিয়া যায়—তাহার জ্ঞান থাকে না। মুক্তির জন্য সে উন্মাদ হইয়া উঠে। জীবনের বহুদিন সেখানে সে কাটাইয়াছে। বহুদিন। কত দিন তাহা সে জানে না। বয়স তো তার কম হয় নাই… প্রথম জীবনের কথা প্রায় কিছুই তাহার মনে নাই—যা একটু আধটু মনে পড়ে—সব আবছায়া ধোঁয়া—কেবল খুব বড় বড় সবুজ মাঠ, তলায় ফল-বিছিয়ে-থাকা বড় বড় গাছ, স্রূপের শীতল স্রোতের জল, সাঁজালের ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ-ভরা আবাসস্থান, এই সব মনে পড়ে।

আজকাল কিন্তু বেশী করিয়া মনে পড়ে, ছোট খুকীর কথা—খুকী তাহাকে সত্যই ভালবাসিত।

এটা কোন্ জায়গা? এক একবার বুধীর মনে হয় হয়তো বা এটা পাউণ্ড ঘর। কিন্তু বুধী জীবনে তো কতবার পাউণ্ড ঘরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে—এ ধরনের পাউণ্ড ঘর তো দেখে নাই! সেখানে তো বাঁশের বেড়া ঘেরা খোলা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইয়াছে,

মাথার ওপর সেখানে নীল আকাশ, সবুজ গাছপালাও চোখে পড়ে, পাখীর ডাকও শুনা যায়—এমন বিশ্রী আওয়াজ তো সে সব জায়গায় শুনে নাই। এমন কঠিন ইঁটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা নয় সে জায়গা।

পাখীর কথায় বুধীর মনে পড়িল অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা। কতদিন আগে তাহা সে বলিতে পারিবে না। মাঠের ধারে সে ঘাস খাইতেছিল; একটা কি পাখী বনের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার শিংএর উপর বসিল। শিংএর উপর পাখী বসা সে পছন্দ করে না—সুতরাং শিং নাড়া দিতেই পাখীটা উড়িয়া বসিল তাহারই সামনেকার উলুঘাসে ভরা বাচড়ার উপর। তখন উলুঘাসের শীষ গজাইয়াছে, শীষের মাথায় সাদা সাদা ফুল অজস্র অজস্র। পাখীটা সেই উলুফুলের মধ্যে বসিয়া পালক ফুলাইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। কি সুন্দর গায়ের রং, কি নরম নরম রঙীন পালকের বোঝা তার গায়ে, কেমন রঙীন ঠোঁটখানি।

বুধীর মন সুন্দর পাখীটার প্রতি ভালবাসায় ভরিয়া গেল। সুতরাং খানিকটা পরেই যখন পাখীটা আবার তার শিংএর উপর চড়িয়া বসিল, এবার সে শিং নাড়া দিল না। এই রকম করিয়া পাখীটার সঙ্গে তার ভাব জমিয়া গেল। পাখীটার ভাষা ছিল তার শিংএর উপর চটুল পা দুইখানির নাচুনি—কত নির্জ্জন রৌদ্রভরা দুপুরে বুধী হয়ত মাঠে দাঁড়াইয়া উত্তাপে ও তৃষ্ণায় ঝিমাইতেছে—অমনি ছোট্ট পাখীটা নিকটবর্ত্তী বনভূমি হইতে উড়িয়া তাহার শিংএ আসিয়া বসিত। বুধীর নিঃসঙ্গতা অমনি দূর হইয়া যাইত—তাহাদের কত কথা কত গল্প চলিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—তারপর নামিত অন্ধকার। বুড়ী আসিয়া খোঁটা উপড়াইয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইত—পাখী যাইত উড়িয়া। একদিন সেই মাঠে ফাঁদ পাতিয়া কাহারা পাখী ধরিতে আসিল। পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বন্য পাখীটা খাঁচার নিকটে যাইতেই ফাঁদে পড়িয়া গেল। শিকারীরা তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে ছোট পাখীটার কি করুণ আর্ত্তনাদ।

মাঝে মাঝে বুধীর সন্তান হইত। বেশ ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ছুটিয়া, লাফাইয়া, নাচিয়া বেড়াইত সারা মাঠ। প্রথম প্রথম তাহাদের বড় ভাল লাগিত কিন্তু বড় হইয়া গেলে তাহারা কোথায় চলিয়া যাইত—তাহাদের কথা বুধীর আর বড় একটা মনে পড়িত না।

…কত কথাই মনে হয়। এই বিকট আওয়াজে ভরা নোংরা, কুশ্রী ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা এই জায়গাটা—আজ ক'দিন আসিয়া সে মরিয়া যাইতেছে…আর একটা ব্যাপার…

বুধী রক্তের গন্ধ পায় কেন এখানে! সন্দেহের সহিত সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, কিছু টের পায় নাই, তবে দূর হইতে রক্তের গন্ধ ভাসিয়া আসে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে।

প্রথম প্রথম তাহার মনে হইত—এও এক রকমের পাউণ্ড ঘর—একদিন বুড়ীর ছেলে আসিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে। কিন্তু পাউণ্ড ঘরের অভিজ্ঞতা হইতে বুধী জানে যে, সেখানে একদিন বা বড় জোর দু'দিন থাকিতে হয়—তার পরেই বুড়ীর ছেলে আসিত দড়ি হাতে তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতে। আর এখানে আসিয়াছে আজ পাঁচ-ছ'দিন কি তারও বেশী। না—এ পাউণ্ড ঘর নয়, তার চেয়েও গুরুতর বিপদে এবার সে পড়িয়াছে।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আর একটা জিনিস বুধী লক্ষ্য করিয়াছে আজ ক'দিন। প্রতিদিন বৈকালে দু'জন লোক আসিয়া এই গরুর ভিড়ের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গরুর গায়ে কি কি ছাপ মারিয়া যায়—পরদিন শেষ রাত্রের দিকে সেই গরুগুলিকে কোথায় যেন লইয়া যায়—তারা আর ফেরে না।

কেন ফেরে না, কোথায় যায় তারা?

আর ঐ রক্তের গন্ধটা···তাজা রক্তের গন্ধ। যেদিন বাতাস ওই কোণ হইতে বয়, সেদিন রক্তের গন্ধটা আসে। ভয়ে সন্দেহে বুধীর বুক উড়িয়া যায়। সাথী ছোট খুকী···কতদিন তোমাদের সাথে দেখা হয় নাই, বন্ধু হিসাবে আসিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো। এমন বিপদে জীবনে কখনো সে পড়ে নাই।

এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া বুধীর রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। এদিকে সকাল বেলা হইতেই চারিধারে বিকট আওয়াজ শুরু হইল। বুধীর সঙ্গেই একটি অল্পবয়স্ক প্রতিবেশী আজ কয়েক দিন ধরিয়া আছে, প্রথম প্রথম বুধী তাকে পছন্দ করিত না। সে যেন একটু বেশী চাল দেখাইতে চায়—বুধী পাড়াগেঁয়ে বলিয়া যেন তাহাকে আমল দিতেই চাহিত না। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর নির্ব্বান্ধব স্থানে চাল কদিন খাটে? শীঘ্রই তাহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীটিকে সমস্ত চাল বিসর্জ্জন দিতে হইল।

একদিন বুধী দেখিল সে কাঁদিতেছে!

বুধীর মনে কষ্ট হইল। আহা ছেলেমানুষ! তাহার প্রথম সন্তান এতদিন ওই বয়সের হইয়াছে—বড় হইলে বুধী তাহাকে আর দেখে নাই! কে জানে কোথায় গিয়াছে! বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে?

সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বুধীর ইচ্ছা হইল সঙ্গীটির সে গা চাটে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তারের বেড়া। বুধী তবুও তাহাকে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দিয়াছিল সেদিন। ছেলেমানুষ, বেশ নধর গড়ন, তবুও এই ভয়ানক স্থানে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া রোগা হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে দু'জনে বেশ ভাব। আজ সকালে উঠিয়া বুধী তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে আবার খাইতেছে। ছেলেমানুষ, খাইবার লোভই বেশী।

খাওয়া শেষ করিয়া তাহার তরুণ বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—হাম্বা-আ-আ।

বুধী বলিল—চুপ করো। ছি, মন খারাপ ক'রো না। কিন্তু তাহার নিজের মন দিয়া তো বুঝিতেছে, কি দারুণ অশান্তিতে কাটিতেছে এখানে, তবুও ছেলেমানুষকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও ভালো।

বুধী বলিল—খাও খাও। যা পড়ে আছে, ও দুটি খেয়ে ফেল। এমন সময়ে দুজন যমদূতের মত লোক তাহাদের কাঠরায় ঢুকিল। বুধীদের কাঠরায় তাহারা প্রায় জন কুড়ি আছে। এই কুড়ি জনের অধিকাংশই প্রৌঢ়বয়স্ক। একজন তো আছে, বৃদ্ধের দলে তাকে অনায়াসেই ফেলা চলে।

এদের মধ্যে বুধীর বন্ধুটি অল্পবয়স্ক এবং বেশ নধর দেখিতে। যমদূতের মত লোক দু'টি তাহার গায়ে কি একটা ছাপ মারিয়া চলিয়া গেল—কাঠরায় আরও দু'টি প্রৌঢ় সঙ্গীর গায়েও তাহারা ছাপ দিল। একটু পরে দু'জন লোক আসিয়া কাঠরায় ঢুকিল এবং ছাপমারা সঙ্গীগুলিকে দড়ি খুলিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল।

সকাল গড়াইয়া দুপুর, দুপুর গড়াইয়া বৈকাল হইয়াছে। বুধীর তরুণ বন্ধু ফিরিল না। ছাপ-মারা সঙ্গীদের কেহই ফিরিল না। বুধীর মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল—সেই সঙ্গে কি একটা অজানা ভয়ে ওর গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। সেই রক্তের গন্ধ···টাটকা তাজা রক্তের গন্ধ··· এখানে কোণাকুণি হাওয়া বহিলেই যেটা পাওয়া যায়—সেই গন্ধের কথা হঠাৎ মনে আসিতেই ভয়ে আতঙ্কে বুধীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে মরীয়া হইয়া সে গলার দড়িতে এক হেঁচকা টান মারিতেই সেটা গেল ছিঁড়িয়া।

বুধী উন্মাদের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। কাঠরায় ঢুকিবার কাঠের মোটা গরাদে বসানো নীচু ফটকাটা বন্ধ। নিকটে কেহ কোথাও নাই! পাড়াগাঁয়ে সে 'মানুষ', উঁচু-উঁচু বাঁশের বেড়া টপ্‌কানো তার আজীবন অভ্যাস—এক লাফে ফটকটা ডিঙাইয়া সে কাঠরার বাহিরে আসিল। তারপর বড় উঠান পার হইয়া বড় ফটকের নিকট পৌঁছিল—সেটাও খোলা। সে ছুটিতে ছুটিতে বড় ফটকটাও পার হইয়া গেল।

পরবর্তী পনের মিনিটের কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে নাই—চওড়া রাস্তা—লোকের ভিড় —বড় বড় এক ধরনের গাড়ি রাস্তা দিয়া ছুটিতেছে—বড় বড় বাড়ি,—একটা খাল—একটা পুল —আরও লোকজন—একজোড়া মহিষ—সেই বিকট আওয়াজ সর্ব্বত্র—দিশাহারার মত ছুটিতে ছুটিতে বুধী রাস্তার পর রাস্তা পার হইতে লাগিল—কত রাস্তা! এদেশে রাস্তার কি শেষ নাই? আবার বাড়িঘর—আবার রাস্তা—দু'দুবার সে গাড়ি চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল! আবার বড় একটা পুল—দূরে রেলগাড়ি যাইতেছে—রেলগাড়ি সে চেনে—তাহাদের গ্রামে দক্ষিণ মাঠে ট্যাংরার ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়া বাঁধা উঁচু সড়ক বাহিয়া রেলগাড়ি যায়।

এখানে উপরে রেলরাস্তা—নীচে দিয়া রাস্তা—ছুটিয়া পুলের তলা দিয়া সে রেলরাস্তাও পার হইল।—আবার দৌড়। দৌড়! বৃদ্ধ শরীর, সে হাঁপাইয়া পড়িল। যখন তাহার দিশেহারা ভাবটা কাটিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সে দেখিল একটা জলার ধারে খুব বড় মাঠের মধ্যে সে একা দাঁড়াইয়া। সামনের প্রকাণ্ড জলাটি কচুরিপানায় বোঝাই, সেখান দিয়া পথ বন্ধ। আর ভিড় নাই, রাস্তার গোলকধাঁধা নাই, গাড়ির ঘড় ঘড় আওয়াজ নাই। এখানে অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশ দেখা যাইতেছে—হু হু হাওয়া বহিতেছে জলার দিক হইতে···যেন তাহাদের গ্রামের নদীর ধারের মাঠের মত।

মুক্ত! মুক্ত! সে মুক্ত!

তবু নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিল না—স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারিল না। কি জানি যদি লোকজন আসিয়া আবার তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পাঁচিল-ঘেরা বড় বাড়িটায় পুরিয়া রাখে!

বহু ঘুরিয়া পরে সে ক্লান্ত হইয়া একটা গাছতলায় রাত্রির জন্য আশ্রয় লইল। সে শুইয়া পড়িল একেবারে—কোনদিকে লোক নাই, তবু সে ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ভোর হইয়াছে। সে চলিতে আরম্ভ করিল। দুপুর পর্য্যন্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক কতদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ তাহার মনে হইল দূরে যে বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে,—যার দু'ধারে বড় বড় গাছের ছায়া—ওই রাস্তা সে ইতিপূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছে!

সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে তাহার মনে পড়িল—অদ্ভুতভাবে পুরানো স্মৃতিটা মনে পড়িল হঠাৎ!

ওই রাস্তাটা দিয়াই তাহাদের একটা বড় দলের সঙ্গে সে আসিয়াছিল মাসখানেক আগে! সেই রাস্তাটা!

বুধী ছুটিয়া গিয়া বড় রাস্তাটার উঠিল। হাঁ, ঠিক চিনিতে পারিয়াছে, সেই রাস্তাটাই তো! কোনো ভুল নাই। সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—মুক্তি মিথ্যা, এত প্রচুর নরম কচি ঘাস মিথ্যা, নীল আকাশের তলায় বড় বড় মাঠের নিরঙ্কুশ, নিরাপদ নির্জ্জনতা আর হু-হু উন্মুক্ত হাওয়া সব মিথ্যা—যদি সে তাহার আজন্ম সুপরিচিত সেই গ্রামটিতে না ফিরিতে পারে, ছোট্ট খুকীর দুটি ছোট্ট স্নেহ-হস্তের স্পর্শ পুনরায় সে না পায়।

জীবনপণ—বুধী যে করিয়াই হউক, তাহার গ্রামে তাহার খুকীর কাছে ফিরিয়া যাইবেই।

একটা পথ-চল্‌তি গরুর গাড়ি হইতে একটা বিচুলির আঁটি পড়িয়া গেল—বুধী গিয়া সেটা মুখে তুলিয়া লইল। শুধুই একঘেয়ে সবুজ ঘাস খাইতে কি মুখে লাগে? মাঝে মাঝে এই ধরণের সুখাদ্য খাইয়া মুখ বদলাইয়া লইতে হয় বৈকি! তারপর বুধী সোজা রাস্তা বহিয়া চলিল —একদিন, দু'দিন, তিনদিন। খাদ্যের ভাবনা নাই—দু'ধারে মাঠ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, নব-বর্ষায় সুন্দর নিবিড় সবুজ ঘাসে ও আউশ ধানের জাওলায়। আমন ধান আজও রোয়া হয় নাই। জলেরও নাই অভাব, রাস্তার দু'দিকের খানায় প্রচুর টাটকা বৃষ্টির জল।

যাইতে যাইতে একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। একটা গাছতলায় দুপুর বেলা সে বিশ্রাম করিতেছে—একটা ছেলে আসিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া চলিল হঠাৎ। বুধী তো অবাক!

ছেলেটি তাহাকে একটি গ্রামের মধ্যে একটি খড়ের ঘরে—সেখানে লইয়া গিয়া খুঁটির গায়ে বাঁধিল। বাড়িতে তখন কেহ নাই—ছেলেটিও কোথায় চলিয়া গেল। বুধী লক্ষ্য করিল একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে কি বকিতেছে আর দুলিতেছে। বাড়ির উঠানে একটি খেজুর গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, বাড়ির পেছনে একটা ডোবা। একটু পরে একটা বৌ ডোবা হইতে একরাশ বাসন মাজিয়া আনিয়া দাওয়ার এক কোণে নামাইয়া বৃদ্ধাকে বলিল—তুমি একটু চুপ করবে কি না সকালবেলা, আমি জিগ্যেস্ করি। বাড়ির সবাই পাগল, পাগলা গারদের মধ্যে থেকে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, আর পারিনে বাবু, মরণ হোলেও বাঁচতাম! ফের তুমি যদি ওরকম বকবে মা, তবে হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে পড়ে, ভাতের পিণ্ডি কে খেতে দেয় দেখবো এখন আজগে! এই সময় বুধীর দিকে নজর পড়িতে বৌটি বলিল—ছেলেটা বুঝি গরুটা এনেচে তা হোলে! বাবা! কাল থেকে কি কম খোশামোদটা করচি ওকে? গরুটা হারালো, খ্যাখ কোথাও কেউ পণ্টে পাঠালে, কি কেউ বেঁধে রাখলে—তা আমার কথা কি কেউ—গরুটারও হাল হয়েচে খ্যাখো—

কথা বলিতে বলিতে তাহার সামনে আসিয়া বৌটি বলিয়া উঠিল—এ তো আমাদের নয়! ···কার আবার পরের গরু ধরে এনেচে খ্যাখো! নাঃ, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি নে—এ যেন মনে হচ্চে ও পাড়ার ভুবনের মার গরু—মাগী এসে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এখন, যদি টের পায়—

বৌটি তার গলার দড়ি খুলিয়া তাহাকে কিছু দূর তাড়াইয়া উঠানের বাহির করিয়া দিল —সম্ভবতঃ এই জন্য যে, ভুবনের মা এখন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গরু যে এখানেই বাঁধা ছিল, ইহার কোন চিহ্ন না পায়।

গ্রামের বাহিরে এক জায়গায় প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ। গাছের তলায় সে একটু দাঁড়াইল। চারিদিকে মাঠ, কচি কচি আউশের জাওলায় মাঠ ঘন সবুজ, বুধীর ভয়ানক লোভ হইল, মাঠে নামিয়া সে ধান-গাছ খায়—কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, যদি এখানে পাউণ্ড-ঘরে দেয়—তবে কে আসিয়া পয়সা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে? না—সে কোথাও আর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। উঃ, বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, এখনও সেই বড় বাড়ি, সেই উঁচু পাঁচিল, সেই গরাদওয়ালা কাঠরা, সেই বিশ্রী আওয়াজ—সকলের ওপর, সেই রক্তের গন্ধের কথা মনে উঠিল···!

মুক্তির আনন্দ আজ নবযৌবনের সঞ্চার করিয়াছে বুধীর দেহে—সে ভুলিয়া গিয়াছে তাহার বয়েস আঠারো-উনিশের কম নয়—সে প্রৌঢ়, সাত-আটটি সন্তানের জননী, তার ওপরে গত

পনর-কুড়ি দিনের উদ্বেগে, কষ্টে, উপবাসে শীর্ণদেহা…তার স্নায়ুতন্ত্রীও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—তার মনে বল নাই…শরীরে সামর্থ্য নাই…

কিন্তু উদার নীল আকাশে প্রভাতের সূর্য্য উঠিয়াছে, যেমন উঠিত তাহার জন্মভূমিতে, পাখীরা কলধ্বনি করিতেছে, যেমন করিত তাহাদের নদীর ধারের মাঠের অনেক দিনের সেই পক্ষী বন্ধুটি, বাঁশতলায় প্রথম বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া পিপুল লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে, অনন্তমূলের চারা বাহির হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে 'বৌ-কথা-কও' পাখীর সেই সুন্দর আবাল্য পরিচিত ডাক…সম্মুখে অনেক দূরে কোথায় তাহাদের গ্রামখানি, ছোট্ট নদীটা—সুগন্ধি অনন্তমূলের কচি পাতার কি চমৎকার আস্বাদ!…এই তো জীবনকে সে আবার খুঁজিয়া পাইয়াছে…কত কালের পরে মুক্তি আসিয়াছে…এখন মরিলেও তার দুঃখ নাই—শিয়াল শকুনে তার জীর্ণ দেহটা খাইয়া ফেলিলেও দুঃখ নাই—তবে ছোট্ট খুকীটাকে একবার দেখিয়া সে মরিবে—

আবার সে রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিল—এই মাঠের ধারেই একদিন তাহার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে, এই গাছতলার রাত্রে শুইয়াছিল বটে। যাহারা তাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, এই গাছতলাতেই তাহারা রাত্রে রাঁধিয়া খাইয়াছিল।

আবার পথ…চলিয়াছে; চলিয়াছে…পথের শেষ নাই—প্রভাত দুপুরে পরিণত হইল—দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল। ক্ষুধা পাইয়াছিল, এক জায়গায় পথের ধারে ছোট বিল—বিলের ধারে ভারী চমৎকার সবুজ ঘাস! বুধীর লোভ হইল—সে রাস্তা হইতে নামিয়া বিলের ধারে গেল—নরম কচি ঘাসে মুখ ডুবাইয়া সে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

বিলের ধারে আরও কয়েকটি গরু চরিতেছিল।

একজন বলিল—এ বুড়ী কোত্থেকে এসে জুটলো হে? একে তো চিনিনে!

আর একজন বলিল—চেহারা দেখ না—যেন কসাইখানার ফেরতা! হাড়-পাঁজরা গুনে নেওয়া যাচ্চে! মরি মরি, কি যে রূপ! বলি, ওগো, তোমার বাড়ি কোথায়?

ইহারা বুধীর সন্তানের বয়সী, ইহাদের ফাজলামি তাহার ভাল লাগিল না। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে আপন মনে ঘাস খাইতে লাগিল। নিজের মান নিজের কাছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। বেয়াদব ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল—বলি, কথা বল্‌চো না কেন বুড়ী? কসাইখানা থেকে পালিয়ে আসচো নাকি? এমনা চেহারা কেন? হঠাৎ বুধীর ভয় হইল। কসাইখানা কি জিনিস? পলাইয়া তো আসিয়াছেই বটে—আর সে সেখানে দাঁড়ানো নিরাপদ মনে করিল না। লোভনীয় কচি ঘাসগুলি ফেলিয়া ছুট দিয়া রাস্তার ওপর আসিয়া উঠিল।

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আরে বাবা, কোথাকার অসভ্য জানোয়ার! ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে হয় তাও জানে না?

চলিতে চলিতে একদিন বুধী কি করিয়া বুঝিতে পারিল সে ভুল পথে চলিতেছে। এ রাস্তা বাহিয়া এতদূর সে আসে নাই। মাঠের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা কোথা দিয়া যেন নামিয়া গিয়াছিল—সেই মেটে রাস্তা দিয়া আসিয়া সেবার তাহাদের দল উঠিয়াছিল বড় রাস্তাটায়। বুধী ঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, কোথায় সেই মেটে রাস্তা বড় রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সম্মুখে একটা নদী পড়িল। এ নদী সে দেখে নাই। সে পথ ভুল করিয়াছে।

সে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল—মাঠের মাঝখান বাহিয়া কত সরু সরু রাস্তাই চলিয়াছে—এর একটাও পূর্ব্ব পরিচিত নয়। কতকগুলি গন্ধ ও কতকগুলি বিশেষ ছবি বুধীর মনে আছে

সেই আগের রাস্তাটা সম্পর্কে। সে ছবি ও গন্ধের সঙ্গে এ রাস্তা খাপ খাইতেছে না। একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সে ক্রমে আসিয়া পড়িল। দিশাহারা হইয়া গিয়াছে সে। আর কোন কিছুরই ঠিক নাই তার। এসব জায়গায় কখনও সে আসে নাই, এসব পথে হাঁটে নাই।

মাঠের মধ্য দিয়া অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিতে চলিতে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া পাশের দিকে চাহিল। একটা মস্ত বড় কাল্‌কেউটে ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। ছোবল মারিবার দেরি চক্ষের পলক মাত্র—বুধী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎবেগে পিছু হাটিয়া আসিল—পরক্ষণেই দৌড় দিল খানা, ডোবা, পগার ভাঙিয়া। কেউটেটা কিছুদূর তাহার পিছু পিছু আসিয়া একটা কাঁটাঝোপে আটকাইয়া থামিয়া গেল।

কাঁটাঝোপের ওপাশেই ছোট্ট ডোবাতে দু'টি ছেলে মেয়ে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। বুধী হুট্-পাট্ করিয়া তাহাদের সামনে গিয়া পড়িতেই তাহারা ভয়ে ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বুধী মানুষ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল অনেক আগেই। সাপটা দেখা যায় না পিছনে, চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

মেয়েটি ছেলেটির হাত চাপিয়া ধরিয়া বড় বড় ভয়ার্ত্ত চোখে বুধীর দিকে চাহিয়া বলিল—ও দাদা, গুঁতিয়ে দেবে—কাদের গরু।

আহা, তাদের গ্রামের তার সেই খুকীটির মত। স্নেহে বুধীর মন গলিয়া গেল। বুধী বলিতে চাহিল—গুঁতিয়ে দেবো কেন, খুকী—সোনা আমার, মানিক আমার—আমি কিছু বোলবো না—ভয় কি? ধরো, তোমরা মাছ ধরো।

ছেলেটি ছিপ উঁচাইয়া মারিবার ভঙ্গিতে বলিল—যাঃ বেরো—যাঃ—এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো আবার—যাঃ যাঃ—

বুধীর ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ওদের মাছ ধরা দেখে—খুকীটাকে দেখে। কিন্তু খুকীর দাদা ছিপ গুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মারিবে বোধ হয়। সেখান হইতে সে সরিয়া পড়িল।

নিকটে একটা গ্রাম। কাহাদের বাড়ির উঠানে প্রকাণ্ড এক বিচালির গাদা। উঠানে বড় বড় নাদায় কতকগুলি গরু খোল-মাখা বিচালি ও ভুষির জাব্ খাইতেছে। প্রকাণ্ড নাদাগুলি হইতে উত্থিত সুমিষ্ট খোলের গন্ধে বুধীর জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। শুধু ঘাস আর জল, জল আর ঘাস···সেখানে সেই বড় বাড়িটাতে বন্দীশালায় থাকিবার সময় শুক্‌নো বিচালি খাইয়া মরিয়াছে কতদিন।

খোল মাখানো জাব্, কতকাল সে যে খায় নাই!

বুধীর বড় লোভ হইল—সে দেখিল একটা ছোট নাদায় দুটি বাছুর জাব্ খাইতেছে। এই তাহার সুযোগ—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—উঠানটাতে লোক নাই—অন্ধকারও বেশ ঘন। বুধী চট্ করিয়া বাছুরের পাশে আসিয়া নাদাটাতে মুখ ডুবাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আঃ, কতকাল পরে খোল-মাখা জাবের আস্বাদ আবার সে পাইল!···

ছোট বাছুরটা বিস্মিত ও ভীত হইয়া ডাকিল—মা—আ—আ। কে এসে খাচ্ছে দেখ—

কিছু দূরের নাদাটা হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মা বুধীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—কে রে? দূর হ—দূর হ—আপদ—

কথা শেষ করিয়াই বাছুরের মা শিং নাড়া দিয়া বুধীকে গুঁতাইতে আসিল। বুধী তখন মাত্র কয়েক গ্রাস খাইয়াছে—ভয়ে সে খাওয়া ফেলিয়া দৌড় দিল।

একটা বড় গরু বলিয়া উঠিল—আস্পর্দ্ধা ভাখো না ভিখিরীটার!···

বুধী বড় অপমান বোধ করিল। জগৎটা যে এত খারাপ তাহা সে আগে জানিত না।

এতটুকু সহানুভূতি সে স্বজাতীয়ের কাছে আশা করিতে পারে না? আবার ভিখিরী বলিয়া অপমান করা? গ্রামের বাহিরে আসিয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে জগৎ কি নিষ্ঠুর! তখন অন্ধকার খুব ঘন হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গাছতলার মধ্যে জোনাকী জ্বলিতেছে। মশায় খাইয়া ফেলিয়া দেয় বলিয়া বুধী এই সব গাছতলায় শুইতে পারে না যেখানে সেখানে। সারা-দিনের পরিশ্রমে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। বরাবর তাহার সাঁজালের ধোঁয়ায় শোয়ার অভ্যাস। এই সময়ে প্রতিদিন মনে পড়ে তাহার আবাল্য পরিচিত নিজস্ব গোহাল ঘরটির কথা। তাহার ক্ষুদ্র জগতের কেন্দ্র সেখানে। সেই তাহার গৃহ। আজ তারই অভাবে সে গৃহহীন, ছন্নছাড়া হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে। আর কখনো কি সেখানে ক্লান্ত শরীরকে এলাইয়া দিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিবে?

গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে তবুও মশা অনেক কম। এইখানেই একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বুধী শুইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাঠের মধ্যে ফেউ ডাকিতেছে। বাঘ বাহির হইলেই ফেউ ডাকে, বুধীর জানা আছে। ভয়ে তাহার শরীর অবশ হইয়া গেল—সর্ব্বনাশ! যদি বাঘ আসিয়া পড়ে? যদি তাহাকে দেখিতে পায়? সারারাত দূরে দূরে ফেউ ডাকিল। বুধীর ঘুম হইল'না। একবার ভাবিল গাঁয়ের মধ্যে কোন গোহালে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাক্। পরক্ষণেই ভাবিল, পরের টিটকারী সে সহ্য করিতে পারিবে না—বিশেষতঃ স্বজাতীয়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অসহ্য—তার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া ভালো।

শেষ জীবনে এত দুর্দ্দশাও তাহার কপালে ছিল! কেহ ভালবাসে না, কেহ এক আঁটি বিচালি দিয়া আদর করে না, আপনার জন বলিতে কেহ নাই—যাহারা ছিল, তাহারা যে কোথায়, কত দূরে, কোন্ দিকে—কে তাহাকে পথনির্দ্দেশ করিবে?

পথে পথে যে কতদিন কাটিল বুধীর তাহার হিসাব নাই। কত মাঠ, কত গ্রাম, কত বিল-বাঁওড়ের ধারের বাবলা বন, কত কচুরীপানায় ভর্ত্তি মজাগাঙ। কচুরীপানার পাতা খাইলে মুখ চুলকায় সবাই জানে, বুধী কখনো এর আগে খায় নাই—কিন্তু সব জায়গায় ঘাস ভাল নয়—বিশেষত বন্যায় ডোবা পচা ঘাস খাইলে গলা ফুলিয়া মারা পড়িতে হয়, একথা বুধী জানে। বাধ্য হইয়া সুতরাং কচুরীপানার পাতাই এবার খাইতে হইল। এক জায়গায় পথের ধারে একটা কামারের দোকান। চাষালোক লাঙ্গলের ফাল জোড়াইতে আসিয়াছে। বুধীকে দেখিয়া একজন লোক বলিল—গরুডো কাদের হ্যা?

আর একজন বলিল—কয়জদ্দি বিশেসের গোরুডোর মত দেখ্‌তি—না মামু? পূর্ব্বের লোকটি বলিল—সে তো ধুঁজি শিংয়ে গাই—এডার মত নয়। বুধীকে একজন আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বুধী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সাধ্য নাই যে পালায়।

সবাই মিলিয়া দেখিয়া বলিল—এডা ভিন্ গাঁয়ের গরু, ছাড়ান দাও, কি কত্তি কি হবে, দরকার কি পরের গরু বেঁধে, শেষকালে কি একটা থানা-পুলিসির হ্যাংগামায় পড়তি যাবা? ছাড়ান দাও। দলের মধ্যে একটা লোক ছিল, সে মানুষের মত মানুষ, তার হৃদয় আছে। সে বলিল, আহা কাদের গোরুডো? হাড়সার হয়ে গিয়েচে। এডা বোধ করি মামু, চালানের পাল থেকে পালিয়ে আসচে। বাড়ি নিয়ে দু'টো সানি খেতে দিইগে—তারপর ছাড়ান দেবানে।

কিন্তু অন্য লোক তাহাকে বাধা দিল। বাড়ি লইয়া যাইতে দিল না। বুধী সেখান হইতে গ্রামের বাহিরের রাস্তা ধরিল। তারপর একদিন আসিল ভীষণ বিপদ। বুধীর ভীষণ তৃষ্ণা পাইয়াছে—কোথাও জল পায় না। অবশেষে একটা কি নদী পাওয়া গেল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে—সে জলের ধারে জল খাইতে গিয়া নরম পাঁকে পুঁতিয়া

গেল। এ পাখানা উঠাইতে যায় তো ওখানা ডুবিয়া যায়। ক্লান্ত বুধী সে গভীর হাবড় হইতে নিজেকে কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিল না। জলও খাওয়া গেল না—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে অথচ দু'হাত দূরে টলটলে কালো জল। সে ক্রমশঃ পাকে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল—শেষের দিকে বুধীর আর জ্ঞান রহিল না—শকুনিতে তাহার চক্ষু দু'টি ঠুক্‌রাইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, মুচিরা ছাল ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে, হাড়গোড় সাদা হইয়া পড়িয়া থাকিবে জলের ধারে, হাড়-বোঝাই নৌকা একদিন কুড়াইয়া নৌকায় বোঝাই দিবে—মাংস খাইবে শিয়াল-শকুনিতে—এ নিষ্ঠুর, অনতিদূর ভবিষ্যতের ছবি বুধীর চোখের সামনে কতবার সে কালরাত্রির অন্ধকারে ভাসিয়া উঠিল—কতবার মিলাইয়া গেল যে!

সকাল হইল, বেলা হইল। বুধীর তৃষ্ণার্ত আধ-অচেতন চক্ষু দুটি তখন নদীর কালো জলের দিকে চাহিয়া আছে একদৃষ্টে। একটু জল কেউ যদি দিত!···

খররৌদ্র চড়িল। উলুর ফুল ফুটিয়া আছে হাবড়ের ওপরকার চরে। দু'একটা গাঙ-শালিক বুধীর নিকটে আসিয়া বুধীর দিকে কৌতূহলের সঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বোধ হয় বুধীর ভাল জ্ঞান ছিল না। যখন তার চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল, একখানা ছইওয়ালা নৌকা তাহার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এতক্ষণ পরে এই মানুষের চিহ্ন! বুধী অতিকষ্টে আর্তস্বরে এক আবেদন পাঠাইল—ওগো আমাকে বাঁচাও—কে তোমরা—

নৌকায় ছইয়ের বাহিরে একটি তরুণী বৌ বসিয়াছিল—হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল বুধীর দিকে। বৌটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, বাইরে এসো—একবার এদিকে এসো—

একটি লোক বাহিরে আসিয়া বলিল—কি—! কি হয়েচে?

—ওগো, দ্যাখো একটা গরু হাবড়ে পড়েছে। আহা, কতক্ষণ হয়তো পড়ে আছে, উঠতে পাচ্চে না—ওকে উঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—ওঃ এই! আমি বলি কি না কি। ও কিছু না, যাদের গরু তারা এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এখন।

বুধী বৌটির চোখে মুখে দয়া ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছিল আগেই—সে মানুষ চেনে। বুধী আকুলনেত্রে আর্ত আবেদনের দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চাহিল। বৌটি বলল—ওই দ্যাখো না কেমন করে চাইচে—না, ওকে না তুলে দিয়ে যাওয়া হ'বে না—এই চরে এখানে মানুষজন কোথায় যে ওকে তুলবে?

নৌকার মাঝিরাও বলিল। এর নাম চাঁপাবেড়ের চর। এ তল্লাটে মনিষ্যি নেই বাপু! মা-ঠাকরুণ ঠিকই বলচেন।

লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করিল। নানা ওজর-আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৌটি নাছোড়বান্দা। গরুটাকে না তুলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না। বলিল—দ্যাখো, যাওয়া হচ্ছে একটা মঙ্গলের কাজে—গোড়াতেই একটা অমঙ্গল দিয়ে শুরু করা চলে? এই বুড়ো গরুটার চোখের চাউনি আমি সারাদিন ভুলতে পারবো না—ও মরে যাবে এই হাবড়ে যদি কেউ না তোলে।

লোকটি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল—তোমার নিয়ে বেরুলেই একটা না একটা হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে এই ধরণের—এখন কোথায় লোকজন পাই যে গরু তুলি! বাঁশ চাই, দড়ি চাই, লোক চাই—ও কি সোজা পুঁতে গিয়েচে, দেখচো না?

ঘন্টাখানেক নৌকা সেখানে বাঁধা রহিল। নৌকার মাঝিরা নামিয়া কোথা হইতে জনকতক

লোক ডাকিয়া আনিল—আরও ঘণ্টাখানেক টানাটানির পরে সকলে মিলিয়া বুধীকে টানিয়া তুলিল হাবড় হইতে!…জল! জল—সে একটু জল খাইবে।

বৌটি বলিল—আহা কি তেষ্টাটাই পেয়েছিল দেখলে? চোঁ চোঁ করে এক গাড়্ জল খেয়ে ফেলল—বুড়ো গরু! দেখ না ওর পা কাঁপচে, দাঁড়াতে পারচে না।

লোকটি খিঁচাইয়া বলিল—মরুক গে। ট্রেনটা ফেল হোল তো এখন? কোথাকার এক ছেঁড়া ল্যাঠা জুটিয়ে দু'টি ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে। চলো এখন—স্টেশন বসে থাকো রাত দশটা পর্য্যন্ত।

নৌকা চলিয়া গেল। বুধী কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে?

…ওগো অপরিচিতা, জীবনের বড্ড শেষের দিকে তুমি এলে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে যদি আগে দেখা হোত।…যাও যেখানে যাবে।

গরুর আশীর্ব্বাদে মানুষের কোন কাজ হয় কি না জানি না—শুভ হোক তোমার জীবনের যাত্রাপথ।

তারপর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বুধীর সারাদিন ভয়ানক কষ্ট গেল। সেদিন যেমন দারুণ বর্ষা, তেমনি ঝড়। তেমনি একটা বড় গাছও পাওয়া গেল না যাহার নীচে এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সে আশ্রয় নেয়। একটা বাঁশ-ঝাড়ের তলায় আরও কয়েকটি গরুর সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই বুধীর ঘুম ভাঙিল। সারা গায়ে জোঁক লাগিয়া তাহার অর্দ্ধেক রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে, এমন ভয়ানক জায়গা। ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে; রৌদ্র উঠিল।

হঠাৎ কিছু দূরে একটা পুকুর ও তার পাশের আমবাগান দেখিয়া তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল।

জায়গাটা যেন পরিচিত মনে হইতেছে।

বুধী আগাইয়া গিয়া দেখিল। এই আমবাগান তো সে ইহার আগেও দেখিয়াছে; যে দলটির সঙ্গে সে সেবার গিয়াছিল—এই আমবাগানে তাহারা একদিন রাত্রি কাটায়; পাশে পথটা—ওটাও সে চেনে।

বুধী সেই পথ বাহিয়া আগ্রহের সহিত হাঁটিয়া চলিল—যতই যায় ততই তাহার বেশ মনে পড়িতে লাগিল, এই পথ তাহার পরিচিত। এ পথে সে আগে আসিয়াছে। এমন কি একদিন মনে হইল, তাহাদের গ্রাম আর বেশী দূরে নাই। ওই পথে সে পাউণ্ড-ঘর হইতে ফিরিয়াছে দু'তিন বার। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বুধীর মনে হইল তার হৃদ্‌স্পন্দন বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে! ওই তো তাহাদের গ্রাম, তাহাদের গ্রামের সেই বড় অশ্বত্থ গাছটা, ওই তো সেই বেগুনের ক্ষেত—ক্ষেতের পাশেই তাহাদের নদী; ওই তো গ্রামের ভাগাড়, ভাগাড়ের পাশে ভাঙা ইঁটখোলা।

বুধী দৌড় দিল; তখন আনন্দে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য।

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। বুধী দূর হইতে বাড়ি দেখিতে পাইল। গাবতলায় যে আনারসের জমি ছিল, বুধী আনন্দে উৎসাহে আনারসের ক্ষেতের বেড়া ভাঙিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির উঠানে গিয়া পৌঁছিতেই কোথা হইতে এক তীক্ষ্ণ মিষ্টি ক্ষুদ্র মেয়েলী কণ্ঠের আনন্দ ও বিস্ময় ভরা চীৎকার শোনা গেল—"ওমা, ও ঠাকুরমা, শীগগির এসে ভাখো কে এসেচে—শীগগির এসো—"

পরক্ষণে বুধী তার গলায় দু'টি নরম কচি হাতের সাগ্রহ নিবিড় বেষ্টন অনুভব করিল। খুকীর মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কে এসেছে বলছিস্ খুকী?…ওমা, ও কে, বুধী না?

খুকীর ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন—বুধী এলো কোত্থেকে! আহা, কি হাড়সার হয়ে গিয়েছে, ওকে যে আর চেনা যায় না!

খুকীর মা বলিলেন—ও কি করে পালিয়ে এলো আজ দু'মাস পরে। ঠিক দু'মাস হয়েচে। আমি তখন বলেছিলুম চালানে পালে গরু বেচে না ওরা—শুনিচি নাকি কলকাতার কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। সত্যি মিথ্যে জানিনে বাপু। এই রকম কিন্তু সবাই বলে। তোমরা তখন শুনলে না—ভাবলে বুড়ো গরু দুধ তো আর দেবে না—বেচে ফেলে আপদ মিটিয়ে দিই। সংসারের মঙ্গল হোত ভাবচো ওই গরু যদি বেঘোরে মারা যেতো? ও কি করে পালিয়ে এলো তাই ভাবি! বোধ হয় রাস্তা থেকে পালিয়েছে পাল থেকে, কি হাড়সার হয়ে গিয়েচে, মা গো মা!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুধী গোহালে শুইয়া পড়িয়াছে। এই তাহার আপনার গৃহ—এখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না যে সত্যই বাড়ি ফিরিয়াছে। এই তাহার আবাল্য পরিচিত গোহাল, এই সেই বিচালির গাদা, সেই রকম ঘন সাঁজালের ধোঁয়ায় গোহাল অন্ধকার—একটাও মশা নাই, বড় বাছুরটা একপাশে সানি খাইতেছে। খুকীদের রান্নাঘরে খুকীর মা রাঁধিতেছেন, খুকীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে। আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

বিধু মাস্টার

বিধু মাস্টারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর স্মৃতি হয়তো আজীবন আমার বহন করে বেড়াতে হবে। মাত্র ক'টা মাস তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তারপর চলে গেলেন—শুধু এই ক্ষণিকের পরিচয় আজ অমর হয়ে রয়েছে।

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল রবিবার। আমি সকালবেলা কৌমুদী খুলে ধাতুরূপ মুখস্থ করছি চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে, এমন সময় বাইরে কে যেন ডাকলেন, হারাণবাবু আছেন? হারাণবাবু!

আমি জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে প্রশ্ন করলুম, কাকে চাই?

—এখানে হারাণবাবু বলে কি কেউ থাকেন?

—থাকেন। তিনি আমার কাকা।

—তাঁকে একবার ডেকে দাও তো।

—কি দরকার?

—তাঁর কি একজন টিউটর চাই?

সত্যিই তো মেজকাকা আমাদের জন্ত একজন টিউটর চাই ব'লে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম। বললুম, আপনি বুঝি সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আসছেন?

—হ্যাঁ।

—তা ভেতরে এসে বসুন। আমি মেজকাকাকে ডেকে দিচ্ছি।

ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, কালোপানা লোকটা অত্যন্ত দ্বিধায়, অতি সন্তর্পণে আমাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। আমি বললুম, বসুন আপনি।

তিনি ভয়ে ভয়ে যেন একবার আমার দিকে তাকিয়ে একখানা পাশের বেঞ্চে বসলেন। আনাড়ী লোকটাকে দেখে আমার মাস্টারের প্রতি সকল শ্রদ্ধা তিরোহিত হল। বললুম, ঐ চেয়ারটায় বসুন না।

তিনি প্রথমে বললেন, থাক্ থাক্। তারপর একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি ফ্যানটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেলুম মেজকাকাকে ডেকে দিতে। মেজকাকা উঠে এলেন, আমিও এলুম তাঁর পিছু পিছু, আর এল ঝণ্টু, মিণ্টু, চাঁদু ও রেবা। মেজকাকা বৈঠকখানায় ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলেন। মেজকাকা বললেন, আপনি তো আজ সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মেজকাকা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এই পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে। রাতে তিন ঘণ্টা। মাইনে তো লিখেই দিয়েছি সাত টাকা। কামাই চলবে না।

তিনি বললেন, না, কামাই করবোই বা কেন?

মেজকাকা বললেন, তা আপনি থাকেন কোথায়?

—শ্রীনাথ দাস লেনে।

—আপনার নাম?

—শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

—কদ্দূর লেখাপড়া আছে?

—ম্যাট্রিক পাস।

কথাটা শুনে মেজকাকা ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন, টেবিলের ওপর বারকয়েক ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে পারবেন তো?

ফোর্থ ক্লাসে পড়ি কেবল আমি। এদের দলের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড়। আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠল। আমি বিধু মাস্টারের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তিনি বললেন, তা আর পারব না কেন?

মেজকাকা বললেন, বেশ ভাল। সোমবার থেকে কাজে লাগবেন। সন্ধ্যা ছ'টার সময় ঠিকমত আসবেন। তারপর আমাদের বললেন, ইনি তোদের নতুন মাস্টার, এঁর কাছে মন দিয়ে পড়বি। বুঝলি?

তারপর সোমবার দিন তিনি এলেন ঠিক ছ'টার সময়ে। আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখলেন—বেশীক্ষণ দেখলেন আমার ইংরিজি বইখানা। বললেন, বেশ শক্ত বই পড়ানো হয় তো।

তাঁর কথা শুনে আমার কি আনন্দই না হল! আমি বললুম, আমাদের আবার ইংরিজি ফিজিকস্, কেমিস্ট্রি পড়ানো হয়।

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, তাই নাকি?

আমি তাঁকে আমাদের সায়েন্স বইখানা এনে দেখালুম। তিনি বললেন, কি পড়া হয়েছে?

—প্রপারটিস্ অব্ এয়ার আর ব্যারোমিটার।

আমার কথাগুলো শুনে তিনি বেশ চমকে গেলেন আর আমি খুব কৌতুক বোধ করলুম।

তিনি তখন রেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি খুকি?

রেবা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল। নতুন লোক দেখলে ওর ঐ রকম লজ্জা। আমি বললুম, বল্ না রে কি নাম?

তিনি তখন রেবার পশমের মত কোমল চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রেবাও অনেক কষ্টে বলল, লেবা।

ও 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি বললেন, বা! বেশ নাম তো তোমার, খাসা নাম তো তোমার।

কিন্তু দিন যত বয়ে গেল রেবার লজ্জাও তত কমে যেতে লাগল আর বিধু মাস্টারও রেবাকে বেশী ভালবাসতে লাগলেন। শুধু রেবাকেই না, তিনি আমাদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। তিনি পড়াতে আসবার পর প্রায়ই একজন ফেরিওয়ালা সুর করে হেঁকে যেত, চাই অবাক-জলপান, স্বাধীন ভাজা, ঘুঘনিদানা।

মাস্টার মশাইও আমাদের প্রায় ঐ কিনে খাওয়াতেন। নতুন মাইনে পেয়ে তিনি আমাদের সবাইকে বারো আনার কুল্পী বরফ খাইয়েছিলেন। সবাই তাই মাস্টারকে খুব ভালবাসতো। তাঁকে আদৌ দেখতে পারতুম না কেবল আমি। কেন তা জানি না। তথাপি আমার অনিচ্ছায় তাঁর অধীনে থাকতে হোত, কারণ মেজকাকার হুকুম। মেজকাকাকে আবার সবার চেয়ে ভয় করি, মায় বাবার চেয়েও। সুতরাং আমি খুঁজতে লাগলুম মাস্টারের ভুল-ত্রুটি, যাতে আমি তাঁর হাত থেকে রেহাই পাই। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, মাস্টার মশাই, পাহাড়ের হাইট মাপতে গেলে ব্যারোমিটার কি দরকার লাগে?

তিনি বললেন, দরকার লাগে নাকি? কে বলল?

—স্কুলের মাস্টার।

—তা হবে। কোথায় লেখা আছে বল তো?

—সায়েন্সের বইতে।

—দেখি সায়েন্সের বই।

আমি তাঁর হাতে বইখানা তুলে দিয়ে বললুম, কিছুই বুঝতে পারিনি মাস্টার মশাই।

তিনি বইয়ের পাতা খুলতে খুলতে বললেন, বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমায় বোঝানো দূরের কথা তিনি নিজেই হয়তো সেই ইংরিজি অংশটার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অগত্যা অনেকক্ষণ পরে তর্জ্জমা করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পেরেছো?

আমি বললুম, কিছুই না।

তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার বইখানা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, একবার পড়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো।

বইখানা নিয়ে গেলেন সত্যি, সেটা আমায় ফিরিয়েও দিলেন যথাসময়ে; কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কথাটা কাকাকে বলতে তিনি বললেন, আচ্ছা, কেমন পড়ায় তা আমি দেখছি।

পরের দিন থেকে তিনি আমাদের কাছে বসে পড়া শুনতে লাগলেন। মাস্টার মশাইয়ের পড়ানোর তিনি প্রায়ই ভুল ধরতেন। হয়তো বলতেন, লুসি গ্রের শেষের স্ট্যাঞ্জা দুটো আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন। ঐ যে ওর।

O'er rough and smooth she trips along
And never looks behind;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

ওর ভাবার্থটাও ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। বুঝেছেন কি না?

এ সব ক্ষেত্রে মাস্টার মশাই কোন কথা বলতেন না বড় একটা। কাকাকে তিনি বেশ সমীহ করে চলতেন।

তিনি বড় একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষতে পারতেন না। একদিন কাকার সামনে তিনি একটা অঙ্ক এক্স দিয়ে কষছিলেন। কাকা বললেন, সব গোলমাল হয়ে গেল মাস্টার মশাই।

তিনি বললেন, কেন?

কাকা বললেন, ও অঙ্ক তো আলজেব্রার প্রসেস্ অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন না।

যাই হোক, তিনি কিন্তু কোন উপায়েও আমায় অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চলে যাবার পর কাকা বললেন, মাস্টার তত সুবিধের নয়।

এমন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা পূজা এল। আমরা বললুম, মাস্টার মশাই, আমাদের ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে।

তিনিও রাজী হলেন কারণ তিনি সম্প্রতি মাইনে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণের একটা মনোহারী দোকান থেকে এক টাকার প্রায় ঘুড়ি লাটাই কিনে দিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি যা কিনে দিতেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা নিষেধ ছিল। এসব লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দিতেন। রেবার জন্মদিনে তিনি তিন টাকা দামের একটা কলের রেলগাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কাউকে বোলো না যেন ঘুণাক্ষরে।

বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন চারেক পর একদিন শ্রীনাথ দাস লেনে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। আমি নমস্কার করলুম। তিনি বললেন, এই যে, পিণ্টু যে। কোথায় চলেছো?

আমি বললুম, আপনি কোথায় থাকেন মাস্টার মশাই?

তিনি বললেন, এইখানেই।

—চলুন না দেখে আসি।

কি জানি কেন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি দেখবার জন্যে আমি অত্যন্ত উতলা হলুম। তিনি দ্বিধায় আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ব্ব গৃহে। টিনের চাল দেওয়া একখানা মেটে বাড়ির দোতলায় একখানা ছোট্ট ঘরে থাকেন। সরু ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে ভয় করে। ফালি বারান্দাটা মানুষের ভারে সামান্য কাঁপে। আস্তে আস্তে তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরের দিকে গেলুম। তিনি গিয়ে তাঁর ঘরের তালা খুললেন। অপরিষ্কার ও অপরিসর ঘর। দেওয়ালে কতকগুলো ক্যালেণ্ডার টাঙানো। একপাশে একখানা বিবেকানন্দের ছবি। মেঝের ওপর একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর আবার একটা কালো ও তেল-চিটচিটে বালিশ। মাস্টার মশাই আমায় বসিয়ে 'আসছি' বলে কোথায় চলে গেলেন সহসা। আর আমি তাঁর ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। বড় দুঃখ হ'ল তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা দেখে। ঘরের মধ্যে আর একখানা কাপড়ও নেই। যদিও বা একখানা আছে তাও শতছিন্ন এবং অত্যন্ত কালো। একটি জামা ও একখানি মাত্র কাপড়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। আমার বড় অনুকম্পা জাগল তাঁর প্রতি। তাঁকে যে আমি এত ঘৃণা করতুম তা একেবারে বিস্মৃত হলুম। হঠাৎ যেন আমি একেবারে বদলে গেলুম।

এমন সময়ে মাস্টার মশাই এক ঠোঙা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি ব্যথিত সুরে বললুম, ও সব আবার কেন মাস্টার মশাই?

তিনি আমার কথা শুনে একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন, না-না, এ আর এমন কি?

আমি বুঝলুম যে তাঁর শ্রমের পারিশ্রমিকটা এমন করে অপচয় করা তাঁর শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত গ্রহণ করার সামিল। আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম, না, এ কখনই হবে না।

আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁর মুখের চির প্রফুল্ল হাসি অকস্মাৎ যেন মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ চুন করে বললেন, এ কি বলছো পিণ্টু?

আর সাহস হোল না কিছু বলতে। যাই হোক, বাড়ি ফেরার পথে সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে মাস্টার মশাই যাতে আমাদের জন্যে তাঁর মাইনে থেকে কিছু খরচ না করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক বেচারা ঐ ক'টি টাকা সম্বল ক'রে কলকাতায় বাস করছেন।

কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা মত কাজ করবার আগেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। মেজকাকা একদিন আমার ট্রান্সলেশনের খাতাখানা দেখতে দেখতে মাস্টার মশাইকে বললেন, এ সব কি পড়াচ্ছেন মাস্টার মশাই! ইংরিজি আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। I live in a boarding সেন্‌টেন্‌সটার মধ্যে 'in' কি এমন অপরাধ করেছে যে ওকে তুলে আপনি 'at' বসিয়ে দিলেন! আসলে ওর ভুল কোথায় তা তো দেখতে পেলেন না। আর Every bush and every tree was in bud সেন্‌টেন্‌স্‌টার 'was' কেটে 'were' করলেন কোন্ Grammar অনুযায়ী? আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলে পড়াবেন কেমন করে?

মাস্টার লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। আর আমি? আমি ভাবতে লাগলুম ভাবী বিপদের কথা। মেজকাকা বললেন, তাই বলি ছেলেরা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন। পিণ্টু, তোর হাফ্ ইয়ার্‌লির প্রোগ্রেস্ রিপোর্টটা নিয়ে আয় তো।

আমি ভয়ে ভয়ে আমার প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট নিয়ে এলুম। মেজকাকা বললেন, দেখুন কি বিশ্রী রেজাল্ট! ইংরেজিতে তো ফেল। আর সবে রগ ঘেঁষিয়ে পাস করেছে। এর পর আর আপনাকে রাখতে আমি সাহস করি না। তা হলে ওদের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। আমরা অন্য মাস্টার দেখবো। আপনার বাকী মাইনেটা দু' তারিখে নিয়ে যাবেন।

মেজকাকার কথায় মাস্টার মশাই একটি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করলেন না, নীরবে নিঃশব্দ পদ-ক্ষেপে প্রস্থান করলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। এর জন্যে দোষী তো আমি। আমি তো মাস্টার মশায়ের ভুলগুলো মেজকাকাকে বলে বলে তাঁর মন একেবারে চটিয়ে রেখেছিলুম।

আমি অপরাধীর মত বসে রইলুম মুখ নীচু করে।

উন্নতি

গোকুলদের অবস্থা যে কত শোচনীয়,—তা গ্রামের কেউ জানত না। বুদ্ধিমতী গোকুলের মা নিজেদের দারিদ্র্য লোকচক্ষু থেকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু এবার শীতকালের দিকে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে আর কোন রকমে ঢেকে রাখা চলে না। গোকুলের মা একদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে বল্লে, সত্যি গোকুল, তুই বসে বসে আর কতদিন সংসারটি মাটি করবি? একটা কিছু ভ্যাখ একবার।

গোকুল পৈতৃক কোঠাবাড়ির ভাঙা রোয়াকের একপাশে বসে সান্ধ্য চা-পানে নিযুক্ত। অর্থাৎ, চটা-ওটা একটা কলাই-করা বাটিতে সে একপ্রকার ফিকে কটা রংয়ের বিস্বাদ তরল পদার্থ সেবন করছিল—তাতে দুধের ছিটেফোঁটা থাকলেও চিনির বালাই ছিল না। পুরোনো

খেজুর-গুড় সংযোগেই গোকুলের প্রাত্যহিক চা-পান নিষ্পন্ন হয়—আজ ওর মা গুড় দিতে নারাজ—ও চাইতে গিয়ে বিমুখ হয়ে এসেচে। মায়ের কথার মধ্যে যুক্তির অভাব ছিল না। বাড়িতে ঠাকুরপূজো আছে, দশমী-দ্বাদশী আছে, এক ভাঁড় খেজুর গুড় এসে সিকি ভাঁড়ে ঠেকেচে—নূতন বছরে এখনও গুড় কেনা হয়নি বা কেনবার পয়সাও নেই—ওইটুকু ফুরিয়ে গেলে তখন চলবে কিসে?

এই গুড়ের ব্যাপার নিয়ে মায়ে-ছেলের বচসা চললো সারা সন্ধ্যাবেলা।

গোকুল বিয়ে-থাওয়া করেনি, বয়স এই মোটে পঁচিশ বছর, বাপ মারা যাওয়ার পরে লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে আজ আট-দশ বছর বাড়ি বসে আছে—গরীব বামুনের সহায়-সম্পত্তিহীন ছেলে, কে চাকরি করে দেবে? লেখাপড়ারও তেমন কিছু জোর নেই। সংসার অবিশ্যি খুব বড় নয়, সে আর তার মা। গোকুলের বাবা বেঁচে থাকতেই মেয়েটির বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন বারো বছর বয়সে, তাই রক্ষে—নইলে এ বাজারে আর ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া গোকুলের সাধ্যে কুলিয়ে উঠতো না।

গোকুলের মা বল্লে, আমার বুদ্ধি শোন্ গোকুল, চল আমরা কলকাতায় যাই। সেখানে কত লোক কত কি করচে, সেখানে গেলে তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। আমিও তোকে ফেলে থাকতে তো পারবো না। আমিও সঙ্গে যাই। বড় আমবাগানটা বিক্রী করে ফেলি।

এ প্রস্তাব মা আরও কয়েকবার করেচে, কিন্তু গোকুলের গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরে না। কলকাতা শহরকে সে মনে মনে ভয় করে। অত বড় শহরে তো তার জন্যে চাকরি নিয়ে লোকে বসে আছে! মার যেমন কথা।

আজ কিন্তু মার কথায় তার মনটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখলে হয় একবার। এখানেও তো মাঝে মাঝে অনাহার শুরু হয়েচে আজকাল, সেখানে তার চেয়ে আর কি বেশী কষ্ট হবে? কলকাতায় পয়সা রোজগারের অনেক রকম উপায় আছে সেও শুনেচে বটে।

সারারাত ধরে মা ও ছেলে পরামর্শ করলে। বড় বাগান বিক্রী করলে এখন দর হবে না, বন্ধক রেখে সেই টাকা থেকে প্রথম মাস কয়েক শহরের খরচ চলবে। এখানকার বাড়িতে কিছুদিন তালা বন্ধ থাকুক।

অবশেষে কলকাতায় যাওয়াই ধার্য্য হোল। যদুহরি কুণ্ডু স্থানীয় বাজারের বড় কাপড়ের মহাজন—বাগানখানা পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় তার কাছে বন্ধক রাখা হ'ল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে মায়ে-ছেলের কলকাতায় রওনা হোল। চিৎপুর শোভাবাজারে শঙ্কর মিত্রের লেনে ওদের গ্রামের এক নাপিত থাকতো। বাক্স হাতে ঝুলিয়ে জাত-ব্যবসা করে সে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার করতো মাসে। গোকুল খুঁজে খুঁজে তার বাসা বার করলে। একখানা ছোট খোলার ঘর—তাতে সে একা থাকে, নিকটবর্ত্তী হোটেলে একবেলা ডাল-ভাত খায়, একবেলা মুড়ি খেয়ে কাটায়, এই তার অবস্থা। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যা তার খোলার ঘরে অতিথি, বঙ্কু পরামানিক শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। রান্নার হাঁড়িকুড়ি কিনে নিয়ে এল, আর নিয়ে এল চাল ডাল তরকারি। খোলার ঘরে একখানা ছোট্ট পরচালার নীচে আপাততঃ রান্নার ব্যবস্থা করা হোল।

বঙ্কু বল্লে—মা-ঠাকরুণ, রোজ রোজ মরি উড়ে বামুনের রান্না খেয়ে, আজ আমার সৌভাগ্যি যে আপনারা এয়েচেন, মা-ঠাকরুণের হাতের দু'টি প্রসাদ খেয়ে বাঁচবো আজ।

গোকুল আর তার মা বঙ্কু পরামাণিকের সেই খোলার বাসার পাশেই আর একখানা ছোট

খোলার ঘর নিলে। মাসে মাত্র তিনটি টাকা ভাড়া।

গোকুলের মা এখানে এসে অকূল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে—একমাত্র ভরসা বঙ্কু পরামাণিক, যে কলকাতার রাস্তাঘাট চেনে—সে যদি কিছু কিনারা করতে পারে এর।

প্রতিদিন দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলা নিকটেই কোথা থেকে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসরের আওয়াজ আসে। একদিন গোকুলের মা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বঙ্কু, এখানে কি কোথাও ঠাকুরবাড়ি আছে নাকি? বঙ্কু বল্লে,—হ্যাঁ, মা-ঠাকরুণ, পাশেই মিত্তিরবাড়ি, ওরা মস্ত বড়লোক। ওদেরই তো ঠাকুরবাড়ি রয়েছে বাড়িতেই। এই রাসের সময় খুব ধুমধাম হবে—আপনি যাবেন না দেখতে? সবাই যাবে। খুব ভাল বন্দোবস্ত।

রাসের দিন পাড়ার আরও পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে গোকুলের মা মিত্তিরবাড়ি ঠাকুর দেখতে গেল। প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝের উপর ঝকঝকে রুপোর বাসনে ভোগ, রুপোর ঘণ্টা, কড়িকাঠ থেকে বড় বড় কাঁচের পরকলাওয়ালা ঝাড়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, ধূপ-ধুনোর গন্ধ বেরিয়ে ঘর আমোদ করেচে, আর নানা রকম ফুলের কি চমৎকার গন্ধ।

গোকুলের মা এমন ঠাকুরবাড়ি, এমন জাঁকজমক কখনো দেখে নি জীবনে, বাড়ির কর্ত্রী-ঠাকরুণ ঠাকুরের এক পাশে বসেছিলেন, লোকে চিনিয়ে দিলে। আশী বছর হয়েচে, এখনও কি ধপধপে গায়ের রং।

আরতি ও কীর্ত্তনাদি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। গোকুলের মা বড় থালায় এক থালা খাবার নিয়ে বাড়ি এল। মা ও ছেলে দুজনেই খুব খুশী, এসব খাবার ফলমূল কখনো পাড়াগাঁয়ে ওরা চোখেও দেখেনি।

গোকুলের মা আরও দু'চারদিন ঠাকুরবাড়ি সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন শুনতে গেল।

একদিন গিন্নীমা ওকে লক্ষ্য করলেন। নূতন মুখ, একে তো আগে কখনো দেখেন নি ঠাকুরবাড়িতে।

কাছে ডেকে বল্লেন—তোমার বাড়ি কোথায় গা? এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। গোকুলের মা সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোয় না, এত বড় বাড়ির কর্ত্রী নিজে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইচেন। ও সব পরিচয় দিলে। দেশে দুঃখকষ্টে পড়ে এখানে এসেচে, কাছেই খোলার বাড়িতে থাকে। ছেলেটি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করচে। কেই বা চাকরি দেবে, এখানে ও কাউকেই চেনে না!

গিন্নীমা ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কইলেন, লোকটি বড় ভালো। বল্লেন—আমাদের ঠাকুরবাড়িতে রাত্তিরের ভোগ ব্রাহ্মণ-বাড়ি দেওয়ার নিয়ম আছে। তুমি বাছা রোজ এসে আরতির পরে ভোগ নিয়ে যেও, আমার বলা রইল। কত রবাহুত, অনাহুত লোক এসে খেয়ে যায়। তুমি আর তোমার ছেলে খেলে আমি খুশী হবো।

সেদিন থেকে গোকুলের মায়ের কপালে যা ঘটতে লাগলো—সে স্বপ্নেও তেমন সৌভাগ্য কখনো কল্পনা করে নি।

মস্ত বড় এক থালা-ভর্ত্তি লুচি, তরকারি, মিষ্টি, ফলমূল গোকুলের মায়ের বাড়ি নিয়ে যাওয়াই কষ্ট। কে কত খায়? বঙ্কু নাপিত পর্য্যন্ত লুচি খেয়ে আর পারে না। রোজ রাত্রে লুচি। রোজ রাত্রে একরাশ ফলমূল, বাদাম পেস্তা ছানা মিষ্টি। বড়লোকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নৈশভোগের যা কিছু উপকরণ সকল ওদের বাড়িতে।

মাঘ মাসের দিকে ঠাকুরবাড়ির পুরাতন টহলদার মারা গেল। গিন্নীমা গোকুলের মাকে সে কাজে নিযুক্ত করলেন। মাইনে পাবে সাত টাকা, দু'বেলা ভোগের প্রসাদ পাবে। সকালের

ভোগটা খুব জমকালো, উপকরণও বেশী—কিন্তু চারজন ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ভোগটা বিলি করে দেওয়ার প্রথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত, গোকুলের মায়ের সুপারিশে গোকুল সেই চারজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালো।

এছাড়া পুজাপার্ব্বণে, বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যায়—ভোজন দক্ষিণা থেকে ওঠে! গিন্নীমা গোকুলের মাকে বড় অনুকম্পার চোখে দেখতে আরম্ভ করেচেন, এতে অন্যান্য ঝি-চাকরের চোখ টাটায়।

একদিন গিন্নীমা বল্লেন—হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলে লেখাপড়া জানে কতদূর? গোকুলের মা ভাল জবাব দিতে পারলে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে তার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

গিন্নীমা বল্লেন—ওকে নীচে ম্যানেজারের কাছে একদিন দেখা করতে বলো। যদি মুহুরীর কাজ-টাজ করতে পারে, তবে আমি আমার ছেলেকে বলে দোব এখন।

গিন্নীমার সুপারিশে গোকুল পনেরো টাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল। ওর বাংলা হাতের লেখা খুব ভাল, গ্রামে ওর হাতের লেখার খ্যাতি ছিল।

গোকুলের ইচ্ছা খোলার বাড়িটা বদলায়, মা ওর কিন্তু এতে আপত্তি করলে, বল্লে—বাবা, এই খোলার বাড়িই লক্ষ্মী—এ ছেড়ে কোথাও যাবো না। এ থেকে আরও উন্নতি হবে দেখিস তুই।

হোলও তাই। গোকুল পরের বৎসরই বিল-সরকারের পদে উন্নীত হোল। এ কাজে উপরি রোজগার খুব, দেনাদারেরা কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে নিজেদের বিলের ওয়াদা দেরিতে ফেরাতো। গোকুল মাসে ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারতো—কিন্তু ও স্টেটের মুখের দিকে চেয়ে কোথাও ঘুষ নিত না। ফলে ওর আমলে টাকা বেশী আদায় হতে লাগলো। ম্যানেজারের নজর পড়ল ওর দিকে।

সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদ খালি হোল ইতিমধ্যে। বুড়ো নায়েব নালু মুখুয্যের চোখের অসুখ হওয়ার দরুণ সে পেন্‌সনের দরখাস্ত করলে। এই পদে মাসে একশো-দেড়শো টাকা কমিশন পাওয়া যায়, বিভিন্ন মুদী, খাবারওয়ালা, দোকানদারের কাছে। ন্যায্য ভাবেই এটা পাওয়া যায় এতে স্টেটের কোনো অনিষ্ট নেই। এ-কাজে একজন বিশ্বস্ত লোকেরই দরকার বটে।

ম্যানেজার একদিন ওকে ডেকে বল্লেন—গোকুল, সংসার সেরেস্তার নায়েবের কাজের জন্যে তুমি দরখাস্ত করেচ?

ও বল্লে, আজ্ঞে হাঁ বাবু।

ও দিয়েছিল কপাল ঠুকে একখানা দরখাস্ত করে। সেরেস্তার অনেকেই তো করেচে। ম্যানেজার বল্লেন—তুমি কি পারবে? বড্ড হুঁশিয়ারির কাজ, আর বড় খাটুনি। গোকুল সাহস করে বল্লে—খাটুনির ভয় করিনে হুজুর। আর হুঁশিয়ারির কথা বলচেন, আপনি তো বিল আদায়ের কাজেও দেখেছেন আমায়।

—আচ্ছা তুমি পাঁচশো টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও স্টেটের নামে। ও কাজে পাঁচশো টাকা ডিপজিট দিতে হবে তোমায়। তোমার মাইনে থেকে আমরা মাসে মাসে দশ টাকা কেটে নেবো হ্যাণ্ডনোটের দেনার দরুণ। তোমাকে আমি ও পোস্ট দিলাম। মন দিয়ে কাজ কোরো।

গোকুল চোখে ঝাপ্‌সা দেখলে। ব্যাপার কি? সে স্বপ্ন দেখচে না তো? পঁচিশ টাকা মাইনের বিল সরকারী থেকে সে ষাট টাকা মাইনের সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদে

ঠেলে উঠলো এই এক বছরের মধ্যে—যে পদের উপরি কমিশনের আয় গড়ে মাসে দেড়শো টাকার কম নয়।

কিন্তু সত্যিই তার পরদিন তাকে ডেকে ম্যানেজার একখানা পাঁচশো টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে ওকে গিয়ে সংসার সেরেস্তার গদিতে বসতে আদেশ দিলেন।

সেদিন গোকুলের মা ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়ে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। লোকজনের ভিড় কমে গেলে, কাছে রমানাথ মণ্ডলের গলির বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড় বৌ গোকুলের মাকে এক পাশে ডেকে বল্লেন—মা, তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমার মেয়ে রমাকে তো দেখেছ তুমি মিত্তিরবাড়িতে ঠাকুরঘরে? তাকে তোমায় নিতে হবে।

গোকুলের মা ভাবলে সে ভুল শুনচে। বাঁড়ুয্যেদের অবস্থা বেশ ভালই, মেয়েটিও সুন্দরী—কিছুদিন আগেও স্কুলের বাসে উঠে তাকে স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে দিব্যি পুতুলটির মতো সেজেগুজে। আজ বাঁড়ুয্যে-গিন্নী আপনা থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেচেন তার সঙ্গে গোকুলের বিয়ের?

সেই মোমের পুতুলের মত সুশ্রী মেয়েটিকে পুত্রবধূ করবার স্বপ্ন দেখতেও তো তার সাহস হয় না।

বাঁড়ুয্যে-গিন্নী খুব হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন। একদিন সামাজিক ভাবে মেয়ে দেখাও হোল। মেয়েকে পছন্দ না করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। বিয়ের প্রায় সব ঠিক-ঠাক, বাঁড়ুয্যের বাড়ি থেকে মেয়েরা দল বেঁধে পাত্র দেখতে এল। পাত্র গোকুল বিয়ের ব্যাপারে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে খুশীই ছিল। মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী, তার ওপর ভাল অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুলে-পড়া মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে গোকুলের পক্ষে স্বপ্নের অতীত ওখানে বিয়ে হওয়া।

গোকুল মাকে বললে, ঠিকুজিখানা তো মা এখানে নেই, বাড়ির বড় কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটাতে জমিজমার কাগজ-পত্তরের সঙ্গে এক বাণ্ডিলে বাঁধা আছে। আমি সেটা এই শনি-বারে গিয়ে রবিবার নিয়ে আসি। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয়নি, অমনি বাড়িঘর দেখেও আসা হবে এখন।

শনিবার ছুটোয় অফিস ছুটি হতেই গোকুল শেয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি রওনা হোল। এসেচে আজ তিন বছর দেশ থেকে, এর মধ্যে আর যাওয়ার অবকাশ ঘটেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিজের গাঁয়ে ঢুকতেই হাটতলার চারিদিক থেকে লোকে ওকে ছেঁকে ধরল। আজ শনিবার, গ্রামের হাট, সব লোক আজ সেখানে জড় হয়েচে, শেষ হাটে জিনিসপত্র সস্তা হয় বলে অনেকেই বেলা শেষ করে তবে হাটে আসে।

—আরে গোকুল না? বেঁচে আছিস? আমরা ভাবলাম—

—এতদিন কোথায় ছিলে গোকুল বাবাজি, তোমার মা কোথায়?

—এই যে গোকুল-দা, কোত্থেকে এ্যাদ্দিন পরে, সব ভালো তো?

নানা অধীর আগ্রহ-ভরা প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান। গোকুলের বেশভূষা দেখে সবাই বুঝলে ওর নিশ্চয় ভাল চাকরি হয়েচে কলকাতায়। সবাই এই তিন বছরের ইতিহাস শোনবার জন্যে ব্যস্ত।

গোকুল তাদের হাত এড়িয়ে পৈতৃক বাড়ির চাবি খুললে। ঘর-দোর বিশ্রী অপরিষ্কার হয়ে আছে। উঠানে বন-জঙ্গল গজিয়েচে। জানালা দরজায় উই ধরেচে, কড়িকাঠে বাদুর চাম-চিকের বাসা। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেকে ডেকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন চেয়ে আনলে

ওদের বাড়ি থেকে। তক্তাপোশটা থেকে একরাশ চাযচিকের নাদি সরিয়ে সেখানে সুটকেসটা রাখলে নামিয়ে।

একটু পরে তিনকড়ি মুখুয্যের ছেলে প্রমোদ তাকে ডাকতে এলো। প্রমোদের বাড়ি যেতে গোকুলের যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। এরই বোন বীণার সঙ্গে গোকুলের একবার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল বছর তিনেক আগে, যে বছর ওরা কলকাতায় যায়, সে বছর। গোকুল বলেছিল চাকরি না পেয়ে সে বিয়ে করবে না।

বীণার বয়েস এখন হয়েচে ষোল-সতেরো। এখনো তার বিয়ে হয়নি, একথা গোকুল জানে। বীণাকে ছেলেবেলায় সে সঙ্গে করে নিয়ে কত বেড়িয়েচে, কুল পেড়ে দিয়েচে, কত শাসন করেচে, পাঠশালার পড়া বলে দিয়েচে। বাড়ি থেকে যাবার আগে বীণা প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসতো যেতো, ওর সঙ্গে গল্প করতো—কেবল বিয়ের প্রস্তাবের পরে তাকে আর বেশী দেখা যেতো না।

এতদিন পরে দেশে এসে বীণাদের বাড়ি যাওয়া একটা কর্ত্তব্য বটে, বীণার সঙ্গে দেখা করাও উচিত। কিন্তু যদি বীণার মা পুরোনো প্রস্তাবটি আবার পাড়েন। এখন তো চাকরি করচে, এখন কোন ওজর থাকবার কথা তো নয়।

অথচ বীণাকে বিয়ে করবারও ইচ্ছা নেই।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না জানে লেখাপড়া, না জানে গান, না জানে ভালো করে কথা কইতে। অবস্থাও খারাপ ওর বাপের—

রমাকে দেখবার পরে ওর মনে হয়েচে, এমন ধরনের মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে লাভ করা একটা সৌভাগ্য। দেখবার মত মেয়ে; তার মায়েরও আন্তরিক ইচ্ছা তার বিয়ে হয় রমার সঙ্গে।

প্রমোদের মা যখন পরদিন সকালে কথাটা পাড়লেন, গোকুল তখন মায়ের কথাটাই বড় করে বললে। তার কোন হাত নেই। আচ্ছা, কলকাতায় গিয়ে মাকে জানাবে, পরে কি হয় পত্র লিখবে।

বীণা বোধ হয় তখন জানালা ধরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল—ওর কথা শেষ হতেই চলে গেল—কেউ টের পায়নি, কখন যে এসেছিল পাশের ঘরে—কিন্তু গোকুলের চোখ এড়ালো না।

তারপর যখন ওদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে, তখন বীণার সঙ্গে আবার দেখা হোল বাড়ির বাইরে গোয়ালের দরজায়। গরুর দড়ি হাতে বীণা ওদের ছোট্ট বাছুরটা পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে বাঁধচে। পরনে আধময়লা শাড়ি, গাছাকতক কাঁচের চুড়ি হাতে, শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেখতে এমন কিছু নয়; ওকে দেখে বীণা লজ্জায় চোখ তুলে যেন ভাল করে চাইতে পারলে না; কারণ তার আগেই বীণা শুনেচে মায়ের মুখে বিয়ের প্রস্তাবটা।

গোকুল দেখলে যখন দেখা হয়ে পড়লো তখন একটা কথাও না বলাটা ভাল দেখাবে না। বললে—বীণা, ভাল আছিস? ওঃ, বেশ লম্বা হয়ে পড়েচিস যে!

বীণা সলজ্জ মুখে বললে—ভাল আছি—তুমি ভাল আছ গোকুলদা?

—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

—জ্যাঠাইমার শরীর ভাল আছে?

—মায়ের শরীর মন্দ না, তবে সেই বাতের ব্যথা মাঝে মাঝে—

বীণা আর কিছু না বলে গোয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিকেলের ট্রেনে গোকুল কলকাতায় রওনা হোল। চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন বিকালটা, গাড়ির জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কেবলই বীণার কথা ওর মনে আসচে দেখে ও আশ্চর্য্য হোল। আজ সকালে বীণার সেই দীনমূর্ত্তি—পরণে আধময়লা শাড়ি, হাতে গাছাকতক কাঁচের

চুড়ি···

আরও দেখে আশ্চর্য্য হোল—ও ভাবচে, বীণার কোথায় বিয়ে হবে, কার ঘরে পড়বে অজ পাড়াগাঁয়ে—এই বয়সে, গোয়াল, গরু, ধানসেদ্ধ, ভাত র াঁধতেই জীবনটা কাটাবে। যখন বাপের পয়সার জোর নেই, জীবনে কিছুই দেখবে না, শুনবে না।

তার চেয়ে যদি ওকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়—থিয়েটার, বায়োস্কোপ, লোকজন—মাঝে মাঝে দোতলা বাসে করে কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বর, যা কখনো বীণা দেখেনি —কি খুশীই হবে বীণা! জীবনে কখনো ওর হয়নি···রমা কলকাতার মেয়ে, কত দেখেচে, কত শুনেচে। তাকে আর নতুন কি দেখাবে ও।

কিন্তু সহানুভূতি বা দুঃখ এক জিনিস আর তা থেকে কাজের প্রেরণা পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য— বিশেষতঃ স্বার্থপর যৌবন চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ—

গোকুল বীণার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।

কিন্নর দল

পাড়ায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্ব্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুন, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়িটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্তবড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েচে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে সে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্জ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাং হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায়-

গিন্নী মুখুয্যে-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্প-বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরনের চর্চ্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরল প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট্‌।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস-গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এঁদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরন-ধারণ রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো,—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্তে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গীতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোনোনি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো:

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হ'লো না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মন-মরা ভাবটা এক মুহূর্ত্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা আর ঘোঁটের আভাস ওরা পেলে, রায়-বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে, ভেতরে তা'হলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নী বল্লেন—তাই বল! নইলে এম্নি কোথাও কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে, এ

কি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটার? হিঁদু তো?

অর্থাৎ, তাহ'লে রগড়টা আরও জমে।

রায়-বৌ বল্লেন,—হিঁদুই, মেয়েটা বদ্দি বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দি বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা একপ্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ, তা অনেক। শুনচি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ! ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন—তাহ'লে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ-মা বুঝি ধরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো—তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারী মজার খবর বটে, মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হ'ল। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগলো। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগ্‌গির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেননি,—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ! তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করচে।

মেয়ে-মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস্ না হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিস্টানি কাণ্ডকারখানা, কালে কালে হ'ল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন্ সাহসে আসবে।

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একখানা নৌকা এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকো থেকে নামল শ্রীপতি, তার নববিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, সুতরাং সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাস্থ চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও পিসিমা, ও বৌদিদি, আপনারা

আপনাদের বৌকে হাতে ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু-তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সারদা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ির উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপ্‌ধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো—মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্ব্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরনের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটা-মত মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখলে, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি···। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি-গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলো—চমৎকার, খুড়ীমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভাল।

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে, না সত্যিই বলছে। বললেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বল্লেন—না, বৌ যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, শহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘষছে, পাউডার ঘষছে, তোমার-আমার মত রাঁধতে হ'ত, বাসন মাজতে হ'ত তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘষলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির একথা মনে হ'ল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন—আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলেছে।

—ধরন-ধারণ যেন কেমন-কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হ'লে ও-হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেক্‌লেস্ ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাতপুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বল্লে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁজের সঙ্গে বললে—তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দর ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোন ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর, খুব গাজগোজ কি করে? সাদাসিদে শাড়ি সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে—ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদা'র বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্ত্তে আলো হয়ে উঠল, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেকলো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়িপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা-পরিহিতা মূর্ত্তিই দেখা যায়, বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদের খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ি-ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মনে হ'ল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বল্লেন— আহা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না-ও-হাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতির কল্‌কাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়লো। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বলে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়-মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্য্যন্ত করিনি কেন জানো,

গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি!

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ, সে আর তোমায় কি বলব খুড়ীমা, বৌদিদি যা বাজালে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তাহ'লে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ি চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এসরাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এসরাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায় সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এসরাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ি নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেচে ঠাকুরঝি যে আমি গান গাইতে জানি?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজী, ম্যয় গিরধর কে ঘর যাঁউ
গিরধর ম্হারা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই

মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তার বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দীগান গাইলে বৌ, এঁরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো, শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে —রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চ ধারণা করতে সকলে বাধ্য হ'ল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁশিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে—কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখেনি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এসো, এসো, মা আমার এসো। থাক্ থাক্, তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথায় চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হ'ল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে!···এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পুজোর সময় এসে পড়েচে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালী রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুযো-বাড়ি পুজো হয় প্রতি বৎসর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্ব্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শেখবার জন্তে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্তে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক্। থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে—কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল।

শ্রীপতির বৌ হেসে বল্লে—সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—স্থাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও ছুটি ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে ছুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত সুবিধে নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নী তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয় সব, কেমন আছিস? ওঃ, কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়সের তফাত। জানা গেল মেয়ে ছুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই-বোন, বাকী সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্তে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক্। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিন্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোশাক এনেছে, সিল্ক

নীল পোশাকে সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা—বোস-গিন্নী, মণ্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব্ব অনুভব করে, যখন পিণ্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আসুন বাড়ি যাই!

পুজো এসে পড়লো। এ গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পুজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্য্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষ যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তাপোশ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হল্দে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাই-বোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটচে।

শান্তি বল্লে—তুমি এতো জানলে কি করে বৌদি?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদিদি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়িতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়—

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশায়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দু'জনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব-যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ কেউ দিতে পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হ'ল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্ত্তকী হিসাবে। তার বুক কেটে যাচ্চে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপর কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা; রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপ-কথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো স্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব্ব

নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিণ্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হোল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামে মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নী ও শান্তির মা ও মণ্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ও পাড়ার রাম গাঙ্গুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মণ্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছু পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই জুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারচে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিণ্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!…

শান্তির মা বল্লেন—পিণ্টু খাচ্ছে না, দ্যাখ সেজো বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো খিদে পেয়ে গিয়েছে।…কি চমৎকার মানিয়েছিল পিণ্টুকে, না সেজো বৌ?—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে…

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হোল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বল্লে—নামটি বেশ কিন্নর দল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বল্লে, কৃত্রিম গর্ব্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল, সকলে এক যোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠলো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশী মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য্য কি?

মণ্টুর মা ভাবলেন কিন্নর দলই বটে!…

ওদের খেতে খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল!

শ্রীপতির বৌ বল্লে, আসুন, বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক্!

শ্রীপতি বাড়ি নেই, সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুযো-বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রের যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বল্লে, তা ভাল, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে!

শান্তি বল্লে—বৌদি, অশ্রুধারার সেই গানটা গাও আর একবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এসরাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা একসঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখী বাঁশ গাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাক্ আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হ'ল।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরনের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেচে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেচে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান-বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান-বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তিত সঙ্গীর শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েচে! শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াসুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে —জানিস্ শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটলো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিয়ি বাণপুর, ওর শ্বশুরবাড়িতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল ভাবে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্ত্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কত্তি-বাড়ির দুপুর বেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্রবর্ত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন করুথনো করেনি···আহা! আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে হেসে, 'আমরা কিন্নরের দল খুড়ীমা', শাপভ্রষ্ট কিন্নরই তো ছিল।···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান···ওকি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে বলতে মণ্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ জানে না। মুখে সে-সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

•

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ির পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতিদাদাদের বাড়িতে কে গান গাইচে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

বিরহিনী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্ত্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে এ জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্নারাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার— ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌছেচে। ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাইরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বল্লে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে!

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, শুভ্র জ্যোৎস্না-রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হোল তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পূজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগলো!

রূপহলুদ

ননীবালা

ননীবালা মেয়েকে বল্লে, সুপুরি কুড়িয়ে আন তো কালী রায়ের গাছের তলা থেকে!

মেয়ে বল্লে—হ্যাঁ, খাণ্ডা পিসি দাঁড়িয়ে আছে, বলেছে এবার সুপুরি কুড়ুতে হ'লে পয়সা দিয়ে যেও। সুপুরি এমনি পাওয়া যায় না বাজারে।

ননীবালা এ গাঁয়েরই মেয়ে, তার রাগ হয়ে গেল খুব। কালী রায়ের বুড়ী দিদিকে ঘাটের পথে পেয়ে খুব করে শুনিয়ে দিলে।

বুড়ী বল্লে—তুমি ভাই অনর্থক তিলকে তাল কোরো না। সুপুরি কুড়ুতে এসেছিল সেদিন, সর্ব্বদা কুড়ুতে আসে, তাই বল্লাম আমাদেরও তো দরকার আছে, কেন আস রোজ রোজ?

—সর্ব্বদা কুড়ুতে যাবার দায় পড়েছে!

—রোজ আসে, আমি বলছি। তুমি ভাই জানো না।

—কে বল্লে রোজ যায়?

—আমি জানি। রোজ দেখি যেতে।

—আচ্ছা বেশ। এবার যায় যদি, পয়সা নিয়ে যাবে।

কালী রায়ের দিদি পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলো—বড্ড গোমর হয়েছে ঐ ননীর। পয়সা দেখাতে আসে আমার কাছে! এমনি আদ্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ে না, আবার পয়সার গোমর! ঝি-গিরি করে তো চালাচ্ছিস্—পয়সা দেখাতে লজ্জা করে না?

ননীর মেয়ের নাম নালু, ভালো নাম সরবালা। নালু এর গাছের লিচু, ওর গাছের কুমড়োর জালি, শশার জালি চুরি করে আনে। পাড়ার কারো গাছে এঁচোড় আর থাকবার জো নেই নালুর জন্যে।

ননী কিন্তু তা জানে না। খিদের জ্বালায় সরবালা যা চুরি করে, রাস্তাতেই তা খেয়ে ফেলে। বিকেলে কি ভীষণ খিদে পায়, কে দেয় একগাল চালভাজা? রায়েদের গাছে কি মাদার পেকে আছে! পাকা যেমনি, বড়ও তেমনি। ঠেলে উঠলো গাছে। রায়-ঠাকুরমা দেখে বল্লে—ও মা, গেছো মেয়েছেলে কখনো দেখিনি! তুই এমন গেছো হলি কবে? নাম নাম—

—দুটো মাদার পাড়চি ঠাকুমা—

—খেলেই জ্বর! কেন ওসব ছাই খাবি?

কেন সে খাবে সে-ই জানে। মা ও-পাড়ার দামাদি কাকার বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার করে ও বিচালি কেটে জল তুলে আটটা গরুকে জাব দেয়। এসব করতে সন্ধ্যে। সন্ধ্যের পর মা বাড়ি এসে ভাত রান্না করবে, তবে খেতে দেবে। পেট যে এখুনি জ্বলবে, তার কি? কি খাবে সে, ভেবে পায় না। শুধু সে নয়, পল্টু, হাবু, নন্তু, ননকু, রেণু, নেপু সবাই আসে।

ওদেরও বাড়িতে ওই অবস্থা। দুপুরে ভাত খাও, তারপর বিকেলে হাজার খিদে পাক না কেন, খাবার নেই। তবে সে একটু আসে ঘন ঘন। তার মা বাড়িতেই থাকে না যে। সে কি করবে? ওরা চাইলে পায়, তার তো চাইবার লোকই নেই। অথচ খিদে—কি ভীষণ খিদে! পেটের মধ্যে কেমন যেন কামড়ায় খিদের জ্বালায়।

রাত্রে নালুর জ্বর হ'ল।

ননী পড়ে গেল মুশকিলে। মেয়ের গা দেখলে পুড়ে যাচ্ছে। কি খেতে দেবে, রুগীর পথ্যি

কি আছে ঘরে ? ডাক্তারই বা কোথায় ? এক আছে সুরেন ডাক্তার। দু টাকার কম এ রাত্রে আসবে না। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে বল্লে—যেমন তুমি তেমনি হয়েছে আমার অবস্থা। কি যে করি—

রাত্রে বড্ড জ্বরটা বাড়তে সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে—ও জ্যাঠাইমা—জ্যাঠাইমা—ইদিকে একবার আসুন, খুকীর বড্ড জ্বর—

প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন ঘুম থেকে। অনেক রাত। দেখে বল্লেন—তাই তো, বড্ড জ্বরটা বেড়েছে। কুইনেনের বড়ি আছে আমার কাছে। কাল সকালে খাইয়ে দিও—

—দেখুন তো জ্যাঠাইমা, গরীবের ঘরে কি কাণ্ড—

—তাই তো বাপু। সবই অদেষ্ট তোমার। তোমার বাবা ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। দোজবরে তাই কি? দিব্যি চেহারা। কলকাতায় বাসা। ইন্‌জিনিয়ার লোক। দু পয়সা আয় ছিলো, সইলো না তো কি হবে! অল্প বয়সে কপাল পুড়লো।

—সে তো একশোবার জ্যাঠাইমা। নইলে খুকীকে আজ দুটো পেট ভরে ভাত দিতে পারি নে! এ কি কম দুঃখু! পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি, তাতে আমার এ গাঁয়ে অপমান নেই। এ গাঁয়ের মেয়ে যখন আমি। বলুন—ঠিক কি না?

—সে কথা তো বটেই মা। তার আর কি হবে বলো। সবই অদেষ্ট। আমি গিয়ে কুইনেনের বড়ি নিয়ে আসচি—

—এখন দরকার নেই জ্যাঠাইমা, কাল সকালে পাঠাবেন।

—মা, রাতটা আজ এখানেই থাকবো ?

—না জ্যাঠাইমা। আমি বেশ থাকবো এখন। আপনি মায়ের মত, তাই কথাটা বল্লেন। এ গাঁয়ে ও কথাও কেউ বলবে না।

ননীবালা সত্যিই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে পাঁচ টাকা আর একবেলা ভাত পায় এক থালা। ভাত সে বাড়ি নিয়ে আসে। যে বাড়িতে কাজ করে, তারা ভাত দিতে কৃপণতা করে না, বড় বড় ধানের গোলা তাদের বাড়িতে পাঁচ-সাতটা, বাগান, পুকুর, জমিজমা সব আছে। মা আর মেয়ে সেই এক থালা ভাত খায়।

ননীবালার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক বড় ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। দোজবরে পাত্র হোলে কি হবে, বেশ ছিলেন তিনি দেখতে শুনতে। বয়েসটা একটু বেশী ছিল, ননীবালা গিয়ে দেখেছিল তার বয়সের দুটি সৎমেয়ে আছে তার। সৎমেয়ে দুটি কোথায় থেকে পড়তো, বাড়িতে আসতো খুব কম। মাত্র দু বছর স্বামীর সঙ্গে সে তেতলার বাসায় কাটিয়েছিল পরম সুখে, এর মধ্যে বারকয়েক দেখা হয়েছিল সৎমেয়ে দুটির সঙ্গে।

বড় মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। সে সময়েই স্বামীর অসুখ করলো। বিয়েও হ'ল, মাসখানেকের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। তারপর বড় মেয়ের স্বামী ছোট মেয়েটিকেও নিয়ে গেল সুদূর পশ্চিমে তার কর্ম্মস্থলে।

সৎশাশুড়ী একা বাসায়। ননীকে কেউ বল্লেও না সে কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে। সরবালা তখন এক বছরের শিশু।

দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে, বড় সৎমেয়ে সুললিতা তার ছোট বোন সীমাকে নিয়ে উঠছে মোটরে স্বামীর সঙ্গে। ননীবালা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুললিতা কাছে এসে দাঁড়ালো। ননীর প্রায় সমবয়সী তার এই সৎমেয়েটি, বরং কিছু বড়। সীমাই ননীর সমবয়সী। সুললিতার পরনে দামী ভয়েলের শাড়ি, হাতে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ।

ননীবালা বল্লে—এসো মা, সাবধানে থেকো। চিঠিপত্তর দিও।

ননীবালা পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে, নিজের কথা কিছু বলতে জানে না। সুললিতা বলে-ছিল একদিন তার স্বামীকে—ওর অভাব কি, বাবা সর্ব্বস্ব ওর পেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ননীবালার পেঁটরাতে নগদ বাইশ টাকা আছে। ঐ তার শেষ সম্বল। ভগবান জানেন।

ননীবালার গহনাগুলো সৎমেয়ে দুটি চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের সময়। বিশেষ করে সুললিতা। ওগুলো নাকি তার নিজের মায়ের গায়ের আদরের গয়না। ন্যায্যমত নাকি ওরই প্রাপ্য।

সুললিতা বেশী কিছু না বলেই বিদায় নিলে।

জামাই এসে প্রণাম করলে। এই লোকটিই প্রথম তার সঙ্গে কথা বল্লে যাবার সময়।

—মা, তাহলে আসি।

—এসো বাবা। চিঠি দিও।

—আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একা রইলেন এখানে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে!

—তা তো বটেই।

—চিঠি দেবেন—

—তোমরা আগে দিও।

পেছন থেকে সুললিতা বলে উঠলো—ওগো, দেরি কোরো না। সাড়ে দশটা বাজে।

ননীবালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কোলে তুলে নিলে। বল্লে—খুকী, ওরা চলে গেল। আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল রে? দেওয়ালে স্বামীর ফটোখানার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো।

এর মাস দুই পরে মেয়েকে নিয়ে ননী বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো এবং সেই থেকেই এখানে আছে।

আজ দশ বছর আগেকার কথা এসব।

সৎমেয়েরা কোনো চিঠিপত্র দেয় নি, কোনো খোঁজখবরও নেয় নি।

সরবালা সেরে উঠলো না। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু জ্বর হয়। না আছে ওষুধ, না আছে পথ্যি।

ননী যখন পরের বাড়ি কাজ করতে যায়, তখন সরবালা একাই বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকে। কোনোদিন জ্বর আসে, কোনোদিন আসে না। যেদিন ভালো থাকে, সেদিন কামার-বাড়ির হর আর মতি তার সঙ্গে কড়ি খেলতে আসে। যেদিন জ্বর আসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। একাই শুয়ে থাকে।

ননী কিন্তু খুব শক্ত মেয়েমানুষ। কিছুতেই সে দমে না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে বেটে কাটে রোজ। আগে বেটে কাটতে জানতো না, ক্রমে শিখে ফেললে। এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া দড়ি কাটতো প্রথম প্রথম, ক্রমে এক সের পর্য্যন্ত কাটতে লাগলো। রাত দশটার মধ্যে এক সের দড়ি বেশ সরু করে কাটতে পারে। প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী একদিন এসে বল্লে, বেটে কাটছো মা? বেশ বেশ।

—শিখিছি জ্যাঠাইমা। কিছু আর করা তো চাই।

—কোথায় শিখলি ?

—বাড়িতে। কে আবার শেখাবে। সন্নিসি কাকা বুড়ো বয়সে বেটে কাটতো। তার কাটা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। সেই থেকে শিখেছি।

সরবালার পা ফুললো, মুখ ফুললো, পুরনো ঘুষঘুষে জ্বর। বল্লে—এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে খারাপের দিকে যাবে।

ননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে একদিন অন্তর যেতে লাগলো। ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লে মেয়ের রোগের ইতিহাস।

মাস দুই ধরে একদিন অন্তর কামাই করবার ফলে চাকুরি গেল ননীর। এক থালা ভাত আসে না, টাকা ক'টাও গেল। এমন হ'ল খাওয়া জোটে না। সরবালা সেরে উঠেছে একটু, কিন্তু খাবার অভাবে শুধু কাঁচা পেয়ারা খায় হিমি ঠাকরুণের পেয়ারাতলায় বসে বসে।

এর ওপর এক নতুন বিপদ বাধলো।

যাদের বাড়িতে ননী ঝি-গিরি করতো, কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তারা খুব চটে গেল। তাদের হাতে গ্রামের কনট্রোলের দোকানের কাপড় দেওয়ার ভার। তিন মাসের মধ্যে একখানা গামছাও তারা দিলে না ননীবালাকে। কত অনুনয় করেও তাদের মন গলানো গেল না। বাইরে বেরুনো যায় না আর কাপড়ের অভাবে। তালির ওপর তালি লাগিয়ে যতদিন চালানো যায় চললো, আর চলে না এমন অবস্থায় এসে পৌছুলো।

বিকেল বেলা ননী মেয়েকে বল্লে,—হ্যাঁ রে, বেটের দড়ি কাটতে বসবি ?

—সন্ধ্যের সময় বসবো মা।

—তেল নেই, অন্ধকারে হবে না। এখন বোস। তবু আনা চারেক পয়সা হবে সকালবেলা।

—মা, একটা কথা শুনবে ? আমি ট্যাঁপের বীচি আনবো মাদ্‌লার বিল থেকে। তুমি ট্যাঁপের খই করতে জানো ?

—খুব জানি। তুই আনতে পারবি ? কার সঙ্গে যাবি সেখানে ? বিলের জলে কেউটে সাপের আড্ডা।

—বাগ্‌দি-বৌ যাবে আর আমি যাবো। বাগ্‌দি-বৌ বলছিল, ট্যাঁপের খই খেলে এক বেলা কেটে যাবে। রাত্রে আমরা ট্যাঁপের খই খাবো।

ননীর মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিল। তার আদরের মেয়ে আজ দুলে-বাগ্‌দিদের মেয়ের মত ট্যাঁপের খই খেয়ে রাত কাটানো খুশির ব্যাপার বলে মনে করছে।

মেয়েকে বল্লে,—নালু,—কাউকে বলিসনে যে ট্যাঁপ তুলতে যাবি। এ গাঁয়ে আবার ইদিকে নেই, ওদিকে আছে কি না।

সরবালা চলে গেল বাগ্‌দি-বৌ নীলার সঙ্গে।

ননী বল্লে,—ও নীলি, দেখিস্ দিদি, নালু যেন বেশী জলে যায় না। পদ্ম গাছে বড্ড সাপ থাকে।

সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদ্‌লার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর নালফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শরতের আমেজ আছে রদ্দুরের গায়।

বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপে তিত্‌পল্লার ফুল ফুটেছে। বাগ্‌দি-বৌ বল্লে—নালু, করমচা খাবে মা ? আর এই ঝোপে কত করমচা আছে—

—খাবো খাবো। তবে নীলি একটা কথা। মাকে কিন্তু বল্লে খাবো না। করমচা খাওয়ার

কথা শুনলে মা বকবে। জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন আগে।

—তবে খেও না মা। থাক গে।

—না খাবো। তুই তবে বল্লি কেন? আমি ঠিক খাবো—

এক মুঠো ডাঁশা করমচা চিবোতে চিবোতে নালু ও নীলি নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। নালু তো অবাক। কত বড় বিলটা! কত পদ্ম ফুটে আছে! ওপারে ওরা কি করছে? মাছ ধরছে? কি মাছ? কই, মাগুর?

নালু ডাক দিয়ে বল্লে,—কি দর, ও জেলে কাকা?

—মাছ নেবা খুকী?

—দর বলো না।

—বাছা বাছা বিলির কই, তিন টাকা সের। আর মাগুর মাছ সাড়ে তিন টাকা।

দাম শুনে কিনবার বাসনা উবে গেল সরবালার। বাপ রে, মাসে মা মোটে পাঁচ টাকা মাইনে পেতো, আমি কিনবো তিন টাকা সেরে মাছ! সে পাঁচ টাকাও আজকাল আর পায় না!

হঠাৎ বাগ্‌দি-বৌ বল্লে,—নালু মা, মাছ ধরবো?

—তুমি?

—তুমি আর আমি। একজনের কাপড় খুলতে হবে। তুই ছেলেমানুষ, কাপড় খুলে ফেল।

—যাঃ!

—কে দেখছে? কোন লোক নেই এ দিগরে। বিল আর মাঠ।

নালুর কাপড় খুলে দিয়ে বাগ্‌দি-বৌ ওকে জলে নামালে। ছাঁকা দিয়ে দুজনে মাছ ধরতে লাগলো। পদ্ম গাছের তলায় আর শেওলার দামের মধ্যে। বৃথা পরিশ্রম। আধ ঘণ্টা জল-কাদা মাখাই সার হ'ল। সন্ধ্যা হবার দেরি নেই। বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুর ঝুলছে। ঘুংরি পোকা ঘুর্-র্-র্ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।

নালু বল্লে, চল নীলি। মা বকবে—এমন সময় তার পায়ের তলায় পদ্মবনের মধ্যে কি একটা জিনিস পিছলে গেল, সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

চক্ষের পলকে নালু চেঁচিয়ে উঠল,—সাপ! সাপ!—আমাকে খেয়ে ফেল্লে। ওমা—ওমা—উহু—উ—হু—

নীলি লাফিয়ে এল ওর কাছে—ভয় কি? ভয় কি? কোথায় সাপ?

—আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে—ও নীলি—আমি মরে গেলাম—মাকে বোলো—পা দিয়ে চেপে ধরিছি—উহুহু—

নীলি জলে ডুব দিয়ে তার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নালুর পায়ের তলা দেখতে গেলো এবং পরক্ষণেই প্রায় আধসের-আড়াইপোয়া ওজনের মস্ত একটা মাগুর হাতে তুলে ভেসে উঠলো, হাঁফাতে হাঁফাতে হাসিমুখে বল্লে,—এই দেখো তোমার সাপ—মাগুর মাছে কাঁটা হেনেছে। আর ও ভাবছে সাপে খেয়ে ফেল্লে—সাপ অত সোজা নয়—

—দেখি, দেখি। ওঃ, এ যে মস্ত বড় মাগুর—

নালু পা দিয়ে কাদার মধ্যে সেটাকে চেপে ধরাতে মাছটা উপরি উপরি কাঁটা হেনেছে। পা টনটন করছে ওর। মাছটা ডাঙায় তুলে এনে ওর সব যন্ত্রণা সেরে গেল। ওরা অন্ধকার বাঁশবনের আমবনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নীলি বল্লে,—মাছটা তুমিই নেও সবটা নালু। তোমাকে কাঁটা হেনেছে,—আর তুমিই পা

দিয়ে চেপে ধরলে—

—না নীলি। তোমার আদ্ধেক আমার আদ্ধেক। এসো আমার সঙ্গে—

অন্ধকার উঠোনে পা দিয়েই নালু চেঁচিয়ে উঠলো—মাগো—কি এনেছি মা, মস্ত এক মাগুর মাছ—তার পরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে একজন চমৎকার মেয়েমানুষ সেজেগুজে ওদের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা বল্লে,—এদিকে এসো। দিদি এসেছেন, প্রণাম করো। তোমার মেজদিদি—

নীলি পেছন থেকে জিগ্যেস করলে—কে উনি দিদি ?

ননীবালা গর্ব্বের সুরে বল্লে,—আমার মেজ মেয়ে সীমা। তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে। নালুকে নিতে এসেছে। বলছে, মা, আমার কাছে দাও, আমি নিয়ে গিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ছোট বোনটাকে এভাবে গাঁয়ে ফেলে রাখতে দেবো না। তা আমি বলছি,—তোমাদের জিনিস তোমরা নিয়ে যাবে, আমার বলবার কি আছে! তোমরাই তো ওর অভিভাবক, আমি কি বুঝি, মুখ্যু মা তোমাদের—

সীমা উঠে এসে নালুকে জড়িয়ে ধরলে দু'হাত দিয়ে।

ওর মা বল্লে—তোমার কাপড়ে কাদা লাগবে, বোসো মা সীমা, আমি আগে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিই।—

সীমা বল্লে,—আমি দিচ্ছি। কেন, ও কি আমার বোন নয়? কি চমৎকার দেখতে হয়েছে খুকী! নাম কি বিচ্ছিরি রেখেছো মা! সরবালা! সরবালা আবার কি ? আমি নাম রাখবো শকুন্তলা, কি সুন্দর চোখ দুটি। এক বছরের ছোট্ট খুকী দেখেছিলাম—

সত্যি, আজ কি অদ্ভুত সকালটা হয়েছিল। কার মুখ দেখে উঠেছিল ননী তাই ভাবছে। বিকেলে সে পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসেছে সবে, এমন সময় একখানি ঘোড়ারগাড়ি এসে ওর দরজার সামনে দাঁড়ালো। বেলা তখন আর নেই। ননী একদম চিনতে পারেনি। দশ বছর পরে সে দেখলে সীমাকে। উনিশ বছরের সীমার বয়েস আজ উনত্রিশ। চোখে আবার সোনা-বাঁধানো চশমা।

সীমা রাতে কত কথা বল্লে। সুললিতা দিদি মজঃফরপুরে থাকে তার স্বামীর কর্ম্মস্থলে। সীমা কলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়েছে। বাবার ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, ডাকঘরে টাকা ছিল, সব নিয়েছে বড়দি আর তার স্বামী। সীমা জানতে পেরে বলেছিল, তোমরা গরীব মাকে ফাঁকি দিলে। তাঁর কি আছে ? তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে মানুষ করবেন ? সুললিতা নাকি বলেছিল—যা, যা, বড্ড যুধিষ্ঠির তুমি! সৎমা গেঁয়ো মেয়ে না হলে সেই আমাদের সব গপ্‌পার পুরতো কি না ? সৎমা, সৎবোন কখনো আপন হয় না।

সীমাকে খেতে দিয়ে ননী বল্লে,—কিছু খেতে দেবার ছিল না। ভাগ্যিস, মাগুর মাছটা এনেছিল নালু বিল থেকে ধরে! বুঝলি নালু, তোর মাছ ধরা সাত্যোক হ'ল।

সীমা পরদিন বিকেলে সরবালাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো। যাবার সময়ে বল্লে,—মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বাসা ঠিক করি আগে। বাসাটা ছোট। শকুন্তলার জন্যে (এরই মধ্যেই সে নালুর নতুন নাম দিয়ে ফেলেছে) ভেবো না। ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবো একবার। ও যে আমার বাবার মেয়ে, তা আমি কি ভুলতে পারি মা? পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেণ্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো।—কি বলিস্ শকুন্তলা ?

বিরজা হোম ও তার বাধা

ভৈরব চক্রবর্ত্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেক দিন আগেকার কথা। বোয়ালে-কন্দরপুর (খুলনা) হাইস্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করতো, মানতো। এক প্রহর ধরে জপ-আহ্নিক করতেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের জলস্পর্শ করতেন না, মাসে একবার বিরজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পরে। স্ব-পাক ছাড়া কারো বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন বলতেন শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্ত্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলের পণ্ডিতি করেননি। টোল করাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গবর্নমেন্টের দেয় বৃত্তির দিকে বড় মন চলে যায়। টোল! ইন্সপেক্টরদের খোশামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে-নামে করেও নামছিল না, দিনে-রাতে গুমটের দরুন আমরা কেউ ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পূব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পরে। কিন্তু এত দুর্দ্দান্ত গরম যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্ম ছেলেরা তদবির করছে, মাস্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিল বারো আনা। হেড্ মাস্টার আপিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার, গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বল্লেন,—সার, মেঘ করেছে—

মুরলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি এ অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বল্লেন,—কিসের মেঘ ?

—আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

—কি হয়েছে তাতে ?

—আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভালো হোত! ছেলেরা অনেক দূর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

—বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের আপিসের হেড কেরানীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া তত্ত্বটি তাঁর নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন—বৃষ্টি হবে না ?

—না।

—কেন সার ? বেশ মেঘ করে এসেছে তো ?

—মেঘের আপনি কি বোঝেন ? ওকে বলে তাতমেঘা, ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখেছিলাম এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বল্লাম—বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন—তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

—কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয় ?

—এখন বৃষ্টি হবে আলট্রা স্ট্রটোস্ মেঘে। যাকে বলে শিট্‌ক্লাউড।

—ও!

—তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মনসুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পূবে।

—ও!

আর কোনো কথা বলতে আমাদের সাহস হোল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্থ করলেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো, মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে। তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো ছুটি ঘণ্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো পর্য্যন্ত স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায় আর যাবে। সবাই আমরা আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বল্লেন—দেখলেন সার, তখন বল্লাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হোত না।

মুরলীবাবু বল্লেন—অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematics পড়ালে বুঝতেন। জগতে space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্নেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazette-এ, বুঝলেন?

—সেটা কি?

—এ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন তো? অঙ্কশাস্ত্রে এ্যালিস্ থ্রু লুকিংগ্লাসের পরীক্ষা আর কি। পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে এলেন। অঙ্কশাস্ত্রের কথা উঠলেই স্বভাবতঃ তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে বড় খুশি। হেড্ মাস্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি!

এমন সময় ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশি মন। আমাকে দেখে ডেকে বল্লেন—কেমন ননীবাবু, বিষ্টি হোল তো?

—এই যে চকোত্তি মশায়, নমস্কার। তা হোল।

—হবি না? আজ তিন দিন থেকে হোম করছি বিষ্টির জন্যে। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে, তা ভালো জানা ছিল না। বল্লাম—বলেন কি? হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে!

গোপীবাবু অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলেন—লাগে তাক, না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বল্লেন—আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাস্টার বাবুরা। দেখুন দেখাই।

গোপীবাবু ও আমি দুজনে দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমটে রাত্রে ঘুমুইনি।

গোপীবাবু কেবল বলছিলেন—আজ খুব ঘুম হবে, কি বলেন?

—নিশ্চয়। তার আর ভুল?

ভৈরব চক্রবর্ত্তী আমাদের নিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনের কুণ্ড—বালি বিছিয়ে তৈরি, বেলকাঠ ও জগ্‌গিডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ)

এক পাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো, তামার টাটে নারায়ণশীলা! সিঁদুর বেলপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক ওদিক ছড়ানো।

ভৈরব চক্কত্তি বল্লেন—দেখলেন মাস্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কি না দেখলেন?

গোপীবাবু বল্লেন—আপনি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চয়ই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতার কাণ্ড দেখেছি যে কত। পঞ্চমুণ্ডির আসনে জপ করার সময়!

—বলুন না দু'একটা ঘটনা?

—না, সে-সব বলবো না। থাক গে। কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান-বাড়ি। সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হোল। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড়্ ছড়্ করে পাকা জাম পড়তে লাগল চক্কত্তি মশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জলে ব্যাঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুইনি। এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবার উপায় নেই। বেশ জমিয়ে গল্প শুনবার জন্যে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর মাটির দাওয়ার মাদুরের ওপর বসে গেলাম।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর শুরু করলেন গল্প বলতে:

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পোরেনি। আমার এক যজমান-বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্যে। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকো করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা স্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘরকতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস। যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম বিকেলে। খুব বন-জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইটের তৈরি। মন্দিরের মাথায় বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। প্রকাণ্ড বড় একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে, চামচিকের নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময় আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে শৈল চালভাজা ও ছোলাভাজা নিয়ে এলো তেলনুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্ত্তী বিপত্নীক, তার মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হোল, চলে গেলে চক্রবর্ত্তী মশাই নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্ত্তীও সেই সঙ্গে। এখনও দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল-ছোলাভাজা যে খেতে পারে, তার বহুদিনেও দাঁত নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চল্লেন—এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো-চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—গলায় একরাশ

মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই এবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর, তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলাম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে হোল না। তাছাড়া, আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে।

গৃহস্বামী বল্লেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন মাথায় ওর।

পায়ের ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছুই সেখানে নেই, না একটা-কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পায়ের ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম করি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ইঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এর লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসবো না? সন্ধ্যার কিছু পরে শিবমন্দিরের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে—শুনুন, শুনুন। দুবার কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়লো শিবমন্দিরের মধ্যে ঠিক দোরের গোড়ায় একটি কে মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে।

বল্লাম—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ। ও খুকীর জন্যে বিরজা হোম করবেন না। ও বাঁচবে না।

—কে আপনি?

—আমি যে-ই হই। যদি ভাল চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হোলাম। নির্জ্জন, অন্ধকার, ভাঙা মন্দির। সেখানে এখন মেয়েমানুষ আসবে কে? এমন আশ্চর্য্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা রাগও হোল। আমার ইচ্ছার ওপর বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূরের কথা, অপদেবতাকেও কখনও গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আশীর্ব্বাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈরব চক্রবর্ত্তীকে ভয় দেখানো সহজ নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বল্লাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্রের ফর্দ্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল, গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বল্লেন। এইবার আমার গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোনো ছিরি সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লীগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা, সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ বাড়ির ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট চওড়া এককালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল, আতপ চাল, বড়ি, আলু

আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কাছে কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরি চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আওট-কলার পাতে। তারপর খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল ছাদে আমি একা নেই। এদিক ওদিক চাইলাম, কেউ কোথাও নেই, রাত বেশি হয়েছে, বাড়ির লোকও নিচের তলায় খেয়েদেয়ে শুয়েছে, গ্রামই নিষুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম।

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ ? কালো মত, লম্বা তাল গাছের মত ? এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি, কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে ? ছিল নিশ্চয়ই, নয়তো এখন দেখছি কি করে। কি গাছ ওটা ! সত্যি, যখন চা খেলাম, তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার ওই রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুরগাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে আমাকে ওদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন, কই তো অত বড় একটা তাল গাছ—উঁহু, কই ! নাঃ, দেখিনি।

কিন্তু তাল গাছটা এমনভাবে—ও কি রকম তাল গাছ ? ওকি ! ওকি !

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে উঠে পড়েছি।

তাল গাছ না।

এখনো ভাবলে—এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি, তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মত মূর্ত্তি, তার তত বড় বড় হাত পা—সেই মাপে। মাথাটা একটা ঢাকাই জালার মত, চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে ! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা, যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্ত্তি। তালগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হোল ? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল শাল নারকোল গাছের মত তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্ত্তি বিরাজ করছে সামনে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হোল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই—দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায় ! কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্য্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বারকয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুনতে যত সময় লাগে, ব্যস্। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ ওই বিকট অপদেবতার মূর্ত্তি অন্ধকারে নির্জ্জনে ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি। পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্ব্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হোলে ওরাই পালায়।

নিজেকে তখুনি সামলে নিলাম। তারামন্ত্র জপ শুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে

চেয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুনতে যতটা সময় নেয় ততটা। এর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম, কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচের তলা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

—তখুনি ?

—তখুনি। এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনার কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

বুড়ো হাজরা কথা কয়

সকাল বেলা পাঁচুদাসী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

সারাদিন নৌকো বেয়েছে মাঝি, সন্ধ্যায় বনগাঁ ইস্টিশানে এসে পৌঁছোয়। কতদূরে যেতে হবে তা সে জানতো না। কত জলকচুরির দামের ওপর পানকৌড়ি বসে থাকা, ঝিরঝিরে-হাওয়ায়-দোলা বাঁশবনের তলা দিয়ে দিয়ে নৌকো বেয়ে আসা; জলকচুরির নীল ফুলের শোভায় গলুসি-বল্দিপুরের চর আলো করে রেখেচে; কত বন্যেবুড়োর গাছে গাছে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজে বকের দল, পানকৌড়ির দল বসে ঠিক যেন ঝিমুচ্চে।

পাঁচুদাসীর স্বামী উদ্ধব দাস বেশ জোয়ান-মর্দ্দ লোক। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওর—শক্ত হাত-পা, এই লম্বা এই চওড়া বুক, এই হাতের গুলি, এই বাবরি চুল। জাতে কাপালী, বন-জঙ্গল উড়িয়ে তরিতরকারির আবাদ করে সোনা ফলায়। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ওরা এসে এখানে বাস করচে আজকাল সেই সব গাঁয়ে, যেখানে দশ বছর আগেও ছিল কাঁটাবন, ঝোপ-জঙ্গল। যা-হোক দু'পয়সা রোজগারও করে, বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের দরুণ তরিতরকারির যা দাম।

উদ্ধব বল্লে স্ত্রীকে—চিঁড়ে কতগুলো আনলি ?

পাঁচুদাসী বেশ শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। একহারা, লম্বা, শ্যামল, উনিশ-কুড়ি বয়েস, মুখের ভাবে বেশ একটা কাঁচা লাবণ্য মাখানো—অথচ একা সংসারের সব কাজ মুখ বুজে করে যাবে, চার-পাঁচটা হালের গরুর ডাবায় জল তুলবে কুয়ো থেকে, বাইরের বড় গোয়াল পরিষ্কার করবে, দশ গণ্ডা বিচালির আঁটি কাটবে—তারপরে আবার রান্নাবাড়া করবে—স্বামীর মাঠের পান্তাভাত, গরমভাত, জনমজুরের ভাত—এসো-জন, বসো-জন, গেরস্থর সবই তো থাকে। রাতদুপুরে লোক-কুটুম্ব এলে পাকি আড়াই-সেরা কাঠার এক কাঠা ডবল-নাগরা চালের ভাত বড় তোলো হাঁড়িটায় চড়িয়ে দেয় এক নিমেষে। দেখতে নরম-সরম হোলেও লোহার মত শক্ত হাত-পা।

পাঁচুদাসী একটা ছোট থলে নৌকোর খোল থেকে টেনে বার করে হাতে আন্দাজ করে বল্লে—কাঠা দুই—

—ওতেই হবে!

—আমি তো উপোস। শুধু তুমি আর মাঝি ছোঁড়া খাবে—

—তেঁতুল এনেছিস্ তো ?

—হুঁ-উ-উ।

স্বামীর দিকে বঙ্কিম-কটাক্ষে চেয়ে বলে—যত পারো—

তারপর আবার নৌকা চললো উলুটি বাড়োর কিনারায় কিনারায়, নদীর ঠাণ্ডা শ্যামল জল-ধারা যেখানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে ভাঁটার টানে সাতভেয়েতলার বড় বটগাছের দিকে। উদ্ধব দাস তামাক খাবার জন্যে চকমকি ঠুকচে, মাঝিকে বলচে—ইদিকি এবার বাগুনের বীজপাতা দেওয়া হয়নি দেখচি—হ্যাঁ রে, এ ক্ষেতটা কি জেড়ো কুমড়োর ?

মাঝি বল্লে—জেডো কুমড়ো না হলে কি অত বড়ডা হয়—গ্যাখচো না ?

—চত্তির মাসের শেষ—এখনো ক্ষেতে শীতের কুমড়ো কাটেনি—কেমনধারা চাষা এরা ?··· তামুক খাবা ?

মাঝি ছোঁড়া ঘাড় নেড়ে বল্লে—খাইনে।

—তোর দাদা মনিন্দর তো খায়।

—খায় না ? বলে হুঁকো শোষে। দাদা খায় বলে কি আমাকেও খেতে হবে ?

—না তাই বলচি।

—কি চর এডা ? আর কদ্দুর ?

—চর পোলতা। আর দু'খানা বাঁক।

—বাঁকের মুড়োয়, না বাঁকের মাজায় ?

—এক্কেবারে ও মুড়োয়—

—তাহ'লে এখনো দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা—

পাঁচুদাসী দেখতে দেখতে যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে ওর। বাড়ি থেকে কত দিন একটু বেরুনো হয়নি, শুধুই গোয়াল পরিষ্কার, ক্ষার কাচা, বাসন মাজা, তোলো তোলো ধানসিদ্ধ, গরুর ডাবায় জল তোলা···এ যেন মুক্ত দিনের লীলায়িত অবকাশ! দিন-শেষের হলদে রোদে আকাশ কেমনতর হয়ে উঠচে, নৌকোর গলুইয়ে চলমান নদীর ছলছল রাগিণীর ছন্দ বাজচে, গলা-লম্বা কি পাখী শেওলার মধ্যে জেলেদের পাতা তেঁতুল ডালের হুড়ির ওপর বসে নৌকোর দিকে চেয়ে আছে, নলখাগড়ার বনের গত শীতকালের তিতপল্লার ফল শুকিয়ে শুকিয়ে ঝুলচে, ভুস ভুস করে শুশুক ডুবচে উঠচে জলে নৌকোর এপাশে ওপাশে।

—হ্যাগো, ওগুলো কি, শুশুক না কচ্ছপ ?

—শুশোক—

—আহা-হা, শুশোক বুঝি ?—শুশুক তো বলে। বাঙাল কোথাকার।

পাঁচুদাসী নাগরিকতার আভিজাত্যে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসির ঝিলিক দিয়ে স্বামীর দিকে চায়।

—নাও, নাও, ওই হোল, শুশুকই হোল—

—খিদে পেয়েচে ?

—পাইনি ? সে তুই বুঝচিস নে ? তোকে বলতে হবে ?

ঠিক ঠিক। পাঁচুদাসীর ভুল হয়ে গিয়েচে। ওর বড় খিদে, জোয়ান মরদ পুরুষ, ভূতের মত খাটে দিন-রাত, মাটির সঙ্গে কাজকারবার। একটি কাঠা তার নাম। চিঁড়ে আর তেঁতুল আর লবণ আর আখের গুড়। এক নিঃশ্বাসে কাবার করবে। ওর খাওয়া একটা দেখবার মত জিনিস বটে।

বালাই ষাট, চোখ দিতে নেই।

—আডট পাতায় দেবো তো!

—ভিজিয়েচ ?

—না, এই গামছায় বেঁধে দিচ্চি—নৌকো থেকে জলে ডুবিয়ে খানিকটা বসে থাকো! বাঁশমলা ধানের চিঁড়ে, এখুনি ভিজে কাদা হয়ে যাবে। ওই মাঝি ছোঁড়াকেও দিই ওই সঙ্গে—তাকেও বলো—

চর পোলতা ছাড়িয়ে দু'ধারে বনজঙ্গল, ঘাটবাঁওড়ের চর। ওরা একমনে খেয়ে যাচ্চে, মাঝি নৌকো বেঁধেছে একটা বাঁড়া ঝোপের কোলে। বড় কুবো পাখী পাখা কট্‌পট্‌ করচে আলোক-লতার জালের আর কুঁচকাঁটার জটিল ডালপালার নিবিড়তায়। কাল রাতের সে স্বপ্নটার কথা মনে পড়ায় পাঁচুদাসীর সারা গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আর ঠিক কি কাল-রাতেই!

যে ভোরবেলা নৌকো ছাড়বে মিশেনখালি যাবার জন্যে, ঠিক তার আগের রাতেই!

সারা গা যেন শিউরে ওঠে আনন্দে ও বিস্ময়ে।

স্বপ্ন দেখলে সে যেন ওদের বাড়ির উত্তরদিকে যে কলুদীঘি আছে, তার উঁচু পাড়ে বড় ঘোড়া-নিমগাছটার তলায় অকারণ দাঁড়িয়ে আছে। ঘেঁটু ফুল দুটি আলো করেছে দীঘির পাড়, এখন চৈত্র মাসে তার মাঝে মাঝে কালো শুঁটি ধরেছে—সেখানটাতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে বনের দিকের কোথা থেকে যেন এল। ওর হাঁটু ধরে দাঁড়ালো, ওর মুখের দিকে চাইলো—ওর হাতে একটা পাকা বেগুন ঝোলানো, তাদের ক্ষেতে বীজপাতা দেওয়ার জন্যে যেমন বেগুন টাঙানো থাকে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের আড়ায়। বল্লে—তোর কাছে আমি আসবো মা?

পাঁচুদাসীর নিঃসন্তান বুভুক্ষু প্রাণ বলে উঠলো—আসবি খোকা? আসবি? তোর হাতে ও কি?

—বাগুন। তোদের ক্ষেতে নিড়েন পাট করে পুঁতে দেবানি—

—ওরে আমার সোনা! ক'নে ছিলে এমন মানিক? আয় আয়—

কি চমৎকার মুখখানা খোকার। ওই ছিরু ঘোষের মেজ নাতির মত দেখতে। পাঁচুদাসীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো স্বপ্নের কথা ভেবে। কোথায় হারিয়ে গেল সে মুখ। স্পষ্ট মুখখানা মনে পড়ে এখনো! চোখে জল এসে পড়ে পাঁচুদাসীর।

সত্যি যেন এ স্বপ্ন! সত্যি হবে?

আজই বিশেষ করে ও-স্বপ্ন কেন?

আজ পাঁচটি বছর বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলে নেই, মেয়ে নেই। নিঃসন্তান দাম্পত্য সংসারের আকাশে বাতাসে আড়ালে অবকাশে নিষ্ঠুর কালো ছায়া ফেলে থমথমিয়ে থাকে, অথচ অভাব তো নেই সংসারে। গোলাভরা ধান, ডোলভরা মুসুরি, ছোলা, ক্ষেতপোরা বেগুন, কুমড়ো, ঢেঁড়শের চারা ঠেলে উঠেছে কানিজোলের ক্ষেতে। গত শীতকালে সাতগণ্ডা ভাঁড় খেজুর গুড়ে ভর্তি করে আড়ায় তুলে রেখেছে বর্ষাদিনের জন্যে। হাটুরা হাট চার-পাঁচ-টাকা শুধু বেগুন কুমড়ো বিক্রি। লাউ কী মাচায়! যেমন তেজালো লতা, তেমনি তার ফলন! সূর্য্যমুখী লঙ্কা খেতে দুদিকে মুখ করে যেন চোদ্দ পিদিম জ্বালিয়ে রেখেছিল মাঘের শেষেও।

উদ্ধব দাস খাওয়া শেষ করে থালা ধুয়ে ফেল্লে নদীর জলে। মাঝি ছাড়লে ডিঙি। পশ্চিম আকাশে মেঘ জমে আসচে, কালবোশেখীর দিন, উদ্ধব বল্লে—ও মাঝি, হাত চালিয়ে নাও—ওই অ্যাখো—

মাঝি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈশান কোণের আকাশে চেয়ে বল্লে—তাতমেঘা। জল হবে না।

—তোকে বলেচে!

—দেখে নিও মোড়ল। তাতের মেঘ, বাতাস উঠতি পারে, জল হবে না।

—বাতাস উঠলেও তো মুশকিল। হাত চালিয়ে নাও—এবার ক'খানা বাঁক ?

—আর একখানা। ওই পাইকপাড়ার বটগাছ থেকে শুরু হোল বাঁকখানা। ওর ও-মূড়োর—

পাঁচুদাসীর মজা লাগে ওদের কথাবার্ত্তা শুনতে।

বাড়ি থেকে বেরুলে দুশো রগড়। আজ চরের কাশবনে চড়ুইভাতি চাঁদের আলোর তলায়। বাঁশের চোঙে ফুঁ পেড়ে ধোঁয়াভরা রান্নাঘরে ভাত রান্না নয়। কি বিশ্রী এবারকার তেতিত্ত বীজ গাছের চ্যালাগুলো। আগুন ধরতে কি চায়! ফুঁ পেড়ে পেড়ে চোখ রাঙা হয়ে যায় একেবারে। সেই ছোট্ট খোকা যেন ওই চরে কাশের ডগায় ডগায় ফড়িং প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। তাকেই ও দেখচে সর্ব্বত্র। সব সময়ই তার কথা মনে পড়চে।

স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?

যদি সত্যি হয়! কে বলতে পারে ?

ওর সারা গা আবার যেন শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ওই দূরে বাঁ-দিকের পাড়ে একটা ইটের পাঁজা। অন্যদিকে হলদে রঙের কোঠাবাড়ি একটা। বড় বড় গাছের তলায় আরও দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে। পাঁচুদাসী জিগ্যেস করলে—হ্যাগা, ওই বাড়িটা কাদের ? ভালো বাড়ি।

মাঝি বল্লে—ওটারে বলে ডাক-বাংলা। সাহেবরা এসি থাকে।

উদ্ধব দাস বল্লে—সেবার বাগুন বিক্রি করতি এসে দেখি ওর বারান্দায় গোরা সাহেব পিলপিল করচে। এই সঙ্গে মটোর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিড় কি! সাহেবের ছেলেরা ছুটোছুটি করচে ইদিকি ওদিকি।

পাঁচুদাসী কি ভেবে বল্লে—হ্যাগা, সাহেবদের ছেলেরা দেখতি কেমন ?

—খুব ফরসা।

—কেমনধারা ফরসা ?

—সে কি বোঝাবো তোরে ? তুই পাড়াগেঁয়ে ভূত। সাহেবের কি বুঝিস্ ?

—আহা-হা! আর উনি একেবারে শহুরে বাবু! সেই একবার বাগুন বেচতি তো এসিছিলে—বলে জন্মের মধ্যি কম্ম, চত্তির মাসে রাস!

ওরা ডাঙ্গায় জিনিসপত্র নামালো। হেঁটে যেতে হবে ইস্টিশানে—আধকোশটাক ডাকবাংলার ঘাট থেকে। একটা ভারি বোঁচকা, এক বোঝা ডাঁটা আর কুমড়ো শাক এই সঙ্গে। পাঁচুদাসী বোঁচকা কাঁখে পেছনে পেছনে চললো—আগে আগে উদ্ধব দাস! মাঝি রইল ঘাটেই, ঝাল-তলায় সে রেঁধে-বেড়ে খাবে, নৌকোতে শুয়ে থাকবে রাত্রে—আবার কাল রাত দশটার সময় ওরা ফিরবে, নৌকো ছাড়া হবে তখন।

উদ্ধব দাস বল্লে—তোমার কি কি লাগবে বল, কিনে দিয়ে যাই—

—হাঁড়ি একটি, সরা একটি,—আর খলি মাছ যদি বাজারে পাই, মাছের দামটা দিয়ে যাও।

—মুসুরি ডাল খাবা। এক সের ডাল দিইচি আবার মাছের পয়সা; ভারি বড়নোক দেখেচো মোরে!

মাঝি অনুনয়ের সুরে বল্লে—দিয়ে যাও মোড়ল। আমাদের ওদিকি খয়রা মাছ খেতি পাইনে। যদি কাল বাজারে খয়রা মাছ পাই—চার আনা দ্যাও।

পাঁচুদাসী স্বামীকে ধমক দিয়ে বল্লে—দ্যাও না গো ওকে। ছেলেমানুষ। যাচ্ছি একটা শুভ কম্মে। যা খেতি চায় ওর প্রাণ, দাও ওকে। চারগণ্ডা পয়সা দাও মাছের আর দু-আনা

দাও রসগোল্লার—

উদ্ধব দাসকে অগত্যা নগদ ছ'আনা পয়সা দিতে হোল মাঝির হাতে। মেয়েমানুষের নাই পেলে কি আর রক্ষে রাখে লোক? যাকগে।

কখন গাড়ি আসে নাভারনের ওরা কিছুই জানে না। স্টেশনে গিয়ে জিগ্যেস ক'রে জানা গেল নাভারনের গাড়ি আসবে কাল ভোরবেলা। কেউ জানে না সেকথা। পাঁচুদাসী স্বামীকে বকলে, না জেনেশুনে আসো কেন? নৌকোতে রাত কাটালে দিব্যি হোত। এখানে কি শোবার জায়গা আছে? এত ভিড়, এত লোকের চিৎকার—মাগো, ইস্টিশান নয়—যেন কুঁদিপুরের গাজনতলার আড়ং বসেচে।

উদ্ধব দাস অভিজ্ঞতার অটুট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে—তুই থাম দিকি। তুই চিনিচিস্ কেবল কুঁদিপুরের গাজনতলার আড়ং—দেখলি বা কি জীবনে?

—তুমি খুব দেখেচো তো? তা হোলেই হোলো—

—তোর চেয়ে তো বেশি। আমি আসিনি বনগাঁ ইস্টিশান? শেয়ালদ' গিইচি আলু-পটলের আড়তে। এই রেলে চড়ে যেতি হয়। সাড়ে চোদ্দ আনা ভাড়া। এই দিকি—

উদ্ধব দাস আঙুল দিয়ে কোলকাতা লাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা দেখালে।

উদ্ধব দাস জিগ্যেস করে একজন কুলীকে—বলি শোনো, একটু ভালো জল পাওয়া যায় ক'নে?

কুলী আধা বাংলা আধা হিন্দিতে যা বলে গেল তার অর্থ এই—ভালো জল আমি পাব কোথায়? নিজে খুঁজে ছাখো।

একজন ওদের বলে দিলে, ওভারব্রিজের ওপর বিছানা করে শুতে। ওখানে হাওয়া আছে, মশা লাগবে না, প্ল্যাটফর্ম্মে বেজায় মশা।

ওরা তাই করলে বটে, কিন্তু রাতে পাঁচুদাসীর মোটে ঘুম হলো না। হৈ-চৈ চিৎকার, রেলগাড়ি আসচে সারা রাত ধরে। কত কষ্টে ভোর হোল। রাত আর পোহায় না।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে পাঁচুদাসী বল্লে—হ্যাগো, ওই চা কি লোকের খাবার সময় অসময় নেই গা? সারা রাতই চা গরম! লোকে ঘুমুবে না চা খাবে? চক্ষেও কি ওদের ঘুম নেই? এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডও যদি কখনো দেখে থাকি!

ভোরে নাভারনের ট্রেন এল। লোকজন সব উঠলো। ওরাও উঠল। আবার সেই ছোট খোকার মুখ মনে পড়লো পাঁচুদাসীর। সেই ছোট্ট সুন্দর মুখখানি, সম্মুখের এক অজানা দিনের কোণ থেকে উঁকি মারচে, কিসের আড়াল ওদের দুজনের মাঝখানে? হাজরাতলার বুড়ো হাজরা ঠাকুর কি সে আড়াল দূর করতে পারবেন!

নাভারন ছোট্ট ইস্টিশান।

সামনের চওড়া পাকা রাস্তা গিয়ে ওধারের বড় রাস্তায় মিশেচে। বড় বিলিতি চটকা-গাছের সারি পথের দুধারে। পাঁচুদাসী বল্লে—ও রাস্তা কোথাকার গো?

উদ্ধব দাস জানে না। বল্লে—কি জানি? বলতে পারিনে।

একজন গাড়োয়ান ধানের বস্তা নামাচ্ছিল গরুর গাড়ি থেকে, সে বল্লে—ওই রাস্তা? ও গিয়েছে যশোরে, ইদিকে কলকাতায়। ওর নাম যশোর রোড।

যশোর রোড! যশোর রোড! পাঁচুদাসীর মুখে হাসি এসে পড়ে অকারণে! কি নাম রে বাপু!

উদ্ধব দাস সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে বললে—নিশেনখালির হাজরাতলায় নিয়ে যাবা?

—তা যেতি পারি। ক'জন ?

—দুজন। এই তো দেখতে পাচ্চ।

—আজ পরবের দিন, সেখানে বড্ড ভিড় হয়, কত দেশ থেকে হাজরাতলায় পুজো দিতি লোক আসে। পাঁচটি টাকা ভাড়া লাগবেক যাতায়াতে।

এমন সময় পাঁচুদাসী লক্ষ্য করলে দামী শাড়ি পরনে একটি সুন্দরী বৌ স্টেশনের বাইরে জামতলাটায় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গে একটি ফরসা জামাকাপড় পরা ভদ্রলোক, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। পেছনে পেছনে একটা চাকর গোছের লোক, তার হাতে চামড়ার একটি বাক্স। বৌটি তাকে বল্লে—তুমি কোথায় যাবে ?

পাঁচুদাসী সঙ্কোচের সুরে তাকে বল্লে—নিশেনখালির হাজরাতলায়—

বৌটি পেছন ফিরে তার সঙ্গী ভদ্রলোককে বল্লে—ওগো, এরাও সেখানে যাচ্ছে—

ভদ্রলোকটি উদ্ধব দাসকে বল্লে—তোমরাও হাজরাতলায় যাবে ?

—হ্যাঁ বাবু। আপনারাও সেখানে যাবেন ?

—আমরাও সেখানে যাচ্চি। কত দূর ?

—তা তো বাবু জানিনে। আমরা নতুন যাচ্চি। আজ মঙ্গলবার, সেখানে আজ পুজো দিতে হয়, তাই যাবো। আমাদের বাড়ি অনেকদূর এখান থে।

—তাই তো! এ যে অজ পাড়াগাঁ দেখছি। কোথায় কতদূর যেতে হবে না জানলে এখন করি কি—

—বাবু, এই গরুরগাড়ি সেখানে যাবে বলছে। পাঁচ টাকা ভাড়া। চলেন ওই গাড়িতেই সবাই যাই। আপনারা এখন গাড়ি পাবেনই বা ক'নে, মাঠাকরুণ না হয় গাড়িতে উঠুন, আমি হেঁটে যাবো এখন।

বেলা বারোটার সময় ওরা একটা আধমজা নদীর ধারে এসে হাজির হোল। নদীর নাম ব্যাং নদী—দুধারে বনজাম আর হিজল বাদামের বন, বাঁশনি বাঁশের বন আর বেতঝোপ। অত বেলা হোলেও রোদ নেই নদীর এপারে, দিব্যি ঘন ছায়া। গাড়োয়ানের মুখে শোনা গেল নদী পার হয়ে আধক্রোশটাক গেলেই নিশেনখালির হাজরাতলা।

ইতিমধ্যে বৌটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে পাঁচুদাসীর। ওর নামটি বড় কটোমটো, মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়া কঠিন—ম-ন-জু-লা। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যিনি এসেছেন উনিই স্বামী, কলকাতায় চাকুরি করেন। পয়সাওয়ালা লোক, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি আছে। বিয়ে হয়েচে আজ চার বছর, ছেলেপুলে না হওয়াতে হাজরাতলায় পুজো দিতে চলেছে ওদেরই মত।

ম-ন-জু-লা বলছে—আচ্ছা ভাই, ঠাকুর খুব জাগ্রত, না ?

—শুনেছি তো দিদি। আমারও তো সেইজন্যিই আসা। যদি উনি মুখ তুলি চান—

—আমারও তাই। তোমায় বলতে কি, সব আছে কিন্তু মনে সুখ নেই। উনি আবার এসব মানেন না, আমি জোর করে নিয়ে এসেছি। বলি চলো, পাঁচ জায়গায় দেখতে হয়—এতে আর কষ্ট কি ? আমার তো দিব্যি লাগছে ভাই। কি চমৎকার নদীর ধারটা—কলকাতা থেকে কতকাল কোথাও বার হইনি ভাই—মধুপুর যাওয়া হয়েছিল সেবার পুজোয়—দু'বছর হোল—

—সে কোথায় দিদি ? মধুপুর ?

—পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণায়। পাহাড় আছে, শালবন আছে সেখানে। বেশ ভালো জায়গা—কিন্তু এ জায়গাও আমার বেশ ভালো লাগচে—কত পাখীর ডাক! পাখীর ডাক শুনে

যেন বাঁচলাম কত দিন পরে। কেমন সুন্দর, না?

পাঁচুদাসী বৌটির কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে কৌতুক অনুভব করলে। পাখীর ডাক শুনে শুনে তার কান পচে গেল। সে আবার কি একটা জিনিস এমন তা তো জানা নেই! যত আজগুবী কাণ্ড! ভদ্রতার খাতিরে সে বল্লে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক। চলুন আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে ঝিটকিপোতায়। দিনরাত পাখীর কিচিরমিচির শোনাবো।

তারপর ওরা ব্যাং নদী জীর্ণ খেয়ায় পার হয়ে ওপারে চলে গেল। আরও কয়েক দলের সঙ্গে দেখা হোল—আশপাশের গ্রাম থেকে তারাও চলেছে, আজ মঙ্গলবারে হাজরাতলায় পুজো দিতে। গাড়ি নদীর ওপারেই রয়ে গেল। এ পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা যজ্ঞিডুমুর গাছের তলা দিয়ে বনঝোপের পাশ কাটিয়ে পথ চলেছে উত্তর-মুখে—বাবলা গাছে ভর্ত্তি সবুজ মাঠের মাঝখান বেয়ে।

পাঁচুদাসীর বড় আমোদ লাগছিল। কত লোকের সঙ্গে দেখা, কত দেশ-বিদেশ। কলকাতার বৌটিকে ওর বড় ভালো লেগেছে—হোক না কটোমটো নাম, কি ভালো মেয়ে, কি মিষ্টি কথা, অমায়িক ব্যবহার।

আর একটি বৌ এসেছে। ওর নাম তারা, জাতে সদগোপ। বাড়ি বনগাঁর কাছে হরিদাস-পুর। তার ছেলে হয়ে মরে যাচ্ছে—গত পৌষ মাসেও একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে ওর—সেই ছেলের কথা বলে আর কাঁদে।

ম-ন-জু-লা বোঝাচ্ছে—কেঁদো না ভাই। সবই ভগবানের ইচ্ছে। আবার কোলজোড়া খোকা পাবে বই কি—এখনো তুমি ছেলেমানুষ—তাঁর নাম করে চলো, কাজ হবে ঠিক। কি বলো ভাই?

ও পাঁচুদাসীর দিকে চেয়ে শেষের প্রশ্নটা করলে। কিন্তু পাঁচুদাসীর মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে সেই কলুদীঘির ধারে বড় তুঁততলায়—হাতে পাকা বীজবেগুন, চাঁদমুখখানা ওর দিকে উঁচু করা, কত বিঘের ক্ষেতের বীজ!—দুহাতে ছড়ানো···ও ধন সোনামণি, তুমি আসবা, আসবা আমার কুঁড়েঘরে আমার কোলজোড়া হয়ে। আসবা আঁধার পক্ষের শেষ রাতের অন্ধকারে, পাখীপক্ষী যখন ডেকে উঠবে আমবনে, বাঁশবনে, কুল্লো পাখী ডাকবে শিমুল গাছের মগডালে বিলবাওড়ে মাছ ভেসে উঠবে কেউটে পানার দামের মধ্যি! বুড়ো হাজরার দোহাই, পেঁচোপাঁচীর দোহাই···এসো খোকা, এসো···

একজন কে বলচে—আঁচল পাততে হয় হাজরাতলায়—নদীতে নেয়ে আঁচল পেতে ঠাকুর-তলায় বসে থাকতে হয়—

পাঁচুদাসী বল্লে—কেন?

আঁচলে ফল পড়ে, ফুল পড়ে—যার যা হবে তাই পড়ে।

কথা চাপা পড়ে গেল। সবাই বলচে ওই হাজরাতলা দেখা যাচ্ছে—

ওরা পৌঁছে গেল।

নদীর ধারে মাঠের মধ্যে চারিধারে বহু প্রাচীন ষাঁড়া গাছের সারি নিবিড় ঝোপ তৈরী করেচে ওরা জড়াজড়ি করে। বেড়ার মত আড়াল করেচে···ওর ওদিকে কিছু চোখে পড়ে না। সেই ষাঁড়া ঝোপের বেড়ার ধারে একটা বড় ষাঁড়া গাছই হচ্ছে হাজরাতলা, বৃদ্ধ হাজরা ঠাকুরের স্থান।···

সেই গাছতলায় পুজোর যোগাড় হয়েছে···পুরুতঠাকুর বসে আছে। চাল, কলা, ছোলা-ভিজে, পেঁপে···ফুলের রাশ। লোকে লোকারণ্য হাজরাতলায়। দশ-পনেরোখানা গরুরগাড়ি

দাঁড়িয়ে আছে—এপার থেকে যারা এসেছে তাদের গাড়ি।

ঝাঁড়া ঝোপ ঘেরা মাঠের বাইরে দোকান বসেচে···মুড়িমুড়কি, ফুলুরি, কাটিভাজা, ছোলা-ভাজা। পিঁ-পিঁ বাঁশি বাজচে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে···খেলনা বিক্রি হচ্ছে। মাটির ছোবা, পুতুল, রাধাকেষ্ট, শিবঠাকুর, ঘোড়া—মণিহারি দোকানে ফিতে, কাঁচের চুড়ি, চিরুনি বিক্রি হচ্ছে···দু'তিনখানা দোকানে পাঁপর ভাজা হচ্চে। তেমনি খদ্দেরের ভিড়—বেশির ভাগ ছোট ছেলেমেয়ে আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক ঝি-বৌ বিনা কারণেই পুজো দেখতে এসেচে হাজরাতলায়।

বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে। পুজোর বাজনা বেজে উঠলো।

পুরুতঠাকুর বল্লেন—যাও মা-ঠাকরুণরা স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে সব হাজরাতলায় আঁচল বিছিয়ে বসো—

কলকাতার বৌটি আর পাঁচুদাসী একসঙ্গে নেয়ে উঠলো নদী থেকে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিতে হবে, উত্তর মুখ হয়ে হাজরা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে হবে।

ম-ন-জু-লা চুপি চুপি বল্লে—ভাই, আমার বুক কাঁপচে।

—কেন দিদি?

—আমার বড় সাধ—তোমাকে বলচি ভাই। বুকখানা হুহু করে মাঝে মাঝে। আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী যাদের বিয়ে হয়েছিল, সবার একটি দুটি সন্তান হয়ে গিয়েচে—ওঁর মনে বড় কষ্ট—

—বাবার দয়া দিদি। হয়ে যাবে, চলো শীগগির করে যাই—

পাঁচুদাসীর বড় মায়া হয় বৌটির ওপর। কি চমৎকার মানিয়েছে ওকে নীল রং-এর ফুল তোলা ভিজে শাড়ি পরে···দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলও ওকে · সুন্দরী বটে··· পাড়াগাঁয়ের হাটে-মাঠে অমন সুন্দরী মেয়ে চক্ষে পড়ে কখনো? আহা, মোমের গড়ন হাত দুটি কখনো কি গোবরের ঝুড়ি ধরতে পারবে? গড়ে ধান ভেনে দিতে পারবে—আঙুল ছেঁচে যাবে তা হোলে। ও-হাত ধান ভেনে দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি।

অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ জন বৌ, সবাই তরুণী, ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে হাজরাতলায় দাঁড়িয়ে। পুরুতঠাকুর সকলের মাথায় কুশিতে করে জলের ছিটে দিয়ে বল্লেন—যাও সব মায়েরা, এইবার আঁচল পেতে বসো গে—

একজন বল্লে—কতক্ষণ বসে থাকবো বাবাঠাকুর?

—চোখ বুজে বসবে সবাই। যতক্ষণ না আঁচলে কিছু পড়ে ততক্ষণ বসবে মা তোমরা। চোখ চেও না কেউ, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো না যেন অধৈর্য্য হয়ে।

চৈত্র মাসের খর রোদে মাঠ তেতে উঠেচে—বাতাস যেন আগুনের হলকা, তবুও হাজরা-তলায় বেশ ছায়া আছে তাই রক্ষে—পাঁচুদাসীর জলতেষ্টা পেয়েচে। জল খাওয়ার কথা এখন ভাবতে নেই। বুড়ো হাজরা দয়া করুন। ঢোল বাজচে কাঁসি বাজচে। ট্যাং ট্যাং ট্যাং—কাঁইনানা, কাঁইনানা,···না, ও সব ভাবতে নেই···হাজরাঠাকুর অপরাধ যেন না নেন। পাঁচু-দাসী আবার মনকে স্থির করবার চেষ্টা করল।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পাঁচুদাসী এর মধ্যে বার তিনেক চোখ চেয়ে দেখেচে। আশপাশে হাজরাঠাকুরের কোন মন্দির বা মূর্ত্তি নেই। একটা মস্তবড় ঝাঁড়া গাছ অনেকদূর জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় ছড়িয়ে পড়া শুকনো পাতার উপর তরুণী বৌয়ের দল চোখ বুজে আঁচল বিছিয়ে

বসে···কোনো লোক নেই এদিকে···পুরুতঠাকুর রয়েছেন দূরে ও গাছের তলায় পুজোর জায়গায়। ও ভাল করে চেয়ে দেখলে গাছতলায় একখানা সিঁদুর মাখানো ইট পর্য্যন্ত নেই।

পাঁচুদাসী আবার চোখ বুজলো।

হঠাৎ ওদের সারিতে একটি বউ অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো—আমার আঁচলে একটা কি পড়লো!

পাশের একজন উপদেশ দিল—চোখ চেয়ে স্থাখো না কি!

একটা ষাঁড়া কল।

বৌটি সারি থেকে উঠে চলে গেল পুরুতঠাকুরের কাছে, যেখানে পুজো হচ্চে। সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো পাঁচুদাসীর এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকও কেঁপে উঠলো। কি জানি ভাগ্যে কি আছে!

আরও দুটি বৌ সারি থেকে উঠে চলে গেল—একজনের ফুল আর একজনের ফল পড়েচে। ইতিমধ্যে আর একজন কেঁদে উঠলে ডুকরে। সবাই বল্লে—কি হোল গো, কি হোল?

—আমার আঁচলে চুল আর ঢিল পড়েছে গো। পোড়া কপাল গো!

সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেল সারি থেকে। বুড়ো হাজরা নিষ্ঠুর, দয়া করলেন না তার উপর। কি অপরাধ হোল বাবার চরণে! পাঁচুদাসীর বুক কেঁপে ওঠে আবার। বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। একটা বৌ ঢিপঢিপ করে মাথা কুটছে মাটিতে ওর সারিতে। ওর আঁচলেও তাহলে চুল আর ছাই পড়েছে।

দয়া করো বাবা হাজরা, বুড়ো হাজরা দয়া করো!

বেলা ঘুরে গিয়েছে। আরও কতক্ষণ কাটলো। হঠাৎ পাঁচুদাসীর বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হবার উপক্রম হোল। টপ করে একটা কি পড়লো ওর আঁচলে! ফল? ষাঁড়া ফল? চুল বা ছাই পড়বার শব্দ কি অমন! ঢিল!

···বাবা হাজরাঠাকুর!

সবাই মিলে ব্যাং নদীর খেয়া পার হচ্ছে। উদ্ধব দাস স্ত্রীকে বল্লে—তুই কি পেলি?

পাঁচুদাসী বল্লে—কল, একটা ষাঁড়া কল। হাজরাঠাকুরের দয়া গো—

ওর মন ভালো না। ম-ন-জু-লা ফিরে গিয়েছে আগের খেয়ায়। ও পেয়েছিল জট-পাকানো চুলের নুড়ি। পুরুতঠাকুর আর একবার বসতে বলেছিলেন আঁচল পেতে। আবারও সেই চুলই পড়েছে তার আঁচলে। পুরুতঠাকুর বলেছেন—মা, আমি কি করবো, আমার ওতে হাত নেই। তোমার অদৃষ্টে সন্তান থাকলে ফুল-ফলই পড়তো—বাড়ি ফিরে যাও মা—কি করবো বলো—

ম-ন-জু-লার কান্না দেখে ওর নিজের চোখে জল এসেছিল। সত্যি, কত আশা করে এসেছিল! হাজরাঠাকুর কি করবেন? যা অদৃষ্টে আছে তাই তিনি বলে দেবেন মাত্র। বেচারী ম-ন-জু-লা! অত টাকা ওদের!

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ব্যাং নদীর পশ্চিম গায়ে বনজাম আর হিজল আর বেত ঝোপের আড়ালে। পাঁচুদাসীর মন আনন্দে ভরে উঠলো হঠাৎ। খোকা আসচে, হাতে তার বীজবেগুন, কত ক্ষেতে ক্ষেতে শক্ত হাতে সে লাঙ্গল দেবে, বেগুনের চারা তুলে পুঁতবে হাপর থেকে, সোনা ফলাবে মাটির বুকে। বুড়ো হাজরা বলবার আগে স্বপ্ন দেখেছে তার আসবার। সে আসচে।

কাশী কবিরাজের গল্প

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিগ্যেস করলেই বলে—এই যাচ্চি সনেকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বল্লে—নৈহাটি যাচ্চি রুগী দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাবো।

—সেখানে আপনার রুগী আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছর খানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বৌকে ধানসেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমলো। বৃষ্টি আসে-আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমায় উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বল্লাম—ও কবিরাজ মশাই—শুহুন শুহুন, কোথায় চল্লেন? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসলো।

বল্লে—একটু রাণাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগী ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজী। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্-রা টেক্স্-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখই এক্স্-রা—

আমার হাসি পেলো। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস কর কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বল্লেই কি লোকে তোমাকে বড় কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এলো। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহোলে বেশ বেড়েচে?

—বাড়বে কি ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাবো।

—বলেন কি!

—এই জন্তেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে এ পাগল বলে কি? বড় বড় রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েছি।

—বটে!

—তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জান কিনা,—সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মান?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌঁছুলো! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বল্লাম—যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকাল গিয়েচে!

রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বল্লাম। চা এসেচে? তাহ'লে একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়লো, চারিদিক অন্ধকার করে এলো। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করলো।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে ব'লে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এলো।

আমি বল্লাম—আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো—

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড় দেউড়ি, দু-তিন মহলা বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড় বারান্দা। ওদিকে ঠাকুর-দালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এ সবই ভগ্নপ্রায়—পূর্ব্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চুড়োর কাটলে বন্য শালিখের গর্ত্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড় একটা আধ-মজা দীঘি পানায় ভর্ত্তি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড় পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাব হোল।

আমি বল্লাম—কি ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হোল, এ বড্ড অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষি। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সে কথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালীতে ঝাড়-ফুঁক করে শেকড়-বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়ালো। রোগী কথঞ্চিত সুস্থ হয়ে উঠলো।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলো, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামী নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান,—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটী।

আমি বললাম—বড়লোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদী ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরনো চাল-চলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বৌ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদার-বাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকলো কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হলো, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক্। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কি দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বল্লাম—রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এলো, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্য্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কি করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে করসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিলো?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিলো?

—কোনদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্ব্বিরোধী ভাল লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ব-বোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কি করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখল, সেই বৌটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। বৌটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম—মাঠের দিকে গেলো একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কি ভাবলেন?

—আমি আর কি ভাববো মশাই, একেবারে অবাক্। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জ্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বল্লে—শীগ্গির আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক, তখনকার মত ব্যবস্থা করতে হোলো। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠলো। তখন আবার এসে শুয়ে পড়লো কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

পরের দিনমান রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চললো। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়ই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমন কি কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড় দীঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার

আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হোল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশী···। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিলো না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করলো কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হোতে লাগলো। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেলো ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখলো কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বৌটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কি কাশী কবিরাজের বড় বিস্ময়বোধ হোল। কি সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেলো, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বৌটি ওর ঘরে এসে ঢুকলো। আমি বল্লাম—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিলো?

—বাড়ীতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হ্যারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইলো। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বল্লে—তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখানে থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগী দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কি করে যাবো?

—তুমি এ রুগী বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কি করে আপনি জানলেন রুগী বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবোই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনো ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি। সে আমতা-আমতা করে বল্লে—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হোল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্চে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবোই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কি ব্যাপারটা সামনে ঘটেচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বল্লে—মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বৌটি বললেন—তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সব

দিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এ পক্ষের স্ত্রীকে ব'লে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হোল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথ-রাত্রির শুভ্র-জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম—বলেন কি!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্ত্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মত। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্ত্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হোল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হোল।

মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এলো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিলো। তখনকার মত সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বল্লে—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বল্লাম—বাইরে এসে সব কথা বল্লেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বল্লাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বল্লেন,—আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি।

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বল্লেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখাবো। এ সংস্রবে আর আনবো না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেলো।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। এগারো দিনের পর কাশী কবিরাজ পথ্য দিলেন তাঁর রোগীকে।

বল্লাম—ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?

—না!

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে

শহর বা তীর্থের জাঁকজমক গোলমাল আমার ভালো লাগে না। আমি চিরদিন নির্জ্জন ভালোবাসি। তাই পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল দেখে বেড়াই। বনে-জঙ্গলে ভগবানের সৃষ্টির কি সৌন্দর্য্যই না দেখি!

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস,—আমি তখন ঘাটশীলায়। ছোটনাগপুরের জঙ্গল দেখবার

সাধ হোল। মিস্টার সর্দ্দার সিংও রাজী হলেন। আর দেরি নয়—দুজনে বেলা তিনটার ট্রেনে ঘাটশীলা ছেড়ে চক্রধরপুরে এলুম। রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে দুজনে চললুম হরদয়াল সিং-এর বাড়ি—সেখানে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রেস্তোরাঁতে গিয়ে দুজনের রাত্রিযাপন।

সকালে হরদয়াল সিং-এর বাড়ি থেকে এলো ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা মূলো—চায়ের সঙ্গে সেই মূলো খেয়ে দুজনে মোটরে করে বেরিয়ে পড়লুম। ভগবানের অসীম দয়া—তাই এমন সব বন্ধু পেয়েচি। না হলে এমন আরামে আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যেতো কে ? এলুম চাঁইবাসায়।

চাঁইবাসা জায়গাটি বেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি হ্রদ আছে। তেমন বড় না হোলেও ভারি সুন্দর। উঁচু-নীচু পথ—চমৎকার বাঁধানো। পথের একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে টানা জঙ্গল। সরকারী ফরেস্ট। এ জঙ্গলে ছোটখাটো জীবজন্তু আছে। পথে সঞ্জয় নদী। নদীর উপর প্রকাণ্ড পুল। পার হয়ে জঙ্গলের পথে ষোল মাইল আসবার পর শলাই বাংলো। দু-বছর আগে এখানে এসেছিলুম। বাবলুর মা রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেকথা মনে পড়লো।

পাশে ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম বাকৈলা। বাকৈলায় হপ্তায় দু-দিন হাট বসে—নানা জিনিস বিক্রি হয়। এ হাটে বাবলুর মা একখানি চাদর কিনেছিলেন—এখানকার তৈরী চাদর। জঙ্গলের দৃশ্য এখানে অদ্ভুত—অপরূপ সৌন্দর্য্য। নিস্তব্ধ বনভূমি—যেন সৌন্দর্য্যের পশরা উন্মুক্ত করে রেখেছে। যাকে বলে ভীমকান্তি দৃশ্য।

বাকৈলায় পৌছুলুম বেলা তখন একটা। ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো আছে। সেখানে উঠলুম। সঙ্গে খাবার-দাবার ছিল—খেয়ে একটু বিশ্রাম করে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে বেরুলুম জঙ্গল দেখতে। বহুদূর চলে গেলুম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো—চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। আকাশে একটুখানি চাঁদ গাছপালার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে, দেখা যায় না। পৃথিবীর মাথার উপর আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে—আকাশের গায়ে অপূর্ব্ব নক্ষত্রশ্রেণী! মনে হচ্ছিল—যেন আকাশে দেওয়ালির দীপ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করেছিলুম। মনে হচ্ছিল, ভগবানের কি মহাশিল্প এই পৃথিবী! বাবলুর কথা মনে হোল—তার যেন চোখ খোলে। সে যেন ভগবানের এ শিল্প চোখে দেখতে পায়।

বাংলোয় ফিরলুম খানিক রাত্রে। পরের দিন সকাল আটটায় আবার বেরুলাম জঙ্গলের পথে। দুধারে কি ঘন জঙ্গল—আর গাছে গাছে কত রকমের লতাপাতা! গাছপালার আড়ালে ওদিকটা যেন লুকোনো আছে। পথ-চলা পথিক পথে যেতে যেতে জঙ্গলের সব ঐশ্বর্য্য দেখে যাবে, সে উপায় নেই। সে ঐশ্বর্য্য পুরোপুরি দেখতে হলে পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। কত রকমের গাছ—কত রকমের ফুল! দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে—পিটুনিয়া ফুটেচে। নভেম্বর মাস—জায়গাটা আশ্চর্য্যরকম ঠাণ্ডা। করম, কভিলা, শাল, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ-গাছড়া, বুনো কলা আর বুনো বাঁশ গাছ প্রচুর। দেখতে দেখতে কুরো নদীর ধারে এসে বসলুম। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটা স্টেশন। খানিকক্ষণ বসবার পর মোটরে চড়ে খাজুড়িয়া হয়ে একটা গ্রামে এলুম। গ্রামে হো-দের বাস—সকলেই খৃষ্টান। মেয়েদের মাথায় লাল ফিতে বাঁধা—সকলেই কাজকর্ম্ম করচে। এখানে এক পাদ্রী আছেন, তাঁর নাম ধনকুমার হো। তাঁর সঙ্গে খানিক আলাপ করে বাংলোয় ফিরলুম, বেলা তখন একটা। স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়লুম। শোবামাত্র নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেচে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় সামান্য রোদ পড়েচে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী—সে-সব পাহাড়ের গায়ে রাঙা রোদ। বসে বই

পড়তে লাগলুম—"রেজার্স এজ"। পড়তে পড়তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে চারিদিক বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তখন ঘরে এলুম। ঘরে আগুন জ্বালা হয়েচে—আগুনের পাশে বসে আবার বই পড়া। প্রেমচাঁদের গল্পের বই। বই শেষ করে খাওয়া-দাওয়া। তারপর অনেক রাত্রে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখি বনের কি শোভা! আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। তারার ঝিকিমিকি আলোয় নিস্তব্ধ বনভূমি দেখাচে যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। আর কোন কথা নয়। মন কেবলি বলে ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

বিকেলে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে গৈলকেরা গ্রামে বেড়াতে বেরুলুম। ঘুরে ঘুরে সব দেখে গ্রামের পিছনে একটা ডুংরীর উপরে উঠে বসলুম—সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্চে—কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! এমনি সুন্দর জায়গা আর এমনি সুন্দর দৃশ্যের ছবি কত কল্পনা করেচি, কিন্তু কল্পনায় এ দৃশ্য কোনোদিন ধরতে পারিনি—ভগবান আজ সে ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুললেন। ডুংরীতে বসেই বাড়িতে চিঠি লিখলুম।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—শাল বনস্পতির মাথায় অনেক রাত্রেও জ্বলজ্বল করচে অগণিত তারা। সেই শালবনে বসে ভগবানের এই অপূর্ব্ব বিশ্ব-সৃষ্টি দেখে মনে মনে কেবলি বলতে লাগলুম, বাবলু বড় হয়ে যেন এ শিল্প দেখে—দেখে উপভোগ করে।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটরে চড়ে পান্টু-বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা। পথে সরকারী ফরেস্ট—হু'তিনটে বাংলোও দেখা যায়। কি ঘন জঙ্গল! ছোটনাগপুরে বহু জঙ্গল দেখেচি—কিন্তু গৈলকেরার মত এমন ভীষণ জঙ্গল আর কোথাও দেখিনি। জঙ্গলে প্রচুর শালগাছ—জঙ্গলে কাঠুরেরা আসে কাঠ কাটতে। বাঘের কবলে অনেকে মারা যায়। এখান থেকে চার মাইল দূরে সারেন্দা-টানেল। শুনলুম, বিশ-পঁচিশ বছর আগে সেখানে এক প্রকাণ্ড বুনো হাতীর সঙ্গে বি-এন-রেলওয়ের একখানা চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ হয়—হাতীটাই জখম হয়ে শেষে মারা যায়।

যেতে যেতে জঙ্গলের প্রান্তে কাঠবোঝাই কখানা গোরুর গাড়ি দেখলুম। সার চলেচে। আরো খানিক এগিয়ে দেখি, পথের ধারে তিনটি ময়ূর—বন থেকে বেরিয়ে পথে এসেচে। আমাদের দেখে, চলন্ত মোটর দেখে তারা সরে গেল না। এমন নির্ভয়! পথে কারো নদী পার হলুম—তারপর কোইনা পার হয়ে শলাই-বাঙলোয় পৌছুলুম। খানিকটা বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বেড়াতে বেরুলুম। এক জায়গায় একটা নালা। নালার উপর রেলওয়ে-ব্রিজ। ছোট লাইন—কোন মাইনিং ফার্ম আচে, তাদের প্রাইভেট লাইন। লাইনে দুজনে বসলুম—কি চমৎকার দৃশ্য! দুধারে পাহাড়—বন-জঙ্গলে আগাগোড়া ঢাকা লাইন থেকে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত—লাইনকে যেন উঁচু পাঁচিলের মত ঘিরে রেখেচে। জঙ্গলের গাছে গাছে পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলচে—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-চাঁদ। ভগবানের উদ্দেশে দুজনে প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করলুম।

রাত্রি বাড়চে দেখে মিস্টার সিং বল্লেন—এবার ওঠা যাক। আমার উঠতে ইচ্ছা হয় না। আমি বল্লুম—এইখানে পড়ে থাকা যাক সারা রাত। মিস্টার সিং বল্লেন—সর্ব্বনাশ! ঐ জঙ্গলে আছে কত বুনো হাতী, হায়েনা আর বাঘ—নরখাদক বাঘ। তিন-চার দিন হলো, মাইনিং কোম্পানির তিনজন কুলি এখানে কাজ করছিল—তাদের—তিনজনকেই বাঘে নিয়ে গেচে। কদিন তাই কাজ বন্ধ আচে। শুনে গা ছমছম করে উঠলো।—থাকতে ভরসা হলো না। নদীর ধার দিয়ে চলে আসছিলুম—মিস্টার সিং দেখালেন, নদী-কিনারায় ভিজা বালিতে হাতীর পায়ের দাগ—হায়েনার পায়ের দাগ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন শোভা এমন

সৌন্দর্য্য—তার পিছনে মৃত্যুর এ কি করাল ছায়া!

পরের দিন মোটরে চড়ে আবার যাত্রা। পথে এক জায়গায় দেখি, উঁচু একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের নীচে গাড়ি থামিয়ে নামা হোল। নেমে উপরে ওঠা। শৈলমালায় ঘেরা একটি টিলার উপরে স্তম্ভ। উঠবার সিঁড়ি আছে—বরাবর। মিস্টার সিং বল্লেন,—আপনার জন্যই কারা ওই টাওয়ারে ওঠবার সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে! সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠলুম। উপর থেকে কতদূর পর্য্যন্ত দেখলুম! বেশ উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। সিং বল্লেন—শশাংদাবুরু পাহাড়—তিন হাজার ফুট উঁচু! বসে বসে দেখচি আর দেখচি। মনে হচ্চে কোথায় থাকি—আর কোথায় এসেচি আজ! কি সুন্দর জায়গা! সত্যিই চোখে দেখচি? না, স্বপ্ন?

ক্রমে চাঁদ উঠলো—আকাশের পটে রাশি রাশি নক্ষত্র। ভয় হলো বিরাটত্বের রূপ দেখে। নীচে লৌহ-প্রাচীরের মত শৈলমালা—ঘন অরণ্য—মাথার উপর অগণ্য সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা। বিশ্বরূপের বিরাটত্ব বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করলুম। মনে মনে ভাবলুম, তোমার এ রূপ দেখার সুবিধা আর সৌভাগ্য বারবার যেন পাই, হে ভগবান!

মায়া

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্য্যন্ত এ-সব অজ পাড়া-গাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণ ভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলচে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

আমি বল্লাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্চি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বল্লে—বোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি।

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বল্লে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্ত্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা।

এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বল্লাম—থাকতে পারি!

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারি খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বল্লে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল। কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বল্লে—চা করতে জানো? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বল্লে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে।

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্ব্বদা আলো জেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমার উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধু হাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে

তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বল্লে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বল্লে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি!

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বল্লে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঁঃ, যতো সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি জুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বল্লে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বৌকে পর্য্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বল্লে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্ব্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন?

—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘটঘট্ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিস-পত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে। ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাচ্ছে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বল্লে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাত্তে।

—ও! হ্যা—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বল্লেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাশুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বল্লে—কত লোকে ভাওচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইলো তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল।' আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।

—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেচি।

—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে। অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে

যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফূর্ত্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্ত্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালায় ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটা ধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটা ধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্য্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্ম্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জ্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্য্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্ত্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্ত্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্ত্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই, আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম—কৈ, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরে জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে কে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি ?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েছি, তা কোথা থেকে এলো ? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে।

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো ! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বল্লে—কি রকম আছো ? বলি, কিছু দেখচো নাকি ?

—না।

—শুনচো কিছু ?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি ? ভূতের মন্তর ?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি ? বৌ-মত ? কোনো গন্ধ পাওনি ?

—কিসের গন্ধ ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্য্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না ! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি ? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল ! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো ? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি !

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনেটাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

আমার ডাক্তারি

আমাকে দত্তমশাই ডেকে বল্লেন—ও ডাক্তারবাবু, জল খেয়ে নিন একটু—

আমি বল্লাম—এখন থাক্, এর পরে হবে।

—না না, সে কি হয় ? আসুন, সামান্য কিছু।

আমার এ সম্বন্ধে একটু বাধ-বাধ ঠেকে। রোজ রোজ আমাকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে

এনে জলখাবার খাওয়ানো চাই-ই। আমি ডাক্তারি করি পাড়াগাঁয়ে—নলিনী দত্তমশাইয়ের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে থাকি। আমার কাছে ভাড়া তিনি নেন না। বল্লেন—না না, ব্রাহ্মণ দেবতা। আপনি আমার বাড়িতে দয়া করে বাস করচেন, এতেই আমার ভিটে পবিত্র হয়ে যাচ্চে। আবার ভাড়া নেবো এই পাড়াগাঁয়ে আপনার কাছে?

সে যাক্ গে। ভাড়া না হয় না নিলেন। কিন্তু রোজ সকালবেলা ডেকে আমায় জলখাবার খাওয়ানো চাই। মুড়ি, গুড়, চিঁড়ে, নারকোল—যেদিন যা জোটে, একটা পাথরের খোরা ভর্ত্তি করে দেবেন। অত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই বল্লেও শুনবেন না। আমার লজ্জা করে রোজ রোজ খেতে। ভাড়া নেবেন না, তার ওপর রোজ জলখাবার! এও এক-রকম জুলুম ছাড়া আর কি?

দত্তমশায়ের মেয়ে এসে বল্লে—ডাক্তারবাবু, আপনি না খেলে বাবা কি কিছু খাবেন? দাঁতে কুটো দেবেন না।

—কেন?

—ব্রাহ্মণ বাড়িতে অভুক্ত থাকলে বাবা খাবেন না।

—বটে! আচ্ছা চলো।

সেদিন গিয়ে দেখি চালভাজা, ছোলাভাজা আর ঝুনো নারকোল কোরা। পৃথক্ বাটিতে খেজুর গুড়। চায়ের ব্যবস্থা এদের বাড়িতে নেই, সেকেলে গৃহস্থ, চা খাওয়ার রেওয়াজ গোড়া থেকেই গড়ে ওঠেনি।

আমি পাস করা ডাক্তার নই। বাড়িতে বই দেখে হোমিওপ্যাথিক শিখে আগে গ্রামেই ডাক্তারি করতাম। কিন্তু গ্রামের লোক পয়সা দিতে চায় না। ধার বাকি ফেলে আর শোধ করে না। তাই দেখেশুনে এই রঘুনাথপুরে এসে বসেচি আজ প্রায় তিন-চার মাস। আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে—আট-ন' ক্রোশ। রেল নেই, হাঁটা পথে আসতে হয়। এ গ্রামে এসে প্রথমে এক চাষী-কৈবর্ত্ত গৃহস্থবাড়িতে দিন পনরো ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী দত্তমশায় গিয়ে আমায় বল্লেন—প্রাতঃপ্রণাম হই ডাক্তারবাবু। আপনার নিবাস কোথায়?

—আসুন, বসুন। আপনার এ গ্রামে বাড়ি?

আমার বাড়ির মালিক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লে—উনি এ গাঁয়ের একজন কর্ত্তা-ব্যক্তি লোক। ওঁর নাম নলিনী দত্ত।

দত্তমশায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না, না, কর্ত্তা না হাতী! ও সব কিছু না। তা গিয়ে, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা অনুরোধ করতে।

—কি, বলুন?

—আমার বাড়িতে দয়া করে আপনাকে থাকতে হবে। আমার বাইরের ঘর আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—ভাড়া কি রকম দিতে হবে?

—আপনার নিজের বাড়ি। ভাড়া দেবেন কাকে? চলুন দিকি জিনিসপত্তর নিয়ে।

ভারি অদ্ভুত লোক তো! কিছুতেই ছাড়লেন না। লোক পাঠিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে গেলেন মুকুন্দদের বাড়ি থেকে। গত মাঘ মাসের কথা। সেই পর্য্যন্ত এখানেই আছি।

আজ নলিনী দত্ত বাইরে এসে বল্লেন—এখন কোথাও যাবেন?

—না।

—রুগী কি রকম হচ্চে ?

—মন্দ না।

—রোজ কি রকম হয় ?

—তার কিছু ঠিক নেই।

—দৈনিক ত্রুটো করে টাকা তো হওয়া চাই-ই।

—তা এখনো হয়নি।

—ইয়ে, রাঁধবেন আজ একটু দেরিতে।

আমি তখনই বুঝেচি, কোনো একটা কিছু দিতে চাইচেন। রোজ রোজ নেওয়াটা ঠিক নয়। চক্ষুলজ্জায় বাধে না ? কি একটা ওজর করব ভাবচি, এমন সময় দত্তমশায় বল্লেন—একটা বড় মাছ আজ নেদের বাগান পুকুর থেকে ধরতে বলেচি। রসিক সর্দার বলে আমার এক বাল্যবন্ধু, সে-ই নিয়ে আসবে। আপনাকে মাছ একটু দেবো।

—ও, আচ্ছা বেশ।

আর কি বলি। রোজই এই রকম চলচে।

দুপুরের পর হঠাৎ চারজন লোক এসে হাজির। হাতে পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। দত্তমশায়ের কাছে খবর গেল। তিনি খেয়ে একটু শুয়েছিলেন। শুনে বাইরে এলেন। ওঁদের দেখে আনন্দে বিগলিত ও কৃতার্থপ্রায় হয়ে বিনীত স্বরে হাতজোড় করে বল্লেন—আসুন আসুন। পরম সৌভাগ্য। ওরে ও দীপু, গা-পা ধোবার জল দিয়ে যা—

দীপু দত্তমশায়ের বিধবা মেয়ে। বাড়িতে অন্য মেয়েমানুষ নেই। হাত-মুখ ধোওয়ার জল সে-ই নিয়ে এল। দত্তমশায় বল্লেন—তা হোলে আপনাদের আহারের যোগাড় করি ?

ওঁদের মধ্যে একজন বল্লেন—হাঁ, তা হোক।

আবার বেচারী দীপুকে অসময়ে আগত এই চারজন জোয়ান অতিথির জন্যে রান্না করতে হয়। তাই কি ভাতে-ভাত রান্না ? তা হবার জো নেই। দত্তমশায় বসে তদারক করবেন, অতিথিদের পান থেকে চুন না খসে। এরা নেয়ে এসে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইল। দত্তমশায় ধোপদস্ত চারখানা ধুতি বের করে দিলে তবে পরলে। তারপর জলযোগ সেরে ওরা বসে যখন তামাক খাচ্চে তখন কৌতূহল আর না চাপতে পেরে জিগ্যেস করলাম—আমাদের নিবাস ?

দুজনে বল্লে, হাটগাছা। অন্য দুজনের বাড়ি অন্য এক গাঁয়ে। বল্লাম—দত্তমশায় বুঝি আত্মীয় ?

একজন বল্লেন—না, আত্মীয় নন।

পরে শুনলাম ওঁরা এখানে আসেন খাজনা আদায় করতে।

বছরে একবার বা দুবার আসেন এবং এখানেই ওঠেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এঁদের নিজের নিজের বিষয়সম্পত্তি আছে। প্রতিবার এসে দশ-বারো দিন থাকেন। খাজনা হঠাৎ তো আদায় হয় না, একজন প্রজার কাছে একবারের জায়গায় দশবার ছুটতে হয়, তবে তারা পয়সা বের করে।

এবারও রইলেন প্রায় দশ দিন। যতক্ষণ একটি প্রজার কাছেও খাজনা বাকি থাকবে, ততদিন এঁরা নড়লেন না। আর অসীম ধৈর্য্য আর আতিথেয়তা দেখলাম দত্তমশায়ের। এক-একবার মনে হোত পায়ের ধুলো নিই দত্তমশায়ের।

সকাল থেকে ছুটোছুটি করচেন কোথা থেকে গলদা চিংড়ি মাছ আনা যায়, ভালো কই মাছ কি করে সংগ্রহ করা যায়, অমুকের বাড়ি থেকে পটল আনচেন, অমুকের বাড়ি থেকে মানকচু

আনচেন। সর্ব্বদা চেষ্টা অতিথিদের কি করে খুশী করবেন, কি করে ভালো খাওয়াবেন। এরাও জানে দত্তমশায়ের হোটেলে যতদিন ইচ্ছে থাকো, কেউ বারণ করবার নেই।

আমার কষ্ট হোত দীপু বেচারীর জন্যে।

হোটেলের রাঁধুনী তো আর দ্বিতীয় নেই।

দুবেলা রান্না, তাও কি সোজা রান্না, হরেক রকমের রান্না, গরমজল, কাপড়ে সাবান দেওয়া, সর্দ্দিকাশির পাঁচন জ্বাল দেওয়া—সব ঐ বেচারীর ঘাড়ে।

—ওরে দীপু, সরকার মশায়ের বড্ড সর্দ্দি হয়েচে, একটু পাঁচন করে দিস্ তো।

দীপু অমনি বেরুলো গুলঞ্চের লতা আর বাসক ছাল যোগাড় করতে।

একদিন দেখি বকচেন মেয়েকে।

—তোর একটু হুঁশ করে চলা উচিত। কাল বিশ্বেস মশায়কে মশারি টাঙিয়ে দিলি—তা দেখলিনে কোথায় ছেঁড়া, তিনি সারারাত ঘুমুতে পারেননি মশার উপদ্রবে। কেন, দেখে তখনই একটু সেলাই করে দিলেই মিটে যায়। তোর হুঁশ বড় কম—

মনে মনে ভাবলাম, ওর হুঁশ যদি কম হোত তবে আপনার এ অবারিত-দ্বার হোটেল কোন্‌কালে দরজা বন্ধ করে লালবাতি জ্বালতো। কি রত্ন পেয়েছেন ঘরে, তা ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন।

একদিন দেখি, বাড়ির সামনের জঙ্গলের মধ্যে দীপু কি করচে। বেলা পড়ে গিয়েচে, সন্দে হয়-হয়, বল্লাম—কি ওখানে দীপু?

—কচুর ডাঁটা কাটবো।

—এখন কেন?

—ওনারা কাল কচুর শাক খাবেন বাবা বল্লেন। তাই এখন তুলে ধুয়ে রাত্রে কুটে রেখে দি। সকালে সময় পাবো না।

—এখন অবেলায় ওখানে না যাওয়াই ভালো। সাপ বেরুতে পারে।

—এখন না তুল্লে তুলবো কখন? কাল সময় পাবো না। আজ সারাদিনের মধ্যে এখন একটু যা সময় পেলাম।

—দত্তমশায় কোথায়?

—তিনি ইলিশ মাছ আনতে গিয়েচেন পাঁচঘরার হাটে। কাল কচুর শাক দিয়ে রান্না হবে কিনা।

—আজ ইলিশ মাছ এনে কাল রান্না হবে?

—কেন হবে না? আজ বেশ করে ভেজে রাখবো রাতে। কাল মাছ পাবেন কোথায় হাট ছাড়া? কাল না খাওয়ালে ওঁদের কচুর শাক খাওয়ানো হবে না। পরশু চলে যাবেন সব।

—যাবেন সত্যি? আমার মনে হচ্চে না।

দীপু আমার কথার শ্লেষ বুঝতে না পেরে বল্লে—কেন মনে হচ্চে না?

মেয়েও তো দত্তমশায়েরই। বাপের মতই সরল। বল্লাম—না, তাই বলচি।

—বাবা বলছিলেন কালকের দিনটা ওঁরা আছেন, পরশু চলে যাবেন। কাল রাতে তাদের বড়া করে খাওয়াতে।

—বেশ বেশ। খাওয়াও। অতিথিসেবায় পরম পুণ্য।

—কত রকমের রান্না হচ্ছে বাড়িতে। কিন্তু আপনাকে দিতে পারিনে বলে কষ্ট হয়।

—দিতে বাধা দিচ্চে কে? আমি বাধা দিইনি অন্তত।

—কি যে বলেন! ব্রাহ্মণের পাতে রান্না তরকারি দেবো সে ভাগ্যি কি আর করে এসিচি?

—তা হোলে মিটেই গেল।

—একটা জিনিস কাল খাওয়াবো।

—কি?

—বলুন না?

দীপুর চোখে কৌতুকের হাসি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কি জিনিসের কথা বলচে। তবুও মজা দেখবার জন্যে বল্লাম—তুমি বলো। আমি বুঝতে পারলাম না। কচুর শাক?

দীপু হি-হি করে হেসে বল্লে—না। আহা, কি বুদ্ধি আপনার! কচুর শাক তো সক্‌ড়ি। আমার রান্না কচুর শাক আপনার পাতে দেবো?

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লাম—সে আমার অদৃষ্ট!

—আহা! আপনার অদৃষ্ট না আমাদের অদৃষ্ট! আপনি ভারি—

—কি জিনিসটা কাল খাওয়াবে বল্লে না?

—তালের বড়া।

—ওটা বুঝি সক্‌ড়ি নয়? তবুও মাথা রক্ষে। বাঁচলুম।

—থাক্, আপনাকে আর ব্যাখ্যান করতে হবে না। চলি এখন, অনেক কাজ।

দীপুকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ওর বয়েস হবে, কিন্তু বালিকার মত সরল। মুখ বুজে কি খাটুনিটাই খাটে দিনরাত! বাবার মন যুগিয়ে চলতে ওর জোড়া নেই, দত্তমশায় মুখের কথা খসালেই হোল। ও কি খায় সারাদিন খাটুনির পর তা কে দেখচে? দত্ত-মশায় নিজের অতিথিদের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের বেলা পান থেকে চুন না খসে।

পরের দিন শুনলাম অতিথিরা আরো দিন চার-পাঁচ থেকে যাবেন। খবরটা পেলাম দত্ত মশায়ের মেয়ের কাছ থেকেই। সে এসে বল্লে—আমার পাপ হবে, না ডাক্তারবাবু?

অবাক্ হয়ে বল্লাম—পাপ? কিসের পাপ?

—আপনার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না, সেইজন্যে?

—কি কথা?

দীপু কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমি ওর কথা শুনি মন দিয়ে। সায় দিই ওর কথায়, বোধ হয় ওর ভালো লাগে। কথা বলবার মানুষ এ বাড়িতে আর ওর কেউ নেই আমি ছাড়া।

ও বল্লে—ভুলো কেন ও-রকম আপনি? তালের বড়া খাওয়াতে চেয়েছিলাম আজ মনে আছে? তা আজ হোল না।

—তা হোলে অতিথিদের তালের বড়া খাওয়ানো হোল না?

—সেই জন্যেই তো। ওঁরা কাল যাবেন না। আরো দিন চার-পাঁচ থাকবেন কিনা, তাই বাবা বললেন আজ না করে ওঁদের যাবার আগের দিন করলেই হবে।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু—ওঁদের তো কালই যাবার দিন ধার্য্য ছিল?

—কি নাকি বাঁশঝাড় নিয়ে গোলমাল বেধেচে ওঁদের মধ্যে একজনের। সে গোলমাল না মিটিয়ে তো যাওয়া হয় না।

—সে তো বটেই। একজনের কাজ যখন বাকি, তখন বাকি তিনজন একযাত্রায় পৃথক্ ফল করে আর যান কি ভাবে? যাওয়া উচিত নয়।

—সে আবার কি?

—ওই একটা কথার কথা ধরো।

—ভারি মজার কথা বলেন আপনি কিন্তু। হাসি পায় এমন!

—সে যাক্, তাহোলে তালের বড়া হচ্ছে কবে?

—সেই যেদিন যাবেন, তার আগের দিন। তবে শুনুন একটা কথা বলি। আপনার জন্তে ছোট্ট একটা তাল এনে রেখেচি। সেইটেই গোলা করে অল্প চাট্টি বড়া আপনাকে ভেজে দেবো এখন সন্দেবেলা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—না না দীপু। লক্ষ্মী, আমার কথা শোনো। আমার জন্তে আলাদা করে তোমায় কিছু করতে হবে না। কেন করতে যাবে তা? আমি ওতে রাগ করবো। না, করবে না।

দীপু না দাঁড়িয়ে চলে গেল। ও কখন আসে, কখন যায়, বোঝা যায় না। নাঃ, এর সঙ্গে পারা যাবে না। আমার কোনো দরকার নেই তালের বড়ায়। ও কি শুনবে কোনো কথা? যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে।

অতিথিদের ওপর ভারি রাগ হোল আমার।

এসেচ নিজেদের খাজনা আদায় করতে, বিষয়-আশয় দেখতে, তা পরের ঘাড়ে কেন রে বাপু? মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত। বাবা আর মেয়েকে সরল আর ভালোমানুষ পেয়ে—হোত অন্য জায়গা, এতদিন সেখানে বসে আজ পায়েস, কাল রুইমাছ খেতে কেমন দেখতাম।

অতিথিদের একজনের নাম জনার্দ্দন সরকার, ধূর্ত্ত দৃষ্টি চোখে, কূট বিষয়ী আর মামলাবাজ, দেখলেই বোঝা যায়। আমায় বিকেলের দিকে ডেকে বল্লে—ও ডাক্তারবাবু, বলি কি হচ্চে?

নীরস স্বরে বল্লাম—কিছুই না। বসে আছি।

—এখানে রুগীপত্তর কেমন?

—মন্দ না।

—কতদিন আছেন এখানে?

ভালো বিপদ! আমার গল্প করবার ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে!

আছি না আছি, সে খোঁজে কি দরকার তোমার? তোমার গলা জড়িয়ে ধরে সে সব বর্ণনা করবার ইচ্ছেও আমার নেই। বল্লাম—কেন বলুন তো?

—না, সেবার এসে আপনাকে দেখিনি কিনা তাই।

—আপনারা কি-বছর আসেন বুঝি এখানে?

—তা আমরা আসচি আজ দশ-এগারো বছর। নরসিংহপুরে আমার তালুক আছে। এই সময় খাজনা আদায় করতে আসি। আমরা ক'জনই আসি। সকলেরই বিষয় আছে পাশাপাশি মৌজায়। এসে দত্তমশায়ের বাড়ি উঠি। উনি স্বজাতি আর বড় ভালো লোক। আর কোথায় যাই বলুন।

—তা তো বটেই। কোথায় আর যাবেন। আজকাল কেউ কাউকে জায়গা দেয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। আমি ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবচি এইবার রান্নার আয়োজন করা যাক। এমন সময় দীপু হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে একটা পাথরের বাটি আমার সামনে রেখে বল্লে—এই নিন। আলো জ্বালেননি?

বল্লাম—না, এই ভাত রান্না করবো ভাবচি এখুনি। এবার জ্বালাবো। এতে কি?

বলে বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি তালের বড়া। সন্ত ভাজা, গরম। আমি কিছু বলবার আগেই ও বল্লে—ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়াবো। তাই ছোট্ট একটা তালের গোলা করে আপনার জন্যে গোটাকতক ভেজে এনেচি। গণ্ডা দশ-বারো সবসুদ্ধ্। আমি যাই, রান্না-বান্না সব পড়ে রয়েচে।

—শোনো দীপু, যেও না, আমার আলোটা জেলে দিয়ে যাও।

—অত কুঁড়ে কেন ? কই কোথায় দেশলাই দেখি ?

—আচ্ছা, কেন তুমি আমার জন্যে তালের বড়া করতে গেলে ? আর কারো জন্যে না ?

—না, না, শুধু আপনার জন্যে। বাবার কাছে বলবেন না। কেউ জানেন না। সব লুকিয়ে ফেলেচি। তালের খোসা, তালের গোলা—চললাম। কেউ যেন জানে না।

দীপু চলে গেল। ওর তালের বড়ার বাটি আমার সামনে পড়ে রইল। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কোথায় কি নৈশ পুষ্প ফুটেচে তার সুবাস বেরুচ্চে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

দীপুর মনের ভেতরটা আমি এই নির্জ্জন আঁধার সন্ধ্যায় বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওর মুখের হাসিতে তা ধরা দিয়েচে। ওর মন আমি বুঝতে পেরেছি—ও নিজে হয়তো বোঝেইনি।

এখানে আমি আর থাকবো না। থাকা উচিত হবে না। অতিথির দলকে দত্তমশায় তোয়াজ করুন যত খুশি, তারা তালুকমৌজার বৈষয়িক সুবন্দোবস্ত যতদিন ধরে করুক বসে, কিন্তু আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। দত্তমশায় অতি সরল, ভালো লোক। দীপুও তাই। ওদের নামে কোনো কথা উঠলে আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। তা ছাড়া, জালে জড়াই কেন নিজেকে ? আমার বাড়িতেও স্ত্রীপুত্র আছে।

সেই সপ্তাহের শেষেই নির্ম্মম ভাবে জাল গোটালাম।

দত্তমশায় এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বল্লেন—বলা কওয়া না, হঠাৎ চললেন, মানে ? কি অপরাধ হোল আমার ?

কোনো লম্বা কৈফিয়ৎ দেবার আবশ্যক বিবেচনা করিনি। ডাক্তারি ভালো চলচে না, রুগী-পত্তর সুবিধে হচ্চে না। দীপু যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা এলো। বল্লে—আপনি নাকি চলে যাচ্চেন, সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—কেন যাবেন ?

—চলচে না।

—কেন, বেশ তো রুগী আসে ?

—ওতে ডাক্তারি চলে না।

—যাবেন সত্যি ?

—হুঁ।

দীপু কেঁদে ফেললে। চোখের জলে ভিজে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমি চলে যাবার সময় দত্তমশায়ের ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

সাত মাস পরে দত্তমশায়ের এক চিঠি পেলাম। দীপুর খুব অসুখ। আমি যেন একবার দেখতে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামেই ডাক্তারখানা খুলে বসেচি। দু'একদিন যেতে দেরি হোল। গিয়ে দেখি দীপু বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে। আগেকার স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী দীপুকে

আর চেনা যায় না। আমায় দেখে দীপুর রোগজীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার পাশে ওর হাত দুটি ধরে বল্লাম—কি হয়েচে দীপু? দেখি হাত?

ও বল্লে—কিছু হয়নি।

—তবে এমন চেহারা হয়েচে কি করে? দাঁড়াও দেখি।

দত্তমশায় বোধ হয় অতিথির জন্যে চা ও খাবারের যোগাড় করতে বাইরে গেলেন। আমি ওর হাত দেখলাম। জ্বর রয়েচে নাড়িতে। পুরনো ম্যালেরিয়া জ্বর, ভালো চিকিৎসা হয়নি। সংসারের খাটুনি এক দিনের জন্যে কামাই যায়নি। অতিথি তো লেগেই আছে। অনুমানে বুঝলাম সব। শরীর ওর একেবারে ভেঙে গিয়েচে?

দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি রকম দেখলেন?

—ভালো। সেরে যাবে। গোটাকতক ইনজেকশন নিয়মিত দিলেই হবে। শক্ত অসুখ কিছু না।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আপনি এসে আমাদের বাড়ি আবার থাকুন না কেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। দাঁড়াও একটা ইনজেকশন দিতে হবে এখুনি।

—দেবেন এখন। আপনি আসবেন বলুন! সত্যি, বলুন!

দীপুকে বাঁচাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত রাণাঘাট মিশন হাসপাতালে আমি ও দত্তমশায় নিয়ে গেলাম ওকে। শেষ দিন আমার হাত ধরে বলেছিল—আমি সেরে উঠলে আমাদের বাড়ি এসে থাকবেন, সত্যি? অনেক রুগী হবে এবার—

চূর্ণী নদীর ধারে ওর সৎকার করার পরে আমরা দুজনে ফিরে এলাম দেশে। দত্তমশায় আমার হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—একলা থাকতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আমার বাড়ি এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমার আর কেউ নেই।

দীপুকে কথা দিয়েছিলাম হাসপাতালে। দত্তমশায়ের বাড়ি এসে আবার ডাক্তারখানা খুলেচি। দীপুর মুখের কথা সত্যি হয়েচে বটে, আজকাল রুগীর ভিড় খুব।

বর্শেলের বিড়ম্বনা

'বর্শেল' অর্থাৎ বঁড়শি ও ছিপ দিয়ে মাছ মারতে যে পটু। এক কথায় ওস্তাদ মৎস্যশিকারী। লাঠি যে চালাতে পটু সে হোল 'লেঠেল', ছিপ-বঁড়শি বাইতে যে পটু সে হোল 'বর্শেল'।

এই সামান্য ভূমিকার দরকার ছিল এই জন্যে যে অনেকেরই 'বর্শেল' কথাটির অর্থ জানা নেই হয়তো—প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা প্রয়োজন যে, যেমন লাঠি হাতে নিয়ে সবাই বেড়ায়, কিন্তু সবাই লেঠেল নয়, তেমনি ছিপ দিয়ে মাছ সবাই ধরে, কিন্তু তারা বর্শেল নয়।

আমাদের গাঁয়ের রামহরি হোড় নামজাদা বর্শেল, আশপাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তাঁর নাম বর্শেল হিসাবে প্রসিদ্ধ। 'তাঁর' ব্যবহার করলাম এজন্যে যে, রামহরি বনেদী ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান আমাদের গাঁয়ের—লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, বড় বড় গোঁফ, চোখ বড় বড় ও রাঙা। আমরা ছেলেপুলের দল তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে চলি, বড্ড রাশভারী লোক। আগে অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন বিষয়-সম্পত্তির সামান্যই অবশিষ্ট আছে; তারই আয়ে অতি কষ্টে সংসার চলে।

রামহরি জীবনে কারো চাকুরি করেননি, এখন তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেচেন—সুতরাং এ বয়সে পরের দাসত্ব আর স্বীকার করবেন না এটা নিশ্চয়।

কিন্তু মাছ ধরা সম্বন্ধে একজন 'অথরিটি' তিনি। বহু লোক এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে আসে।

—হ্যাঁ হোড়মশাই, গাঙে কি চার করে রাখবো আজ ?

—কিসের চার দিচ্ছ ?

—গোবর আর কেঁচো।

—নতুন বর্ষার জল, তুঁষ আর কুঁড়ো দাও।

তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বিস্তৃত। কে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে ? হোড় মশায় জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ধরনের বড় মাছ ধরেচেন, তাঁর মুখে সে-সব গল্প শুনলে আহার-নিদ্রা ভুলে যেতে হয়। অবিশ্যি আমাদের মত ছেলেমানুষের সঙ্গে সে-সব গল্প তিনি কখনো করতেন না, বড় লোকেদের সঙ্গে বসে বলতেন, আমরা বসে শুনতাম।

এ সব পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলচি, আগেই বলে রাখি।

আমার তখন বারো-তেরো বছর বয়েস। আষাঢ় মাস, খুব বর্ষা হয়ে গিয়েচে, মাঠে-ডোবায় জল থৈ-থৈ করচে।

হাবুল বল্লে, মাছ ধরতে যাবি সন্তুদা ? জটেমারির খালে বড় বড় বান মাছ আর জিওল মাছ পড়চে।

—কে বল্লে ?

—কাল গোপাল আর নেড়াকাকা এই বড় বড় বান মাছ ধরে এনেচে।

—তোর বড় ছিপ আছে ? আমায় একখানা দিবি ?

—দুখানা মোটে আছে—বাকি তিনখানা পুঁটিমাছ ধরা ছিপ।

বেলা তিনটের পর আমরা চারজন সমবয়সী বন্ধু জটেমারির খালে কাঠের পুলের নীচে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি—রামহরি হোড় সেখানে তাঁর লম্বা লম্বা ছিপগুলো নিয়ে দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে একমনে গম্ভীর মুখে একা বসে।

সন্তু প্রশংসাসূচক বিস্ময়ের সুরে বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মাছ ধরচে !

আমি বল্লাম—কই ?

—ঐ দ্যাখ্ ঐ গাছের নীচে।

আমার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। মস্ত-বড় বর্শেল রামহরি জ্যাঠা দস্তুরমত চারকাঠি পুঁতে মাছ ধরতে বসেচেন। যদি মাছ ধরতে হয়, তবে ওঁর আশেপাশে বসে। নয়তো মাছ হবে না। যে যে-সাধনায় সিদ্ধ তার শরণাপন্ন না হোলে সে-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

আমি বল্লাম—চল্, রামহরি জ্যাঠার ডাইনে ওই ফাঁকা জায়গাটায় ছিপ ফেলি।

হাবুল বল্লে—উনি যদি বকেন ?

—বকেন তো বকবেন, দেখছিস্ নে, ওঁর চারে বড় বড় মাছ সব আসতে শুরু করেচে ! অমন ওস্তাদ এ দেশে নেই। কি দিয়ে চার করতে হয়, কিসে বড় মাছ আসে, এ উনি যেমন জানেন, এমন কেউ জানে না।

আমরা পাশে বসবার উদ্যোগ করচি, রামহরি বর্শেল কিন্তু সেটা তত প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। একটা কারণ হচ্চে, তিনি মাছ জড়ো করবার মশলা ছড়িয়েচেন জলে, এখন অন্য কেউ এসে তাঁর তৈরি জমিতে চাষ করুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয়তঃ আমরা চঞ্চল

বালক, তাঁর মত চুপচাপ বসে থাকতে পারবো না, গোলমাল করবোই। তা হোলে মাছ আসবে না চারে। ভয় পেয়ে ভেসে যাবে।

রামহরি হোড় তুরীয় অবস্থা থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এই! ওখানে বসবি নাকি?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আপনার পায়ে পড়ি কিছু বলবেন না আমাদের।

রামহরি বিরক্তিপূর্ণ মুখে বল্লেন—যতো আপোদ! আর জায়গা পেলি নে? আচ্ছা চুপ করে বোস্। কেউ কথাটি কইবি নে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ছিপ ফেলেচি আমরা, কিন্তু একটা মাছও ঠোক্‌রায় নি। গোলমাল না করি, কথাবার্ত্তা চলচে সমানে। ক্রমে কথাবার্ত্তার স্বর চড়লো।

পচা বল্লে—ওই ক্ষেতটাতে কাঁকুড় হয়েচে, সন্তু যা গোটা-চারেক কচি দেখে কাঁকুড় তুলে আন—

রামহরি বর্শেল ওদিক থেকে ধমক দিয়ে বল্লেন—এই সব, কি হচ্চে?

আমরা ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে হাবুল এবং পচা বাবলা-কাঁটার নীচু বেড়া ডিঙিয়ে অদূরবর্ত্তী কাঁকুড়ের ক্ষেতে ঢুকে পড়লো এবং তিনটে বড় বড় কাঁকুড় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

গণ্ডগোল বাধলো কাঁকুড়ের ভাগ নিয়ে।

আমি বল্লাম—তোমরা ভাগ বেশী নেবে কেন? সমান ভাগ করো। আমি তোমাদের ছিপ নিয়ে চৌকি না দিলে তোমরা কাঁকুড় আনতে পারতে?

পচা বল্লে—আমি বড়টা তুলেচি, ওটা আমার।

যতীশ নাপিতের ছেলে কেষ্ট বল্লে—তা কেন? সমান ভাগ হবে।

রামহরি আবার ধমক দিয়ে বল্লেন—ও সব কি হচ্চে রে? মাছ ধরতে এসেছিস্, না কাঁকুড় খেতে এসেছিস্ এখানে?

আমি বল্লাম—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না জ্যাঠামশায়!

—কি করে মাছ ঠোকরাবে? তোমাদের তো মাছ ধরা নয়, মাছ ধরা খেলা। কি জানিস্ তোরা মাছ ধরার? সব ক'টাতে জুটে হুটোপাটি করচিস্ আর কাঁকুড় চুরি করচিস্ পরের ক্ষেত থেকে। মাঝে পড়ে আমারও মাছ হোল না তোদের গোলমালে। নইলে যা চার করেছিলাম, কুঁড়ো দিয়ে আর পুরনো তেঁতুল—

রামহরি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উত্তেজনার মুখে মৎস্য-শিকারের গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আর একটু হোলে।

আমি চুপি চুপি বল্লাম—ওই শুনে রাখ, কুঁড়ো আর পুরোনো তেঁতুল—এই দিয়ে চার করতে হবে বুঝলি তো! ভুলে বলে ফেলে দিয়েচেন—

হাবুল ছিপ একখানা জল থেকে তুলে বল্লে—মাছ মোটে ঠোকরাচ্চে না।

রামহরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছিপটার দিকে চেয়ে বল্লেন—ও কি বহর দিয়েছিস্? তোদের সবই হোল ছেলেখেলা! জল মেপে বহর দিতে হয়।

আমি আগ্রহের সুরে বল্লাম—সে কি করে করতে হয় জ্যাঠামশায়?

—জল মেপে নিস্‌নি?

—তা তো জানিনে।

রামহরি দাঁত খিঁচিয়ে বল্লেন—তা জানবে কেন? জানো কাঁকুড় চুরি করতে। ঢিল বেঁধে

সুতো জলে ছেড়ে ম্যাখো কতটা ভিজেছে—সেখানে ফাত্‌না তুলে বাঁধো—তাকে বহর দেওয়া বলে। দেখি?

আমি ছিপ তুলে দেখাতে রামহরি বর্শেল সেদিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—আড়াই হাত বহর দে।

সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। রামহরি বর্শেল স্বয়ং আমাদের বহর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েচেন। এইবার মাছ না হয়ে যায়?

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পরে আমাদের মধ্যে আবার গুঞ্জন-রব উত্থিত হোল এবং খুব শীগ্‌গির সে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হয়ে গেল। এবার গোলমাল বাধলো ছিপের বহর নিয়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ ধরতে ব্যগ্র।

পচা বল্লে—আমায় ছিপ দাও—আমি নিজে বহর দিই।

আমি বল্লাম—তুই কি বুঝিস বহরের? আমায় দে, দিয়ে দিচ্চি।

—থাক্, তোর আর ওস্তাদি করতে হবে না—ঢের হয়েচে।

—মুখ সাম্‌লে কথা কবি সন্তু!

—তুই মুখ সাম্‌লে—

আমাদের সুর তখন পঞ্চমে উঠেচে। রামহরি বল্লেন—কি বিপদেই পড়েচি এদের নিয়ে! আজ যে আমার চার করাই মাটি হোল দেখচি এদের জ্বালায়! তোরা বাপু অন্য জায়গায় যা—ওঠ ওখান থেকে—বেরো—

আমরা তাড়া খেয়ে ছিপ গুটিয়ে সেখান থেকে উঠে আর কিছু দূরে গিয়ে বসলাম। একটা কাশঝোপের আড়াল থাকার দরুন সেখান থেকে রামহরি বর্শেলকে ভাল করে দেখা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সামনের ছোট খালে কচুরিপানার দামে নীল ফুল ফুটেছে, বর্ষার জল থৈ-থৈ করচে খালের কানায় কানায়। ওপারের চরে আরামডাঙা গ্রামের বাঁশ-খেজুর-তালগাছের শীর্ষ বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের তলায় একটি শ্যামল সরলরেখা রচনা করেচে। দু-একটা সাদা বক জলের ধারে পানা-শেওলার দামের ওপর চরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনে আমরা রামহরি জ্যাঠার দিকে চাইলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে একটা বড় ছিপ দু-হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে তুললেন—এটুকু আমরা দেখলাম। তারপর তিনি বলে উঠলেন—যাঃ—

হাবুল বল্লে—রামহরি জ্যাঠা মস্ত বড় মাছ বাধিয়েচে, চল্ গিয়ে দেখি—

সবাই মিলে তখনি ছুটে গিয়ে শুনলাম প্রকাণ্ড মাছ বেধেছিল ওঁর ছিপে, কিন্তু উনি টান দিতেই ছিপের আগা ভেঙে নিয়ে মাছটা পালিয়েচে। সত্যি দেখি, বড় একটা ছিপের আগার দিকটা ভাঙা, ছিপটা হাতে করে বোকার মত রামহরি দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখে বিরক্তির সুরে ঝাঁজের সঙ্গে তিনি বল্লেন—তোদের জন্যে আজ সব মাটি। না দিলি চারে মাছ আসতে, না দিলি সুস্থ হয়ে মাছ ধরতে। সেই বেলা তিনটে থেকে পেছনে লেগেচিস্ বাপু, মাছ ধরতে আসিস্ কেন তোরা? কি বুঝিস্ মাছ ধরার? এ কি ছেলের হাতে পিঠে? এত বড় মাছ খেলে, তোদের জ্বালায় তুলতে পারলাম না, সুতো কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাঃ, আজ আর মাছই ধরবো না। কাল থেকে আমার ত্রিসীমানায় বসতে দেবো না বলে দিচ্চি—

রামহরি জ্যাঠার যত রাগ আমাদের ওপর এসে পড়েচে বুঝলাম। নইলে তাঁর মাছ পালিয়ে

গেল সুতো কেটে, তাতে আমাদের অপরাধ কোথায় ? হাবুল নীচু সুরে বল্লে—বা রে, উনি পচা সুতো নিয়ে মাছ ধরতে এসেচেন, তাতে আমাদের দোষ বুঝি ? আমরা মাছকে শিখিয়ে দিইনি তো—

যাহোক্, রামহরি জ্যাঠা তো ছিপ গুটিয়ে চলে গেলেন। তারপরেই যে ঘটনাটি ঘটলো, আমাদের মত বালকের জীবনে সেরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

রামহরি জ্যাঠা চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ আমার নজর গেল বাঁ-দিকের শেওলা-দামের ধারে একটা সাদা শরের ফাত্‌না একবার ডুবচে একবার উঠচে। আমার কথায় হাবুলও সেদিকে চেয়ে দেখলে। ফাত্‌নাটা ক্রমেই যেন ডাঙার দিকে আসতে লাগলো—অথচ খালের স্রোত তো এখন উল্টোদিকে বইচে, তবে ফাত্‌না ডাঙার ধারে আসচে কিসের জোরে ?

হাবুল বল্লে—তাই তো সন্তুদা, ওটা কি হচ্চে ?

হঠাৎ আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম। রামহরি জ্যাঠার সেই ছিপের ফাত্‌না ! বড় মাছ ওর তলায় বঁড়শিতে বেধে আছে।

কথাটা যেমন মনে হওয়া, আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন কিসের ঝাঁজ বেরিয়ে গেল ! ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি। হাবুলকে বল্লাম—রামহরি জ্যাঠার সেই মাছটা ! ও জখম হয়ে এসেচে বলে অবসন্ন হয়ে ডাঙার দিকে আসচে। জলে নামো সবাই।

হাবুল বল্লে—পচা, তুই ছেলেমানুষ আছিস, পরনের কাপড় খুলে ফেল্, মাছটাকে কাপড় দিয়ে জাপটে ধরতে হবে।

আমি বল্লাম—ভারী মাছ, খুব সাবধানে তুলবার চেষ্টা করো। জলের তলায় ওর কুমীরের মত শক্তি।

সবাই মিলে জলে নামলাম। ফাত্‌না ধরে সন্তর্পণে টান দিতেই জলের তলায় প্রকাণ্ড মাছ ঝটপট করে উঠে জল ছিটিয়ে আমাদের সারা গা ভিজিয়ে দিলে। আমাকে তো টেনেই নিয়ে গেল কিছুদূর—হাবুল আমার কোমর জড়িয়ে টেনে রাখলে। বল্লে—টান দিস্ নে, সুতো ছিঁড়ে যাবে—মস্ত মাছ—সাবধানে তোল্।

প্রায় মিনিট পনরো ধরে মাছটা যুঝল। যারা কখনো বড় মাছ ছিপে ধরেচে, তারাই জানে এ ব্যাপার কি ! এক-একবার এমন হোল যে, মাছ বুঝি আর থাকে না, চোঁ-চোঁ ছুটলো বেশী জলের দিকে। তার চেয়েও ভয় ছিল ঘন কচুরিপানার দামের নীচে গিয়ে লুকুলে এ মাছের আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

অবশেষে মাছটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। মুখে আড়াই ইঞ্চি বঁড়শি নিয়ে কতক্ষণ পারবে ? মাছ অবসন্ন হোলে ক্রমশঃ আপনিই ডাঙার কাছে আসে। পচা সেই সময় কাপড় দিয়ে মাছটা জাপটে ধরলো—আমরা সবাই গিয়ে পড়লাম মাছটার ওপরে। টেনে ডাঙায় তুলে দেখি, সের-পাঁচেক আন্দাজ ওজনের রুইমাছ।

গ্রামে ঢুকবার পথেই রামহরি বর্শেলের ঘর। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেচে, রামহরি জ্যাঠা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন। আমরা হৈ-হৈ করে আসচি দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন —কি রে ? মাছ পেলি নাকি ?

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাই। রামহরি জ্যাঠার নাকের সামনে দিয়ে বড় মাছটা নিয়ে যাবো!

দাওয়া থেকে নেমে এসে রামহরি বল্লেন, এত বড় মাছটা তোরা কোন্ ছিপে ধরলি ? তোদের সঙ্গে তো বড় ছিপ ছিল না!

আমি বল্লাম—হরকওলা বঁড়শির একখানা ছিপ আছে—এই যে !

রামহরি হাজার হোক, ওস্তাদ বর্শেল তো! আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—মাছটার নিতান্তই তা হোলে মরণ ছিল। হরকগুলা বঁড়শিতে পাঁচ সের রুইমাছ ওঠে, এ কখনো সম্ভব হয় না। তোদের ও ছেলেখেলা করতে গিয়ে এত বড় মাছটা জুটে গেল অমনি অমনি—নইলে ও-মাছ হরকগুলা ছিপে ডাঙায় ওঠানো তোদের সাধ্যি ছিল? ওই যে বল্লাম, মাছটার কপালে নিতান্তই মৃত্যু ছিল আজ!

বাড়ি ফিরে রামহরি জ্যাঠার বাড়ি আমরা সের দেড়েক কাটা মাছ আর মুড়োটা পাঠিয়ে দিলাম।

কাদা

একঘেয়ে গ্রাম্যজীবনের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল আমাদের পাশের বাড়ির শ্যামাকান্ত চক্কত্তির বিয়ে। শ্যামাকান্ত চক্কত্তি আমার কাকা হন, অবিশ্যি গ্রামসম্পর্কে। শ্যামাকাকার বয়েস কত তা জানিনে, তিনি নাকি কলেজে পড়েন কলকাতায় না কোথায়। গ্রামে আসেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

বিয়ে হচ্চে আমাদের গ্রামের কাছে নসরাপুর।

নসরাপুর গ্রামের বীরেশ্বর ভট্‌চাজের মেয়ে। বীরেশ্বর ভট্‌চাজকে দেখেছি, বুড়োমানুষ, ঐ গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেনও বারকয়েক।

বিয়ে হবে সামনের সোমবারে।

হৈ হৈ পড়ে গেল পাড়ার ছেলেদের মধ্যে।

আমাদের দল ঠিক করলে একটা উৎসব করতে হবে এই বিয়ের দিনে। আমার উৎসাহটা সব চেয়ে বেশি। আমি ভেবেচিন্তে দক্ষিণ মাঠের বিলের ধার থেকে কতকগুলো পাকাটি নিয়ে এলাম এবং পথের ধারের প্রত্যেক গাছে এক গাছা করে পাকাটি নোনার ডালের ছোটা দিয়ে বাঁধলাম।

হরি জ্যাঠামশায় দেখে বল্লেন—ও কি হচ্চে?

বড় বড় মোটা কাঁচের পরকলা বসানো চশমার ভেতর দিয়ে দেখি হরি জ্যাঠামশায় আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্চেন। ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

—বলি—ও—এই—

—কি?

—বাজি আলো করবো শ্যামাকাকার বিয়েতে। তাই পাকাটি বাঁধচি।

—ইঃ! যত ছেলেমানুষি! এই একটা সরু পাকাটি জেলে আলো হবে? কতক্ষণ জলবে ওটা?

—যতক্ষণ হয়।

—ছাই হবে। বুদ্ধি কত! ও কখনো জলে?

হরি জ্যাঠামশায় চলে গেলেন। আমার রাগ হোল মনে মনে। উনি সব জানেন কিনা? পাকাটি জলবে না তো কি জলবে?

ক্রমে বিয়ের দিন এসে পড়লো। যেদিন বিয়ের বর রওনা হয়ে চলে গেল, সেদিন পাকাটি জ্বালতে সঙ্গী সতু ও হীরু বারণ করলে। আজ জ্বেলে কি হবে? যেদিন বর আসবে বৌ নিয়ে,

সেদিন জেলে দিবি। দেখাবে ভালো।" বিয়ের বরযাত্রী গেল গাঁশুদ্ধ ঝেঁটিয়ে। কিন্তু আমার যে অত উৎসাহ, আমারই যাওয়া হোল না। কেন যে যাওয়া হোল না, কি জানি। বাবা গেলেন অথচ আমায় নিয়ে গেলেন না।

তার জন্যে কোনো কান্নাকাটি করলাম না।

খাওয়ার ওপর আমার বিশেষ কোন লোভ নেই। খেয়ে আমি সহ্য করতে পারিনে, পেটের অসুখ করে। ওই জন্তেই বোধ হয় বাবা আমায় নিয়ে গেলেন না, কে জানে?

মঙ্গলবারে সন্ধ্যের আগে বর-বৌ আসবে, বরযাত্রীরা ফিরে এসে বল্লে।

আমি ঠিক করলাম যেমন ওরা আসবে অমনি যে পথে আসবে ওরা, সে পথের দুধারের গাছে যত পাকাটি বেঁধেছি, সবগুলো জ্বালবো।

কেবল ঘর-বার করছি, একে ওকে কেবল জিগ্যেস করছি, কখন বর আসবে।

বেলা যায়-যায়।

এমন সময় নীলু এসে বল্লে—শীগগির চল—বৌ আসচে—

আমি বল্লাম—কে বল্লে?

নীলু আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। গোয়ালাপাড়ার মোড়ে গিয়ে বাজনার শব্দ পাওয়া গেল যথেষ্ট। বল্লাম—কদ্দূর রে?

—তা বুনোপাড়ার কাছে হবে। অনেক দূর এখনো।

দেখতে দেখতে শ্যামাকাকার ঘোড়ার গাড়ি কাছে এসে গেল।

আমরা ঘোড়ার গাড়ি বেশি দেখিনি, দু-একখানা কালেভদ্রে শহর থেকে এসে এ গ্রামে ঢোকে, তাও আমাদের জীবনে সবসুদ্ধ মিলে বার-দুই দেখেছি মাত্র।

ছেলের দল কলরব করে উঠলো—ওই রে ঘোড়ার গাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বর-বৌসুদ্ধ গাড়ি কাছে এসে পড়লো।

এইবার কিন্তু বাধলো মুশকিল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে খানিকটা কাঁচা রাস্তায় গেলে আমাদের গ্রাম। শ্রাবণ মাসের শেষ, বেজায় কাদা হয়েচে কাঁচা রাস্তায়। বিশেষ করে একটা জায়গায় হাবড় কাদা—সেটার নাম ষাঁড়াতলার দ'। গাড়ি সেখানে এসে সেই হাবড়ে পড়ে পুঁতে গেল। মোষের গাড়ি সে গাড়ি সে কাদায় পড়লে ওঠে না, শহুরে ঘোড়ার সাধ্যি কি সে হাবড় থেকে গাড়ি ওঠায়?

ননী বল্লে—এ রামকাদা থেকে বাছাধনের আর উঠতে হবে না। ও রোগা ঘ্যানা ঘোড়ার কম্মো এই হাবড় ঠেলে ওঠা?

তখন সবাই মিলে চাকা ঠেলতে লাগলাম। গাড়ি চলে এলো শ্যামাকাকাদের বাড়ি। শ্যামাকাকার মা বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বর্ষাকাল, রোদ আছে কি নেই বোঝা যায় না—যদিও তিন-চারদিন বৃষ্টি হয়নি। আমাদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েচে ঘোড়ার গাড়িখানা। সেখানা বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, তার চারিপাশ ঘিরে গ্রামের যত ছেলেপিলে। গাড়োয়ান বলচে, যদি আমরা ষাঁড়াতলার দ'-এর হাবড় পর্যাণ্ড গিয়ে চাকা ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিতে রাজী হই, তবে সে আমাদের গাড়িতে চড়তে দেবে পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত।

আমরা সবাই হৈ-হৈ করে গাড়িতে উঠলাম, কতক গাড়ির ছাদে, কতক পেছনে, কতক ভেতরে। ষাঁড়াতলার দ-এর কাদা থেকে সবাই মিলে ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিলাম, তার বদলে পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল। কি মজা!

আমরা যখন পাকা রাস্তায়, তখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। ননী বল্লে—গা ধোবো কোথায় ? সব্বো অঙ্গে কাদা।

আমাকে বল্লে—মশাল জ্বালবিনে ? চুপ কর্ কে ডাকচে।

সর্ব্বনাশ ! আমার বাবার গলা।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বাবা আমায় খুঁজতে বেরিয়েচেন। তিনিই ডাকাডাকি করচেন। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরিনি, বাবা ডাকতে বেরিয়েচেন।

ননী বল্লে—আলো দিবিনে গাছে গাছে ?

আর আলো ! আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে। বাবা কাছে এসে পড়েচেন ডাকতে ডাকতে।

আমি উত্তর দিল্যম—যা-ই-ই—

এই সন্ধ্যেবেলা সারা গায়ে কাদা মেখে আমি ভূত হয়ে আছি। আপাদমস্তক কাদা। চালাক গাড়োয়ান একটুখানি গাড়িতে চড়বার লোভ দেখিয়ে কাজ গুছিয়ে চলে গিয়েচে। এখন আমায় ঠেকায় কে ?

বাবা এসে আমার কান ধরলেন। বল্লেন—হতভাগা বাঁদর, পড়া নেই শুনো নেই—এত রাত পর্য্যন্ত বাঁদরের দলে মিশে—এ কি ? গায়ে এত কাদা কেন ?.

আমি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বল্লাম—এই গাড়োয়ান বল্লে—আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দাও—বড্ড কাদা—তাই সবাই মিলে—আমি আসতে চাইনি···আমায় ওরা নিয়ে এল—ওই ননী, নিন্তে, শশী—

বলে সাক্ষ্যপ্রমাণের চেষ্টায় সঙ্গীদের দিকে ফিরে চাইতে গিয়ে দেখি জনপ্রাণী সেখানে নেই। কে কোথা দিয়ে সরে পড়েচে এরি মধ্যে।

বাবা বল্লেন—তোমার দোষ নেই ? তোমাকে সবাই নিয়ে গিয়েছিল ? তুমি বুড়ো-দামড়া কিছু জানো না—না ? ঘোড়ার গাড়িতে না চড়লে তোমার—

কথা শেষ না করেই দুড়দাড় মার। চড় ও কিল। বিষম মার। চোখে সর্ষের ফুল।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম বাবার আগে আগে। মা বল্লেন—আচ্ছা, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে ? না কি ? এই ভর্‌সন্ধ্যেবেলায় ছেলেটাকে অমন ভূতোনন্দি মার—ওমা, তা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না হয় গিয়েইচে একটু, আজ একটা আনন্দের দিন ওদের, তোমার মত বুড়ো তো ওরা নয়—ছি ছি—নে, এদিকে সরে আয়, খুব আমোদ করেচ ! এসো—

সে-রাত্রে পাকাটি জ্বালিয়ে রোশনাই করা আমার দ্বারা আর সম্ভব হয়নি।

এর ত্রিশ বছর পরের কথা।

আমি কলকাতায় চাকরি করি। বর্ষাকাল। মহকুমার স্টেশনে নেমে বাড়ি যাবো, এমন সময় শ্যামাকাকার ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোল।

শ্যামাকাকা মারা গিয়েচেন আজ দশ-বারো বছর, গ্রাম ছেড়ে তাঁর ছেলেরা আজকাল শহরে বাস করে, শ্যামাকাকার বড় ছেলেটি এখানে চাকরি করে। ওর নাম অরুণ।

অরুণ বল্লে—বাড়ি যাচ্চেন দাদা ? দীপ্তির বিয়ে পরশু। আপনাকে আসতে হবে অবিশ্যি অবিশ্যি। আসুন না একবার আমাদের বাসায়—

গেলাম। দীপ্তি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী মেয়ে। আমায় দেখে খুশী হয়ে এগিয়ে এল। বল্লাম—কোথায় তোর বিয়ে হচ্ছে রে দীপ্তি ?

দীপ্তি মুখভঙ্গি করে বল্লে—আহা-হা !

—তার মানে ?

—তার মানে আপনার মুণ্ডু।

—কথার কি যে ছিরি !

—হবে না ছিরি ? আপনার কথার ছিরিই বা কি এমন ?

—বল্ না কোথায় বিয়ে হচ্চে ?

—ফের ?

—ত্যাখ্, দীপ্তি, চালাকি যদি করবি—বল্, কথার উত্তর দে—

দীপ্তি আঁচল নাড়তে নাড়তে বল্লে—আহা, যেন জানেন না আর কি !

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—সেখানে নাকি ? সে-ই ?

—হুঁ !

—ভালো। খুশী হোলাম।

—খুশী কিসের ?

—আবার চালাকি করবি দীপা ! হোস্‌নি খুশী তুই ?

—ওরকম বল্লে আমি মরবো আপিং খেয়ে। সত্যি বলচি।

—আচ্ছা যা, আর কিছু বলবো না। এখন একটু চা করে খাওয়াবি, না এমনি চলে যাবো ?

—খাওয়াচ্ছি, ওমা ! ঘোড়ায় জিন দিয়ে যে ! এমন তো কখনো দেখিনি—

—দেখিসনি, দেখলি। নিয়ে আয় চা।

—খাবেন কিছু ?

—তোর খুশী।

একটু পরে চা ও খাবার হাতে দীপ্তি এসে ঢুকে বল্লে—সোমবারে কিন্তু আসতে হবে। আপনাকে থাকতে বলতাম এখানে, কিন্তু বলবো না। বাড়িতে বড্ড ভিড়। আপনার কষ্ট হবে। সোমবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি—

—আচ্ছা।—

—কথা দিলেন ?

—নিশ্চয়। বরযাত্র না কনেযাত্র ?

—দুই-ই। আপনাদের গাঁয়ের যখন বর, তখন বরযাত্র তো হোতেই হবে।

—কনেযাত্র কার অনুরোধে ?

—আমার।

—আচ্ছা আসি—

—ঠিক আসবেন পরশু ?

—ঠিক।

—ঠিক ?

—ঠিক।

দীপ্তি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন আমি চলে এসে রাস্তার ওপর উঠেচি।

যার সঙ্গে দীপ্তির বিবাহ, সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে বটে কিন্তু তারা পশ্চিমপ্রবাসী। দেশের বাড়িতে জ্ঞাতি-ভাইরা থাকে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহুকাল পরে ওরা সবাই দেশে এসেচে, বিয়ের পরই আবার চলে যাবে। গ্রামে আমিও গেলাম অনেকদিন পরে, আমিও গ্রাম ছেড়েছি দশ-পনরো বৎসর। গ্রামে যেতেই ওদের দল এসে আমায় বরযাত্রী হওয়ার নিমন্ত্রণ

করে গেল।

বিবাহের দিন এসে পড়লো।

বিবাহের লগ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেই।

অন্যান্য বরযাত্রী কতক নৌকোতে, কতক গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে কনের বাড়ি চলে গেল। শহর থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসেচে, সেখানেতে বর, বরকর্তা, পুরুত ও আমি যাবো এই স্থির হয়েছে।

বর বল্লে—নিতাইদা, চা খেয়ে নাও, আর বেশি দেরি না হয়, বাবাকে বলো—তুমিই সব গুছিয়ে নাও!

—সে ভাবনা তোমার কেন? যা করবার করচি।

—শোনো একটা কথা। দীপ্তি তোমায় কিছু বলেছিল?

—না।

—বিয়ের বিষয়ে?

—না।

—দেখা হয়নি আসবার দিন?

—না। কেন?

—তাই জিগ্যেস করচি।

সন্ধ্যের অল্পই দেরি আছে, তখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, গাড়িও ছেড়ে দিলে।

আমাদের পিছনে শাঁক বাজতে লাগলো, হুলু পড়তে লাগলো।

গাড়ি গাঁ ছাড়িয়ে খানিকদূর যেতে না যেতে অন্ধকার নামলো, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়াতলার দ'য়ের কাদায় গিয়ে পড়লো গাড়ি। কিছুতেই আর ওঠে না। ঝাড়া পনরো মিনিট বৃথা চেষ্টার পর গাড়োয়ান বল্লে—বাবু, একটু নামতে হবে। খালি গাড়ি তখন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন বোঝাই গাড়ি যাবে না। আপনারা একটু নামুন—

অগত্যা নামা গেল—কিন্তু তখন গাড়ির চার চাকা যা পুঁতবার পুঁতে গিয়েচে।

ঘোড়াকে চাবুক মারলে কি হবে, গাড়ি নড়ে না।

তখন আমি আর বরকর্তা দুজনে সেই কাদায় নেমে চাকা ঠেলি। কোনো লোক নেই। বরকে বা পুরুতমশায়কে অনুরোধ করা যায় না চাকা ঠেলতে। আমরা দুজন ছাড়া ঠেলবে কে?

দীপ্তির বিয়ের সুলগ্ন উত্তীর্ণ না হয়ে যায়, তার বিয়েতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, প্রাণপণে ঠেলতে লাগলুম সেই চাকা, সেই ষাঁড়াতলার হাবড়ের মধ্যে। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হোল। বরকর্তা বুড়োমানুষ, তাঁকে আমি বেশি ঠেলতে দিলাম না। নিজেই ঠেলে কাদা পার করে তুললাম।

বর বল্লে—এঃ, তোমার এ কি চেহারা হোল? কাদায় যে—

আমি বল্লাম—তোমরা যাও, আমি যাচ্চিনে—

সবাই বলে উঠলো—সে কি? সে কি? সে কি হয় নাকি?

—আচ্ছা, এগোন আপনারা। পেছনে আসচি। জামাকাপড় ছেড়ে আসি—

গাড়ি চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেদিকে চেয়ে। আর আমি যাবো না। দীপ্তির বিয়ে সুলগ্নে হোক, বাধাশূন্য হোক।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো একদিনের কথা। দীপ্তির বাবা বিয়ে করে যেদিন ওর মাকে নিয়ে ফিরছিলেন। ত্রিশ বছর আগের ঠিক এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যা।

সেই শ্রাবণ মাসে খাঁড়াতলা দ'এর কাদা ঠেলে গাড়ি উঠিয়েছিলাম কাদায় মাখামাখি হয়ে। বাবার কাছে মার খেয়েছিলাম।

আজ আবার তাদেরই মেয়ের বিয়েতে সেই রকমই গাড়ি ঠেলছি, গাড়িও যাচ্ছে শহরের দিকেই। তাঁদেরই মেয়ে দীপ্তি। হয়তো সে আজ খুব রাগ করবে আমি না—

জীবনে কি আশ্চর্য্য ঘটনাই সব ঘটে!

ভৌতিক পালঙ্ক

অনেকদিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধ-অন্ধকার আধ-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্তদেহে ছ্যাকড়া-গাড়ির মত ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম—আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল—খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম—তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে! ভাগ্যিস্ ডাকলাম!

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য্য!

—'না' বল্লে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আর শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হোল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিল:

> "একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয়
> খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে।
> জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে
> অনুশোচনা করিতে হইবে।
> ২।৩.........স্ট্রীট।"

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বল্ল—পড়।

—বুঝলাম। তা 'রহস্যজনক' শব্দটার মানে কি?

—ঐটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল—পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীর—কেন জানি না—একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লীর চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম—খাটে কাজ নেই সতীশ, চল ফিরে যাই। আমার বাঙালী-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল—ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনও ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিমগাছ ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যত সব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিক্‌রে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। মাথার উপর দিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার উপরকার নরকঙ্কালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে এসে পৌছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জ্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কারুর ছায়া পর্য্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কাণ্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্ত্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্য্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত—চারিদিকে গোলকধাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি; কিন্তু ঠিক ঐ রকম আশ্চর্য্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড় নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য্য, সেই খাট বাড়িয়ে, দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দর-কষাকষি হতে লাগল। ঐ সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কি সে ব্যাকুলতা! দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ঐ খাটটি জুটল—পনরো-শ টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল সে-ই বল্ল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বল্ল—আবার এস, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উস্কখুস্ক চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি!

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করতাম—আরে, ব্যাপার কি?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কিসের বিপদ?

—সেই খাট!

একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনও খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ঐ খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হোল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জেলে দেখল, না, খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জ্বালল। না, সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্ব্বোধ্য আর্ত্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বল্লাম—বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ্। এইবার বোঝো।

সতীশ বল্ল—দেখ খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঐ হতভাগা খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কি বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোনমতেই।

—তবে মর ঐ খাট নিয়ে।

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ঐ খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর? আর কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গণ্ডগোল হবার তো কোন কারণ নেই!

সতীশের মা বল্লেন—দেখ দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে,—তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বল্ল—বলছ কি মা, ভয় পেয়ে পনরো-শ টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে "হেলথ্ অ্যাণ্ড হাইজিন"।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হোল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ঐ বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়ির ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হোল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্ত্তে বোধ হোল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি, আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম—সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল—ব্যাপার কি খগেন? ব্যাপার কি?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সতীশ আমার দু' কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বল্লাম—ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক্, আর তোমার জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না, আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দু'জনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিটমিট করে জ্বলছিল। বোধ হোল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিক-ফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্ট্রিকের আলো দপ্ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কে?

বোধ হোল কে যেন যেন সুইচ্ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না! সে কি বিকট শব্দ!—হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে হে···

বোধ হোল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হোল। বোধ হোল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্ত্তকণ্ঠে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছে!

তার কান্নার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপ-ধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হোল, কে যেন ক্লোরোফর্ম্ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশী, তাই সে খাটের উপর টর্চ্চ ফেলে গর্জ্জে উঠল—কে, কে ওখানে?

কিছুই দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হোল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কিসের যেন বেদনায়। বোধ হোল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটু একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হোল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোট ঘরে তখন সেই গভীর রাতে টিম-টিম করে একটি দীপ জলছিল। ঘরের মেঝের উপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড় দয়া হোল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হোল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে ঢুলছিল।

তার পাশেই আমাদের এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপি চুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণ ভাবে গর্জ্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ঐ খাটের পানে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করে!—বোধ হল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশতে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বল্লেন—খগেন, বাবা খগেন!

আমি বল্লাম—আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কোথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্ শক্' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে, সেও সেই আমারই মত অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বল্লেন—আগে ঐ সর্ব্বনেশে খাট বিদায় কর বাবা!

খাট-বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হোল—শেষ পর্য্যন্ত দু'হাজার টাকায়। এক ইহুদী সেটা কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হোল। বিক্রি না হলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হোত।

এখনও মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয়—সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্মা—যাকে তার দুর্দ্দান্ত স্ত্রী কোন ক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি, সে কি আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ঐ খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?

উৎকর্ণ

আজ এই ডায়েরীটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনে কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এই জন্তে আরম্ভ করলুম যে সব দিক থেকে আজকার দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। দুঃখের বিষয় এই যে এরকম দিন বেশী আসে না জীবনে। আমি এই ডায়েরীটা লিখব এমন ভাবে যে আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখব না। কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।

অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পূজোর ছুটি উপলক্ষে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পূজোর সময়েই তার বাপের বাড়ি থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়িতে সে মারা গেল।

সেই জন্তেই আজকার দিনটি* আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।

আর একটা ব্যাপার, যে জন্তে আজকার দিনটি স্মরণীয়, সে হচ্ছে আজ বহুকাল পরে আমাদের দেশে বন্যার জলে নৌকো করে বেড়িয়ে এসেচি। আমার জ্ঞানে এমন বন্যা কখনও দেখিনি। কুঠির মাঠে সাঁতার-জল, সেখানকার বন-ঝোপের মাথাগুলো মাত্র জেগে আছে, যেখানে আর-বছর ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলেকোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে-সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে। আমি এমন কখনও দেখিনি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না হয়তো! ওবেলা আজ আমি, ন-দি, রামপদ, পিসীমা, জগো সবাই মিলে গাবতলার কাছে নৌকোতে উঠে কুঠির মাঠ দিয়ে, বেলেডাঙা নতিডাঙা হয়ে আবার বাঁশতলার ঘাটে ফিরে এলুম। ওরা চলে গেল ঘাটে নেমে বাড়িতে। আমি চালকীর জোলের মধ্যে ঢুকে জোলের ঘাটে নৌকো থেকে নামলুম।

গাবতলা! যেখান থেকে নৌকোয় উঠবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনো করতে পারা যেত না!

তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চার মাস পরে। সে কি আনন্দ যাবার সময়ে! কত গল্প এই চার মাসে জমা হয়ে রয়েচে, ওকে সেসব গল্প করতে হবে। প্রথমে খুড়ীমা এলেন, তারপরেই খুকু এল। তাকে বই কাপড় দিলুম, সুপুরিগুলো পেয়ে খুব খুশি। শ্রাবণ মাস থেকে সুপুরিগুলো ওর জন্তে রেখে দিয়েচি বাক্সের মধ্যে, দিল্লীর বেশ ভাল মশলা মাখানো সুগন্ধি সুপুরি-কুচোনো। অনেক গল্প-গুজব হোল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ওরা বারাকপুর যাবে পূজোর পরেই।

আমাদের বাসায় ঢুকবার জো নেই। ভেলা করে গিয়ে খোকা বাসার চাবি খুলে মশারি বার করে নিয়ে এল। কারণ পূজোতে বাইরে বেড়াতে গেলেই মশারি লাগবে।

তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে দিয়ে রাত্রের non-stop ট্রেনটা ছুটে এল। আমি বসে বসে আজ সারাদিনের কথাটা ভাবছিলুম। সকালে সেই কানু মোড়লের তামাক খাওয়ানো.ডেকে, দারিঘাটার পুলের নীচে বন্যার জলের স্রোত, হরিপদদার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ-প্রাপ্তি গ্রামে ঢুকেই, জল, বেড়াতে যাওয়া, চালকী, খুকুর সঙ্গে দেখা—এই সব।

এখন রাত ১২টা। বসে ডায়েরীটা লিখচি। শিলং বেড়াতে যাব বলে গোছগাছ করতে বড় ব্যস্ত আছি। ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্চি কলকাতায়। এখানে মিটিং ওখানে engagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে

---

* ২৫শে আশ্বিন

না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই। এই যে শরতের অপূর্ব্ব রূপ এবার—এমন রূপ দেখতেই পেলুম না, গাছপালার নবীন সরসতা উপভোগ করতেই পেলুম না, কলকাতায় এই হৈ-চৈ গণ্ডগোলপূর্ণ জীবনের জন্যে। তাই কাল সারাদিন এখানে ওখানে শত কাজ ও ব্যস্ততার পরে ফিরে এসে রাত্রে শুয়ে ভাবছিলুম এ হৈ-চৈএর সার্থকতা কি? আমার মনের একটা ব্যাপার আছে বরাবর লক্ষ্য করে দেখে এসেচি—সেটা মাটি ও গাছপালার সাহচর্য্যে বড় ভাল থাকে। সেখানে মন অন্য এক রকমই থাকে, শহরে শত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তা হয় না। আনন্দ পাইনে, আমোদ পাই। শান্ত অনুভূতি নেই, উত্তেজনার প্রাচুর্য্য আছে। অনেকে বলে—এই তো জীবন! পুতুপুতু মিন্‌মিনে জীবন আবার জীবন নাকি? এই রকমই তো চাই!

অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ শহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটে স্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে, কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।

কি করচি এসব করে? কার কি উপকার করচি? কারোরই না। আমার আগে কত লোকে এরকম হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে গিয়েছে, কত মিটিংএর সভাপতিত্ব করেচে, কত সাহিত্য-সম্মেলনের পাণ্ডা হয়েচে, কত ব্যাঙ্কে কত চেক্ কেটেচে—কোথায় তারা আজ? কে চেনে আজ তাদের!

গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্ততঃ আমার। অপরের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশী আনন্দ কিছুতেই পাইনে। এত কোলাহলের মধ্যে থেকে বড় কোলাহল-প্রিয় হয়ে উঠেচি বটে, কিন্তু এ আমি সত্যিই ভালবাসিনে। আমার মন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠচে একটুখানি নীল আকাশের জন্যে, শরতের বনভূমির, মটর লতার ফুল ও বনসিমের ঝোপের জন্যে, কার্ত্তিকের প্রথমে গাছপালার, বনতারা ফুলের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্যে।

কাল যখন আসাম মেলে বেরুতে যাব, তখন কলকাতায় এল ভয়ানক বৃষ্টি। একটা বুড়ো রিক্‌শাওয়ালাকে বললুম আমায় মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে নিয়ে চল্। সে কালা ও বোবা। তাকে ধমক দিতে দিতে মেস পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম, তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে তার রিক্‌শার চাকা গেল ভেঙে। তাকে দিলুম মাত্র দু আনা। সে প্রতিবাদ না করে নীরবে চলে গেল। তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে কতটা অন্যায় করলুম, তা বুঝলুম পরে। যত ভাল দৃশ্য দেখি ততই সকলের আগে আমার মনে পড়ে রিক্‌শাওয়ালার সেই করুণ মুখটা।

আসাম মেলে আসবার সময় দেখলুম আড়ংঘাটা ছাড়িয়ে রেলের দুধারে বহুদূর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ডুবে আছে। ঠিক আমাদের দেশের মত বন্যা এসেচে এখানেও, সর্ব্বত্রই এবার বন্যা, এ পথে ১৯২২ সালের পরে আর কখনও আসিনি, এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হইনি ১৯২১ সালের পরে। তিস্তা ব্রিজ পার হইনি ১৯০৬ সালের পরে আর কখনও। সেই এসেছিলুম বাবার সঙ্গে রংপুরে, তখন আমি আট-ন' বছরের বালক। কত জল তার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে চলে গিয়েচে! (ইংরীজি ইডিয়মটি বড় লাগসই, ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুম না।)

লালমনিরহাটে এলুম রাত তখন ১১টা। এখানে খুকুর খুড়তুতো ভাই থাকে, কিন্তু এত রাত্রে কে তার খোঁজ করে? বেজায় ভিড় ট্রেনে, তবুও শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। গোপোকগঞ্জ স্টেশন, বাংলার সীমানা পার হয়ে আসামে পৌঁছুলাম। ভোর হোল রঙ্গিয়া

জংশনে। নিম্ন আসামের ভূমি জলমগ্ন, নলখাগড়ার বনে পরিপূর্ণ। আমিনগাঁওতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পাণ্ডারা এসে জুটলো। কোন রকমে তাদের হাত এড়িয়ে পাণ্ডুঘাটে উঠলুম স্টীমারে। তারপর মোটরে গৌহাটি হয়ে শিলং রওনা হলুম।

এ পথের বন-বনানী ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ভারি সুন্দর। এ পথের উপযুক্ত বর্ণনা কেউ করেনি। শুধু মাইলের পর মাইল দুধারে উজ্জ্বল শৈলমালা, মধ্যে মধ্যে ঝরনা বা পার্ব্বত্য নদী, নদীখাতে ভীষণ ঘন বন, কত বনফুল, কত বিচিত্র গাছপালা, মোটা মোটা লতা গাছে গাছে ঝুলছে, শেওলা জমেচে বড় বড় গাছের গায়ে, নিবিড় অন্ধকার বনানীর তলদেশে সত্যিকার ট্রপিক্যাল জঙ্গল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড় এর তুলনায়, উচ্চতায় বা বনশোভায় কিছুই নয়। এরকম নিবিড় ট্রপিকাল বন সেখানে নেই, সম্ভবও নয়। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের কুঠীর মাঠের সেই ছোট এডাঞ্চির বন এখানে পাহাড়ের সর্ব্বত্র—অন্ততঃ তিন হাজার ফুট উঁচুতেও আমি ঐ গাছের বন দেখেচি। আসামের পাহাড়েই কি ছোট এড়াঞ্চি গাছের আদি বাসস্থান ?

বৈকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম লাবানে। পথে দেখি অবিকল সুপ্রভার মত একটি মেয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম কে না কে! একটু পরে দেখি মেয়েটি পিছন ফিরে আমার দিকে বার বার চাইচে। তারপর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—আপনি!

চেয়ে দেখি সুপ্রভা। সে বললে—ওবেলা মোটর-স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলুম আপনার জন্যে—সে ফিরে এসে বল্লে, আপনি আসেননি। আসুন।

'সনৎ কুটীরে' ও থাকে। সেখানে বীণাও এল দেখা করতে। চা খেয়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরুই। সঙ্গে রইল তার ভাইপো। প্রথমে ক্রিনোলাইন ফল্‌স্ দেখে ও বল্লে, চলুন Spread Eagle falls দেখিয়ে আনি। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরের বাইরে নিবিড় পাইনবনের দিকে বিজন পথে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। পথে খাসিয়া দস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েচে, যখন দেখা গেল সত্যিই ষণ্ডামার্কা গোছের দুজন লোক অন্ধকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসচে। ও বল্লে—আমার ভয় করচে। কি বিপদ! ছেলেমানুষের কাণ্ড। তবে বলেছিল কেন যে আমি জানি Spread Eagle falls-এর পথ!

যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌছে দিয়ে আমি হেঁটে হোটেলে ফিরি। কারণ ও ছেলেমানুষ, আর হাঁটতে পারবে না দেখলুম। শুধু আমায় দৃশ্যাবলী দেখাবার উৎসাহেই ও অতটা গিয়েছিল।

বড় ভাল লাগল এই বেড়ানোটা আজকার। জীবনে এ একটা স্মরণীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েচি। শিলংএর শোভা তো অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মত মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি ক'জন পায় ?

হোটেলে এসেই কালকের সেই গরীব রিক্‌শাওয়ালার কথা মনে এসে দুঃখে চোখে জল এল। যদি আবার তার দেখা পাই! আমার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করব। বাস্তবিকই অন্যায় হয়ে গিয়েচে।

কিন্তু কী ভালই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল-ফোটা পাইনবনের পথে সুপ্রভার সঙ্গে বেড়ানোটা। আর কি সুন্দর দৃশ্য চারিধারে, এমন ঢেউখেলানো ঘন সবুজ শৈলশীর্ষ অন্য কোন জায়গায় দেখিনি। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের চেয়ে শিলং-এর পাহাড়রাজি অনেক বেশী সুন্দর। অনেকদিন আগে একবার ডায়েরীতে লিখেছিলুম যে, ছোটনাগপুরের পাহাড় আর বাংলা দেশের

বনানী এই দুটোর একত্র সমাবেশ হয়েচে এমন কোন জায়গা যদি থাকে, তবে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা হবে না। আমার একটি স্বপ্ন ছিল, ঐ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে এমন একটা জায়গা দেখব। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পেছনের মেঘস্তূপগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে কতবার নিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু এখানকার বনানী দেখে বুঝলুম স্বপ্নলোকের সন্ধান পেয়েচি। লতা, ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় undergrowth, পরগাছা, চঞ্চল উচ্ছল ঝরণাধারা, শিলাখণ্ড, বিরাট বনস্পতির দল, বড় বড় নদীখাত—সব রয়েচে এখানে, অনেক বেশী রয়েচে—আর কী বাঁশবন, পাহাড়ের সর্ব্বত্র—শুধুই বাঁশ—আর নতুন কোঁড় বেরুচ্চে সোনার সড়কির মত হেমন্তের প্রথমে—কি শোভা সে নবোদ্গত তরুণ বেণুদণ্ডের, কি তার ছায়া, কি তার শনশন মর্ম্মর ধ্বনি, বাংলার গাছগুলোর মত সেই স্নিগ্ধ হৈমন্তী সুঘ্রাণটি পথে পথে। অবিশ্যি তিন হাজার ফুটের ওপরে আর ও-প্রকৃতির ট্রপিক্যাল অরণ্য নেই, শুধুই পাইন আর পাইন।

সকালে উঠেচি, এমন খুব কিছু শীত নয়। বাংলাদেশের পৌষ মাসের শীত এর চেয়েও বেশী হয়। সুপ্রভাদের ওখানে যাব বলে বেরিয়েচি, দেখি সুপ্রভা ও আরও দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হোল। একটি মেয়ে আসামী, নাম উষা ভট্টাচার্য্য, ফিলজফিতে এম-এ পাস করেচে। সে প্রথমে বললে—আসামী ভাষা ছাড়া সে জানে না। তার খানিকটা পরে বেশ বাংলা বলতে লাগল। পাইন্ মাউন্ট স্কুলের পথে আমরা উঠলুম একটা পাহাড়ের মাথায়—সেখানে একটা চমৎকার পাইনবন, ঘন, নির্জ্জন। তারপর নেমে Kench-strasse দিয়ে সরীতলা বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনে আমরা বসে রইলুম বহুক্ষণ। বিকেলে ওরা মোটর নিয়ে এল, সবাই মিলে Elephant falls বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথ—gorgeটার ওপর একটা কাঠের পুল আছে। আমরা তার পাশের পাথরে কাটা সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে একেবারে নীচে দাঁড়ালুম। কত বিচিত্র ফার্ণ ও বন্যপুষ্প পাহাড়ের গায়ে দুধারে। খুব বৃষ্টি এল, আমি একটা পাথরের ছাদের তলায় দাঁড়ালুম। সুপ্রভারা কাঠের পুলটায় দাঁড়িয়েছিল, নেমে দেখতে এল আমি উঠচি না কেন। সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মোটরে উঠলুম, তখন আবার বেশ রৌদ্র। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের নীল ফুটে বেরিয়েচে। সনৎ কুটীরে এসে চা খেয়ে আমি বেরুলুম লেক দেখতে। তারপর চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে মোটর স্টেশনে গেলুম। আসবার পথে ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছাত্রদের দল এসেচে, তাদের ওখানে গিয়ে গল্প করলুম।

আপার-শিলংএর যে পথে আজ এলিফ্যাণ্ট্ ফল্‌স্-এ গেলুম—সেটি বড় সুন্দর জায়গা। মাঝে মাঝে খুব নীচে পাইনবনে আচ্ছন্ন অধিত্যকা—দূরে দূরে লাবান ও শিলং পাহাড়চূড়ায় ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী—এই রোদ, এই মেঘ, আবার এই রোদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের মত ছোটখাটো ব্যাপার তো নয় এ, খাসিয়া ও জয়ন্তী শৈলমালার কূলকিনারা পাওয়া যায় না একটা ছোট জায়গা থেকে। এত কতদিকে যে কত কি দেখবার জিনিস আছে, তা তিনদিনের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব। তবে জায়গাটা বড় মেঘলা, বৃষ্টি লেগেই আছে, রোদের মুখ ক্বচিৎ দেখা যায়। এত ভিজে জায়গা আমার পছন্দ হয় না। শুকনো খট্‌খটে, নীরস জায়গা আমি বেশী পছন্দ করি, শিলং একটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে ব্যাপার। একঘেয়ে পাইনবনও আমার ভাল লাগে না। এইজন্যে গৌহাটি থেকে শিলং-এর পথে আড়াই হাজার ফুট নীচেকার নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য্য যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখানকার rolling downs-এর মরকত-শ্যামরূপ

তত ভাল লাগে না। আর সব জায়গাতেই মাটি আর কাদা, কোথাও বসা যায় না, ভিজে— একখানা বসবার পাথর নেই কোথাও। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো নেই, অনাদৃত প্রস্তরময় শৈলগাত্র ক্বচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ঝর্ণা, এত বন্যপুষ্প সেখানে কোথায়? শিলং শহর অতি সুন্দর, ছবির মত সাদা সাদা বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। Kench-strasse-এ ধনী ও শৌখিন বাঙালীদের বাস—বেশ চমৎকার সাজানো বাগান সেদিকে। প্রায় সকলের বাড়িতেই ফুলবাগান। গোলাপ, ডালিয়া, কস্‌মস্, ফর্গেট্-মি-নট্ এসময়ে প্রচুর। বন্যজঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের Compositae প্রায় পাইনবনের নীচে সর্ব্বত্র। আর এক রকমের lichen—আমি তার নাম দিয়েছি bird's feather lichen—গাছের ডাল থেকে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়চে। এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্ যাবার পথে সুপ্রভা একরকম বনের ফল তুলে খাচ্ছিল, আমাকেও খেতে দিলে—রাঙা, ছোট ছোট, যেন কুঁচফলের মত—খেতে টক্। ও ফল আবার খাসিয়া মেয়েরা বাজারে বিক্রী করচে। ও বাজে ফল যে কে পয়সা দিয়ে কিনে খায়! খাসিয়া মেয়েরা দেখতে বেশ, এক-একটা এত সুন্দর ও এমন চমৎকার তাদের মুখশ্রী! ওবেলা 'সনৎ কুটীর' যাওয়ার পথে একটি মেয়ে দেখেছিলুম, সে একেবারে পরীর মত সুন্দরী।

এত ব্যাপার সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে শিলং শহর আমার ভাল লাগেনি। সে প্রাণ-নাচানো সৌন্দর্য্য, বিরাট রুক্ষ রূপ নেই এখানকার প্রকৃতির—যা দেখেচি নাগপুরের রামটেক পাহাড়ে, Highland drive-এ বা নীলঝর্ণার ছোট্ট পাহাড়ে বা সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে। এ বড় বেশী সাজানো—বেশী পুতুপুতু, সাজগোজ পরানো আহ্লাদী পুতুল। দেখতে চমৎকার কিন্তু মনে কোন বড় ভাব জাগায় না।

একথা কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের lower elevation-এর পক্ষে খাটে না—সেখানে যা দেখে এসেচি, তার তুলনা নেই। আমি এখন বলচি শুধু শিলং শহর ও আপার শিলং-এর কথা। আমি যা ভালবাসি, প্রকৃতির সে বর্ব্বর বন্যরূপ এখানে নেই—ঐ যে বললুম, বেশ সাজানো-গোছানো আহ্লাদী পুতুলটি। পাইনবন অবিশ্যি খুব চমৎকার বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক্ বৈচিত্র্য নেই ট্রপিক্যাল বনের মত। কিন্তু lower elevation-এ এক জায়গা থেকে স্যার জোসেফ হুকার দু'হাজার নানা শ্রেণীর গাছপালা সংগ্রহ করেছিলেন। শিলংকে রেলওয়ে বিজ্ঞাপনীতে 'প্রাচ্যদেশের স্কট্‌ল্যাণ্ড' বলে কেন জানি নে—এই যদি স্কট্‌ল্যাণ্ড্ হয় তবে স্কট্‌ল্যাণ্ডের ওপরে আমার শ্রদ্ধা কমে গেল।

অথচ যে কেউ শিলং আসবে, সবাই বলবে—উঃ, কি চমৎকার জায়গা মশাই শিলং! একজন যা বলে, সবাই তার ধুয়ো ধরে। এগুলোর চোখ নেই নাকি? এই ভিজে স্যাঁৎসেঁতে একঘেয়ে পাইনবন তাদের ভাল লাগে? কি ভিজে, 'rain, rain, go to Spain'—নীচে নেমে চল মন, শিলং মাথায় থাকুন, বাংলার সমতল জমিতে নেমে রোদের মুখ দেখে বাঁচি।

একটা পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরখণ্ডে বসে লিখচি। চারিধারে সোনালী কী ফুল ফুটে আছে। দূরে সমুদ্রের মত সিলেটের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর পথ! শিলংটা যেমন বাজে, চেরাপুঞ্জি একেবারে স্বর্গ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথের তুলনা দেব আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ আমি এ ধরণের ল্যাণ্ডস্কেপ্ কখনও দেখিনি। যাঁরা বিলেত বা আয়র্লণ্ডের ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখেচেন, তাঁরা হয়তো বলবেন এর দৃশ্য Surrey downs-এর মত, আয়র্লণ্ডের পল্লী অঞ্চলের মত। গৌহাটি থেকে শিলং রোডে যা দেখে

এসেছি, তা থেকে এর দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বড় বড় চুনাপাথরের শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র ছড়ানো—উঁচু-নীচু শৈলমালা সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায়—কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প মাঠের মধ্যে। শিলাস্তূপের ধারে ধারে, দূরে দু-চারটে সঙ্গীহারা গাছ হয়তো ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শিলং-এর সেই লাল ফুলটা Compositae, বন্যমল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল। করবীফুলের মত কি ফুল—আরও কত কি ধরণের ফুল। চেরাপুঞ্জির থেকে মৃশমাই-এর পথে যে জঙ্গল আছে তা দেখায় ঠিক যেন লিচুগাছের বাগানের মত—অথচ তাদের ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিডে ভরা—তলায় নিবিড় undergrowth—অদ্ভুত ধরণের বন। এক এক জায়গায় চুনা পাথরের শৈলসানু ও নদীখাতের বিশাল ঢালু সম্পূর্ণরূপে বন্যপুষ্পে ভরা—কত ধরণের যে ফুল, তাই গুণে সংখ্যা করা যায় না। পাইনবন এদিকে একেবারেই নেই। চেরা বাজারে গাড়িতে বসে লিখচি—সামনে নদীর বিরাট gorgeটা মেঘ ও কুয়াসায় ভরে গিয়েচে, তার ধারে নিবিড় বন। গাড়ি ছাড়ল—এত জোরেও গাড়ি চালায় খাসিয়া ড্রাইভারগুলো! উঁচু-নীচু শুকনো খটখটে রাস্তা দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছুটচে, একদিকে উজ্জ্বল পর্ব্বতচূড়া, বনফুলে ভরা শৈলসানু, অন্যদিকে নদীর বিরাট খাত, কুয়াসা ও মেঘ আটকে রয়েচে। তাতে আবার রামধনুর সৃষ্টি করেচে। এক এক জায়গায় ঘন বন, যেন লিচু বাগানের মত দেখতে। অথচ মধ্যে ঘন অন্ধকার, শাখাপত্রে নিবিড়, ডালে ডালে অর্কিড, নীচে undergrowth-ওয়ালা বন—এ অঞ্চলের কী একটা গাছও চিনিনে! আসামের বন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, না ফার্ণ, না Compositae, না প্রাইমূলা, না মল্লিকা, করবীর মত ফুলগুলো—কিছুই কি বাংলাদেশের মত নয়? ঊনবিংশ মাইল থেকে বড় নদীখাতটা শুরু হোল, প্রায় ৮।১০ মাইল মোটর রোডের সমান্তরাল চলেচে, তবে কুয়াসায় আবৃত বলে ভাল দেখা গেল না। অপর পারের সানুদেশে নিবিড় Temperate forest, ফার্ণ আর শেওলা, থুজা আর প্রাইমূলা অজস্র। যার অভাবে শিলং ভাল লাগছিল না—তা পেলুম আজ চেরার পথে। এত বেশী পরিমাণে পেলুম, যে আর আমার কোন অভিযোগ নেই শিলংএর বিরুদ্ধে। এ এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেচি চেরার পথে, যে স্বপ্নলোক পাথরে, বনে, ফুলে, মেঘে, ধূ ধূ নির্জ্জনতায়, বিরাটত্বে অভিনবত্বে বিচিত্র। যেখানে আজ মৃশমাই গ্রামে চেরা মালভূমির প্রান্তে শিলাখণ্ডে বসে লিখছিলুম, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা আছে? ওই তো আমার চিরকালের স্বপ্নের সার্থকতা।

শিলং ফিরে দেখি সুপ্রভা নেই মোটর স্টেশনে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম তারপর লাবান চলে গেলুম। একটা কথা লিখতে ভুলেচি। বড়বাজারের কাছে যখন বাস থেমেচে দুটি সাহেবের ছেলে এসে মোটরে উঠল, কি চমৎকার চেহারা দুটির। বড়টির সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ লাজুক, কোন ইংরেজ বালকদের মত উগ্র নয়। বললে তার মা খাসিয়া মেয়ে। মোটরে স্টেশনে সুপ্রভাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাবানে গেলুম। ওরা মোটর যোগাড় করতে পারেনি বলে আসতে পারেনি। সেখানে চা খেয়ে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বীণা একটা ফুলের তোড়া দিলে, চমৎকার সাদা গোলাপ ফুলের তোড়াটি। কাল যাওয়ার কথাবার্ত্তা হোল, সাড়ে আটটার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাব আমরা। ও বল্লে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে বড় মাথা ঘোরে।

বৃষ্টি নামল সামান্য। আমি হোটেলে ফিরলুম। রাত সাড়ে সাতটা।

কাল সকালে শিলংয়ের ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলুম, চারিধারে পাইনবনের সারি, ঘুরে

লাবান হিলের চূড়া, লেকের ধারে শিশির-সিক্ত নানা গাছপালা—বেশ ভাল লাগল শিলং শহরটিকে। কিন্তু সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। সাড়ে আটটাতে সুপ্রভাদের গাড়ি আসবে, কাজেই রেণুর চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েই হোটেলে এসে স্নানাহার করে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরে সুপ্রভার ভাই শান্তি এসে বললে—এ কি! আপনি রয়েচেন যে! আমি তো অবাক্, রয়েচেন মানে কি! গাড়ি কোথায়? শান্তি বল্লে—গাড়ি তো আপনার এখানে এসেছিল, আপনাকে না পেয়ে চলে গেল। শুনলুম হোটেলের ম্যানেজার ভুল করে বলে দিয়েচে যে, আমি ট্যাক্সি আসার দেরি দেখে বাসে সিলেট্ রওনা হয়েচি। কাজেই ওরা চলে গিয়েচে।

কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ করে বসে আছি সকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ির জন্যে—আর হোটেলের ম্যানেজারটা না জেনেশুনে বলে দিলে আমি সিলেট্ চলে গিয়েচি?…

তখনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রথম টোল্ গেটে রওনা হলুম—মাত্র ৩২ মিনিট সময় হাতে আছে, এই ৩২ মিনিটের মধ্যে ১৪ মাইল গিয়ে নঙ্‌মাল্‌কি গেটে ওদের গাড়ি ধরিয়ে দিতে হবে। গাড়ি ছুটল তীরবেগে—Upper Shillong-এর রাস্তা দিয়ে। মোড়ের মাথায় আমি থামতে দিইনে। ড্রাইভার বলে গাড়ি উল্টে যাবে বাবু। বাঁকের মুখে দশ মাইলের বেশী চালাবার উপায় নাই, তাতে খালি গাড়ি। এলিফ্যাণ্টা ফল্‌স্-এর কাছে যখন এলুম, তখন ড্রাইভার বল্লে, ভরসা করছি বাবু, ধরিয়ে দিতে পারব।

চালাও চালাও, আরও জোর দাও। ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না! আর কতটা? শুধুই উঁচু-নীচু, বাঁকা আর বাঁকা, খাদের মত রাস্তা চলেচে পাহাড়ের গায়ে। জোর দেয় বা কি করে? নঙ্‌মাল্‌কি গেট দূর থেকে দেখা গেল। দুখানা বাস আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েচে। আমরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ট্যাক্সিখানা ছেড়ে ঠিক সিলেটের পথে গিয়ে উঠল বাঁদিকে। আমি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি থামালুম, দেখি তাতে এক সাহেব আর মেম। খবর নিয়ে জানলুম আর একখানা সাদা ট্যাক্সিতে দুটি বাঙালী মহিলা ও এক ভদ্রলোক কিছু আগে চলে গেলেন।

কি আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টাফিসের কাছে দেখি কান্তি দাঁড়িয়ে পথে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলুম। সে বল্লে—একটায় সিলেটের ডাক-ভ্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেয়। আমার মন বেজায় খারাপ, শিলং-এ থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মেল-ভ্যানে টিকিট বুক্ করে এলুম। পথে সুপ্রভার সেই দাদা মোটরে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—কি, আপনি যান নি? এখানে যে?

আমি সব বল্লুম। সুপ্রভার বুদ্ধির নিন্দাও করলুম। তিনি বল্লেন—তার কোন দোষ নেই। আমিও ছিলুম তখন, আপনার হোটেলে গিয়ে দশ মিনিট আমরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—গাড়ি না আসাতে আপনি মোটরবাসেই সিলেট চলে গিয়েচেন। পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েচে মনে হোল।

কি আর করব, যা হবার তা হয়েচে। এতদিন থেকে ঠিক করে আসচি যে সিলেটের পথ দিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে যাব, তা উভয় পক্ষের সামান্য বুদ্ধির দোষে ঘটল না।

একটার সময় বাস ছাড়ল। নঙ্‌মাল্‌কি গেটে গিয়ে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৪২ মিনিটে গেট্ পার হয়ে গিয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে। ঠিক দশ মিনিট আগে গিয়েচে ওরা।

সিলেটের পথ অপূর্ব্ব। বেশ বিপজ্জনকও বটে, ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট gorge—তার

ঢালু নিবিড় বনে চাপা। ট্রিফার্ণ আর কত ধরণের গাছ, কত কি ফুল! চেরাপুঞ্জির পথের সে gorgeটা এদের তুলনায় কিছু না। কুয়াসা করে আছে gorge-এর মধ্যে। যেন ওর মধ্যে কেউ কাঠখড়ে আগুন দিয়েচে, সাদা ধোঁয়া উঠচে। ডাইনে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে সরু পথ, বাঁয়ে গভীর খাদ। খাদের দিকে জানলা দিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে, নীচু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঢালুতে কত রকমের গাছপালায় নিবিড় বন। চেরাপুঞ্জির সেই সব ফুল, আরও সংখ্যায় বেশী। খাসিয়া ড্রাইভার প্রাণের মায়া রাখে না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বেজায় আঁকা-বাঁকা উচু-নীচু সংকীর্ণ পথে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়েচে—যদি স্টীয়ারিং একটু বেগড়ায়, কি গাড়ি স্কিড করে—তবে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে পড়ে গাড়িসুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

পাইউম্‌প্লে গেটে দুদিকের গাড়ি একত্র না হলে মোটর ছাড়ে না। এদিক থেকে শিলংএর, ওদিক থেকে সিলেটের বহু বাস্ ও প্রাইভেট্ কার দাঁড়িয়ে। নেমে বেড়ালুম, দূরে সিলেটের সমতলভূমি মেঘের মত দেখা যাচ্চে। আমি কেবলই ভাবচি—কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে চলে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকত, দুজনে কত গল্প করতুম। সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথা আমার মনে হয়েচে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকের গোটা অপরাহ্নটির এ বিচিত্র যাত্রাপথে। পাইউম্‌প্লে ছাড়িয়েও কত gorge—নংটু বলে একটা জায়গায় কয়েক মাইল মাত্র আগে একটা সুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে কি নিবিড় অরণ্যানী, চেয়ে দেখলুম, অত নীচে তো নজর হয় না, তবুও যতটা দেখলুম, নিবিড় কালো অন্ধকার হয়ে রয়েচে ভেতরটা। শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে সেই ট্রিফার্ণ শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নংটু থেকে পথ অনেক নেমে গেল, গাছ-পালার শোভা আরম্ভ হোল, সত্যিকার বন যাকে বলে তা আরম্ভ হোল। সে বনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনও সে ধরণের নিবিড় বন দেখিনি। সে বন অন্ধকারে নিবিড়, দুষ্প্রবেশ্য, আর্দ্র, কত কি বিচিত্র গাছপালায় ভরা। আসামের এদিকের একটা গাছও আমার পরিচিত নয়। জংলা কলা, সুপুরি, Cycades, বাঁশ, পাম্ এসবও আছে। ফুলই বা কত রকমের! বড় বড় পার্ব্বত্য ঝর্ণা শিখরদেশ থেকে নীচে সবেগে নামচে। (আর এখন লিখব না, টেপাখোলাতে স্টীমার এল, এর পরেই গোয়ালন্দ, জিনিসপত্র গোছাতে হবে।)

কলকাতায় বসে সেই পথের কথাই মনে পড়ছে।

সেই অপূর্ব্ব পথের সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে সারাক্ষণ কেবল ভেবেছি—আহা, সুপ্রভা যদি থাকত, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা সে নেই, কাকেই বা বলি? আমার পাশে যে কয়েকটি লোক বসে—সবাই লাট-দপ্তরের কেরানী, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে—তারা বসে ঢুলচে, নয়তো গল্প করচে অবিশ্রান্ত, দুজনে বমি করতে শুরু করে দিলে, কেউ চেয়েও দেখছে না সেই বিরাট gorgeগুলোর সৌন্দর্য্য, তার উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈচিত্র্য, কত ট্রিফার্ণ, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ঝর্ণা, মেঘ উঠছে gorge থেকে, গভীর খাতের নিম্নতল থেকে ওপর পাহাড় পর্য্যন্ত বহু Zone-এ বিভক্ত উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈজ্ঞানিক রূপ। কি বিপজ্জনক সংকীর্ণ রাস্তা পাহাড়ের ওপর; কি রূপ সারাপথের! নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সে কি নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী গভীর gorge-এর তলদেশে কালো অন্ধকারের মধ্যে, কত জংলী ফল, Cycawers, ফার্ণ, আর ফুল, ফুল, ফুল—পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেছে সেই লাল ফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলেটের সমতলভূমিতেও দেখা যায়—দশ-বারোটা বিভিন্ন শ্রেণীর ফুল গুনেচি, বড় বড় লতা, পরগাছা, অনেক নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেচে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই

ট্রিফার্ণ-শোভিত নিবিড় বনের মধ্যে। সত্যিকার ট্রপিক্যাল প্রকৃতির অরণ্যানী এই প্রথম দেখলাম ডাওকির পথে।

ডাওকিতে যখন মোটর পৌঁছল তখন অস্তদিগন্তের আভায় পর্ব্বত ও অরণ্যানীর শীর্ষদেশ রাঙা হয়ে উঠেচে—নিস্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে নীচু উপত্যকায় ঘন ছায়া নেমেচে, গাছপালার সুগন্ধি বেরুচ্ছে, যেমন হেমন্তের অপরাহ্নে আমাদের দেশে বেরোয়। সুন্দর জায়গাটা, দু-একটা ডাকবাংলা আছে টিলার মাথায়। সম্ভবতঃ অস্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ের নিম্নসানুতে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে। এখানে চা খেয়ে নিলুম, তারপর আবার মোটর ছুটল—শৈলমালা চলেচে মোটর রোডের সমান্তরাল ভাবে বাঁদিকে, অনেকগুলো ঝর্ণা নেমে আসচে পাহাড় থেকে নিয়ে বনানীর মাথার ওপর, দুধারে ছেটেখাটো জঙ্গল আর জলাভূমি, বড় বড় নলখাগড়ার বন। মোটর ছুটেচে তীরবেগে, হু-হু হাওয়া বাধচে বুকে, তৃতীয়ার একফালি চাঁদ উঠেচে সামনের আকাশে। সন্ধ্যার অন্ধকারেই জয়ন্তীপুর বলে একটা গ্রামের ডাকঘর থেকে ডাক তুলে নেওয়ার জন্যে গাড়ি সেখানে দাঁড়াল। সাড়ে সাতটায় সিলেট্ টাউনে এল। টাউনটা আমার ভাল লাগল না—Read huts আর টিনের ঘর, সিনেমা—বেতের ও বাঁশের আসবাব বিক্রী হচ্ছে দোকানে। সময় খুব অল্পই ছিল, সুরমা নদীতে খেয়া পার হয়ে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়লুম। কি ভিড় গাড়িতে, আজই সব আপিস-আদালত বন্ধ হয়েচে, সব লোক ছুটেচে বাড়ি, পা রাখবার জায়গা নেই। কুলাউড়াতে আসবার পর কুলাউড়া আর শ্রীমঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল, চা বাগানও নীচে আছে, কিন্তু অন্ধকারে কোন্‌টা চা বাগান আর কোন্‌টা জঙ্গল এ বোঝা বড়ই শক্ত। কুমিল্লাতে একদল ছেলে উঠল, তারা ময়নামতী সার্ভে স্কুলের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি চলেচে। ঘুম পেল না গাড়িতে, যদিও জায়গা যথেষ্ট ছিল। চাঁদপুরে স্টীমারে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ওপর বসে বেলা একটা পর্য্যন্ত কাটালুম। ডেকে পা রাখবার জায়গা নেই, সর্ব্বত্র লোকে বিছানা পেতে শুয়ে বসে আছে। পদ্মাবক্ষে কাটল প্রায় এগারো ঘণ্টা। ভাগ্যকুলে কিছু খাবার কিনে খাই। গোয়ালন্দ থামবার আগে সে কি ভীষণ বৃষ্টি আর ঝড়! তাতেই স্টীমার দেরি করে ফেললে আসতে। চাটগাঁ মেলে চড়ে বসে ভাবলুম এ তো বাড়ি এসেচি, আমাদের রানাঘাট দিয়ে যে ট্রেন চলে সে তো বাড়িরই সামিল।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হোল। খুব দীর্ঘ হয়তো নয়, কিন্তু দীর্ঘটা relative term, আমার কাছে এই ভ্রমণই খুব দীর্ঘ বটে। তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর-যত্নে এবারকার ভ্রমণের স্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।

ওখান থেকে ফিরে নলহাটি এসেচি কাল রাত্রে। রেল কোম্পানি জায়গাটা ভাল বলে যতই বিজ্ঞাপন দিক, আসলে জায়গাটা ভাল নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তো কিছুই না—শুধু ধানের ক্ষেত চারিধারে, একটু ডাঙা আছে, এখানকার লোকে বলে 'পাহাড়'—আমার মনে হয় সেটা একটা কাঁকর ও রাঙা মাটির ঢিবি। বৈকালের পড়ন্ত ছায়ায় দূর-প্রসারিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখা গেল ডাঙাটার ওপর থেকে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ওর বেশী আর কিছু নেই এখানে। জগধারী বলে একটা গ্রাম আছে দু'মাইল দূরে, ব্রাহ্মণী নদীর ধারে। সেখানে গুরুপদ সিংহের বাড়ি আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। বীরভূমের এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ির গড়ন আমাদের চোখে ভাল. লাগে না। গৃহ-নির্ম্মাণের শ্রী-ছাঁদ নেই, সৌষ্ঠব নেই, চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়াদের পাথরের বাড়িগুলোতেও যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েচি, এই সভ্য বাংলাদেশে তার নিতান্তই অভাব চোখে পড়ল। জগধারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি দেখলুম। পটে দুর্গা পূজা হচ্চে।

সেকালের একখানা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দেবীর পট টাঙানো, পেছনে রাঙাপাড় কাপড় পরা আগাগোড়া ঘেরাটোপে ঢাকা কলা-বৌ, পূজার উপকরণ যথেষ্টই, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে করলে যেমন হয় তেমনি। আমরা নদীতে স্নান করলুম, হাঁটু পর্য্যন্ত জল, কোন রকমে শুয়ে স্নান করা করা গেল। কাছেই একটা মঠ আছে, সেখানে গিয়ে গুরুপূজার বিধি আছে দেখে এবং একটা মোটা লোকের ফটোগ্রাফের গলায় ফুলের মালা কৌশলে পরিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো হচ্চে দেখে চটে গেলুম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করলুম। নর-পূজা আমাদের ভাল লাগে না, আমার ধাতে ও বরদাস্ত হয় না।

মুড়াগাছায় গিয়েছিলুম একটা লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে। লোহারাম মুখুয্যে ওখানকার জমিদার, তাদের বাড়িতে থাকবার জায়গা দিলে। বেশ লোক ওরা, কি খাতির-যত্নটাই করলে! ওদের বাড়ির একটা ছেলে বিলেত-ফেরত, হিসেব শিখতে গিয়েছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী, বসে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত স্পেনের গল্প করলে। সকালে উঠে গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম—আমাদের দেশের কত গাছপালা, খুব বড় বড় বাড়ি গ্রামের মধ্যে, বড় বড় সেকেলে পূজোর দালান, যেন দিল্লীর মতি মসজিদ কি দেওয়ান-ই-আমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পূজোর দালানের এই স্থাপত্যটা মুসলমান তথা মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ, ও বিষয়ে কোন ভুল নেই। হিন্দু স্থাপত্য যে এটা নয়, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের, কোনারকের সূর্য্য মন্দিরের গঠনরীতি দেখলে তা বোঝা যাবে। কাছেই ধর্ম্মদহ গ্রামে বাবা ছেলেবেলায় কথকতা করতে এসেছিলেন, সে কথা মনে পড়ল স্কুলের মাঠে বেড়াতে গিয়ে। বৈকালে অল্পক্ষণই মিটিং-এ ছিলুম, তারপরে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে ট্রেনে উঠলুম—দুধার বন্যার জলে ভেসে গিয়েচে, এখানকারও অবস্থা আমাদের দেশের মতই। ক'দিন কেবলই ট্রেনে ট্রেনে বেড়াচ্ছি, ১৩ই অক্টোবর শুরু হয়েছে, আর আজ ২৮শে—এই ১৫ দিনের মধ্যে কত জায়গায় গেলুম—আর কত বার বেড়ালুম।

আজ ক'দিন এখানে এসেচি। এবার অতিরিক্ত বন্যা আসাতে কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই। আমার তেমন ভাল লাগে না—ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো তো জলে হেজে পচে গিয়েচে, যেখানে সেখানে কাদা ও পানা-শেওলার দাম ও কচুরীপানা। খুকু এখানে আছে, ও রোজ সকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে। আমি সকালে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে দিয়ে ঘাটে যাই, বেশী বনের মধ্যে যাই, মাকড়সার জাল এবার চোখে পড়চে না। তা হলেও খুব বড় বড় জাল দেখলুম, শিলং-এ একরকম বড় জাল দেখেছিলুম পোস্টাপিসের কাছে। আমাদের এখানে মাকড়সাদের জালের টানা খুব দূরে দূরে হয়। আবার খুব ছোট টানার জালও দেখিনি যে তা নয়, যেমন কুঠীর মাঠে একটা ঝোপে সেবার দেখেছিলুম, এই গাছপালা, লতাঝোপ, মাকড়সা, পাখী এদের একটা বিভিন্ন জগৎ—সহানুভূতির সঙ্গে ওদের না-দেখলে কি ওদের বোঝা যাবে না চেনা যাবে?

বিকেলে রোজ মাছ ধরতে যাই। অনেককাল পরে আবার কেঁচোর টোপ গেঁথে মাছ ধরতে বসেচি। বোধ হয় বনগাঁ স্কুলে ভর্ত্তি হবার পরে আর কখনও মাছ ধরিনি—দু'একদিন ধরতে বসলেও এত তোড়জোড় করে যে ধরিনি তা ঠিক। এবার ইছামতীতে মাছও হয়েচে বিস্তর। আমার ছোট ছিপে কেবল পুঁটি আর ট্যাংরা ছাড়া পাইনে, কিন্তু ফণি চক্কত্তি ও হরিপদ রোজ সাত-আটটা বড় বড় বান মাছ ধরে। বেলা যত পড়ে আসে, রোদ খুব রাঙা হয়ে ওঠে। ভারী সুন্দর শোভা গাঙের, বকের দল উড়ে যায় জলের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামে—

আমি কাৎনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকব না সন্ধ্যার শোভা দেখব ? চোখ ঠিকরে যায় কাৎনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। চোখে এত ব্যথা হয় যে মনে হয় যেন খুব বই পড়েচি। সন্ধ্যার সময়টা খুব lovely লাগে, কিন্তু বসে পাঁচীদের সঙ্গে গল্প করি।

আজ সর্ব্বপ্রথম ভাল লাগল কুঠীর মাঠ। বন্যার দরুন এবার কুঠীর মাঠের সে সৌন্দর্য্য ছিল না, ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো সব হেজে পচে গিয়েচে, সে শ্যামলতা আর কোনদিকে চোখে পড়ে না। আজ দুপুরে খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে, তারপর আমার মনে পড়ল যে এবার এসে আইনদ্দির সঙ্গে দেখা করা হয়নি। নব্বই বছর হয়েচে ওর বয়েস, কবে মরে যাবে, যাই একবার দেখা করে আসি। মনে ছিল আনন্দ, কি জানি কেন জানিনে, সেই আনন্দভরা মন নিয়ে গেলুম পড়ন্ত বেলার হলুদে রোদমাখানো গাছপালার নীচে দিয়ে কাঁচিকাটা পুলের দিকে। বনের দিক থেকে এক এক জায়গায় কি সুন্দর ফুলের সুবাস ভেসে আসচে, অথচ কি ফুলের যে অত সুঘ্রাণ তা দেখা যায় না। খুঁজে খুঁজে দেখি পথের ধারে এক জায়গায় ঝোপে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেচে, তার গন্ধ ঠিক আতরের মত। কিন্তু যে গন্ধটা আগে পেয়েছিলুম, তা নাটা ফুলের গন্ধ নয়। সে গন্ধ অন্য ধরনের। শুধু ফুলের গন্ধ বলে নয়, বনভূমির পাশ দিয়ে যাবার সময় লতাপাতা, ফুলফলের গন্ধ জড়িয়ে মিশিয়ে যে অপূর্ব্ব সুবাসের সৃষ্টি করে গাছপালারাই তার স্রষ্টা, নীলাকাশের তলায় কোটি যোজন দূরের সূর্য্যের রৌদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির রস,, বায়ুমণ্ডলের অদৃশ্য বাষ্প, এদের সংযোগে ওরা যে রসায়ন প্রস্তুত করে, তাই আমাদের প্রাণীজগতের উপজীব্য। ভূতধাত্রী তরুলতা নির্ম্মমভাবে ছেদন করবার সময় একথা সব সময় আমাদের মনে ওঠে না। তাই আজ সকালে যখন দেখলুম তেঁতুলতলার মাঠের ধারে খানিক করে জমির জঙ্গল কেটে দিয়েচে—তখন এত কষ্ট হোল! ওখানে নাকি ওরা বেগুন করবে। আহা, কি চমৎকার সাঁইবাবলা ও কেঁয়োঝাঁকা গাছগুলো কেটেচে, আজ ত্রিশ বছর ধরে ওই বনভূমি কত বনের পাখীর আহার্য্য যুগিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে। সৌন্দর্য্যে, ছায়ায়, ফুলের সুবাসে আমাদের তৃপ্তি দিয়েচে, তাদের ওভাবে উচ্ছেদ সাধন করে যে কোন্ প্রাণে তাও বুঝিনে। একটা গাছ কেউ কাটলে আমি তা সহ্য করতে পারিনে। কাগজের কলের জন্যে আমাদের দেশ থেকে গাড়ি গাড়ি বাঁশ চালান যাচ্চে, বাঁশবন দেশের একটা শোভা, এবার সর্ব্বত্র দেখচি বাঁশবন ধ্বংসের পথে চলেচে। দাম তো ভারী, পাঁচ টাকা করে একশো—আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি বেচিনি। দুপুরে যখন রৌদ্রে মাঠের মধ্যে গামছা পেতে চুপ করে শুয়ে থাকি, দূর গ্রাম-সীমান্তে বাঁশের বনে নতুন বাঁশের দল সোনার সড়কির মত উঁচু হয়ে থাকে, নীল আকাশের তলায় শিমুলের ডাল বাতাসে দোলায়, রঙিন-ডানা প্রজাপতিরা বনের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, একটা গাঙ্‌চিল ইছামতীর পারের বড় কদম গাছটা থেকে ডাকে—মনে আসে অপার ব্যোমের উদার ইঙ্গিত, বনপুষ্পের বাণী, বনবিহঙ্গের কলতান —যে সৃষ্টিকে যে জগৎকে জানিনে, বুঝিনে, ভ.ল করে চিনিওনে তার রহস্যে দেহমন সবল হয়ে ওঠে।

তারপর গেলুম আইনদ্দির বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে মরাগাঙের বড় বড় বট গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুন্দরপুরের দিকে। আবার সেই বনঝোপের গন্ধ, সেই ছায়া, সেই পাখীর ডাক। এবারকার বন্যায় অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও এ পথের সৌন্দর্য্য তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। মনে হোল সেই ডাওকি নদীর দোদুল্যমান সেতু ও সেই gorgeটার কথা।

ঠিক দুপুর বেলা। অপূর্ব্ব পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। নৌকো বেয়ে চলেচি বনগাঁয়ে,

মেঘলোক-শূন্য নীলাকাশের কোণে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার ওপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আছে। কিচমিচ পাখী ডাকচে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপে ঝোপে। মন উদাস হয়ে রয়েচে আমার, কিছু ভাল লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের ভালবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু! এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।

খুব বেড়িয়েচি এবার ছুটিতে। সেই ডাওকি নদীর gorge, চেরার পথে সেই প্রাইমুলা ও Compositaeর বন মনে পড়চে। চালতেপোতার বাঁকে এই গাছপালার সৌন্দর্য্যে, খুকুকে ছেড়ে আসবার বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে আছে। এ সময় শিলং, নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সেই বিরাট ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এইমাত্র বারাকপুর থেকে মোটরে ফিরে এলুম। আজ বেলা বারোটার সময় পশুপতিবাবু, বৌঠাকরুণ, নীরদবাবু ও তাঁর স্ত্রী, বগলাবাবু ও আমি গিয়েছিলুম মোটরে বারাকপুরে বেড়াতে। পথে টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন এক জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর যখন বনগাঁ এলাম, তখনই বেলা গিয়েচে। জিনিসপত্র কিনে নিতে কিছু দেরি হয়ে গেল। ওখান থেকে বেলা পড়ে গেলে বারাকপুর গেলাম। পুঁটিদিদিদের বাড়ির সামনে মোটর গিয়ে দাঁড়াল। খুকু নিজের বাড়ি কি করছিল, আমি গিয়ে তাকে বল্লুম। সে কাপড় পরে তখনি এল। পশুপতিবাবু খুড়োদের রোয়াকে বসিয়ে তার ফটো নিলেন। আমিও সেখানে পেছন দিকে দাঁড়াই। তারপর বগলাবাবু গান করলেন—'চাঁদ ডুবে যায় ভোর গগনে।' আমি পশুপতিবাবুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। এসে দেখি শিবুর মা নীরদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েচে। একটু পরে তিনি এসে খুকুদের বাড়ি বেড়াতে গেলেন। আমিও দেখতে গেলুম। খুকু ডাকলে, আসুন না? আমি ওদের ঘরে গেলুম। তক্তপোশের ওপর উনি আর খুকু বসে আছেন। তারপর খুকু দোরের কাছে এসে বসল। বগলাবাবু গান করলেন—আমিও সেই দোরের বাইরেই বসে। গান খুব ভাল হোল। তারপর সবাই খেতে বসে গেল। ওদিকে খুকু, বেলা ও পশুপতিবাবুর স্ত্রী খেতে বসলেন। খুড়ীমা পরিবেশন করলেন। খাওয়াদাওয়ার পরে খুকু একা এ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলে বগলাবাবুর গানের বিষয়ে। সুপ্রভার পত্র দেখতে চাইলে, তা ওকে তো না দেখিয়ে পার পাবার জো নেই। বল্লে, আবার কবে আসবেন? বল্লুম, সেই বড়দিনের সময়। বল্লে, এসে বড় খারাপ লাগছিল এ ক'দিন, আজ ভাগ্যিস আপনারা এলেন!

রাত নটার গাড়ি গেলে আমরা রওনা হলুম। খুকু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে—গুড্ বাই। পশুপতিবাবু বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ওর একটা ফটো তুলেছিলেন, আর একটা কোন্ ঝোপের কাছে দাঁড় করিয়ে।

পথে জাহ্নবীর বাসায় খোকাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ওপারে গেলুম তেল কিনতে। বারাসতের কাছাকাছি এসে গাড়ির টায়ার আবার গেল। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পরে একখানা লরি পেয়ে তাতে করে কলকাতা পৌছুলাম।

এ বেড়ানো মনে থাকবে বহুদিন।

চন্দননগরে একটা সভার আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে বলে গিয়েছিল, কিন্তু শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের আজ বার্ষিক উৎসব। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন। তুপুরে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল চন্দননগরেই। সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লাল চাটুয্যে, আমি সকলে বেলা তিনটের সময় গিয়ে নৃত্যগোপালের পুস্তকাগারে উপস্থিত হলাম। ওরা লাইব্রেরীতে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল—আমি পেছন দিকের নির্জ্জন ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে শীতের অপরাহ্নের হলদে রোদ-মাখানো রাধালতাফুলের ঝোপ ও বাঁশগাছের দিকে চেয়ে রইলুম। কেবলই মনে হচ্ছে সুপ্রভা আর খুকু আজ এই অপরাহ্নে কি করচে। এক একবার আমাদের গাঁয়ের বকুলতলাটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, খুকু এখন পড়ন্ত বেলায় ছায়ায় তাদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে এসেছে এ-বাড়ি। সুপ্রভার আজ ছুটি, হয়তো পাইন মাউণ্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে। ওর রুমালখানা সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলুম। বড্ড ময়লা হয়ে গেছে। ওদের তুজনের কথা ভাবছি, এমন সময় সুরেনবাবু ডাক দিলেন লাইব্রেরীতে ব্রাউনিং শোনাবার জন্তে। সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের 'Rudel to the Prince of Tripoli'র অনুবাদ করেছিল 'বিচিত্রা'য়। সুরেনবাবু তার অন্তভাবে অনুবাদ করেচেন—আমার তুটিই ভাল লাগল—তবে সুপ্রভার অনুবাদ খুব literal না হলেও মিষ্টি বেশী। সুপ্রভা যে ছন্দটাকে অবলম্বন করেচে, তার ধ্বনি ও লয়ের অবকাশ সুরেনবাবুর অবলম্বিত ছন্দের চেয়ে বেশী। ব্রাউনিং পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফটো নেওয়া গেল। মনে পড়ল গোপীর সঙ্গে কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে তারপর আর কখনও আসিনি। বিয়ে করব বলে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি, ১৮ বছর বয়স। অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। মনে আছে, মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বারো বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি। মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তাও আজও মনে আছে। এখন গিন্নীবান্নী হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘরসংসার করচে—যদি বেঁচে থাকে।

চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হবার আগেই সুরেনবাবুকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আমি আর বিজয়লাল চলে এলুম। হাওড়া থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্কে এলাম। সেখানে শিশির-কুমার ইনস্টিটিউটের থিয়েটার হচ্চে পার্ক স্কুলের প্রাঙ্গণে। নীরদবাবু, বৌঠাকরুণ, পশুপতিবাবু সবাই আছেন। জাস্টিস্ দ্বারিক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল।

সেদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। ঢাকুরিয়া, কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে রেল-লাইনের ধারে ছোট ছোট গৃহস্থ-বাড়ি। সন্ধ্যার চাপা আলো পড়ে কেমন একটা শ্রী হয়েচে, যেন কত পুঞ্জীভূত শান্তি ও রহস্য, গৃহস্থালির কত স্নেহ ভালবাসা এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, নারীর মুখের মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে, তার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় সে শান্তি ও মাধুর্য্যের নিত্য আরতি চলচে। যেখানেই একটা মেয়ে এঁদো-পড়া পুকুরের ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটা কি মরুভূমিই হত তাই ভাবি।

রাজপুরে পৌঁছে গল্প করলুম তেঁতুলদের বাড়ি বসে অনেকক্ষণ। ফুলি এল, তেঁতুলের মা বলছিলেন তাঁকে বড়দিনের ছুটিতে হরিদ্বার নিয়ে যেতে। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ হল—কোথা দিয়ে যাওয়া যাবে, কোথায় নামা যাবে, কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে—এই

সব কথা।

কিন্তু আমি দেখলুম গৃহস্থালিতে যে খুব শান্তি আছে, যতটা দূর থেকে ভাবি, তা ঠিক নেই। এ সব বাড়িতে তো ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদা কান্নাকাটি লেগেই আছে—যখন ছোট ছেলেমেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, তখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। আর এ করছে ওর সঙ্গে ঝগড়া, ও করছে এর সঙ্গে ঝগড়া। তেঁতুল তো আপিস থেকে ফিরে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে—তার বৌকে সবাই কেন একলা ওঘরে ফেলে রেখেচে। এ রকম শুধু এদের বাড়ি নয়, সব গেরস্ত বাড়িতেই দেখেচি এই রকম অশান্তি, চীৎকার—চিন্তা ও বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব।

মেয়েরা যদি ভাল হয় তবে সত্যিই সংসারে ওরা শান্তি আনতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকাংশই অশিক্ষিতা, বিশেষ কিছু জানে না, বোঝে না—তুচ্ছ বিষয়ে বড় বেশী ঝোঁক, তুচ্ছ কথা নিয়ে দিনরাত আছে। মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কম মেয়েরই আছে। যে ধরণের সদাহাস্যময়ী মেয়ে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমি হাসিখুশি বড় ভালবাসি, যে মন খুলে হাসতে পারে না, আনন্দ করতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসারে চলা যায় কি?

অনেকদিন পরে খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর গান শুনলুম কাল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। ভাগলপুরে থাকতে হেমেন রায়ের মুখে আবদুল করিমের খুব প্রশংসা শুনি। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এঁর গান শুনব। আমি জানতুম না যে এবার All Bengal Music Conference-এ খাঁ সাহেব আসবেন। সেদিন কাগজে নাম দেখেই স্থির করলুম গান শুনতেই হবে। সত্যিই খুব বড় দরের শিল্পী, ত' তাঁর গান শুনে কাল বুঝে নিয়েচি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার মিষ্টি সুর আশা করিনি, যেন সারেঙ্গী বাজ্‌চে।

এবার বড়দিনের ছুটি দেশে বড় আনন্দে কাটিয়েচি। বৈকালে রোজ কুঠীর মাঠে ছোট এড়াঞ্চি ফুলের বনের মধ্যে একটা চাদর পেতে বসে বসে Jeans-এর Universe Around পড়তুম। একদিন চাঁদ উঠেচে ছোট একটা চট্‌কা গাছের পেছনে, বোধ হয় ত্রয়োদশী, বিকেল বেলা, সে একটা অপূর্ব্ব ছবি—কতকাল মনে থাকবে ছবিটা। পরের প্রতিপদেই হালিডাঙ্গার প্রজা-বাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে ফিরচি, দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে চাঁদ উঠল, কোনদিকে কোন মানুষ নেই, পশ্চিম আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করচে শুকতারা। একটা খেজুর গাছে রসের ভাঁড় পাতা ছিল, ভাঁড়টা নামিয়ে রস খেলাম, কিন্তু গাছে আর সেটা বাঁধতে পারলাম না। তখন আমার মনে হয়নি, তাহলে ভাঁড়টার মধ্যে দুটো পয়সা রেখে এলেই হত।

এবার কি জ্যোৎস্না পেয়েছিলুম দেশে! যেমন দিনে আকাশ সুনীল, মেঘমুক্ত—রাতে তেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—অবিশ্যি শীতও অতি ভয়ানক। খুকু ছিল দেশে, সে সর্ব্বদাই এসে গল্প করত, বেশ লাগত তাই।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উঠে গেলুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেমন একটা মনোভাব হল, খানিকটা বিষাদও তার মধ্যে যে না আছে এমন নয়। এই চারিপাশের বাড়ির কত লোককে জানতুম যখন প্রথম এ মেসে এসেছিলুম, তারা সবাই কোথায় গেল? কতকাল হল তাদের আর দেখি নে। তাদের কথাই মনে হল এ নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে। দুপুরে স্কুলের ছাদে একা বসে বসে যাদের কথা ভাবি, এরাও তাদের দলে আছে। সত্যি, আমার মনের

এ যে কি অদ্ভুত অবস্থা, কোন পরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত মানুষকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয় না, সকলকে কাছে টেনে রাখতে ইচ্ছে করে যে কেন!

"Space & time, I am learning are merely modes or
appearance
Since a corner with thee darling, seems infinite now.—Goethe.

অনেকদিন পরে দেশে গিয়েছিলুম। দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছই। আমার ইচ্ছে, আমি যে গিয়েচি, কেউ যেন না টের পায়। কেননা তাহলে বড় লোকের ভিড় হয়, এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দেখা করতে আসে। আমি অত ভিড় পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ইন্দুদের বাড়ি জানতে পারলে তো আর রক্ষেই নাই। কিন্তু শ্যামাচরণ দাদাদের টিউবওয়েলের কাছে গোপাল দেখি কি করচে, সে তো গিয়ে বাড়িতে খবর দেবে—সেই ভয়ে চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলুম, তবু ও ঠিক টের পেয়েচে। তখন অগত্যা ওদের বাড়ি যেতে হল। তারপর খুকুদের বাড়িতেও গেলুম। খুকুদের বাড়িতে প্রথমটাতে যাইনি। পাঁচীদের বাড়ির উঠোনে আমাকে ঢুকতে দেখেই খুকু ডাকলে, আসুন, আসুন। ওদের দাওয়াতে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ও বল্লে—আপনি শনিবার না আসাতে ভয়ানক রাগ করেছিলুম। খুকুদের বাড়ি থেকে যখন ফিরি, তখন বিকেল হয়েচে। সাজিতলার পূবে যেখানে ভাঙন ধরেছে নদীর পাড়ে, সেখানে একটা হেলে-পড়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে নদীর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলুম। বড় আনন্দ ছিল মনে, আরও বসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে উঠতে হল। চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসা আমার বড় ভাল লাগে—শীতের সন্ধ্যায় ফুটন্ত ছোট এড়াঞ্চির ফুলের বন, শুকনো গাছপালার গায়ে রাঙা রোদ, গরীব লোকের কুঁড়েঘর, ওধারেই নদী, নদীর ধারে মাঠ—দেখতে দেখতে আমি আর উমা যে সাঁকোর ধারে বনের মধ্যে খেলা করতুম, সেখানে এসে উঠলুম।

পরদিন যখন কলকাতায় আসি, ট্রেনে সারাপথ কেবল মড্ কস্টেলোর একটা গানের লাইন মনে আসতে লাগল বার বার—আর কি সে আনন্দ মনে! জীবনটাকে এই একমাসের মধ্যে একটা নতুন চোখে যেন দেখেচি। জীবনের যেন নতুন অর্থ হয়। একটি নতুন উপন্যাস শুরু করব ভাবচি এই সম্পূর্ণ নতুন ধারার।

তারপর আজ পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯।১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম। কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্দ্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমান জীবন-ধারার কথা, যা চিরপুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়—সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্চে, কিন্তু বহুদূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্ত্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?

এ কথা আরও মনে এল যখন দুপুরে একাই পাটনাতে ওদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে বসেছিলুম। ছোট্ট পার্কটা, বড় বড় ডালিয়া ফুটে আছে, আর ক্যালেণ্ডুলার—সেও আধশুকনো। নীল আকাশের নীচে বসে দুপুরের রোদটি এই ভয়ানক শীতের দিনে কি মিষ্টিই লাগছিল। পাটনায় শীতও প্রচণ্ড।

আজ ন'বছর আগে পাটনা থেকে শেষ যখন চলে গিয়েছিলুম, আমার সে জীবনে এ জীবনে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েচে। তখন ছিল অন্য ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি, এখন হয়েচে অন্য ধরণের।

এখন যারা এসেচে জীবনে—তখন ওরা ছিল না। ওদের সত্যিই বড় ভালো লাগে। তাই আজ দুপুরে বসে কেবলই কাল রাতের মত ছোট্ট একটি পল্লীনদী, একটি বকুলগাছের ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম-এর কথাই মনে পড়ে। সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্চে, আহা, কোথায় কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার করেছে অসুখ—ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুব খারাপ হবারই কথা।

সমস্তদিন যদি এ পার্কটিতে বসে এমনি আপন মনে ভাবতে পারতুম, খুবই ভাল হত। কিন্তু তা হবার নয়, আমরা পাটনা শহরে এসেচি শুনে তাবৎ প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভাবচেন আমরা তাঁদের অতিথি, কারণ মাতৃভূমি থেকে এসেচি, একটা প্রীতির চোখে সবাই দেখবেন, ওটা বেশী কথা নয়। বৈকালে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—এখানকার পাব্লিক প্রসিকিউটর মিহির-লাল রায়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা বৈকুণ্ঠবাবু এ্যাডভোকেটের সঙ্গে—ভাগলপুর থেকে যখন-তখন আপীলের মোকদ্দমা করতে এসে ওঁর বাসায় উঠতাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক এসে-ছিলেন—সবাই যখন চায়ের টেবিলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, বিহারীদের সহানুভূতির অভাব, এমন কি বাঙ্গালীদের প্রতি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণনা করছিলেন, আমি তখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে অস্তসূর্য্যের রঙে রঙিন আকাশ ও রাঙা-রোদ মাখানো গাছ-পালার দিকে চেয়ে ভাবচি, কত গ্রামের গাছপালার ছায়ায় এই সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষি মনে কত কি ভাবচে, কত ভাঙা-গড়া করচে মনে মনে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে, কত স্বপ্ন দেখেচে—তারপর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটালে।

সন্ধ্যার সময়ে বি-এন্ কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভিভাষণ বড় চিন্তাপূর্ণ হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা যখন বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি, তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, আজ পাটনাতে তেমন শীত নেই, আমার কেবলই বাংলাদেশের কথা মনে হয়।

এতক্ষণ সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েচে ?

ওরা সবাই ?…

সুপ্রভাও ?…

সুশীলমাধব মল্লিক এখানকার বড় এ্যাডভোকেট। আমি তাঁকে এর আগে হাইকোর্টে কয়েকবার দেখেচি। তাঁরই বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। তাঁদেরই গাড়িতে সবাই গিয়ে পৌঁছলুম। সেদিন বনগাঁয় যেমন এক সভা বসেছিল মন্মথ রায়ের বাড়িতে—এদিন এখানেও সুশীলমাধববাবুর বৈঠকখানায় রবীনদা, কলেজের জনৈক biology-র অধ্যাপক, নীরদ, সজনী, আমি সবাই মিলে আরম্ভ করলুম। আনাতোলা ফ্রাঁস সম্বন্ধেই তর্কটা গুরুতর। খাওয়ার সময় সুশীলবাবু নিজে বসে এত তদ্বির করতে লাগলেন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ বোধহয় সন্ধ্যার পরে দু এক পেগ টেনে একটু খোসমেজাজে থাকেন—যে আমরা না পারি পাতের তলায় সন্দেশ লুকিয়ে ফেলে ফাঁকি দিতে, না পারি মাছ-মাংসের বাটিতে একটুকরো ফেলে রাখতে। পাটনায় এসে কেবলই খাচ্চি, খেয়েই প্রাণ গেল।

রাত অনেক হয়েচে। জ্যোৎস্না আজও ফুটেচে। মণিদের বাড়ি এসে সকলে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে এখানকার সেসন্স্ জজ শিবপ্রিয় বাঁড়ুয্যের বাড়ি আমি, নীরদ আর ব্রজেনদা গেলুম বিলিতী মিউজিক্ শুনতে। নীরদ ও জিনিসটা বোঝে। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাহেবী ধরণের বাড়ি, সবুজ ঘাসে মোড়া লন্, বড় বড় গাছ, ধু ধু করচে সামনে গঙ্গার চর, দূরে ঘাটে স্টীমার পারাপার হচ্ছে। নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সে কি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম পূর্ব্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে। Schubert-এর মোজার্টের সুর কতই বাজচে ওদিকে। গানের সঙ্গে নিজের মনের অনুভূতি জড়িয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দের রসায়ন সৃষ্টি হল, বহুদিন আগে ইসমাইলপুরে থাকতে এমন ধরণের আনন্দ মাঝে মাঝে পেতুম, তারপর আর বহুদিন পাইনি।

ওখান থেকে আমরা গোলঘর ও নিতাইবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়ে বাড়ি এলুম। আমাদের গরম জল দিয়ে গেল ওদের বাড়ির একটি মেয়ে। দুপুরে কমলবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলুম। অনেক ভালো ভালো গোলাপ দেখা গেল তাঁর বাগানে। সতীদেবীর মীরাবাঈয়ের ভজন গানখানা খুব ভাল লাগল।

বরিখে বাদরিয়া শাওন কি
শাওন কি মন ভাবন কি—

বাড়ি আবার এলুম এঞ্জিনিয়ারটির মোটরে। আসবার পথে এরিস্টলোকিয়া লতা দেখাবার জন্যে ট্রেনিং কলেজে নিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লতার ফুলটি।

বৈকালে বি-এন কলেজের হোস্টেলের লনে চা-পার্টি। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ফটো নেওয়া হল। এখানে প্রীতি সেন বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল—তাকে বেশ ভাল লাগল। সন্ধ্যায় মিটিং বি-এন কলেজের হলে। আমি একটা বক্তৃতা করলুম—'রচনার ওপরে ভূমিশ্রীর প্রভাব'—'বহু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পটি পড়লুম। বহু জনসমাগম—সভার পরে এক গাদা অটোগ্রাফ খাতা সই করতে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। একদল আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে এল। আমার বইয়ের ছোট গল্পের সম্বন্ধে ওদের কি ভয়ানক উৎসাহ! আমার যে এত ভক্ত আছে তা জানতুম না।

আমি এখনই বক্তিয়ারপুর যাব। রভীনদা আমায় তুলে দেবেন বলে মোটরে উঠলেন, আর মণি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির মোটর। মণিদের বাড়ি এসে জিনিসপত্র নিয়ে বেরুতে যাব—মোটর স্টার্ট নিলে না। ভদ্রলোক কত চেষ্টা করলেন—হাঁপাতে লাগলেন—আহা! তাঁর কষ্ট দেখে আমার কি কষ্ট! সত্যিই ভেবে এখনও আমার চোখে জল আসচে। মহা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মাত্র আর ২০ মিনিট দেরি আছে গাড়ির। একজন লোক ছুটল—একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এল। তাতেই এলুম স্টেশনে। এসে দেখি পাঞ্জাব মেল ৫৫ মিনিট লেট। ওরা কেউ আমায় ফেলে যেতে চাইলে না। আমি একবার সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁকীপুর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন আমি এখনও ইসমাইলপুরেই আছি। এখান থেকে আজ বা কাল গিয়ে ইসমাইলপুরের সেই প্রান্তরে গিয়ে হাজির হব। কিন্তু কি পরিবর্ত্তনই হয়েচে জীবনে এই ক'বছরে। তখনকার আমি আর বর্ত্তমান আমিতে অনেক তফাৎ। জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন, এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জ্জন, এখন খুকু এসেছে, সুপ্রভা এসেচে। সুপ্রভার কথা অত্যন্ত মনে হচ্ছিল, আমি সেদিন যে পত্র দিয়েচি, তা শিলচরে আজ ঠিক পেয়েচে।

এমন সময় পাঞ্জাব মেল এল। একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ এক্জিবিশন দেখে ফিরচে, তার সঙ্গে রভীনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্লেন—'এই যে বিভূতিবাবু, ইনি বলচেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন বিভূতিবাবুর। আমি খুঁজছিলুম, কোথায় গিয়েছিলেন?' মেয়েটা বেশ ভাল, অমায়িক স্বভাব, সুন্দরীও বটে। জিগ্যেস্ করলুম—লক্ষ্ণৌ এক্জিবিশন কেমন দেখলেন? তিনি বল্লেন—বেশ ভালই, আপনি দেখেন নি? বল্লুম—কই আর দেখলুম!

মনে হল আমাদের পাড়ার খুড়ীমা, ন'দি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবে

শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবন যাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে? মাঝে পড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমী ও সঙ্কীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।

কি ভয়ানক শীত লাগল ট্রেনে বক্তিয়ারপুর আসতে আসতে। অমন শীত অনেক দিন দেখিনি। রাত বারোটার এক্সপ্রেস বক্তিয়ারপুর পৌঁছুল। একটা কুলি নিয়ে কালীদের বাড়ি গেলুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত ইরাদিদি ও কালীর সঙ্গে গল্প করলুম।

পাটনা থেকে এসেই জানলুম সুপ্রভা এসেচে কলকাতায়। সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম। গত শনিবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। সেদিন কয়েকটি গান করলে—আমি জানতাম না ও এত সুন্দর গান গায়। কি মিষ্টি লাগল ওর গান ক'টি সেদিন! বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরেই গেলাম বনগাঁয় ৬-৫০এর ট্রেনে। স্টেশনে সুবোধ ও যতীনদার সঙ্গে দেখা। রাত ন'টাতে বনগাঁয় পৌঁছেই দেখি জগদীশদা'র মেয়ে হাসির বিয়ে—সেদিনই। প্রফুল্ল, হরিবাবু প্রভৃতি বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কাজে মহাব্যস্ত। আমায় বল্লেন—এত রাত্রে কোথা থেকে? খেতে বসে যাও। যোগেনবাবুদের বাড়ি খাবার জায়গা হয়েছিল। খেয়ে যখন বাইরে এলুম তখন চাঁদ উঠেচে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ।

পরদিন দুপুরের পরে বারাকপুরে গেলুম। যাবার সময় আজকাল চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বড় চমৎকার লাগে। খুকুদের রান্নাঘরে ওরা খেতে বসেচে। বল্লুম—খুড়ীমা, অতিথি আছে। ওরা অবাক হয়ে গেল। তারপর খুব খানিকটা গল্পগুজব করে বিকেলে ফিরি। ফেরবার পথে গাজিতলা ছাড়িয়ে সেই খেজুর গাছের হেলানো গুঁড়িটায় বসে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে, ওপারের মুক্ত তৃণাস্তৃত চরভূমির দিকে চেয়ে রইলুম। সন্ধ্যায় বনগাঁ ফিরে চারুবাবুর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, চা খাওয়া সেরে সাড়ে-আটটার ট্রেনে কলকাতা রওনা হই।

আজ বিকেলে গোলদীঘিতে কতক্ষণ বসে ছিলুম। গৌরীর কথা মনে হল অনেকদিন পরে। এই সময়েই সে মারা গিয়েছিল। সেই শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, সুন্দর ঠাকুরের দোকানে ধারে লুচি খাওয়া—সেই সব শোকাচ্ছন্ন গভীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিনগুলো এতকাল পরে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

এরাও তো চলে যাবে। সুপ্রভা পরশু বলচে গঙ্গার ধারে বসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আপনি শীগগির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশীদিন বাঁচব না, সত্যি আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেচে। কবে মরে যাব, আপনি টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হলে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জ্জন, সে নির্জ্জন।

আজ বিকেলে রেডিও আপিস থেকে ফিরবার পথে লালদীঘিতে একটু বসেছিলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটি এখন তাদের বাড়ির সামনের বকুলতলাটিতে আপনমনে হয়তো বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে কি ভাবচে। কি জানি কেন বসলেই ওদের দুজনের কথা মনে হয়। তাই মনে হল এই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া যাব। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই একঘেয়ে দুর্দ্দিনে জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। গৌরী তখন মারা গিয়েচে. আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাই তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ভরে রেখেচে, সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরি করতে

১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। সে কত সালের কথা হয়ে গেল। তারপর ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগলপুরে চাকরি নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। সেও হয়ে গেল ১২।১৩ বছর আগেকার কথা। আর কখনও যাইনি। অথচ এই ১২।১৩ বছরে জীবনে সবদিক দিয়ে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হয়েচে! এখন জীবনে কত লোক এসেচে, যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত। আসলে দেখলুম অর্থসম্পদ কিছু নয়। মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী—ফোর্ড বা রক্‌ফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত-হাস্যে-ভরা চোখ দুটি তোমার অবসর মুহূর্ত্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে না হয় দূরে কোনও পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনও শৈলশিখরের পাইন বার্চ্চ গাছের বনের ছায়ায় কোন স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে, তবে ফোর্ড বা রক্‌ফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।

হয়তো একথা Platitude ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু যে Platitude জীবনে অনুভব করে, তখন সে আর Platitude থাকে না, তার জীবনের অভিজ্ঞতায় তা হয়ে দাঁড়ায় পরম সত্য।

জাঙ্গিপাড়া স্কুলে প্রথম চাকরিতে ঢুকি ১৯১৯ সালে। হঠাৎ জাঙ্গিপাড়া যাওয়া ঘট্‌ল এত-কাল পরে। ১৯২৪ সালে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম, আর কখনও যাইনি। স্কুলের দিকে গিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। চিনতেও পারলেন। চন্দনপুরের গাঁয়ের পাড়ে সেই তাল-তলায় তখন কত বসে থাকতুম। পুরোনো জায়গাটা দেখতে গেলুম শ্রীরামপুরের দিদির সঙ্গে—এই সব জায়গার স্মৃতি বড় বেশী জড়ানো—ওখানে গিয়েই সে কথা মনে পড়ল।

তারাজোলের পথেও খানিকটা গেলাম। সে পথটা তেমন ফাঁকা নেই, বড় বড় গাছ হয়ে পড়েচে। বাজারে আমার কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল—যেমন গজেন, ফকির মোদক প্রভৃতি। গজেন এই স্কুলেই এখন মাস্টারী করচে।

বিষ্ণুপুর গেলুম বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ি। ওদের সেই পুরোনো রান্নাঘরটা ঠিক আছে, তার দাওয়ায় বসে খেলাম অনেক পরে। রাত্রে অনেক গল্প হল পুকুরের ঘাটে বসে। বিজয়বাবুকে বল্লাম—রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলে হয়তো এতদিন পরে এখনও জাঙ্গিপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।

পরদিন সকালে উঠে ওদের পুকুরপাড়ে সেই উঁচু জায়গাটি দেখে এলাম—একটা বড় তেঁতুল গাছ আছে সেখানে। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম জেটিতে বসে এই জায়গাটার কথা ভাবতাম। হঠাৎ যে আজ এখানে আসব—জাঙ্গিপাড়ায়—এত জায়গা থাকতে তা কি কেউ কখনও ভেবেছিল? থানার পাশ দিয়ে পথটায় হেঁটে যাবার সময় পুরোনো দিনের সব কথা, সব মনের ভাব মনে আসছিল। যে ছোট্ট ঘরটাতে ডাকঘর ছিল, চিঠিপত্রের আশায় বসে থাকতাম—সে ঘরটা এখনও সেই রকমই আছে। আমার ছোট্ট ঘরটাতেও গিয়ে দেখলাম—তবে ঘরটা বন্ধ। পদ্মপুকুরের ঘাটের দিকে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুপুরে আমার ছাত্র গজেনের বাড়িতে গেলুম। ওর ভাগ্নী পরিবেশন করলে—তার আবার স্বামী এসেচে, বেচারী ঘোমটা দিয়ে লজ্জাতেই জড়সড়। ওদের মাটির ঘরটা কেমন চমৎকার সাজানো—মাটির মাছ, খেলনা, পুতুল, পুঁতির মালা ইত্যাদি কুলুঙ্গিতে বসানো। দুটি তরুণী লাজুক মেয়ে আনাগোনা করচে ঘরে ও বাইরে—খাঁটি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালি।

এক জায়গায় অনেক গাঁদাফুল ফুটে আছে। একজনের বাগান এটা। সে তার মনের

সৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশ করেচে ফুলের গাছ পুঁতে। এক এক ধরণের কাব্য রচনা। মনের সৌন্দর্য্য যাতেই যে ভাবেই প্রকাশ করা যায় তাই তো শিল্প—সেই হিসেবে উদ্যান-রচনা একটা বড় শিল্প।

ভগবান বোধহয় নিজেকে প্রকাশ করেচেন বিশ্ব-রচনার মধ্যে দিয়ে। Analogyটা হয়তো ঠিক হল না, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে।

আর একটা কথা ভাবছিলুম, যাকে ভালোবাসা যায় বেশী, তাকে দুঃখ দিলে ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়, আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালবাসার ব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালবাসো, তাকে খুব আদর দিও না, ভালবাসা কমে যাবে। মাঝে মাঝে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো, ভালবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

ভগবান যাকে বেশী ভালবাসেন, তাকেই কি বেশী কষ্ট দেন—তবে কি এই বুঝতে হবে ?

আজ বিকেলে বিশ্রী ঝড়বৃষ্টি, একঘেয়ে বাদলা। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিউজিয়মে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েচি। একদল ঢুকেচে একদল ঢুকতে পারেনি, তাই নিয়ে ওখানকার সেক্রেটারীর সঙ্গে ভীষণ গোলমাল—ছেলেরা হাতাহাতি করতে যায়। আমি তাদের থামিয়ে দিই। সাহেব আমার নাম লিখে নিলে—অর্থাৎ আমার নামে কি যেন রিপোর্ট করবে। করগে যা রিপোর্ট, তোর রিপোর্টকে আমি ভয় করিনে। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে জামাকাপড় কিনতে গিয়ে আটকে গেলুম বৃষ্টিতে। তারপর পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ফিরি।

ক'দিনই বড্ড ছুটোছুটি হচ্চে, কাল পুরী যাব। ঝড়বৃষ্টি পড়ে গেছে, তা কি করব, উপায় নেই। এখন না গেলে ছুটি কৈ আর ? কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে বিকেলবেলা। নগেন বাগচীদের পুকুরঘাটে সন্ধ্যার সকলে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে হল—অনেকদিন আগে এদের এই বাড়িতেই ছিলাম। এই পুকুরঘাটে মা নাইতেন। সেই রকমই সব আছে বাড়িটার। কিন্তু এই ১৩।১৪ বছরে আমার জীবনে কি পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে তাই ভাবি। সম্পূর্ণ একটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে, মনের দিক দিয়ে, সবের দিক দিয়ে। তখনকার আমি আর এই আমি কি এক ? মোটেই না—সম্পূর্ণ পৃথক দুই মানুষ।

পুরী যাওয়া হয়নি। ঝড়বৃষ্টি দেখে যাওয়া বন্ধ করিনি। টিকিট কিনে এনেছিলুম, সুপ্রভার পত্র পেলুম, সে ওয়ালটিয়ার গিয়েচে, তাতেই যাওয়া বন্ধ করলুম। দেশে চলে গেলুম সাড়ে ছ'টার গাড়িতে। বেজায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নেমে যদি গাড়ি না পাওয়া যেত, বড় কষ্ট পেতাম। তার পরের দিন সকালে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গল্প করি। দুপুরে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম সরস্বতী পুজো করব বলে আমার ঘরে। খুকুরা ওখানেই আছে। খুকু একটু পরেই বার হয়ে এল। অল্প গল্পগুজব করলে। এবার চড়কতলার ছেলেরা বারোয়ারীতে সরস্বতী পুজো করচে। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েচে বলে রাত্রে আজকাল সেখানেই শুই। আমার ঘরে তার পরদিন সরস্বতী পুজো করলুম। বাল্যকালে দেশে সরস্বতী পুজো করেচি, আর কখনো থাকিওনি দেশে। এতকাল পরে এই। খুকুরা এসে অঞ্জলি দিলে—পাঁচী ও খুকুকে বল্লুম, তোরা প্রসাদ ভালো করে দে সবাইকে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে একাই গেলুম বেড়াতে। গাছে গাছে কুল খেয়ে বেড়াই ছেলেবেলার মত। চারাগাছে কুল ফলেচে, কিন্তু ছেলেবেলার মত কুলগুলো তেমন মিষ্টি না। শিমূল গাছে

প্রথম ফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। সন্ধ্যার রাঙা আকাশের তলায় চারিধারে গাছের মাথাগুলো নানা বিচিত্র-ভঙ্গি ও ছত্রবিন্যাসের সৌন্দর্য্যে ভারী চমৎকার দেখাচ্চে। হঠাৎ পাটনায় মিহির-বাবুর বাড়ির চা-পার্টির কথা মনে হল, সেই যে আমি পর্দ্দার ফাঁকের দিকে রাঙা রোদ লাগানো গাছের দিকে চেয়ে দেশের কথা ভাবছিলুম সেদিন। সে তো এই কুঠীর মাঠের কথাই। খুকুর কথাও। তারপরে বাড়ি ফিরে আসতেই খুকু ছুটে এল—সে ভালো কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল চড়কতলায়। খুড়ীমা বাড়ি নেই—কলে গা ধুতে গিয়েচেন—টিউবওয়েলে।

রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসে ওর মুখে নানারকম গল্প শুনি। ও যশোর জেলায় এক পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করতে গিয়েছিল। গ্রামের নাম কোলা বেলপুকুর। সেখানে কেমনভাবে তাকে একটা গৃহস্থবাড়িতে আদর-অভ্যর্থনা করেছিল, আর এক গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ি কেমন অনাদর করেছিল এ সব গল্প করে গেল। ওর গল্পে অনেক অজানা পাড়াগাঁয়ের ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এমন গল্প বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

পরদিন কালো এল—ওদের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ। খুকু বসে মাছ কুটচে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে, বেলা দশটা, আমি রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ওর দাদা আর মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করলুম। নদীতে কালো আর আমি সাঁতার দিয়ে আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে চলে গেলুম রায়-পাড়ার ঘাটে। বৈকালে খুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে পর্য্যন্ত। তারপর আমি একটু কুঠীর মাঠে পথে বেড়িয়ে এসে স্টেশনে রওনা হলুম জিনিসপত্র নিয়ে। আসবার পথে বুড়ীকে দেখতে গেলাম। বুড়ীর হাত ভেঙে গিয়েচে, ময়লা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। আমায় দেখে কি খুশিই হল! বুড়ী সত্যিই আমায় খুব ভালবাসে। এক-সময় ওর অবস্থা ভাল ছিল, ওর স্বামী ছিল জমীর দেওয়ালি। মুসলমানপাড়ার মধ্যে জমীরের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ছেলেবেলায় জমীর দেওয়ালিকে আমি দেখেচি। বুড়ী তারই বউ। এখন আর কেউ নেই ওর, অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েচে। ভিক্ষে করে চালাতে হয় প্রায় এমন অবস্থা। বুড়ীকে কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বার হলুম, কারণ ট্রেনের বেশী দেরি নেই। অশথতলায় তখনও জ্যোৎস্না কোটেনি, শেষ বিকেলের ছায়া। হরিবোলার দোকানে এসে ইন্দু ও কণিকাকাকে পাওয়া গেল। ওরা বসে গল্প করচে। আমার মনে কি অদ্ভুত আনন্দ! সত্যি এমন সব আনন্দের দিন জীবনে ক'বার আসে? এই জ্যোৎস্না, এই শুক্রতারা, আধখানা চাঁদ, সেকরাদের বাড়ির কাছে নেবু ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—এরই মধ্যে কত কি ভাবনা! এ আনন্দ অনেকদিন ভোগ করলুম বটে। আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুল ফোটা দেখি। আজ চার বছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটির দিনে নানা বিকেলে খুকু আমায় আনন্দ দিয়েচে—কত ভাবে, কত কথায়। ওই ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্টেশনে এলুম। গোপালনগর স্কুলে ছাত্রেরা থিয়েটার করচে আজ। আমাদের গাঁ থেকে মেয়েরা দেখতে আসবে। ট্রেনে যখন বনগাঁ আসচি তখনও আমার অদ্ভুত আনন্দ। গাছের সারির ওপর দিয়ে পারঘাটার জলের ওপারে আমাদের গাঁয়ের দিকে চেয়ে ভাবচি, সবাই এখন কি করচে? খুকু এখন কি করচে? হয়তো রান্নাঘরে বসে আছে এতক্ষণ, কারণ আজ কাকার তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়েছিল বাড়িতে ওবেলা, এবেলা বাসি পায়েস, ভাত-তরকারী নিশ্চয়ই আছে, তাই সে বসে আছে। ইন্দু এতক্ষণ বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে একা বসে আছে। ওরা বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে বনগাঁর ট্রেন এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্ম্মে আমার কাকার ছেলে লালমোহন লুচি-সন্দেশ বিক্রী করচে। ও এখানে আছে অনেকদিন, লেখাপড়া শেখেনি, গরীবের ছেলে,

ওই কাজই করে।

একটু পরে কলকাতার ট্রেন এল—আমি সারা পথ কেবল ভাবছিলুম এই ক'দিনের কথা, আজ সারাদিনের কথা। খুকু কতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্রতারার দিকে চেয়ে ভাবি, ওখানেও কি এমন বনশ্যাম পল্লী আছে, তার ধারে ছোট্ট গ্রাম্য নদী বয়ে যাচ্ছে, কত মাধবী রাত্রে, কত বর্ষামুখর আষাঢ় প্রভাতে, কত বসন্তের দিনে গাছে গাছে প্রথম মুকুল আবির্ভূত হবার সময়ে, ওদের দেশেও চোখে চোখে লোকে কত কথা বলে, কত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ও বাণীর বিনিময়! শুক্রতারা নাকি শুধুই বরফের দেশ, সাত হাজার ফুট উঁচু হয়ে গ্লেসিয়ার বরফের স্তর জমে আছে গ্রহের ওপরে।

ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে দাঁড়াল দমদমা গোরাবাজারে। অপূর্ব্ব সরস্বতী পূজার ছুটি শেষ হল। অনেকদিন মনে থাকবে এদিনগুলোর কথা।

সেদিন চন্দননগরে গিয়েছিলুম সাহিত্য-সম্মেলনে। এখান থেকে মোটরে সজনীদের সঙ্গে গেলুম। উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর প্রভৃতি শহরের মধ্যে দিয়ে—গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পথ। অনেকদিন এপথে যাওয়া হয়নি, সেই অনেকদিন আগে একবার শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম মোটর-বাসে এপথে। সভামণ্ডপে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, নীহার রায় বিলাত থেকে ফিরেচে। সুনীতিবাবু বল্লেন, সেদিন কনভোকেশনের দিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে খুঁজলুম, আর দেখা পেলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটটার কাছে কনভোকেশনের দিন সুনীতি-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললুম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভার উদ্বোধন করেই চলে গেলেন। আমি গেলুম আহার করতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের বোটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি অমল হোম, নীহার রায় সেখানে বসে। বাগান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর। স্যার যদুনাথ সরকার এলেন বিকেলের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বোটটা বড় চমৎকার। মেঘ করেচে আকাশে। ও-পারের মেঘে-ভরা আকাশটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। অনেক দূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে! ওখান থেকে আমরা মতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে গেলুম। ফাদার দোঁতেন আমাদের সঙ্গে মিশল এসে সজনীদের গাড়িতে। ফাদার দোঁতেন জনৈক পাদ্রী, কেমন বাংলা জানে! সন্ধ্যার পরে আমরা আবার বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

আজ মাঘীপূর্ণিমা। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে সেই যে শুশীলেশ্বরী আশ্রমে আর বছর গিয়েছিলুম, এবারও সেখানে গেলুম। গাছে গাছে আমের বউল হয়েচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে জামতলায়, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ পথে, কোকিল ডাকচে। আর বছরের সেই ইন্দুদিদি আছেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়ে বাড়ির ছেলের মত যত্ন করে, খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ালেন। বহু মেয়ের ভিড়। কলকাতার উপকণ্ঠে এই নিভৃত পাড়াগাঁয়ের দেবালয়টি আমার বেশ লাগল।

বসন্তের প্রথম দিনগুলিতে আকাশ খররৌদ্র, নতুন ফোটা ফুলের দল মনে কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ দেবার আশা দেয়, বিশেষ করে এই নীল আকাশ! সেদিন দুপুরে খয়রামারির মাঠে একা বসে বসে বসন্ত-দুপুরের নীল আকাশ আর খররৌদ্র ভোগ করছিলুম। মাঠের মধ্যে ফুল ফোটা শিমুলগাছগুলো সমস্ত পটভূমিকে এমন একটা শ্রী দান করে, তা আর কোন্ গাছ পারে না, খানিকটা পারে শীতকালের ছোট এড়াঞ্চির ফুল। আমার মনে হয় ওরা গ্রাম্য প্রকৃতির ঘরোয়া ভাবটা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর বৃহত্তর ভূমিশ্রীর প্রকৃতির সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়

—মনে এনে দেয় আফ্রিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার আধ-মরু আধ-জঙ্গলে ভরা জায়গার কথা—নানা বিরাট, জনহীন, বহুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক রাজ্যের ছবি। ওতেই এত ভাল লাগে দিগন্ত রেখার রাঙা ফুল-ফোটা শিমূল গাছ, অথবা অর্দ্ধ-শুষ্ক খড়ের মাঠে ছোটখাটো ঝোপের মধ্যে থেকে একা উঠেছে একটা বড় শিমূল গাছ—তবে শেষেরটা ভারী অদ্ভুত। মাঠে যদি অমন দেখি, তবে সেখানে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। লোকে মুখে যে কথাই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই যাকে লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এই জন্যেই মিল প্রায় হয় না।

হরিনাভি স্কুলের ছেলেরা ওদের re-unionএ এসেছিল বলতে, ওদিকে মণিবাবুর বাড়িও নিমন্ত্রণ ছিল, দুই কারণে এদিন রাজপুর ষ্টেশনে নেমে হরিনাভি গেলাম। বসন্তে গ্রাম্যশোভা দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। তাই খররৌদ্র-দুপুরে বেগুনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যে পথটা গিয়ে হরিনাভি স্কুলের কাছে মিশল, ওই পথটা দিয়ে গেলুম নেমে। খুব আম্র মুকুলের সৌরভ, লেবু ফুলের গন্ধ, ঘেঁটুবনের শোভা, কোকিলের ডাক, মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঠিক্‌রে পড়া নীল আকাশ। আপনমনে যাচ্চি, যাচ্চি, কত কালের পুরানো পথ, কতবার এ পথ দিয়ে এসেচি গিয়েচি, যখন হরিনাভি স্কুলে মাস্টারি করতুম। কণিবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে স্কুলে এলুম। প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী আমাদের বাল্যকালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তাঁকে দেখলুম অনেক কাল পরে। স্কুলের ওদিকের আকাশটা আমার তখন-তখন বড় প্রিয় ছিল, আর পাঁচিলের ওদিকের গাছপালা, সভা ছেড়ে আমি তাই দেখতে উঠে গেলাম। তারপর জোৎস্নের সঙ্গে বেরিয়ে বৈকালের ছায়ায় একটা ছায়াভরা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মাঠের ধারে এসে বসলুম। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে, দুজনে বসে পুরোনো দিনের গল্প কতই করি। ওখান থেকে উঠে আরও কিছুদূর এসে একটা পুরোনো ভাঙা দোলমঞ্চের কার্নিসের ওপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকি। দোলমঞ্চটার চারিধারে ভাঙা মন্দির পাড়ার মধ্যে বলে চারিদিকেই আমবাগান, তার তলায় খুব ঘেঁটু ফুল ফুটেচে, একধারে একটা কামিনী ফুলের ঝাড়। নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভে সন্ধ্যার বাতাস ভরপুর। হুতুম-পেঁচা ডাক্‌চে প্রাচীন গাছের কোটরে। দু-একটা নক্ষত্র উঠেচে আমবনের ওপরে আকাশে। অন্ধকার হয়ে গেল। একটা পুকুরের ধারে এসেও খানিকটা বসি।

কাল সন্ধ্যাবেলা নীরদবাবুর বাড়ি গিয়েছিলুম দুপুরে, প্রমোদবাবু অনেক দিন পরে কলকাতায় এসেচেন। অনেক গল্পগুজব করলুম। একদিন হিজলী যাওয়ার কথাও হল। ওখান থেকে পশুপতিবাবুকে ফোন্ করে জানলুম দিলীপ রায় কলকাতা এসেছে এবং আজ থিয়েটার রোডে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি সন্ধ্যায় গান হবে। হেমেনদা এলেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে। ওদেরই মোটরে ওদের সঙ্গে প্রতাপ মজুমদারের বাড়ি গেলুম। দিলীপের সঙ্গেও দেখা গেটের কাছেই। ওর সঙ্গে কখনও চাক্ষুষ আলাপ হয়নি, যদিও চিঠিপত্রে আজ আট ন' বছরের আলাপ। নাম শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, কি চমৎকার উদার স্বভাব দিলীপের। বড় ভালো লাগে ওকে। বহু বিশিষ্ট নরনারী এসেচেন দিলীপের গান শুনতে। আজ আট ন' বছর পরে দিলীপ কলকাতায় এল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, জীবনময় রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, উমা মৈত্র, 'পরিচয়' কাগজের দল—অনেককেই দেখলুম। কেবল মনি বোসকে পাওয়া গেল না। আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের কৃষ্ণ বিষয়ক গানটি আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগল। আসল গানটা হিন্দীতে ছিল, দিলীপ বাংলাতে অনুবাদ করেচে। কি চমৎকার গাইচে দিলীপ আজকাল। বাংলা গানের অমন ঢং কোথাও আর কখনও শুনিনি।

কাল দিনটা খুব ছুটোছুটি গিয়েচে। চারুবাবু হাইকোর্টের জজ হয়েচেন বলে তাঁকে স্কুল থেকে অভিনন্দন দেওয়া হল। কালই আবার দিন বুঝে ইউনিভার্সিটিতে Examiner's meeting—স্কুলে ফণিবাবু এসেছিলেন, আমাদের স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আসেননি। তাঁর সঙ্গে গল্প করে চলে এলুম ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মণি বোস, প্রমথ বিশী, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, মনোজ বসু, বারীন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনবাবু সকলের সঙ্গে দেখা। সুনীতিবাবু প্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভিনন্দন সভা তখন জোর চলচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টারমশাই আর আমি এসে সেন্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে অনেক পুরোনো কথার আলোচনা করলুম। রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, ক্লারিজ সাহেবকে আমরা কেমন সাবধান করে দিয়েছিলুম এই সব কথা।

ইস্টারের ছুটিতে বারাকপুরে কাটাইনি অনেকদিন। এবার গিয়েছিলুম। আমার যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘেঁটুফুল দেখা। প্রথম দেখলুম বনগাঁয়ের খয়রামারির মাঠে—কি অজস্র ঘেঁটুবন সেখানে। এর আগের সপ্তাহেও যে তিনদিন ছুটি ছিল, তাতেও বনগাঁ গিয়ে রোজ বিকেলে রাজনগর ও চাঁপাবেড়ের মাঠে যেতুম বেড়াতে। ফিরবার পথে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় একটি ঘেঁটুবনের কাছে বসে থাকতুম। পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করত, তেতো তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধ। পাখী ডাকত, কোকিল ও পাপিয়া। বৌ-কথা-ক'র এখনও আমদানি হয়নি। বারাকপুরে ঘেঁটুবন কোথাও তেমন নেই, কেবল আছে সলতেখাগী জামতলায়, বরোজপোতায় ডোবার গায়ে আর সাজিতলার পথে। সকলের চেয়ে বেশী পেলুম আসবার সময়ে চালকী মুসলমান পাড়ার ওই পথটায়।

ক'দিন চমৎকার কেটেচে। অবিশ্যি ম্যাট্রিকের কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকার দরুন বড় কোথাও বেরুতে পারতুম না। একদিন গোপালনগর হাটে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিল জগো, গুটকে ও জীবু। ও পথেও কিছু কিছু ঘেঁটুবন আছে বড় আমবাগানের কাছে। বৈকালে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বেড়াতে যেতুম বেলা পড়ে গেলে। চাঁদ উঠবার সময়ে নদীর ধারে মাঠে একা একা কত পাত পর্য্যন্ত বসে থাকতুম। জ্যোৎস্নায় নদীজলে নামতুম, স্নান করে আলোছায়ার জালবোনা পথে মেয়েদের পিঠে দেওয়ার যাঁড়া গাছের তলাটি দিয়ে বাড়ি ফিরতুম। দুপুরে ও বিকেলে কত কি গন্ধ দুধারের মাঠে। রোদপোড়া মাটির গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শিমুলের গন্ধ, শুকনো পাতালতার গন্ধ, টাটকা-কাটা কাঠের গন্ধ—খয়রামারির মাঠে বনমল্লিকার ঘন সুগন্ধ—প্রভৃতির নানা সুবাসে মন ভরে ওঠে।

কাল মনোরায়দের গাড়িতে বারাকপুর থেকে বনগাঁ ফিরলুম। রাত্রের ট্রেনে কলকাতা।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিয়েছিলুম বারাকপুরে। একদিন চাঁপাবেড়ের মাঠে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে ছিলুম, তারপর এসে ফুটবল খেলার মাঠটাতে বসলুম। দুপুরবেলা বারাকপুর গিয়ে পৌঁছই। ঝম্ ঝম্ করচে রোদ। খুকুরা ঘুমুচ্ছিল। ওদের ওঠালুম, তারপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। ফণিবাবু ও যতীনবাবু গাড়ি করে গেল আমাদের গাঁয়ে দেখতে। তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম কুঠীর মাঠ।

এবার শিমুলের গন্ধ বড় ভাল লেগেচে। ঘেঁটুফুল এখনও আছে—তবে খুব কমে গিয়েচে।

কোন কোন বনে কিন্তু নতুন ফুটেচে তাও দেখতে পেলুম।

·

কাল রাত্রে হেমেন রায়ের বাড়ি দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই আমরা অনেকে গিয়েছিলুম। গণপতিবাবু ও নীরদবাবুরাও ছিলেন। হেমেনদা অনুযোগ করলেন, মঙ্গলবারে পেনিটির বাগানবাড়িতে আমরা তাঁকে কেন নিয়ে গেলুম না! দিলীপ আসতে বড় দেরি করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগল আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের সেই হিন্দীগানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওর মেজাজ আরও ভাল ছিল, কি চমৎকারই গাইলে!

কলকাতায় কিন্তু সব সময়ই থাকা আমার বড় খারাপ লাগচে। চারিদিকে দেওয়াল তুলে এখানে মনে প্রসারতা ও আনন্দ বন্ধ করে দেয়। সব সময়েই কোন না কোন ঘরের মধ্যে আছি, হয় স্কুল, নয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নয় মেস, নয় কোন বন্ধুর বাড়ি, নয়তো সিনেমা। এত ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনে, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় এতে। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি আসচে—এই যা একটা আনন্দের!

কাল কাগজের বোঝা সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়ে নামিয়ে চলে গেলুম দক্ষিণাবাবুর বাড়ি। হেঁটেই গেলুম। মনে ভারী ফূর্ত্তি—কাগজগুলো দেখতে সত্যিই এই দেড় মাস কি কষ্টই না গেছে—আর এই রদ্দুরে। ফিরবার সময়ে আলিপুর হয়ে বাসায় ফিরি।

এইমাত্র পানিতর থেকে ফিরে এলুম। প্রসাদের বৌ-ভাত গেল কাল। আজ সকালে আমি কিরণবাবুদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলুম। কিছুদূর নৌকো আসতে না আসতেই এল খুব মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। আমরা নেমে ইটিণ্ডার স্কুলঘরে আশ্রয় নিলুম। কিরণবাবুর মেয়েদের ধরে নামালুম একে একে। তারপর বৃষ্টি থামলে ওখান থেকে বার বয়ে এসে নৌকোয় বসিরহাট পৌছেই ট্রেনখানা পাওয়া গেল। পানিতরের খালের ঘাট থেকে নৌকো চড়ে অনেকদিন আসিনি।

ক'দিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। বুধবার দিন গিয়েছিলুম সকালের ট্রেনে। নৌকো এসেছিল ঘাটে। বাড়ি পৌছে দেখি আন্নাদিদি ইত্যাদি এসেচে। সেই সন্ধ্যাবেলা পিসীমা ও সুশীল পিসেমশায় এলেন, আমি তখন নদীর ধারে বসে আছি, সঙ্গে পানিতরের কয়েকটি ছেলে। প্রথম প্রথম যখন পানিতর আসতুম, তখন এসব ছেলে জন্মায়নি। রাত্রে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী চাতালে বসে পিসীমা, হেনা দিদি ওদের সঙ্গে গল্প ও আড্ডা। প্রসাদ বসে বসে গ্রামোফোন বাজাতে লাগল। অনেক রাত্রে ছাদের ওপর শুই—কারণ কোথাও শোবার জায়গা নেই।

কি বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে কাল থেকে! কাল সুপ্রভার ওখানে গিয়ে শুনি সে তখন নেই। হাতে কোন কাজ ছিল না। এসে কাউন্সিল হাউসের সিঁড়িতে বসে রইলুম। কিন্তু ভাল লাগে না—অন্যমনস্ক মন। তখনই স্থির করলুম শিলং থেকে কাল সকালেই চলে যাব। অথচ কালই তো মোটে এসেচি—আর তার ওপর এই বিশ্রী আকাশ। গরম নেই তাই কি? এর চেয়ে গরম ঢের ভালো ছিল যদি রদ্দুর উঠত। যখনকার যা, তাই লাগে ভালো। সুপ্রভাকে চিঠি দেব বলে পোস্টাপিসে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পোস্টমাস্টার আসেই না। একটা

লোক দরজির কাজ করচে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি বসে। এমন সময় দেখি আমার পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ড্ মনোরঞ্জন যাচ্ছে—তার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় কার্মেসিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুব খুশিই হল। কিন্তু আমার মন এই মেঘলায় যেন কিছুতেই ঠিক হয় না। পোস্টাপিস্ থেকে ফিরে শিলং ডেয়ারিতে দুধ খেতে গেলুম। বেশ ভাল দুধ দেয়, পরিষ্কার ঘরটা। জেল রোড আর পুলিস বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন লুম্ শিলং-এর দিকে চেয়ে ভাবলুম আমাদের গ্রামে এতক্ষণ রোদে তেতে উঠেচে চারিদিক। মাঠে সোঁদালি ফুল ফুটেচে, ইছামতী নদীতে এই গরমে নেয়ে খুব তৃপ্তি হবে। তীব্র গরম দূর ক'রে হঠাৎ বেলা তিনটের সময় কালবৈশাখীর মেঘ উঠবে, ঝড় শুরু হবে, গরম পড়ে যাবে, সবাই আম কুড়ুতে দৌড়ুবে।

এই এখন বসে লিখ্চি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার ঘরের দরজা দিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়া, মেঘে ঢাকা কয়েকটি পাইন গাছ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, হোটেলের চাকর ৩নং ও ৪নং ঘরের বাবুদের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করচে, জোড়হাটে বাড়ি এক আসামী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গল্প করচেন। কি বিশ্রী বৃষ্টি! এখানে বসে রৌদ্রালোকিত বাংলা দেশ, তার মাঠে, কুঠীর মাঠে বিকেলের ছায়ায় সোঁদালি ফুলের মেলা, সারাদিনের গরমের পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে একা নির্জ্জন ঘাটে নাইতে নামা, খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ির বেড়ার পাশ দিয়ে—এসব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বৃষ্টি জোরেই নামল—শীত বেশ। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত। কলকাতাও এর চেয়ে ঢের ভালো, সেখানে দুপুর রোদে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাওয়া চলত একমাস মর্ণিং স্কুলের সময়। বৌঠাকরুণদের বাড়িতে চা পান, কমল সরকারের গান—সেও যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। কাল সন্ধ্যায় একবার ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই ট্রি ফার্ণ দুটো দেখলুম। খাসিয়া মেয়েরা বেড়াতে এসেচে। ওখানে দাঁড়িয়ে কাল কেবলই মনে হয়েছে সুপ্রভা এখানে নেই। একবার মনে হল, সেদিন যে পানিতরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে এসেছিলুম সেকথা। সেই চাঁদা কাঁটার বন, সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল। তাই নিয়ে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে সেই নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে একঘেয়ে। থামবার নাম নেই। এ যেন শ্রাবণ মাস। গরম আর সূর্য্যের আলোর জন্যে মন হাঁপাচ্ছে। লাইউমক্রাতে সুনীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও হত—কিন্তু সুপ্রভা না থাকাতে আমার কোন কাজে উৎসাহ নেই। কে বেরোয় এই বৃষ্টির মধ্যে? ভেবেছিলুম একবার শিলং পিক্-এ উঠব—তাও গেলাম না। মজা এই যে এখানে এতগুলো লোক এসেচে হোটেলে—সবাই কেবল বসে বসে খাচ্চে আর শরীর সারাচ্চে—কোন কিছু দেখবার উৎসাহ নেই ওদের। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় সাহেবীভাবাপন্ন হয়েচে। ওরা সাহেবদের ধরণে হাত নেড়ে আনন্দ জানায়—কাল সনৎ কুটিরের সামনে এক খাসিয়া ছোকরা তার বন্ধুকে বল্লে—Cheerio! কেন বাবু, তোদের মাতৃভাষায় কোন কথা নেই? গির্জ্জা থেকে কাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অনেকগুলো খাসিয়া মেয়েপুরুষ ফিরছিল। নিজের ধর্ম্মও এরা ছেড়েচে।

এই শীত আর বৃষ্টির মধ্যে নাইবার উৎসাহ হচ্ছে না। জোড়হাটের ভদ্রলোকটি তেল মাখচেন। আমায় বল্লেন, নাইবেন না? বল্লুম—মাথাটা ধোব মাত্র। আজ এখন চলে যাব—বড্ড ঠাণ্ডা লাগবে সারাদিন।

Rain, Rain, go to Spain—কি একঘেয়ে পাইন বন আর বৃষ্টি, সূর্য্যের আলো নইলে সুন্দর বিকেলের ছায়া নামে না, পাখী ডাকে না, ফুলের সৌন্দর্য্য থাকে না—একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে

মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দূরের পাইনবনাবৃত পাহাড়ের চূড়াটা বৃষ্টিতে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেচে।

এখানে এসেচি অনেকদিন, শিলং থেকে ফিরেই। কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। এসেই প্রথমে একদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম বাগানগাঁয়ে পিসীমার বাড়ি। কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সেদিন গেলুম গাড়া-পোতার বাজারে, গিয়ে একটা দোকানে খানিকটা বসে রইলুম, কারণ সে সময়টা বড় বৃষ্টি এল। তারপর চলে গেলুম পাটশিমূলে। সন্ধ্যার আগে বাগানগাঁ। ফিরবার দিন খুব বেলা থাকতেই মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে এসে পৌছে গেলাম। জামদা'র বাঁওড় পার হলুম দড়াটানার খেয়ায়। পার হয়েই—এপারটা বেশ ছায়াভরা চমৎকার জায়গা—খানিকক্ষণ বসে তারপরে রওনা হই। সন্ধ্যার আগে এসেই বাড়ি পৌছে গেলুম। একটা বটগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসেছিলুম মোল্লাহাটির ওপারে—সেটা বড় ভালো লেগেছিল।

দিন বেশ কাটচে। গোপালনগরের বারোয়ারী দেখচি প্রতি-বৎসরের মত—কাল রাত্রেও হয়ে গেল। কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেচি। একদিন শিমুদের ওখানেও গিয়েছিলুম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার যেন বেশীদিন এখানে ভাল লাগচে না। মন উড়ু উড়ু করচে, কেন তা কি জানি। জীবন এখানে অনেকটা একঘেয়ে, সেইজন্যই কি? কিন্তু নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই বলেই তো এখানে আসা। এবার সেটাও যেন ভাল লাগচে না অন্য অন্য বছরের মত—তার একটা প্রধান কারণ আমি বুঝতে পেরেচি। কলকাতায় যে কর্ম্ম-বহুল জীবন কাটিয়ে এসেচি এবার, তার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রা মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। আমি মাঠের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তবে মোটে সেদিন কলকাতা থেকে এসেচি বলে এই রকম লাগচে—দীর্ঘদিন কাটালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এসব। কথা বলবার লোকের অভাব সকলের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে। শ্যামাচরণদা'র ছেলেটি সেদিন মারা গেল, আমরা সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম তাকে বাঁচাবার। সেজন্যেও মনে একটা কষ্ট আছে।

বিকেলের দিকে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরে। তাই পথে একটু বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল—এত ফুল এত গাছপালাও কুঠীর মাঠে! সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। এখান থেকে আরম্ভ করে বাগানটা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই একটা প্রকাণ্ড বড় পার্ক। কত বিচিত্র লতাবৃক্ষগুল্মের সমাবেশ, কত বিচিত্র বনফুলের সমারোহ—কত কি পাখীর ডাক, বাঁশ-গাছের সারি, প্রাচীন বট-অশ্বত্থ—সবই সুন্দর। মনটা ভার ছিল, একটা ছোট বাবলাগাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। আমার চারিপাশে সোঁদালি ফুল ঝুলচে, একদিকের গাছপালার ফাঁকে কি সুন্দর ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের নীল আকাশ, বসে কত কী ভাবলুম। এই যে বিরাট বিশ্ব-চরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকা-রাজি, কত Globuler cluster, কত নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এদের মধ্যে কত আমাদের মত প্রাণী রয়েচে। Jeans-এর দল যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নেওয়া যাক্, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েছি।

সকালবেলা কি বিশ্রী বর্ষা নেমেছে। আমার ঘরের বাইরে বড় বড় পাতাওয়ালা গোঁড়ালেবুর গাছটাতে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেচে। মনটা ভাল না, বসে বসে লিখছিলুম বাইরে বসে,

হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আসাতে ঘরের মধ্যে এসে বসেচি। বিলবিলের দিকে জলের তোড় ছুটচে কলকল শব্দে। ন'দিদি ও বড় খুড়ীমা ওদের ভূতোতলার আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে জলে ভিজে। খুকুকে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না আমতলায়।

বিকেলে মেঘ-থম্‌কানো আকাশের তলা দিয়ে বেড়াতে গেলুম সুন্দরপুরে প্রমথ ঘোষের বাড়ি। সারা পথটা আকাশে মেঘের কি শোভা! কত পাহাড়পর্ব্বত, আকাশের কি চোখ-জুড়ানো অদ্ভুত নীল রং! নীচে বর্ষাসতেজ শ্যামল গাছপালা, নতুন আউশ ধানের কচি জাওলা বেরিয়েচে মাঠে মাঠে মরাগাঙের ধারে, বাঁওড়ের ওপারে! আষাঢ় মাসে এদিকে প্রকৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তার তুলনা কোথাও বুঝি নেই। শিলংএর পাইন বন এর তুলনায় নিতান্ত এক-ঘেয়ে। জ্যোৎস্না বেশ যখন ফুটেচে, তখন নদীর জলে এসে নামলুম। জ্যোৎস্না চিকচিক করচে জলে, চাঁদ হাজার টুকরো হয়ে জলের মধ্যে খেলা করচে—এখনও নদীপারে বনে কোথায় বৌ-কথা-ক' ডাকচে, নদীর ধারের সোঁদালি গাছগুলোতে এখনও ফুলের ঝাড় ঝরে পড়েনি। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখীর খেলা, আকাশে রঙের মেলা, কি ঘন সবুজ চারিধার। নক্ষত্র চোখে পড়ে না আকাশে, হালকা মেঘের পরদার আড়ালে দ্বাদশীর চাঁদখানি মাত্র দেখা যাচ্ছে।

এতদিন পরে এবার বারাকপুর বড় ভাল লাগচে। মানুষ এখানে তেমন নেই বটে কিন্তু প্রকৃতি এখানে অপূর্ব্ব লীলাময়ী। প্রকৃতিকে নিয়ে থাকতে পার তো এমন জায়গা আর নেই। কলকাতার কাজ আর মানুষ—এখানকার প্রকৃতি, এই দুইয়ের সম্মিলন যদি সম্ভব হত! রোজ কাজকর্ম্ম সেরে কলকাতা থেকে দ্রুতগামী মোটরে বেলা ৫টার সময় যদি বেলডাঙার পুলের মুখে ফিরে আসা সম্ভব হত এই আষাঢ় মাসের দীর্ঘ দিনের শেষে, জীবনটা সত্যি উপভোগ করতে পারতুম। নিজের একখানা এরোপ্লেন থাকলে চমৎকার হত। সমস্তদিনের হৈ-চৈ ও কর্ম্মক্লান্তির পরে শান্ত অপরাহ্নে বর্ষণক্লান্ত আকাশের তলে কাঁচিকাটার পুলের কাছে মরাগাঙের এপারে সবুজ ঘাস ভরা মাঠে উড়ি ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকতে পারতুম—তবে contrast-এর তীক্ষ্ণতায় প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝবার সুযোগ হত—একে উপভোগও করতে পারা যেত আরও গভীর ভাবে।

আজ বৈকালের দিকে খুব ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষা। আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। সন্ধ্যার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে যেন মনে হল এই আকাশ, রঙীন্ মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। আজ কোন একটি বিষয়ে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ঘটেচে। সে অভিজ্ঞতা সত্যিই অপূর্ব্ব।

আষাঢ় মাসের এ দিনগুলো আমার বড় পরিচিত। বাল্যকাল থেকে চিনে এসেচি ওদের। মেঘান্ধকার আকাশ, আর্দ্র বাতাস, বাঁশবনে পিপুললতা ও অনন্তমূলের নূতন চারা বার হয়েচে, ওলের চারা বার হয়েচে, যখনই এমন হয়, তখনই আমার গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে যায়, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। কিন্তু একটা তফাৎ ঘটেচে, আগে এই নবোদ্গত পিপুলচারার সঙ্গে একটা দুঃখ ও বিরহের অনুভূতি জড়ানো থাকত—এখন আর সেটা হয় না। এখন মনে হয় কলকাতা গেলেই ভাল হয়, অনেকদিন তো দেশে কাটল।

কতবার এই নব বর্ষা, এই আষাঢ় মাস আসবে যাবে। যেমন আমার জীবনে এরা কত বার

এসেচে গিয়েচে। কতবার কাঁটাল পাকবে, বাঁশবনে অনন্তমূলের চারা বেরুবে, ফলবিরল আম-বাগানে হাজারী জেলে ও হাজু কামারনী আম কুড়িয়ে বেড়াবে ভোরে। এসব সুপরিচিত দৃশ্য আরও কতবার দেখব। আমাদের গ্রামটুকু নিয়ে যে জগৎ, এ দৃশ্য তারই। অন্য কোথাকার লোকের কাছে এসব হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত তাও জানি, তারা কখনও পিপুললতাই দেখেনি হয়তো।

তারপর আমি চলে যাব, হাজারী জেলেনী চলে যাবে, আমার সমসাময়িক সকল লোকই চলে যাবে, তখনও এমনি আষাঢ়ের নতুন মেঘ জমবে মাধবপুরের ঘরের ওপরে, আর্দ্র বাঁশবনে এমনিধারা পিপুলচারা বেরুবে, বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক বিরল হয়ে আসবে বকুলগাছটাতে, গাঙের জলে ঢল নামবে—শুধু আমার এই আবাল্য সুপরিচিত জগৎ তখন আর আমার চৈতন্যের মধ্যে থাকবে না।

সবদিনে মানুষের মনে সমান আনন্দ থাকে না জানি, কিন্তু আজকার দিনের মত আনন্দ আমি কতকাল যে জীবনে পাইনি! প্রথম তো সকালে উঠেই দেখলুম আকাশ ভারী পরিষ্কার—নিজের ঘরের দাওয়ায় খানিকটা বসে মুসলমান মাস্টারটির সঙ্গে গল্প করে বাঁওড়ের ধারের বট-তলার পথে একটু বেড়াতে গেলুম। এমন নীল আকাশ অনেকদিন দেখিনি। জেলেপাড়া ছাড়িয়েই ঐ সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা সরু কঞ্চি বেছে নিলাম হাতে নেবার জন্যে। বাঁশের কঞ্চির জন্যে এ আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে। যেতে যেতে আমাদের মাথার ওপরকার নীল আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল আষাঢ় মাসের দিনে আকাশ এত নীল, এত নির্মেঘ, এ সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। রোদের কি রং। বাঁওড়ের ওপারের আকাশ নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এই বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথটা দিয়ে আজ আঠারো-উনিশ বছর কি তারও বেশী এমনি সকালে হাঁটিনি। বটগাছের একটা ডালে কাল খানিকক্ষণ বসেছিলুম, আজ সে ডালটায় বসব বলে গেলাম, কিন্তু আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েচে বলে রোদ এসে পড়েচে সেখানে। একটা বাঁশের মাচা করেচে বটতলায় বাঁওড়ের ধারের দিকে। সেখানে বসে কি আনন্দ! আমায় এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থাকতে দেখে কিন্তু কেউ কিছু ভাবে না—সবাই খুব ভালবাসে দেখলুম। আমি অনেককে চিনি নে, ওরা আমায় চেনে। একজন কাল বলচে—দাদাবাবু আমাদের দেখ বসে আছেন বটের শেকড়ে। দাদাবাবুর অঙ্কার নেই গা। আজ একজন পথ-চলতি লোক, তার বাড়ি আরামডাঙায় পরে জানতে পারলুম, আমায় বসে থাকতে দেখে পাশে এসে বসল। বল্লে—বাবু, একটা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্ছি। প্যাটের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠলি এমনি শূলোয় যে আপনাকে কি বলব! কি করি বলুন দিকি বাবু?

সে এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে যেন আমি স্বয়ং ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী।

কি করি আমার কোন ওষুধই জানা নেই—তাকে পরামর্শ দিলুম রাণাঘাটে গিয়ে আর্চ্চার সাহেবকে দেখাতে। মিশনারী হাসপাতালে পয়সা-কড়ি লাগবে না। মনে এমন দুঃখ হল, একটু হোমিওপ্যাথি জানলেও এই সব গরীব লোকের উপকার করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আমি ওর রোগ সারানোর জন্যে আর কি করতে পারি!

ওখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে গেলাম। এক জায়গায় একটা কি চমৎকার লতাবিতান, ওপরে ডালপালায় ছাওয়া, মোটা লতার গুঁড়ি কাঠের মত শক্ত হয়ে তার খুঁটি তৈরী করেচে। ওর মধ্যে বসে একটু পাখীর ডাক শুনলুম, তারপর মাটির মধ্যে এসে বাবলাগাছের মাথার ওপর-

কার আকাশের অপূর্ব্ব নীল রং দেখে সেখানটায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। সে যে কি আনন্দ, তা হয়তো আমি নিজেই কিছুকাল পরে অবিশ্বাস করব, কারণ ওসব অনুভূতি মানুষের চিরকাল বজায় তো থাকে না, পরে শুধু স্মৃতিটা থাকে মাত্র। মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের আকাশ, ঘাসের নীচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বন-লতা, বনফুল—ঐ সূর্য্য থেকে পাচ্চে এদের জীবন, রং ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্য্যেরও পিছনে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলই এমনি দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। ভেবে কিছু ঠিক করতে হবে তার কোন মানে নেই, এই ভাবনাতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা—অদৃশ্য যে লতায় এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েচে, আমি তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন—বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।

মনকে এভাবে তৈরী করে নেওয়ায় সার্থকতা আছে, কারণ মনই সব, মন যে ভাবে পৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মানুষে সেভাবেই দেখে। মন দুঃখ দেয়, সুখ দেয়—মনকে তৈরী করে যে না নিতে পেরেচে, তার দুঃখ অসীম।

ঐ লতাবিতানের মধ্যে আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলুম—ভারী নিভৃত, ছায়া-ঘন স্থানটি। প্রকৃতি অনেক যত্নে একে যেন নিজের হাতে গড়েচে। কাঠবিড়ালী খেলা করচে, কত কি পাখী ডাকচে, পত্রান্তরাল থেকে একটু একটু রোদ এসে পড়েচে, ঠাণ্ডা মাটিতে বড় চমৎকার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, কেয়োঝাঁকা, ষাঁড়া, ডুমুর, কুঁচকাঁটার লতার সমাবেশে এই ঝোপটা তৈরী—দুপুরের রোদে এই নিস্তব্ধ ঝোপের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে বসে বই পড়া কি লেখা বড় ভাল লাগে।

এবেলা থেকে বর্ষা নেমেচে। ইছামতীর ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আজ কলকাতায় রওনা হব ভেবেছিলুম—কিন্তু এরকম বাদলা দেখে পিছিয়ে গেলাম।

আজ সারাদিন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ—কাল চলে যাব, গ্রীষ্মের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। যা দেখচি, সবাই বড় ভাল লাগচে। খুকু বার বার আসচে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে, নানা ছুতোয় নানা ফাঁকে। সারা দিন আজ ভয়ানক বর্ষা—বৃষ্টির বিরাম নেই একদণ্ড। দুপুরের সময় যে বৃষ্টি নামল, তা ধরল বিকেল চারটের পরে। খানা-ডোবা ভরে গিয়েচে। আমন ধানের মাঠে জোয়ার জল হয়েচে। বিলবিলে তো জলে টইটুম্বুর। মেঘমেদুর বিকেলে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে জলের উপর পা ফেলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে গেলুম আইনদ্দির বাড়ি—ওর সঙ্গে আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলোর যোগ আছে—যখনই খুব আনন্দ পেয়েচি, তখনই ওর বাড়িতে গিয়ে বসেচি এই ক' বছরের মধ্যে। আজও গেলাম। ওর বাড়ির দাওয়ায় বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের ঘন সবুজ আউশের ক্ষেত ও প্রাচীন বটের সারির দিকে চোখ রেখে ওর সঙ্গে কত গল্প করলুম। বয়স হয়েছে ৯৮ বছর, কিন্তু আইনদ্দি কখনও শুধু-হাতে বসে থাকে না। আমি যখনই গিয়েচি, তখনই দেখেচি ও কোন না কোনও একটা কাজ নিয়ে আছে—এখন সে একটা তল্‌তা বাঁশের পাশ চাঁচছিল—বল্লে—মাছ-ধরার ঘুনি বুনব।

ওর উঠোনের দক্ষিণ ধারে একটা বাবলার গাছ, তার ঝিরঝিরে সরু পাতাভরা ডালগুলোর দিকে চেয়ে মনে যে কি আনন্দ পেলাম—তার যেন তুলনা নেই। ওখান থেকে বার হয়ে কাঁচি-কাটা পুলের ওপর এসে দাঁড়ালুম—বর্ষাক্রান্ত বৈকালে দিগন্তে মেঘের যে শোভা হয় ইছামতীর ওপরে, মাধবপুরের চরের মাথায়, বাঁওড়ের শেষ সীমানার দিকে—এদের দেখে তুষারমণ্ডিত হিমালয়শৃঙ্গের কথা মনে পড়ে।

ঘোষেদের দোকানে এসে বসেচি। একটা লোক মাথায় একটা পুঁটুলি নিয়ে ঢুকে বল্লে—মুসুরি নেবা ?

ওরা বল্লে—নেবো।

—এর বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

ওরা তাতেই রাজী হল।

তারপর সে বসে বসে গল্প করতে লাগল। চৈত্র মাসে আউশ ধানের বীজ ছড়িয়েছিল বলে তার ক্ষেতে ধান এখন খুব বড় বড় হয়েচে। বাড়ি তার খাব্‌রাপোতায়। খাবার ধান এখন আর ঘরে নেই, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে এখন সে নিঃস্ব, অথচ এগারো জন লোক তার পরিবারে, ছ'বেলা বাইশ জন খেতে। সামান্য কিছু মুসুরী ছিল তাই ভরসা। তাই বদলে চাল নিতে এসেচে।

ফিরবার পথে অস্ত-দিগন্তের মেঘস্তূপে অপূর্ব্ব রাঙা রঙ ফুটল, দেখে দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে প্রায় মাসখানেক হল। কলকাতায় এসে পুরোনো হয়ে গেল। এর মধ্যে একদিন বরাসাত গিয়েছিলুম পশুপতিবাবুদের সঙ্গে, একদিন রাজপুর গিয়েছিলুম। একদিন ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল, অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনলুম তাঁর মুখে। আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েছে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য। এরই মধ্যে যেন মনে হচ্চে কতকাল এসেচি।

গত শুক্রবার বারাকপুর গিয়েছিলুম। পরিপূর্ণ বর্ষার শোভা অনেক দেখা হয়নি—এবার এই বারাকপুরে থাকব বলেই গিয়েছিলুম। ইছামতীর জল ঘোলা হয়ে এসেচে। ছ'দিনই বাঁওড়ের তীরে বটতলার পথে সকালবেলা বেড়াতে গেলুম—ছ'দিনই ঘোলা গাঙে খুকুদের সঙ্গে স্নান করলুম। রৌদ্রে নতুন ওঠা কচি ঘাসের ওপর খানিকটা করে শুয়ে ঘাসের সাদা সাদা ছোটো ফুল লক্ষ্য করলুম। বটগাছের তলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে আজই সকালে কতক্ষণ বসে রইলুম। বিশেষ করে শনিবার বিকেলে ন'দিদির কাছে নতুন বইখানার প্রথম দিকের গোটাকতক অধ্যায় শুনিয়ে যখন ইন্দু মাছ ধরতে বসেছিল তাই দেখতে গেলুম—তখন যেন একটা নতুন দৃশ্য দেখলুম। নকুলের নৌকোতে বেলেডাঙার মাঠে নতুন জায়গায় নেমে নীল আকাশের কোলে রঙীন্ মেঘস্তূপ দেখে মনে হল এমন দৃশ্য ফেলে কেন কলকাতায় পড়ে থাকি!

রাণাঘাট হয়ে কলকাতা ফিরলুম বিকেলে। বেশ লেগেচে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়ে। অনেকদিন যাইনি এ সময়। কাল ছুপুরের পরে ন'দিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়ে শোনালুম নতুন বই থেকে, খুকু খুবই খুশি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, বল্লে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরণের হয়েচে।

নকুলের নৌকোয় যখন যাচ্ছি, নদীর ধারে এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বাব্‌লাগাছ থেকে

কত কি বক্তলতা ঝুলচে, ডাইনে রঙীন্ মেঘস্তূপ, আবার একটা জায়গায় আধভাঙা একটা রামধনু। বেলেডাঙার মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের একধারে বড় সুন্দর একটা ঝোপ। এদিকটা কখনও আসিনি। কতক্ষণ মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। মটরলতা তো যেখানে সেখানে—নতুন পাতার সম্ভার নিয়ে দুলচে, প্রতি ঝোপের মাথা থেকে—আমার কি জানি কেন ভারী আনন্দ হয় নতুন কচি মটরলতা দেখলে। ওর সঙ্গে যেন কিসের যোগ আছে আমার। আজ সকালে জগো আর শুটকে যখন কুঠীর মাঠের গাছটাতে পেয়ারা পাড়চে আমি একটা মটরলতার ঝোপের তলায় বসলুম—নতুন এক ধরণের চওড়া পাতা নরম ঘাসের ওপরে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—মনের আনন্দই তার চরম প্রকাশ।

আমি ডায়েরীতে অনেক বারই লিখি—"এ আনন্দের তুলনা নেই।" হয়ত একঘেয়ে হয়ে যায় কথাটা, কিন্তু আনন্দটা যে একঘেয়ে হয় না। যে আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়, তা সব সময়ে, সর্ব্বকালে এক। যখনই পাই, তখনই মনে হয় এ বুঝি নতুন, এমনটা আর কখনও বুঝি হয়নি। সেই যে নিত্যনূতন চির অক্ষয় আনন্দ, তার কি ভাবে বর্ণনা দেব একমাত্র ঐ কথা ছাড়া যে 'এর তুলনা নেই'। জীবন যে বহু আনন্দমুহূর্ত্তের সমষ্টি, তাদের পৃথক পৃথক বর্ণনা নেই, তারা চির নবীন, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়—কাজেই তাদের তুলনা নেই। সত্যিই তো তাদের তুলনা আর কিসের সঙ্গে দিতে পারি? অন্য অন্য দিনের আনন্দের সঙ্গে? কিন্তু তারা তো তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত—বর্ত্তমানে যা পাচ্চি, তাই তখন বড়।

এত শীগ্‌গির যে আমার আবার শিলং আসতে হবে, তা ভাবিনি। কিন্তু সুপ্রভা আসতে লিখলে, আর আমারও একটা সুযোগ উপস্থিত হল আসবার। কাজেই চলে এলুম।

কাল বিকেলে ট্রেনে সময়টা কি চমৎকার কেটেচে! কত নতুন অনুভূতি, কত নতুন চিন্তা! নৈহাটির কাছাকাছি যখন গাড়িখানা এল, তখন মনে হল, এখান থেকে সোজা বারাকপুর কতটুকুই বা আর, এখন দুপুরবেলা, আমাদের বকুলতলায়, বিলবিলের ধারে ছায়া পড়ে গিয়েচে, খুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে, বৃহস্পতিবার আজ গোপালনগরের হাট, সব লোক হাট করতে যাচ্চে, কত গ্রামে বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা কত পল্লীকুটিরে কিশোরী মেয়েরা প্রেমের রঙীন স্বপ্নজাল বুনে ঘুরে বেড়াচ্চে; খুঁটির কাছে বসে চলে যাবার সময় চেয়ে বসে থাকার, নদীর ধারে কত বন-সিমলতার আড়ালে চোরা চাউনি ও হাসির কত ঢেউ—এই সব ছবি মনে আসে। বিকেলে তারা জলে নেমেচে গা ধুতে। পার্ব্বতীপুর এসে এসে যেন সব চেনা পুরোনো হয়ে গিয়েচে। গাড়িতে বেশ জায়গা ছিল। ট্রেনে ঘুমও হল খুব। লালমণিরহাটে নেমে জেলি ও পাগলার খোঁজ করলুম। অত রাত্রে কোথায় পাব?

ভোর হল রঙ্গিয়া জংশনে, এখানেই প্রতিবারে ভোর হয়। আর যখনই এপথে এখানে এসেচি, বৃষ্টিছাড়া দেখিনি কখনও। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি আর কার্ণ গাছের বন, কাদাভরা মাটির পথ-ঘাট, কলার ঝাড়, নীচু নীচু খড়ের বাড়ি।

ব্রহ্মপুত্র কূলে কূলে ভরা। কি ঠাণ্ডা জল! জলে নেমে মুখে মাথায় জল দিয়ে তৃপ্তি হল ভারী। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে, মেঘমেদুর আকাশ, ওপারের পাহাড়ে কুয়াসার মত মেঘ জমে রয়েচে।

গৌহাটি-শিলং মোটরবাসে ত্রিপুরার মহারাণীর একদল পরিচারিকা উঠল—তাদের কথাবার্ত্তা বিন্দুবিসর্গও বুঝিনে—মোটর যেমন পাহাড়ের পথে উঠল—অমনি ওরা সবাই সামনের বেঞ্চিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল—সবারই নাকি মাথা ঘুরচে। বেশ গরম, নংপোতে এলুম তখনও

এতটুকু ঠাণ্ডা নয়, এমন কি শিলংএও নয়। বরপানি নদীতে বর্ষার পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার এসেচে—শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে আছড়ে পড়ে কি তার উদ্দাম মাতন!

আমার পুরোনো স্নো-ভিউ হোটেলে এসেই উঠলুম। ওদের কলটার কাছে সেই গোলাপ-গাছটা তেমনি আছে, থোকা থোকা রাঙা গোলাপ ফুটেচে।

বড় মেঘ আর বৃষ্টি শিলং-এ। পাইন বনে মেঘ জমে আছে শাশ্বত, আর টিপটিপে জল, রৌদ্র দেখলুম না কখনও শিলং-এ।

লাবানে যাবার সময় গোটা পথটাতেই বৃষ্টি। আজ আসামের ভূতপূর্ব্ব গবর্নর সার মাইকেল কিনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল কলেজ আপিস সকালে ছুটি হয়ে গিয়েচে। তাই ভাবলুম সুপ্রভাদের কলেজও নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়াতে সে সনৎ কুটিরেই ফিরে এসেচে। ওকে পেলামও তাই। হঠাৎ আমায় দেখে খুব খুশি হল। আমিও বড় আনন্দ পেলাম অনেকদিন পরে ওকে দেখে। ওর দিদির দুই মেয়ে রেবা ও সেবাকেও দেখলুম। কমলা সেনের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে সাড়ে ছ'টায় উঠে গবর্নরের বাড়ির পেছন দিয়ে সুশীলবাবুদের বাড়ি Heath Back Cottage-এ গেলুম। সুশীলবাবু তো আমায় দেখে অবাক! আমি কোথা থেকে এলুম শিলংএ! শঙ্কর এল ফুটবল খেলে সন্ধ্যার সময়। সে বড় হয়ে গিয়েচে, আর যেন চেনা যায় না।

লুম্ শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে! এই সন্ধ্যায় আমি দূর বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীর কথা ভাবচি।

সুপ্রভা বলছিল, কাল আপনি ডাউকি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসুন। শঙ্করও বল্লে, সে কাল সকালে এখানে আসবে। দেখি কোথায় পাওয়া যায়।

সকালে শঙ্কর এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। তার সঙ্গে ওয়ার্ড লেক্ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে যৌথ্‌রা গেলুম ডাউকির মোটর কখন ছাড়ে দেখতে। শুনলুম ও পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট দেয় না—সুতরাং চেরাপুঞ্জি রওনা হলাম। আবার সেই আপার শিলংএর রাস্তা! সেই পাইনবন পথে তিন চার রকমের বন্যফুল ফুটে আছে প্রান্তরে, একটা হল্‌দে, একটা ভায়োলেট, একটা লাল, একটা সাদা। ঠিক যেন মরসুমী ফুলের ক্ষেত। সর্ব্বত্র অজস্র ফুটে রয়েচে—চেরার একটু আগে পর্য্যন্ত। চেরাতে নেই, মুস্‌মাইতেও নেই। যাবার সময় Gorge-এ খুব মেঘ করেছিল, খানিকদূর পর্য্যন্ত মনে হল যেন আকাশ এরোপ্লেনে চলেচি। চেরার কাছে অদ্ভুত আকৃতির জঙ্গল আছে—তার প্রত্যেক গাছটাতে অসংখ্য পরগাছা, শেওলা ঝুলচে, ফার্ণ হয়ে আছে—কি ঘন কালো জঙ্গলের তলাটা। আনারস কিনে খেলুম চারপয়সা দিয়ে একটা। খাসিয়া দোকানদার কেটে প্লেটে করে দিল। বেশ মিষ্টি আনারস। একজন ডাক্তার তার ডাক্তার-খানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর মুস্‌মাই পর্য্যন্ত গেলুম বাসে। চমৎকার দিন আজ, মুস্‌মাইএর পথে নীল আকাশ একটুখানি দেখা গেল। সবাই বল্লে, এত ভাল দিন অনেকদিন হয়নি। মুস্‌মাই জলপ্রপাতের এপারে একটা পাথরে কতক্ষণ বসে রইলুম—একধারে সিলেটের সমতলভূমি ঠিক যেন সমুদ্রের মত দেখাচ্চে। একসময়ে তো ওখানে সমুদ্রই ছিল, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ছিল প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীরে। ঢেউ এসে তাল মারত পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে। চেরা থেকে ফিরবার পথে আবার সেই ফুলের ক্ষেত—মাঠের সর্ব্বত্র ওই চার রকম ফুলের বাগান। একটা খাসিয়া গ্রামে বাংলা দেশের গোয়ালের মত একখানা অপকৃষ্ট ভাঙা খড়ের ঘরে টুপিপরা ছেলেমেয়ে, ফর্সা মেয়েরা। বেড়ার ফর্গেট্-মি-নটের বাহার দেখে মনে হল

এ কোন্ দেশে আছি! চেরা থেকে এসে চা খেয়ে ওয়ার্ড লেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। খুকু এতক্ষণ ঘোলার গাঙে গা ধুতে নেমেচে। আমাদের দেশে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে—সে এক দেশ আর এই এক দেশ! অনেককাল আগে এই গোধূলিতে একটা স্মৃতি জড়ানো আছে, পাইনবনের মধ্যে বসে সেটা মনে আনতে বেশ লাগে। সুপ্রভাদের ওখানে গিয়ে দেখি সুপ্রভার বাবা এসেচেন সিলেট থেকে। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভারী চমৎকার লোক, এমন সরল, সদানন্দ, অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক আমি কমই দেখেচি। অনেকদিন পরে সুপ্রভার ছোট বৌদিদির হাতের তৈরী ভ্যানিলা দেওয়া নারকোলের সন্দেশ খাওয়া গেল।

সন্ধ্যার দেরি নেই। লুম শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে। পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু অল্প একটু নীল আকাশের আঁচ—মেঘে রং লেগেচে, ওয়ার্ড লেকের ওপারে পুবদিকের বহু দূরের আকাশে জমেচে অন্ধকার। কেবল শুনি মোটরের ভেঁপু, কত গাড়ি যে যাচ্চে সামনে দিয়ে। খাসিয়া মেয়েরা গল্প করতে করতে যাচ্ছে। গির্জ্জায় প্রার্থনা হচ্চে, সম্মিলিত ইংরিজী গানের সুর কানে ভেসে আসচে। আমি কাউন্সিল হাউসের সোপানে বসে আছি। কি জানি কেন এই সন্ধ্যায় কেবল আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন কোথায় এসেচি, কতদূর—সুপ্রভা না থাকলে একটুও ভাল লাগত না। আমরা যখন পৃথিবীকে ভালবাসি বলি—তখন ভেবে দেখিনে, অনেকেই ভালবাসি খুব সংকীর্ণ অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত একটা জায়গা। সেখানকার গাছপালা, নদী, মাটি, লোকজন আমার কাছে বড় আদরের—তাই তাদের পেয়ে ও ভালবেসে মনে হয় এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি। আসলে সেই গ্রাম বা নগরটাই আমার পৃথিবী। এমন কি রোদ বা জ্যোৎস্না সেখানে যত মিষ্টি, অন্য জায়গায় ঠিক ততটা নয়।

আজ সকাল থেকে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, বেলা ১০টায় বৃষ্টি ধরেচে। সুপ্রভাদের হোস্টেলে গিয়ে বল্লুম—আজই চলে যাব! সুপ্রভা যেতে বারণ করলে, তবুও বলে এলুম, না আজই যাব। কিন্তু হোটেলে এসে আর যেতে ইচ্ছে হল না। ভাবলুম, সুপ্রভা বারণ করলে, আজ থেকেই যাই। দুপুরে সুপ্রভার বাবা, সুপ্রভা, বীণা, রেবা দেখি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে উপস্থিত—আমায় মোটরে উঠিয়ে দিতে। রেবা চকোলেট ও ফুল এনেচে। ওদের সবাইকে দেখে এত আনন্দ পেলুম। তারপর সকলে মিলে গেলুম সুপ্রভাদের কলেজ ও হোস্টেল দেখতে। নতুন তৈরী বিরাট কাঠের বাড়ি, দেখবার মত জিনিস বটে। ওখান থেকে বীণাদের বাড়ি গিয়ে চা, তালের ক্ষীর, তালের বড়া, লুচি কতরকম খাবার খেলুম। সুপ্রভার মাকে দেখে বড় কষ্ট হল। আহা, এই বয়সে এই শোক পেয়েছেন, তাতে মেয়েমানুষ, মনকে বোঝানো ওঁদের পক্ষে খুবই শক্ত। সুপ্রভার বাবাকে যতই দেখেচি, ততই মুগ্ধ হচ্চি তাঁর মনের স্থৈর্য্যে ও প্রসারতায়। তিনি যত সহজে শোক জয় করতে পারচেন, সুপ্রভার মা তা পারচেন না। কাজেই তাঁর মনে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে, দক্ষিণ বনের মাথায়। একটা সীমাহীন নক্ষত্র মিটমিট করচে লুম শিলংএর ওপারের আকাশে। গির্জ্জা থেকে দলে-দলে খাসিয়া মেয়ে-পুরুষ উপাসনান্তে বাড়ি ফিরচে। অনেকগুলি খাসিয়া মেয়ের বাঙালীদের ধরনে কাপড় পরা। তাদের দেখাচ্ছে ভালো।

শিলংএ একটা জিনিস নেই। এখানে কোন সৎপ্রসঙ্গের চর্চ্চা দেখলুম না কোথাও। না সাহিত্য, না গান, না অন্য কোন শিল্প। লোকেরা সব চাকুরিবাজ, নয়তো স্বাস্থ্যান্বেষী হাওয়া-

খোর। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক কিম্ভূতকিমাকার ধরনের জীব। রোগের কথা, পথ্যের কথা, শরীরের উন্নতি কার কতটুকু হয়েছে, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে তারা interested নয়। আর এরা প্রায়ই ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এদেরই বড় ইচ্ছা বাঁচবার। যেন তারা বেঁচে দেশে ফিরে গেলে সোনার দেউল ওঠাবে।

পরীতলা জায়গাটা পাইন বনের মধ্যে একটা ভ্যালি। ছোট্ট ভ্যালিটা যদিও, চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাইন শ্রেণী, মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে, বেশ সুন্দর জায়গাটা। এদিন সকালে লাবানে যাবার পথে একটা উঁচু পাহাড় টপকে পাইন বনের ছায়ায় ছায়ায় সোজা রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় দূরে লাবান হিলের মাথায় ওধারকার পাইন বনগুলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। মর্নিং গ্লোরি ফুল থোকা থোকা ফুটেছে লোকের বাড়ির বেড়ার গায়ে, মাকড়সায় বিচিত্র জাল বুনেচে।

সুপ্রভাদের বাড়ি গিয়ে রেবাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে ঠকিয়েছিলাম। যীশুখৃষ্ট কতদিন মারা গিয়েচেন, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলে না। ওকে দেশলায়ের বাক্সের ম্যাজিকটা দেখিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলুম। বেলা সাড়ে ন'টা। সুপ্রভার সঙ্গে পরীতলা বেড়াতে গেলুম। একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে পাইন বনে ঘেরা নির্জ্জন স্থানটিতে বসে গান শোনা গেল। তারপরে ওখান থেকে চলে এসে সেই পাহাড়টার উপর দিয়ে আসছি, রেবার দাদা আসচে, বল্লে—কাউন্সিলে গিয়েছিল অর্থাৎ শিলং লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে। একটা টিকিট দিলে আমায়। আমি গিয়ে কাউন্সিল হাউসে ঢুকলাম। একজন পুলিস দেখিয়ে দিলে ওপরের সিঁড়িটা। ওপরের গ্যালারিতে লোকে লোকারণ্য। আইন সভার অধিবেশন হচ্ছে নীচের হলটাতে। বসন্তকুমার দাস নিচেকার উঁচু চেয়ারে ডবল কলার পরে গম্ভীর মুখে বসে। তার সামনে, ওপরে, দোতলায়, পেছনে উঁচু চেয়ারে আসামের গভর্নর রিড্‌ বসে। একজন কংগ্রেস-সদস্য মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। রাজস্ব-সদস্য স্যার আবদুল্লা তার জবাব দিতে উঠলেন। একপক্ষ যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, অপর দল দেখলুম হাসি, টিটকিরি সব রকম চালায়—এ বিষয়ে আইন সভা সাধারণ স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের চেয়েও অধম।

কাউন্সিল হাউস থেকে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে মোটর স্টেশনে এলুম। দুটোর সময় মোটর ছাড়ল—অপরাহ্ণের ছায়ায় মোটর-রাস্তার দুধারে অরণ্য-দৃশ্য অতি-সুন্দর—পাহাড়ী নদীটাই কি অদ্ভুত! ফিরে আসতে আসতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে দেখলে মায়ের সেই কড়াখানার কথা মনে হয়। সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মণি ডাক্তারের কথা ভেবে দেখলুম। গাঁয়ের হাটতলায় সে এতক্ষণ সেই মুদীর দোকানটাতে বসে গান করচে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ি যেতে পারে নি। সামনে সূর্য্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটেচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। খুকু এতক্ষণ হয়তো গাঙ্‌ থেকে গা ধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়ো-ভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেছে। স্টীমারে এসে ওপারের ডেক থেকে পাহাড়ে ঘেরা আধ-অন্ধকার বৃক্ষপত্রের দিকে চেয়ে রইলাম কতক্ষণ, কত চিন্তা যে মনে আসে এই সন্ধ্যায়! ট্রেনে উঠে তাড়াতাড়ি শোবার ব্যবস্থা করিনি—রূপেটা স্টেশন পর্য্যন্ত বসে আসামের সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি ও ছোট ছোট গ্রাম দেখতে দেখতে এলুম। কেবলই মনে হয় ওবেলা পরীতলা ভ্যালিতে বসে সেই যে গানটা সুপ্রভা গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল
কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল

আর একটা গান—'রোদন ভরা এ বসন্ত'—চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্যের গানটা।

কামরূপ জেলার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও জলার ওপর আকাশের ছায়া পড়েচে, সন্ধ্যা হয়ে এলেও সূর্য্যাস্তের after glow এখনও আকাশে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে বনে বনে, সুপ্রভা ও শিলং অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে।

মণি ডাক্তার এতক্ষণ বাসা পৌঁছে তার সেই ছোট চালাঘরখানায় ভাত চড়িয়ে দিয়েচে। আহা, গরীব বেচারা! কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, এখান থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে কত গ্রামের কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা দ্বন্দ্বের মধ্যে একখানি মাত্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের জন্যে আমার সহানুভূতি এত বেশি কেন?

রাণাঘাট স্টেশনে পরদিন দুপুরে পৌঁছে যেন মনে হল বাড়ি এসেচি। এখান থেকে আমার সুপরিচিত সব কিছুই। মনে হল নিবারণ গোয়ালা এতক্ষণ ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নেমেচে —কি জানি কেন এই চিন্তাটা মনে হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দেশে যাওয়া আমার পক্ষে একটা আনন্দজনক ব্যাপার। এই জন্মাষ্টমীর সঙ্গে আমার জীবনে অনেক শুভদিন, বিশেষ করে একটি অতীব শুভদিনের স্মৃতি জড়ানো। তাই জন্মাষ্টমী এলেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দেশে যাওয়ার জন্যে। এই ক'বছর তার সুবিধা ও সুযোগও ঘটেচে—১৯৩৪ সাল থেকে। এবারও কাল গিয়েচে জন্মাষ্টমী, আজ নন্দোৎসব। বনগাঁয়ে গিয়েছিলুম শনিবারে। সেদিন কি ভয়ানক বর্ষা! খানাডোবা জলে ভর্ত্তি হয়ে থৈ থৈ করচে! ওদিন দুপুরে খুব জল হয়ে গিয়েচে ওখানে। গিয়েই শুনি ফণিবাবু ওভারসিয়ারের মেয়েটি সেই বিকেলে নিমোনিয়ায় মারা গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে রইলুম। পরদিন খয়রামারির মাঠে আমার সেই প্রিয় স্থানটাতে দুপুরে গিয়ে দেখি মটরলতার ঝাড় তখনও টাট্‌কা রয়েচে, ছোট এড়াঞ্চির ঝোপগুলো বর্ষার জল পেয়ে বিষম বাড় বেড়েচে। বিকেল ছ'টায় গেলুম। যাবার পথটি বড় সুন্দর লাগল সেই ছায়াভরা বিকেলে। খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সন্তু এসেও বসল। কালোর মেয়েকে এনে খুকু আমার কোলে দিলে। সন্তুকে জিজ্ঞেস করলুম সিলেণ্ডাইন্ মানে কি? খুকু বল্লে—আহা, ওকথা আর জিগ্যেস করতে হবে না। মিন্‌তো বাংলাদেশের রাজধানী বলতে পারলে না!—বলে খুকু তো হেসেই খুন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওদের ওখানে ছিলাম, তারপর চলে এলুম। দেবেনের ডাক্তারখানার সামনে বিশ্বনাথ আর সরোজ বসে গল্প করচে অন্ধকারে। আমি সেখানে একটু বসে চলে এলুম ডাক্তারবাবুর বাড়ি গান শুনতে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় কি ভাবে, খুকু সেই গল্পটা করলে সন্তুকে। ১৯১৮ সালের জন্মাষ্টমী ছুটিতেও এই বাসাতে এসেছিলুম সকালে। তখন খিনুরা থাকত, খিনুর মা তখনো বেঁচে। সরকারী ডাক্তারখানার কোয়ার্টারে তখন ওরা থাকত।

আজ সকালে ছায়াভরা পথ বেয়ে একা হেঁটে যাই বারাকপুরে। বর্ষার বনস্থলীর শোভা আরও বেড়েচে। কোথাও তেলাকুচো পেকে টুক্ টুক্ করচে, নাটাকাঁটার ফুল ফুটেচে, বনকলমীর ফুল ঝোপের মাথায় ক্বচিৎ দৃশ্যমান, 'ক্বচিৎ' এইজন্যে বললুম যে এই ফুলটা এবার যেন দেশে একটুকু কম, ঢোলকলমীর ফুল খুব ফুটেচে, কিন্তু বনকলমী তেমন দেখা যায় না। জগোর

সঙ্গে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে যাই বাড়ি পৌঁছে।. বড় আমবাগানের পথে সইমার সঙ্গে দেখা বাঁশতলায়, তিনি হরিপদর বিরুদ্ধে কি একটা নালিশ করলেন আমার কাছে। সেই গাছতলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসি, সেবার যেখানটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আইনদ্দির নাতি স্কুলে যাচ্ছে পথ দিয়ে, আমায় দেখে হাসচে। তাকে ডেকে বাড়ির কে কেমন আছে জিগ্যেস করলুম। আজ সোমবার, ভাবছিলুম যে ও সোমবারের আগের সোমবারে ঠিক এ সময়টা আমি আর সুপ্রভা পরীতলায় বসে আছি শিলংএ পাইনবনে ঘেরা সেই ছোট্ট উপত্যকাটিতে, ছোট্ট নদীটার ধারে।

তারপর জগো আর আমি মাঠে রৌদ্রে একটু নরম ঘাসের উপর শুয়ে থেকে আমাদের ঘাটে নাইতে নামি। ভারী তৃপ্তি হয় ঘোলা জল ইছামতীতে এই সময়টা স্নান করে। একটা ঝোপ থেকে একটা বনসিমের ফুলের ছড়া তুলে নিলাম। দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম দস্তুরমত যে, এই ভাদ্র মাসেও কুঠীর মাঠে ছটো গাছে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে রয়েচে।

খুকুদের বাড়িটাতে কেউ নেই। দাওয়ায় গরু উঠেচে, ভাঙাচোরা পৈঠে। একবারটা সেইদিকে গেলুম। দুপুরে আমার ঘরটাতে শুয়েচি—ইন্দু এসে খানিকটা গান করলে, আমাদের ভিটের দিকে গিয়ে দেখি ঘন জঙ্গল হয়েচে, মায়ের সেই ভাঙা কড়াখানা জঙ্গলে ঢেকে ফেলেচে। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, যাকে অনেকদিন আগে এই দিনটিতে এখানে দেখা যেত।

নৌকো করে বনগাঁয়ে এলুম বিকেলে। ইছামতীর জল খুব বেড়েছে—জলের ধারে উলুটি বাচ্ড়া, নরম সবুজ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে বনকলমীতে ছাওয়া ঝোপ। বিকেলের ছায়ায় নদীবক্ষের কি শান্ত শোভা!

ক'দিন থেকে পূজোর আগে বড় কাজকর্ম্ম চলেছে। স্কটিশচার্চ কলেজে বক্তৃতা ছিল, সেখান থেকে সেদিন বার হয়ে ডি এম লাইব্রেরীতে এলুম। এবার প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে দেখলাম না, অন্য অন্য বার দেখি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন শনিবারে। ঠিক করা গেল এবার পূজোয় কোথায় যাওয়া যাবে, অনেকটা ঠিক হল—হয় চাটগাঁয়ে, নয়তো রাধামাইন্সে। আজ সকালে সাঁতরাগাছি হয়ে গেলুম শ্রীরামপুরে। বর্ষার সবুজ বনরাজির শোভা দেখতে দেখতে আমি ও সুরেন মৈত্র গিয়ে উঠলুম শ্রীরামপুর টাউনহলে। কে একজন বল্লে—আপনার বদ্দিবাটি আসবার কথা ছিল না? বলতে বলতে হরিদাস গাঙ্গুলী এলেন, তাঁরই বাড়িতে ছিল খাওয়ার কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। বাইরে আকাশ আজ বড় নীল। তালগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অনেকদূরের আকাশে। একটা খড়ের বাড়ি পড়ে আছে, দাওয়ায় গরুবাছুর উঠেছে। বাড়িটাতে কেউ নেই। দিদিদের বাড়িও গেলাম, আগেকার দিনের মত কি আর আছে? আগে ট্রেনে যেতে যেতে দানিবাবু আমাকে সাহস দিতেন, তবে যেন শ্রীরামপুরের মাটিতে পা দিতে পারতুম।

আজ সারাদিন ভীষণ দুর্য্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। সকালে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়ে রমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে গেলুম ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখান থেকে প্রবোধ সরকারের দোকান হয়ে গুরুদাস চাটুয্যে এণ্ড সন্স ও কাত্যায়নী বুক স্টল। ওখানে আমার একখানা উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর আজ কণ্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। হয়েও গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সুধীর সরকারের বইয়ের দোকানে এলুম ট্রামে, সেখান থেকে রমাপ্রসাদের বাসায় এসে খানিকটা গল্প করি।

কি দুর্য্যোগ আজ! রাত্রে এখন যেন ঝড় বেড়েচে। আজ সারাদিন এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েচি।

রাত্রি ১০টা। বৃষ্টি সমানে চলচে, গোঁ গোঁ করে ঝড় বইচে। আমি ভাবচি বহুদিন আগে ১৯২৭ সালে ঠিক এই রাত্রিটিতে এই সময়ে আমি আর অম্বিকা ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যেতে জামদহ ডাকবাংলোতে কাটিয়েছিলুম। এখনও মনে পড়চে নির্জ্জন শালবনের মধ্যে চানন নদীর ধারে সেই বাংলোটি—আমি এদিকে কোণের ঘরে টেবিলের ওপর বসে ডায়েরি লিখ্‌চি আর বাংলোর ওদিকে লছ্‌মীপুর স্টেটের ম্যানেজার নদীয়াচাঁদ সহায় প্রজাপত্তর নিয়ে কাছারী করচেন। এই রাত্রেই শোবার সময় আমি অম্বিকাকে বলি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাল লছ্‌মীপুর হয়ে কানিবেলের জঙ্গলের পথে দেওঘর যেতে হবে। তাতে প্রথমে সে ঘোর আপত্তি জানায়, শেষে রাজী হল।

সেই ১৯২৭ সালের এই দিনটি—আর ১৯৩৭ সালের এই দিন! কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে জীবনে সব দিক থেকে···যদি ধরা যায় তারও আগে ১৯১৭ সালের এই সময়ের কথা··সেই মামার বাড়িতে থিয়েটার করলুম আমি ও মেজমামা মিলে করুণা গান গাইলে:—

আমি না তোর জান্‌ কলিজা
ভালবাসা গেছে বোঝা

তবে তো পরিবর্ত্তনের অনন্ত অকূলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্য্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটেনি, বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েচে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরও সব অনেক এসেছে। যেমন সুপ্রভা খুকু, মিনু, রেণু,—এরা সব। এই সামনের রবিবারে তো খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে। ওর মায়ের সঙ্গে কাশী যাচ্ছে পুজোয় বেড়াতে—ওর সঙ্গেও দেখা হবে তারপর আমি চাটগাঁ যাব ইচ্ছে আছে, সেখানে রেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমায় খুব আনন্দ দিয়েচে—তবুও দশ-এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে, প্রান্তরে, অরণ্যসীমায় যাপিত দিনরাত্রিগুলির স্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়···

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান, উভয় দিনের মধ্যে আমায় কত বিচিত্র অমূল্য অভিজ্ঞতা বহন করে এনে দিয়েচে। আমি সেদিক থেকে ধনী, তবুও আজ কেউ যদি বলে—সে জীবন চাও না এ জীবন? আমি সেই জীবনে আবার এখুনি ফিরে যেতে চাই, যদি কেউ দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকব কি? কি লিখব সে দিনটিতে? তখন কোথায় থাকবে আজকের দিনের সঙ্গীরা? কোথায় থাকবে খুকু সুপ্রভা?···রেণু-মা?

কে বলবে?

ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ে বিরাট সোঁ সোঁ শব্দ। রাত্রে ভয়ে ঘুম হল না মেসসুদ্ধ। রাত দেড়টা। মনে হচ্চে যেন মেসের বাড়িটা দুলচে। এমন ভীষণ ঝড় ১৩১৬ সালের পরে আর দেখেচি বলে মনে পড়চে না তো। সারা আকাশ রাঙা ধূসর মেঘে উগ্রমূর্ত্তি, রুদ্র প্রকৃতির রক্তচক্ষু যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারচে।

কাল স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েচে। অন্য অন্য বার এ সময় বাইরে যাবার জন্যে কত আগ্রহ থাকে,

কত উদ্যোগ আয়োজন করি। এবার অন্য অন্য দিক থেকে আমার ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তু বাঁ পা-খানা হঠাৎ সেদিন বনগাঁয়ে মুচকে গিয়ে এক রকম শয্যাগত হয়ে আছি—কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব। সেজন্য মন ভাল নয়। ভাল লাগে কি এ সময় কোথাও বাইরে যেতে না পারলে? সবাই দূরে কোথাও যাবার পরামর্শ আয়োজন করচে, সজনী ও ব্রজেনদা আজ সন্ধ্যায় চলে গেল ভাগলপুরে। সুধীরবাবু কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে যাচ্ছেন হরিদ্বার ও মুসৌরী, অপূর্ব্ববাবু আজ সকালে চলে গেছেন শিমূলতলা, নীরদ চৌধুরী গেছে রাঁচী, অশোক গুপ্ত যাচ্চে বেনারস, শচীন সরকার কাল সকালে চট্টগ্রাম যাবে, নীরদ দাশগুপ্ত তো সস্ত্রীক আগেই চলে গেছে চট্টগ্রাম—আজ সুধীরবাবুদের দোকানে দুপুরবেলা বসে কেবলই শুনি ওদের টিকিট কেনার, বার্থ রিজার্ভ করার, হাওড়া স্টেশনের এন্‌কোয়ারী আপিসে ফোন্ করার বিপুল ব্যস্ততা। হৈ-চৈএর মধ্যে ওরা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেচে—কোথাও যাবে এ আমোদটা কোথাও গিয়ে পৌঁছানোর আমোদের চেয়ে বেশী—কিন্তু আমি শুধু বিষণ্ণমুখে বসে বসে ওদের আয়োজন দেখচি আর ভাবচি এবার আমার আর কোথাও যাওয়া হল না। সুপ্রভা লিখেছিল ৯ই তারিখে ওরা এখানে আসবে কাশী যাবার পথে—তাও সে চিঠি লিখেছে এবার তার যাওয়া হল না। আমার যাওয়ার মধ্যে দেখচি খালি মজিলপুরে দত্তদের বাড়ি সাহিত্য-সেবক সমিতির নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাকে বিশেষ করে ধরেচে যাওয়ার জন্যে—ঐ একমাত্র জায়গা যেখানে যাওয়া ঘট্‌তে পারে, কারণ তারা মোটর পাঠাবে।

হায়, হায়, কি বিভ্রাট এবার—শিলং গেল, চট্টগ্রাম-চন্দ্রনাথ গেল, কাশী গেল, হরিদ্বার গেল, মুসৌরী-দেরাদুন গেল—শেষকাল কি না পুজোতে বেড়াতে যাব জয়নগর-মজিলপুর? আরো না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

অথচ মজা এই, সকলেই বলচে আমাদের সঙ্গে এস। সুধীরবাবু বলচেন, চলুন আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার, নীরদ দাশগুপ্ত তো কাল স্টেশনে লোক পাঠাবে চট্টগ্রাম স্টেশনে—কারণ কাল সকালের ট্রেনে আমার সেখানে পৌঁছনোর কথা পূর্ব্ব ব্যবস্থামত—অপূর্ব্ববাবু তো কাল কলেজ স্কোয়ারে সাধাসাধি—আমার সঙ্গে শিমুলতলা চলুন। সজনী বলচে—আসুন দু'দিনের জন্যেও ভাগলপুরে।

এমন সময়েও পা ভাঙে মানুষের?

পুজোটা এবার একেবারে মাটি হল। অগত্যা কাল দেশেই চলে যেতে হবে।

কাল পর্য্যন্ত ভেবেছিলুম কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পা অনেকটা সেরে উঠল। রাত্রিটা বসে বসে ভাবলুম কোথাও যাব না, এটা কি ঠিক? চাটগাঁতেই যাওয়া যাক্। সকালে উঠে স্টেশনে এসে দেখি চাটগাঁয়ের একটা স্পেশাল ট্রেন ছাড়চে। শচীনবাবুও যাচ্চে সেটিতে। বেজায় ভিড় এমন কিছু নয়—তবে ভিড় দেখলুম স্টীমারে ও চাঁদপুর ট্রেনে বসে, শোওয়া তো দূরের কথা কাৎ হবার জায়গা নেই। তার ওপরে এক এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় আর ছাড়তে চায় না—বিষম বিরক্তির ব্যাপার। চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়ে রেণুদের বাড়িতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্স থেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়। স্নান করে খেয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ * নানা গল্প করি। ষোল বছর আগে এদের বাড়িতে এসেছিলুম—আর এই এখন ষোল বছর পরে। আজ চাটগাঁয়ে বড় গরম, হাডন্ পার্কে আমি রেণুর দাদার সঙ্গে গিয়ে বসলুম

—বেজায় ধুলো চাটগাঁয়ের রাস্তায়। নবগ্রহ বাড়িতে সপ্তমী পূজোর ঢাক বাজচে। একটা বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। এবার আর হবে কি না কে জানে?

সন্ধ্যার সময় রেণু এসে বসে কত গল্প করলে।

ওবেলা দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুব বলে শুয়েছি—রেণু এসে গল্প করতে লাগল, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমায় ডাকে নি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেচি, কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।

নীরদবাবুদের বাসা খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু সেজন্য আমার কোন কষ্ট নেই। এদের আতিথ্যে যত্নে, সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েচে।

সকালে রেণুদের বাড়িতে যখন আজ ঘুম ভাঙল তখন জানলার ধারে শুয়ে দেখি রাঙা রোদের আভাস পূব আকাশে। পরিষ্কার দিনের অগ্রদূত এই অরুণ বর্ণ উদয় দিগন্তের। ভাবচি আমি কি বনগাঁর বাসায়? চাটগাঁয়ে এদের বাড়িতে ষোল বছর পরে এসেচি, এ যেন স্বপ্ন। সেবার যে সেই এদের বাড়ি থেকে অন্নদাবাবুর সঙ্গে ফেণী চলে গিয়েছিলুম—তারপর পৃথিবীতে যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে। হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে। তখনকার দিনের জীবন আর এখনকার জীবন! সেই আমি আর এই আমি? তারপর ঘটেচে ঢাকা, বর্দ্ধমান, বিভূতি, হরকু, চরি, ইসমাইলপুর, গোটা ভাগলপুরের জীবনটাই। তারপর আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ—স্কুল, কত নতুন বন্ধু লাভ, সুপ্রভা, খুকু ওরা সব। জীবনের চলমান স্রোতে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে এনে ফেলেছে গ্যাখো!···

রেণু চা নিয়ে এল। বুদ্ধু বল্লে—আজ চন্দ্রনাথে চলুন।

বেশ যাব। কখন গাড়ি আছে গ্যাখো।

সাড়ে দশটায় গাড়ি।

সওয়া দশটা বেজে গেল বুদ্ধুর দেখা নেই। কোথায় বাইরে গেছে।

আমি একলা স্টেশনে এলুম। ফেরিওয়ালা বিক্রী করচে—চাই বনরুটি, কেক—বলবাশিংসু! আমি ভাবি 'বলবাশিংসু'টা কি জিনিস? চাটগাঁয়ে কোন খাবারের নাম নাকি?

চাই বলবাশিংসু···বলবাশিংসু··

কান পেতে শুনে বুঝলুম লোকটা আসলে বলচে—ভাল পাশিং শো। চাটগাঁয়ে 'ও'-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ করে 'উ'-কারান্ত শব্দের মত। জ্যোৎস্নাকে বলে জুৎস্না। 'শো' হয়ে গিয়েচে 'শু'।

যাক্। চন্দ্রনাথে এসে নামলুম বেলা বারোটা তখন। ঝম্‌ঝম্ করছে দুপুরের রোদ। নীল ইস্পাতের মত আকাশ। একা হেঁটে ভাঙা পা নিয়ে পাহাড়ে উঠচি। পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি—এখনও বেশ খচ্ খচ্ করে হাঁটতে গেলে। বিরুপাক্ষ মন্দির থেকে যাত্রীদের দল নামচে। দুপুরে ঘেমে নেয়ে উঠচি। বিরুপাক্ষ মন্দিরে উঠতে বাঁ ধারে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ আছে—সেইটে ধরে চললুম। বড় নির্জ্জন রাস্তাটা। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে সরু পথটা বনস্পতি-সমাকুল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠে নেমে ঊনকোটি শিবের গুহা বলে একটা ছোট্ট গুহার কাছে গিয়ে শেষ হয়েচে। ঘামের উপদ্রবে ডুবার এর মধ্যে গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসেচি। একটা বনকলার পাতা হাতে নিয়েচি—যেখানে সেখানে সেটা পেতে বসচি। ঊনকোটির শিবের গুহা দেখে ফিরবার সময়

একটা ছোট ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, ঘন জঙ্গলাবৃত—ঝর ঝর ঝরণার জলের তোড়ের শব্দ পাচ্চি। একটা কি পাখী ডাকচে,ঠিক যেন ঘণ্টা বাজচে। সামনে সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে মাঝে মাঝে বেশ হাওয়া বইচে—এই ভীষণ গরমে ও রোদে সে ঝিরঝিরে হাওয়াতে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। ডাইনে একটা উঁচু চূড়ায় একটি মাত্র নির্জ্জন বনস্পতি অত উঁচুতে সুনীল আকাশের নীচে একটা অসাধারণ ছবির সৃষ্টি করেচে। সুন্দর, কিন্তু যেন অবাস্তব। অত উঁচুতে কি গাছ থাকে ?

ফিরবার পথে সেই ঝরণার ধারে বসলুম। যেমন বড় বড় গাছ জায়গাটাতে, তেমনি বড় বড় শিলাখণ্ড। সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলুম—ওপরে বিশাল অরণ্য—regular mountain forest—বেশীদূর উঠতে সাহস হল না এই মচকানো পা নিয়ে—পথটাও জনহীন, শুনেচি চন্দ্রনাথে বাঘ আছে। নেমে আসবার পথে প্রথমে বসলুম সিঁড়িটার ওপরে—মাথার ওপরে চূড়ার পাশে বনের গাছপালা—তার মাথায় চিল উড়চে, দূরে সমুদ্র বেঁকে গিয়েচে। ওই সমুদ্রের দূর গায়ে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামের কত প্রতিমা, কত উৎসব!

সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ! এক এক জায়গায় এর এক এক স্বরূপ, নামবার পথে সেই ঝরণাটার ধারে ঘন ছায়ায় আর একবার খানিকটা বসলুম, বিকেলের ঘন ছায়ায় এই বনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে। সেই যে নীচের পুলটাতে ষোল বছর আগে রোজ সন্ধ্যায় বসতুম এখানে থাকতে—সেইটাতে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই আজ বসলুম। আবার এই ষোল বছরের অতীত ঘটনাবলী মনের মধ্যে একে একে উদিত হল। পরিবর্ত্তন·· পরিবর্ত্তন··· একেবারে আমি নতুন মানুষ এখন। সে আমিই নেই। শম্ভুনাথের মন্দিরের ডাইনের ঘন বনের রাস্তাটি দিয়ে নামলুম। বনের মাথায় সাদা সাদা যেন অনেকটা কাপাস তুলোর ফুলের মত ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। আরও অনেক ফুল দেখলুম।

ফেরবার পথে অখিল চক্রবর্ত্তীর এক ভাই-এর সঙ্গে দেখা। অখিল সেবার আমার পাণ্ডা ছিল—ষোল বছর আগে যখন চাটগাঁ এসেছিলুম। তাদের সে বাড়িটাও দেখলুম। একটা ছোট্ট মেটে বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। তখন ছায়া ঘন হয়ে এসেচে। মাটির উঠান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পেছনে বাঁশের ছেঁচার বেড়া ও বেতবন, ছোট্ট প্রতিমাটি, কতকগুলি গ্রাম্য নরনারী প্রতিমা দেখতে এসেচে, ট্যাং ট্যাং করে ঢোল বাজচে। ওখান থেকে বার হয়ে স্টেশনের কাছে এক বড় পূজার বাড়িতে মহাষ্টমীর আরতি দেখলুম। সুপ্রভাদের বাড়ি পুজো আছে, সে-ও এমন সময় হয়তো আরতি দেখচে দাঁড়িয়ে—খুকুও।

ট্রেন এল। অখিল চক্রবর্ত্তীর ভাই আমার টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। কত কথা ভাবতে ভাবতে চাটগাঁয়ে এলুম। এসে ওপরে বসেচি, রেণু তখনি এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে এসে হাতে দিলে। তারপর চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প করি বসে। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলুম রান্নাঘরে নেমে—রেণু, আমি, বুঙ্কু ও বুঙ্কুর মামা। বুঙ্কুর মামা চন্দ্রনাথের এক পাণ্ডার কীর্ত্তি-কলাপ বলতে লাগল।

ডায়েরী লিখবার সময় বসে বসে ভাবলুম দশমীর দিন দেশে কাটাব।

এবার পাঁচ দিন পুজো—তাই আজও মহাষ্টমী। আজ সন্ধিপূজা। কাল রাত্রে সঙ্কল্প করেচি যে যখন এবার পাঁচ দিন পুজো—তখন দেশে বিজয়া দশমী কাটাতে হবে। সকালে উঠে বাইরের ঘরে বসেচি—রেণু এসে বল্লে, বাতাবি নেবু খাবেন ? একটা ফিরিওয়ালার কাছে

বাতাবি লেবু কিনে বাড়ির মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল একটা প্লেটে করে। বল্লে—লোকে বেড়াতে যাবেন তো? আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠলুম আজ রাত্রে ট্রেনে জাগতে হবে বলে। মোটর এল, রেণুর দাদা, আমি, রেণু বেরিয়ে পড়লুম। শহর ছাড়িয়ে ছোট ছোট পাহাড়, বন্য কাঁটাল গাছ—কেলে কোঁড়া লতা এত দূরেও দেখে অবাক হয়ে গেলুম। হ্রদটি জঙ্গলে ভরা, পাহাড় বেষ্টিত, বৃষ্টি পড়তে লাগল—রেণুকে ছাতি দিলুম, সে কিছুতেই খুলবে না। জোর করে খোলালুম। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলুম সমুদ্র দেখব বলে, কিন্তু সামনে আর একটা পাহাড় দৃষ্টি আটকেচে।

বাড়ি ফিরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে নিলুম। আমি, বুদ্ধু, রেণু একসঙ্গে খেতে বসলুম ওদের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে। গাড়ি এল। রওনা হলুম স্টেশনে। সঙ্গে একজন লোক এল, বুদ্ধু তাকে পাঠিয়ে দিলে। তাকে কিছু বখশিশ দিলুম। ফেরিওয়ালা হাঁকচে—চাই বলবাশিংস্ক…

ঘুম হয়নি ট্রেনে, যদিও শুয়েই এসেছিলুম। লাক্‌সাম জংশন ছাড়িয়ে একটুখানি শুয়েচি—অমনি উঠে দেখি চাঁদপুর ঘাট। স্টীমারে এসে বেশ জায়গা পেলুম। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। রাজাবাড়ি, তারপাশা, মৈনট্ কত কি স্টেশন। ওই ঝড়-বৃষ্টিতে যখন নৌকা করে খাবার বিক্রী করতে আসচে, জলের ঝাপটায় ওদের ধারে যাবার জো নেই। বড় বড় নৌকা করে যাত্রীরা বাক্স-বিছানা, মোট-পুঁটুলি নিয়ে ছাতি মাথায় ভিজতে ভিজতে তীরে যাচ্চে স্টীমার থেকে। বড় বড় চর, কাশবন। চরের মধ্যে লোক বাস করচে। স্টীমার খুব বেগে যাচ্চে। কিন্তু সারা-দিনের মধ্যে বৃষ্টি থামল না। একঘেয়ে বসে বসে ভাল লাগচে না। বেলা চারটার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমার এসে লাগল। ভাবলুম নিজের দেশেই যেন এলুম। এই তো গোয়ালন্দ পোড়াদহ এলুম—তো নিজের দেশ আর কতটুকু?

কলকাতা নেমে দেখি টক্কু আমার ঘরে বসে আছে। সে কলকাতা বেড়াতে এসেচে। আমি ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি গেলুম। মন্মথ এসে বল্লে, না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু। খেতে রাত বারোটা হয়ে গেল। তখন পথেঘাটে মেয়েছেলের হাত ধরে লোকে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে।

সকালে উঠে বাগবাজারে গেলুম পশুপতিবাবুদের বাড়ি নীরদবাবুদের কি হল সে সন্ধানে। বাড়ি তো গেলুম, গিয়ে শুনি নীরদবাবুরা গিয়েচেন গালুডি। সেখানে চা খেয়ে বৌঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করি। বৌঠাকরুণ ৺বিজয়ার প্রণাম সারলেন বিসর্জ্জনের আগেই পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে। আমিও তাই করি। বগলা এল, তার সঙ্গে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখতে গেলুম বাগবাজারে। প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েচে। দুজন ছেলের সঙ্গে বগলা আলাপ করে দিলে এবং তাদের দেখিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তাকে কমল যেতে লিখচে ঘাটশিলায়। তার সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে বসে কাব্যালোচনা করবে বলে মহা উৎসাহে চলেছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল করলে। আমি ওখান থেকে বাসায় এসেই ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলুম।

দুপুরের পরে এসে বনগাঁয়ে পৌছুই। প্রফুল্লদের বাড়ি ঠাকুর বরণ হচ্ছে। আমি, বীরেশ্বরবাবু, যতীনদা, মনোজ সবাই সেখানে গিয়ে বসি। একটু পরে বেলা পড়লে আমি ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর গেলুম বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখব বলে। কতকাল দেখিনি গ্রামের মেলাটা। এবার যখন আছি দেশে, তখন একবার দেখার খুব ইচ্ছে হল। পথে খুব ভিড়, চালকীপোতা চাঁপাবেড়ে থেকে বিজয়ার মেলা দেখতে আসচে লোকে বনগাঁ। চাষার মেয়ে-ছেলেরা রঙিন কাপড় পরে আসচে। এই জোড়া বটতলা, এই রায়দের বড় বাগান—গ্রামে

পৌঁছে গিয়েছি, আমাদের গাঁ !···কোথা থেকে কোথায় এসেছি ভাব !

বাঁওড়ের ধারে ছেলেবেলাকার মতই মেলা বসেচে। গোপালনগরের হাজারি ময়রা পাঁপর ভাজচে, বাসন-বেচা কুণ্ডু পানের দোকান খুলেচে, গ্রাম্য নরনারী ছেলেমেয়েদের ভিড় খুবই। বাঁওড়ে দশ পনেরো খানা নৌকার বাচ্ খেলা হচ্চে। শ্যামাচরণদা, ফণিকাকা, সাতুকাকা, বৃন্দাবন—এদের সঙ্গে দেখা হল। অমূল্য কামারের ছেলে এসে হাত ধরে বল্লে—কাকা, একটা পয়সা দিন না, পাঁপর ভাজা কিনব। রায়েদের বাড়ির ছেলেরা অমনি ঘিরে দাঁড়াল—আমাদেরও দিন। প্রকাণ্ড বড় বটতলায় মেলা হয়। ছায়া পড়ে এসেচে ঘন হয়ে। আমি যেন স্বপ্ন দেখচি। কোথায় চট্টগ্রাম, রেণু—কোথায় মেঘনা আর পদ্মা, কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি জেলা, আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি একেবারে আমাদের গ্রামে, বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখচি।

সন্ধ্যা হয়ে আসচে, মেলার জায়গা থেকে বুড়ীর বাড়ি এলুম। বুড়ীকে কিছু দিলাম বিজয়ার দিন—সে তো আমায় দেখে কেঁদেই আকুল। এখন যেন আর ভাল চোখে দেখতে পায় না—বড্ড বয়েস হয়ে গিয়েচে। পুঁটি দিদিদের বাড়ি এসে দেখি বিলবিলের ধারে বসে পুঁটিদিদি বাসন মাজচে। খুকুদের বাড়িটা শূন্য পড়ে রয়েচে। ন'দিদিদের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর সকলকে বিজয়ার প্রণাম করে কিশোর-কাকার বাড়ি এলুম। কিশোর-কাকা কিছুতেই ছাড়লেন না, বসিয়ে একটু জলযোগ করালেন। কতদিন কিশোর-কাকার বাড়ি বসে বিজয়ার দিন জলযোগ করিনি। তারপর অশথতলাটায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা করলুম—কালও ছিলুম পদ্মার ওপরে স্টীমারে—রাজাবাড়ি, বিক্রমপুর এপারে—ওপারে ফরিদপুর, কোথায় সেই চন্দ্রনাথে পাণ্ডার বাড়িতে সেই ছোট্ট প্রতিমাখানা, সেই আমলকী গাছে ঠেস্ দিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর কোথায় আমার বারাকপুরের হেলা কাঁটালতলা !

চলে এলুম গাড়ি করে বনগাঁয়ে। হরিবাবুর বাড়ি, পটলের বাড়ি, বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গন সেরে ফেললুম। সুপ্রভাদের বাড়িতে তারাও আজ এমনি বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ করচে পরস্পরে। খুকু—সুপ্রভা—রেণু—ওদের সকলকেই মনে মনে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিই।

এবার ভারী চমৎকার পুজো কাটল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতায় বিভূতিদের বাড়ি, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে। আর কোথাও যাব না। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে—ঘোড়ার গাড়ি যেন চলেচে ঘন বনবীথির মধ্যে দিয়ে বনগাঁয়ে। আমি বসে বসে চাটগাঁয়ের কথা পথের কথা ভাবচি। সুপ্রভার কথা ভাবচি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর রাত্রি ! বনপুষ্পের জ্যোৎস্নামাখা সুবাস সন্ধ্যার হিম বাতাসে।

আজ দিন-দশ বারো এখানে এসেচি। ক'দিন খুবই ভাল লেগেছিল—এখনও লাগচে মন্দ নয়। বৈকালে কুঠীর মাঠের সেই জলাটার ধারে বেড়াতে যাই—বনে ঝোপে সর্ব্বত্র বনমরচে ফুলের সুগন্ধ। ওইখানের ঝোপগুলোতে কেলেকোঁড়া আর কেঁয়োঝাঁকার ফুল ফুটে গন্ধে আমোদ করচে—বিশেষ করে কেঁয়োঝাঁকার ফুল। কুঠীর মাঠের দিকে বনমরচে লতা বেশী নেই। রোদ রাঙা হয়ে আসে, তখনও পর্য্যন্ত বসে থাকি, আজ আবার এক রাখাল ছোঁড়া জুটে গল্প করে আমার চিন্তার ব্যাঘাত করতে লাগল। ফিরবার সময় আটির মাঠ দিয়ে গিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে পড়ি ও গোসাঁইবাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি। আজ কি চমৎকার রাঙা মেঘ করেছিল সন্ধ্যার কিছু আগে ! আমি গায়ের চেক্ চাদরখানা পেতে কতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসে রইলুম ভূষণো জেলের কলাবাগানের পাশের জমিতে। এক পাশে আটির ডাঙায় নিবিড় বন,

সামনে মুক্ত মাঠে বৈকালের ঘন ছায়া, মাথার ওপরে আকাশে ময়ূরকণ্ঠী রং, চারিধারে রাঙা মেঘের পাহাড়পর্ব্বত—যেন উঠতে ইচ্ছা করে না। সুপ্রভা কাল যে রুমাল ও বালিশ ঢাকনিটা পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠি ছিল, কাল তো নদীর ধারে মাঠে বসে হাট থেকে এসে পড়েছিলুম, কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ভাল পড়তে পারি নি, আজও সেখানা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। খুকু এবার এখানে নেই, সদাসর্ব্বদাই তার কথা মনে হয়—দুপুরে সে যেন পাশের পথটা দিয়ে আসচে। এসেই বলচে—কি করচেন? চার পাঁচ বছর পরে এই প্রথম দীর্ঘ অবসর আমি বারাকপুরে কাটাচ্চি, যখন ও এখানে নেই। সেই জন্যই এখনও ওর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি মন।

ন'টার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পাচ্চি, নিজের খড়ের ঘরটায় বসে আলো জেলে ডায়েরীটা লিখ্‌চি। এখনও মশারির মধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে গরম বোধ হয়—অথচ মশা এমন যে মশারি না খাটিয়ে লেখাপড়া করার জো নেই রাত্রে। দিনটা এখানে বেশ কাটে, রাত্রে অন্ধকার আর নির্জ্জনতায় যেন হাঁপ লাগে। কারো বাড়ি গিয়ে একটু দুদণ্ড গল্প করব এমন জায়গা নেই। পচা রায় ছিল, সে ডাক্তারী করতে গিয়েচে শুনচি আমডোবে।

আমাদের বাড়ির পেছনের ওই বাঁশবাগানটায় যে ডোবা আছে, আজ দুপুরে শুকনো বাঁশের খোলা পেতে রোদে ওখানে খানিকটা বসে ভারী ভাল লাগল। ঘন বাঁশবন, চারিদিকে বনমরচে ফুলের ঘন সুগন্ধে আমোদ করেছিল দুপুরের বাতাস—বরোজপোতার ডোবার ওপারে কখনো বসে দেখিনি কেমন লাগে। জায়গাটা বড় চমৎকার।

কুঠীর মাঠের অনেক বন কেটে ফেলেচে বেলেডাঙার চাষীরা। ওরা এবার অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করচে। কুঠীর মাঠের বন আমাদের এ অঞ্চলের একটা অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু কাকে তা বোঝাব!

আজকাল বনে-জঙ্গলে মাকড়সার নানা রকম জাল পাতা দেখি। দু'তিন বছর থেকে আমি এটা লক্ষ্য করচি। জাল গড়বার কৌশল ও বৈচিত্র্য আমায় বড় আনন্দ দেয়—কিন্তু আজ সকালে কুঠীর মাঠে একটা জাল দেখেছি, যা একেবারে অপূর্ব্ব। ঘাসের মধ্যে দুটি দূর্ব্বাঘাসের পাতায় টানা বাঁধা ঠিক একটি এক-আনির মত একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সাটা প্রায় আণুবীক্ষণিক, তাকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব—একটা ঘাসের পাতা ধরে একটুখানি নাড়া দিতে এক দিকের জাল যেন একটু নড়ে উঠল—কি যেন একটা প্রাণী নড়াচড়া করচে সেখানটাতে। ওই এক আনির মত ছোট জালটুকুই ওর জগৎ।

ন'টার গাড়িতে রাণাঘাট গেলুম অবনীবাবুদের বাড়ি। অমৃত-কাকা সঙ্গে গেলেন। বৈকালে ওখান থেকে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। বন্ধুর স্ত্রী এখানেই আছে। রেলবাজারে নীরুর সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুনলুম খিন্তু এখানে নেই। গোপালনগর নেমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি ও নন্দ ঘোষ বাজার পর্য্যন্ত এলুম। যুগলের দোকানে ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিলুম ওবেলা!

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে, 'কেঁয়োঝাঁকা' ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলুম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বনফুলের ঘন সুবাস! নানারকম চিন্তা মনে আসে ওখানে নির্জ্জনে বসলে, আমি দেখেচি ঘরের মধ্যে বসে সেরকম খুব

কম হয়। মনের আনন্দই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা—দুঃখও বটে—কারণ আসলে অনুভূতির গভীরতাটাই আসল, দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। আজ সকালেও বেলেডাঙার বটতলার পথটাতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মাঠের মধ্যে সেই যে একটা ঝোপ আবিষ্কার করেছিলাম সেবার—তার পথটা বুজে গিয়েচে শেঁয়াকুলকাঁটায়, ঢুকতে পারা গেল না। নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলাম রায়পাড়ার ঘাটে।

সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসে লিখচি, শিবুদের বাড়ি কলের গান হচ্চে দেখে শুনতে গেলাম। এইমাত্র ফিরচি। অন্ধকার রাত, অন্ধকার আকাশে কি অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। কত জগৎ, কত পৃথিবী—Jeans, Eddington-দের ও কথাই মানিনে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও মানুষের বাসের উপযুক্ত গ্রহ বা নক্ষত্র নেই। এই রকম পরিচিত গ্রামের পথ, ওই যে বকুলতলাটা, শিউলিতলাটা—যা কত দিনের স্মৃতিতে মধুর—আর কোথাও বিশ্বে এমন নেই—স্রষ্টা বুঝি দেউলে হয়ে পড়েছিলেন কায়ক্লেশে পৃথিবীকে তৈরী করেই!

সে অনন্ত, বিরাট দেবতাকে প্রণাম করি। কে-ই বা তাঁকে চেনে, বোঝে বা জানে! যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা কাউকে বলে বোঝাতে পারেননি বা সে চেষ্টাও বোধ হয় করেননি—অসম্ভব বলেই করেননি—সাধারণ লোকের জন্যে কতকগুলো মিথ্যে মনগড়া ফাঁকি সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায় লিখচি। লেখবার জন্তেই এই জায়গাটাতে এসেচি। ভারী সুন্দর বনকুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কূজন শুরু করেচে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েচে। ওপারে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে! পাখীর দল উড়ে যাচ্ছে। এইখানে বসে সুপ্রভার ৺বিজয়ার চিঠিখানা পড়ছিলুম আজ। এখানেই লেখা বন্ধ করি। সন্ধ্যা হয়ে এল। জগোদের নিয়ে হাজারির ওখানে গোপালনগরে কালীপুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে সন্ধ্যার পরেই।

উঠে বাড়ি এসে জগো ও জিবুকে নিয়ে প্রথমে গেলুম বুড়ীর বাড়ি। বুড়ী উঠতে পারে না, তাকে দেখেশুনে গোপালনগর গেলুম। দারিঘাটা পুলটার ওপর থেকে ছায়াপথটা কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। কত নক্ষত্র, অসংখ্য অসীম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম পুলের ওপরে। হাজারিদের বাড়িতে কালীপুজোতে প্রতি বৎসরই আনন্দ উৎসব হয়। এবার জিতেন সুধীরদা ছিল—চট্টগ্রাম ভ্রমণের গল্প করলুম ওদের কাছে। বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল রাত এগারোটা। নক্ষত্রদের জ্যোতি আরও ফুটেচে। কালপুরুষ ন'দিদিদের উঠোনের ওপারেই উঠে এসেচে। আজ যে নক্ষত্রসংস্থান এই কালীপুজোর রাতে, পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠত, আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনও এমনি উঠেচে, দুশো বছর আগে যখন শাঁখারী পুকুরের ধারে বৰ্দ্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনও এমনি উঠত। আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপুজোর রাতে ওরায়ন ন'দিদিদের বাড়ির উঠোনের ওপরে এমনি উঠবে—কিন্তু তখন পাশের বাড়ির পথটা দিয়ে বিলবিলের পাশ দিয়ে খুকুও অমন আসবে না—কে কোথায় চলে যাবে। নতুন দল তখন আসবে পৃথিবীতে—তাদের হাসি কান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামের বাতাস।

কাল এখান থেকে চলে যাব। পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল এবার খুকু ছিল না, তা হলেও কেটেছিল বেশ। বৈকালে প্রায়ই কুঠির মাঠে বনে ঝোপের ধারে বসে বিকেলটা কাটাতুম— ভারী আনন্দ পেতাম। এখন রাত্রি দশটা, আমার ঘরে নির্জ্জনে বসে লিখচি। পুঁটি দিদি মাঝের গাঁ থেকে এসেচে, আমার জন্তে একটা ভাণ্ডীর ফুলের ডাল এনেচে ফুলসুদ্ধ। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি বসে একটু গল্প করে এলুম। কাল গ্রাম ছেড়ে যাব, সকলের জন্তেই কষ্ট হচ্চে। গঙ্গাচরণ মন্থু রায়দের বাড়ি বসে ভাঙা হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেসুরো গলায় সেকেলে যাত্রা দলের গান গাইচে ; মনে হচ্চে, আহা, ওই একটু গিয়ে বসে শুনে আসি। এদের সকলের জন্তেই কষ্ট হয়। গ্রামের এই সব লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত—ওদের জীবনে কোন আমোদ-প্রমোদ নেই—জগতের কিছু দেখেও নি, শোনেও নি। সকলের জন্তেই মন কেমন করে। মন্থু রায়দের বাড়ির মেয়েরা বাঘ-আঁচড়ায় গিয়েছিল কালীপূজো দেখতে—এখন সব গরুর গাড়ি করে বাড়ি এল।

শীতে জেলের নৌকোয় বিকেলে বনগাঁ এলুম। বেলা তিনটার সময় বেরিয়েচি, গাজন বাঁশতলার ঘাটে মাছ ধরচি, ফণিকাকা মাছ ধরচে চটকাতলার নীচে। চালকীর ঘাটে একটা লোক ছিপে প্রকাণ্ড কাছিম বাধিয়েছিল, আমরা নৌকো নিয়ে কাছে গেলাম, সুতো কেটে নিয়ে কাছিমটা গেল পালিয়ে। সীতানাথ মাঝি বিশ বছর আগে নেপাল মাঝির নৌকোয় ভোলা ও বরিশালে গিয়েছিল—সে গল্প করতে লাগল, ওরা নৌকোতে কাজ করত, বাদুড়ে থেকে খাবার জন্তে চাল ডাল কিনত। নলচিটিতে সুপুরি কিনে বিক্রী করতে করতে বনগাঁ পর্য্যন্ত আসত— ওখানে সব বিক্রী হয়ে যেত। নৌকোতে মধু ছিল—চালতেপোতার বাঁকে ছায়াভরা সেই সুন্দর বনঝোপের কাছে এসে সে নৌকোর দাঁড় বাওয়া রেখে তামাক সাজতে বসল। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, দুধারে বড় ঝোপ, সাঁইবাবলা বনের অপূর্ব্ব শোভা। পূজোর ছুটিটা বারাকপুরে বেশ কেটেচে, বরোজপোতার ডোবার ও পাড়ের কথা এখনও ভুলতে পারচি নে। এই বাঁশবাগানটায় কি যে একটা মায়া আছে। তারপর সাজিতলার বনগাঁ এবার নতুন আবিষ্কার। সকলের চেয়ে আমার ওইটাই লেগেচে ভাল। কুঠীর মাঠের জলার ধারে ওই ডাঙাটা। সবই ভাল, কেবল সন্ধ্যার পরে লোক অভাবে বড় নির্জ্জন লাগে। নয়তো এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কোথায় আছে কলকাতার এত কাছে? সুপ্রভাকে পাঠাব বলে কিছু বনের ফুল সংগ্রহ করেছিলুম। কাল পাঠাব।

কাল বৈকেলে খুকুদের ওখানে দেখাশুনো করে এলুম। বেশ কাটল বিকেলটা। যতীনদার বাড়ির ধারের ডোবাটাতে সকালে উঠে যেতে গিয়ে দেখি সাদা সাদা কচুরির ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। কি যে তার শোভা! আবার বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঘণ্টা-দুই পরে দেখি সূর্য্যের কিরণে ফুলগুলোর রঙ এর মধ্যেই নীলাভ হয়ে উঠেচে। সূর্য্যের আলোর কি যে রসায়ন বুঝলুম না—ফুলগুলির কাছে ঘাসপাতায় কি ল্যাবোরেটরি নিহিত, তাই বা কে বলবে? আমি দেখে ভারি মুগ্ধ হয়েচি!

আজ সকালে রাম অধিকারী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে। সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ি। সেখান থেকে গল্পগুজব করে এসে বাড়িতে অভিভাষণের শেষটুকু লিখি। দুপুরের

পরে গেলুম সজনীর বাড়ি। ছেলেবেলায় রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত একবার পড়েছিলুম, গ্রামে তখন কি একটা নিমন্ত্রণ ছিল। মা এক বাটি সুজি করে দিলেন খেতে অনেক দেরি হবে বলে, আর চালভাজা। আমি খেতে খেতে মহাভারতখানা পড়তে লাগলুম রান্নাঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু সেদিন আর দেরি হয়নি, অল্প পরেই খাবার ডাক এসেছিল। আজ সেই মহাভারতখানা সকালে পড়তে পড়তে ছেলেবেলার সেই কথাই মনে পড়েছিল।

সজনীর বাড়ি অমিয় মোটর নিয়ে এল আমাদের নিয়ে যেতে। মনোজ বসু আমাদের সঙ্গে যাবে বলে এসেচে। ওকে দেখে খুব খুশি হলুম। প্রেমেনকে তুলে নিলাম বরানগর থেকে বালী ব্রিজ পার হয়ে। আজকাল দক্ষিণেশ্বর একটা রেলওয়ে স্টেশন হয়েচে জানতুম না। শ্রীরামপুরে টাউন হলে যখন আমরা পৌছুলাম তখন চারটে বেজেচে। লোক আসতে শুরু হয়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হল। প্রথমেই কথাসাহিত্য শাখার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সবাই মত দিলে। কাজেই আমার অভিভাষণ প্রথমেই পাঠ করতে হল। তারপরে প্রেমেনের। বেশ বিকেলটা। সভার কাজ করতে করতে ডাইনের বড় জানলা দিয়ে অপরাহ্নের আকাশ ও একটা তালগাছের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল আগে শ্রীরামপুরে আসতুম জ্ঞানবাবুর সঙ্গে—সে এক ধরণের দিন ছিল। আমাদের গ্রামে আমার খড়ের ঘরখানার কথাও মনে হল। বকুলতলায়ও এমনি ছায়া পড়ে এসেচে, এই তো সেদিন ছেড়ে এসেচি, কিন্তু তাদের কথা মনে হচ্ছে।

সভার কাজ শেষ হবার কিছু আগে আমি চলে এলুম বিনয়দাদের বাড়ি। হরিহাস গাঙ্গুলী সামনের রবিবার শেওড়াফুলি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বাড়ি দেখলুম শান্তি এসেচে, মানুও আছে। শান্তি আমার অনেক বই পড়েচে, বলতে লাগল। ওখান থেকে উঠে লীলা দিদিদের বাড়ি এলাম। লীলা দিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তারপর ট্রেনে আমি প্রেমেন, সুরেন গোস্বামী একসঙ্গে এলুম। মনোজদের দল আগের ট্রেনে চলে গিয়েচে সভা ভাঙতেই। বেশ কাটল রবিবারটা। কাল স্কুল খুলবে। পুজোর ছুটি আজই শেষ হল।

ঘুমিয়ে উঠেই মনে পড়ল বহুদিনের কথা—যখন আমরা কেওটা থেকে ফিরচি—আমার বয়স ছ'বছর—রাজি ও পটীদিদি আমাদের বাড়ির সামনের পথে বাঁশের খোলা ও ধুলো নিয়ে খেলা করচে। ওরাও তখন নিতান্ত বালিকা। আজ এতক্ষণ পাগলা জেলে গিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসেচে। কারণ সাড়ে এগারোটার ট্রেনে সে গিয়েচে—ওর কথা ভাবতেই মনে পড়ল।

বারাকপুরকে মধুর করে গিয়েচে কত লোক। পিসীমা ছেলেবেলায়। মা, চক্কত্তি-খুড়ীমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, মণি আর একটু বেশী বয়সে। প্রথম যৌবনে গৌরী। এদের দান কত বড় তাই ভাবছিলুম। সেই পিসীমার উঠোন ঝাঁট দেওয়া, হেমন্তের এক বিকেলে হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান। সেই গৌরী তাকের কোণে কি একটা নিতে এল। সদ্যস্নাতা কিশোরী, ভিজে চুল পিঠে তুলচে। আমি কাছেই তক্তপোশে বসে পড়চি পুরানো বই—আমার দিকে চেয়ে লাজুক-চোখে হাসলে। তারপর সেও কোথায় গেল চলে। মার কত দিনের কত ভালবাসা মনের মধ্যে গাঁথা রয়েচে।

এখন যারা বারাকপুরে বাস করে তারা জানে না বারাকপুর কি। এখানে যে দেবী বাস করেন, সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যময়ী গ্রাম্যদেবী—বরোজপোতার বাঁশবন রাঙা-রোদ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর আসন পাতা, আমি যেন কতবার একলা সেখানে বেড়াতে গিয়ে দেখেচি। আর কেউ দেখেনি।

একসঙ্গে সবাই দেহ ধরে পৃথিবীতে এসেচি এ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্যে। সবাই, পৃথিবীসুদ্ধ নর-নারী একই সময়ে যারা পৃথিবীতে এসেচে—পরস্পরের আত্মীয়। তাদের উচিত পরস্পরকে

সাহায্য করা, পরস্পরকে elevate করা। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকার জন্যেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে। নইলে কি স্পেনে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে অসহায় শিশু ও নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারত আজ ?

মনে পড়ল, পিসীমা শীতের বদলে 'জাড়' কথাটা ব্যবহার করতেন, ছেলেবেলায় শুনেচি। এখন আর কারো মুখে আমাদের গাঁয়ে ও কথাটা শুনিনে।

আজ বিকেলে P. E. N. Club-এর একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালে আজ কলেজ স্কোয়ারে যখন বেড়াতে যাই, তখনও আমি জানতুম না যে ব্যাপারটা আজই হবে। সরোজ ও গিরিজাদা ছিল স্কোয়ারে, আমি আর রামপ্রসন্ন তো আছিই। ওখানেই সরোজ কথাটা বল্লে, কারণ আমি তখনও পর্য্যন্ত চিঠি পাইনি—তারপর বেড়িয়ে এসে পত্র পেলাম।

নীরদবাবুর সঙ্গে গেলাম, চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তরাঁতে হচ্ছে। খুব বেশী লোক হয়নি, জন চল্লিশ। মেয়েদের মধ্যে শান্তা ও সীতা দেবী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুরেশ বাঁড়ুয্যে, সরোজ চৌধুরী, সুধীরবাবু—মণি বোস—এই জনকতক। খগেন মিত্র ও হুমায়ুন কবীর একটু দেরি করে এলেন।

সরোজিনী নাইডু দেখলুম অদ্ভুত কথা বলতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে অমন সুবক্তা আর অমন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেচি। ইংলণ্ডের নানা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তরুণ বয়সে কি ভাবে ওঁর প্রথমে আলাপ হয়, সে বিষয়ে অনেক গল্প করলেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা এত ভাল লাগছিল আমার যে আরও দু ঘণ্টা বল্লে যেন ভাল হয়, এমন মনে হচ্ছিল।

ওখান থেকে সোমনাথবাবুর ও সুশীলবাবুর বাড়ি হয়ে ফিরলুম নীরদবাবুর বাড়িতে। ওরা 'বিচিত্রা' সম্পাদক হওয়ার জন্যে আমায় বিশেষ অনুরোধ করচে, কিন্তু আমি রাজী হইনি। সুশীলবাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। আমার তো ইচ্ছে নয়।

ঈদের ছুটিতে শুক্রবারে বনগাঁ এসেচি। একদিন রাজনগরের মাঠে গিয়ে বিকেলে বসি। ঠিক যেন ইসমাইলপুরের সেই সোঁদামাটির ও কাশের গন্ধ। পরদিন চলে গেলুম বারাকপুরে। পুঁটিদিদি একা বাড়ি আছে। বরোজপোতার ডোবার ধারের বাঁশবাগান শীতের দুপুরে কি সুন্দরই হয়েচে। দুপুরের পরে গেলুম কুঠীর মাঠে ইন্দুদের বাড়ি খেয়ে। ছোট এড়াঞ্চির গাছে মুকুল ধরেছে—নির্জ্জন মাঠ, ভূষণ জেলের পুরোনো কলা বাগানের পাশেই। ভারী সুন্দর লাগছিল। রোদ রাঙা হয়ে গেলে উঠে এলুম বরোজপোতার বাঁশবনে আবার। তারপর হেঁটে বনগাঁয় এলুম সন্ধ্যার পরে।

আজই সকালে দেশ থেকে ফিরেচি। দেশে ভারী চমৎকার কাটল, যদিও খুকু ছিল না, কেউ ছিল না। একাই পুঁটিদিদির ঘরে থাকতুম, সকালে বিকেলে নিজে খাবার তৈরী করে খেতুম, কঞ্চি কাটতুম, জল আনতুম, কাঠ ও বাঁশের শুক্‌নো খোলা কুড়িয়ে আনতুম। আর রোয়াকে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, খুকুদের বাড়ির দিকের নেবুতলার ঘাটে ফিরে সেই মেয়েটি

আসচে না বসে বসে ভাবতুম। এবার বারাকপুর একেবারেই শূন্য। তবুও বেশ লেগেচে। দুপুরের পরে ভূষণ মাঝির জমিতে একটা খেজুর গাছে ঠেস্ দিয়ে বসে লিখতুম কি পড়তুম। ছোট এড়াঞ্চি ফুলের কি শোভাই হয়েচে চারিধারে। একদিন বেলেডাঙার পথে আমি ও ইন্দু বসে কতক্ষণ গল্প করি। নীল আকাশের তলায় বটতলার কোলে সাদা বক উড়চে। আমি বসে ভাবচি কে বলেচে আপনার সুখ্যাতি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই তো শুনতে চাই।

একদিন চালকী গেলুম শিবে বাগ্দীর বাগানে রস খেতে। বড় বটগাছটার তলায় সে বসে বসে ভূতের গল্প করলে। একদিন আইনদ্দির বাড়ি গেলুম বিকেলে—তার এক ছোট নাতি বই নিয়ে আমার কাছে এল। বাড়ির মেয়েরা দেখতে লাগল, বনগাঁয়েও খুব হৈ হৈ করা গেল। রোজ রোজ ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আড্ডা। একদিন দেবেনের মোটরে সুপ্রভার চিঠি আনতে গোপালনগর গেলুন বনগাঁ থেকে—সেদিন হাজারীর বাড়ি কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার গিয়েচে অনুকূলের মেয়ের চিকিৎসা করতে। তাদের সঙ্গে খুব আনন্দ হল। এক মুচি বুড়ীকে কাপড় দিতে আসবার আগের দিন সর্ব্ব পরামাণিকের বাগান দিয়ে নেমে ওর বাড়ি গেলুম। বেশ লাগল সে সকালটা। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যায় বসে নানা গল্প হল—আগুন করে আমতলায় ন'দি ও খুড়িমা পোয়াত।

কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ী মারা গেল, আমি তখন ওখানে। তার কবর দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম। আর রাধাবল্লভ বোষ্টমের বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পরে এক সন্ধ্যায় বুড়ীকে দেখতে। তখনো সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন।

সেনেটে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্লিওরের বক্তৃতা ছিল—সেখানে খুব ভিড় হয়েচে শুনতে গিয়ে দেখি। আগের বেঞ্চিগুলো প্রতিনিধিদের জন্যে রিজার্ভ আছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে অধ্যাপককে দেখা—কাজেই আমি এগিয়ে প্রতিনিধিদের বেঞ্চি দখল করে বসলুম। কি আর করি! আমার আসনের পেছনে মেয়েদের আসন, সেখানে একটি মেয়েকে যেন সেদিন ইন্দিরা দেবীর ওখানে দেখেছি। বক্তৃতা তো শেষ হল, ভিড়ের মধ্যে আমি সেনেটের পূবদিকের হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তিনটি লম্বা-চওড়া সাহেব হলে ঢুকতে গিয়ে ঢুকবার জায়গা না পেয়ে একটা চেয়ার পেতে একপ্রান্তে বসল। আমার মনে হল এদের মধ্যে একজন সাহেব Sir James Jeans, মূল সভাপতি।

গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি স্যার জেমস্ জিন্স্?

—হাঁ।

—আপনার বক্তৃতা কবে হবে? আমি আপনার বইয়ের একজন ভক্ত। আপনার অধিকাংশ বই পড়েচি।

—বক্তৃতা হবে বুধবারে।

—বিষয় কি?

—নেবুলা।

—দার্জিলিং ও হিমালয় আপনার কেমন লাগল?

—চমৎকার।

—আপনাকে আর একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করব। আমাকে সময় দেবেন কি?

—আমার গলা ধরেচে ঠাণ্ডা লেগে। কথা বলতে কষ্ট হয়।

আমি নাছোড়বান্দা। বল্লুম—দয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন ?

—কি বল ?

—আপনার নাম কি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন কর সাইকিক্ রিসার্চেসের সঙ্গে জড়িত আছে ?

—না, কখনো না। আমি ও জিনিস বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে একটি মেমসাহেব অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এগিয়ে এল দেখে আমিও আমার পকেট থেকে মোহিত মজুমদারের পাটনার অভিভাষণখানা বার করলুম—এই একমাত্র কাগজ যা আমার পকেটে ছিল। স্যার জেম্স্ মেমটির অটোগ্রাফ লেখা শেষ করে তাকে জিগ্যেস করলেন—আমি কি তোমার এই পেনটি ব্যবহার করতে পারি ?

তারপর আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন।

সেনেট হলের মধ্যে আমিও ঢুকলুম স্যার জেমস্ জিন্সের পিছু পিছু। ওঁদের কাউন্সিলের মিটিং বসবে—ডাঃ শিশির মিত্র মঞ্চ থেকে লোকের ভিড় সরাতে ব্যস্ত। শিশিরবাবুকে বল্লুম—এঁদের মধ্যে এডিংটন আছেন ? শিশিরবাবু বল্লেন—না।

ডাঃ কালিদাস নাগ আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডাঃ এ্যালবার্ট ডেভিস মিড-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করলুম ও কার্ড বিনিময় হল। আমি তাঁরও অটোগ্রাফ নিলুম।

ভুলে আমার ফাউণ্টেন পেনটা ডাঃ মিড-এর কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেনেট্ হল থেকে বার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে গিয়ে মনে পড়ল। ফিরে এসে সেটা আবার নিলুম।

স্যার জেমস্ জিন্স্-এর সঙ্গে আলাপ করেছি ! স্মরণীয় দিন না জীবনের ?

আজ সারাদিনটি কি অপূর্ব্ব আনন্দে কাটল ! এমন দিন কটাই বা আসে জীবনে ! প্রথমে তো সকালে বিশ্বনাথ এসে বনগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনের কথা বল্লে। দেশে এমন একটা সাহিত্য-সভা হবে শুনে খুবই আনন্দ হল। সেই আনন্দ নিয়েও যদি কমল সরকার আমাদের দেশে যায়, তবে সে কেমন গান গাইবে পুঁটিদিদিদের ভাঙা রোয়াকে বসে বসে—সে কথা ভাবতে ভাবতে তো স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে বিকেলে সুধীরবাবুর দোকানে গিয়ে শুনি আজ স্যার জেমস্ জিন্সের বক্তৃতা শোনা যাবে না। কার্ড বিলি করা হয়েচে, বিনা কার্ডে ঢুকতে দেবে না, মণীন্দ্রলাল বসু ওদের নাকি বলেচে। আমি মনে ভাবলুম, এই কল্‌কাতা শহরে এমন কোন লোক নেই যে আজ আমায় Jeans-এর বক্তৃতা শুনতে বাধা দেয়। দেখি ঢুকতে পারি কিনা !

গিয়ে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ। পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়ে দেখি সেদিকেরও দরজা বন্ধ। তখন পূর্ব্বদিকের দালানের কোণের দরজা খোলা দেখে সেখান দিয়ে ঢুকলুম। দেখি অত বড় হলে মাত্র ছ'জন প্রাণী উপস্থিত। একজন তার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান জগতের লোক সুধাংশু। সে আমায় ডাক্‌লে। তার কাছে গিয়েই বসলুম। কিছু পরে সোমনাথবাবু সস্ত্রীক এলেন। ডাঃ সুশোভন সরকার এলেন, আমাকে দেখে পাশে এসে বসলেন। একটু পরে ভীষণ ভিড় জমে গেল। দরজা সব বন্ধ, দরজায় লোক ধাক্কা মারতে লাগল। ভিড় ঠেলে দেখি হুটু আসচে। হুটু সামনের দিকে গেল। বি. এম. সেন মাইক্রো-ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—Ladies & Gentlemen, Sir James Jeans has arrived and I am only testing the microphone—একটা খুব হাসির রোল উঠল। একটু পরে জিন্স্ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। যখন সে শ্লাইড্‌খানা পড়ে পর্দ্দায় আমি অমনি বলি ওরায়ণ, নেবুলা, এটা এড্রোমিডা, সিফিড্ ভেরিয়েবল্‌স্-এর কথা Jeans তুলতেই সুশোভনবাবুকে

বল্লুম। নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পেছনের সন্ধ্যার আকাশে দূরে একটা গ্রামের এক মেয়ে বলেছিল—আপনার সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগে—সেই কথা, সেই বাঁশবন, সেই বকুলতলা, সেই ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা নির্জ্জন মাঠ—বার বার মনে হচ্ছিল—আর মনে হচ্ছিল শিবুর বাবাকে। আজ ফি-এর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি—শিবুর ম্যাট্রিকের ফি, গরীব লোক, কাল হাটবেলা, পিয়নে যখন টাকা দেবে, কি খুশিই হবে। পশুপতিবাবু যে কাল ফোনে বলেছিল—আপনি মিডিয়ম ভালোই, তামার তার ভিন্ন কি বিদ্যুৎ চলে? খুব ভাল কথা।

বক্তৃতা অন্তে কালিদাস নাগ ও সেই পরশুকারের এ্যাল্‌বার্ট ডেভিস্ মিডের সঙ্গে দেখা। কালিদাসবাবু বল্লেন—রবিবার দুপুরে কোন এনগেজমেণ্ট নেবেন না, বিভূতিবাবু।

আমার বোধ হয় উনি কোন পার্টি দেবেন বৈদেশিক ডেলিগেটদের।

বাইরে আসবার পূর্ব্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা। বল্লুম—মেঘনাদদা, ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?

ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি জিন্‌স্-এর বক্তৃতার সেই কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্নিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়ল। সেও এই শীতকালে। তখন কোথায় কি? কোথায় সুপ্রভা, কোথায় খুকু, কোথায় আমি! সুপ্রভার কথা বড্ড মনে হচ্ছে। যদি এ সময়ে সে আসত! যখন যে মেয়ে হলে ঢোকে, তখনই আমি দেখি সুপ্রভা যদি তাদের মধ্যে থাকে!

নীরদবাবু ও কান্তিবাবু রাস্তা পার হচ্ছেন, বল্লেন—কত খুঁজলাম আপনাকে। সোমনাথ-বাবুর মুখে শুনলুম আপনি এসেচেন। কাল যাবেন ঠিক সাড়ে চারটার সময়—'বিচিত্রা' সম্পর্কে পরামর্শ আছে।

সুধীরবাবুর দোকান হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়িতে বসে আশু সান্যাল ও রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে বাসায় এসে দেখি সুপ্রভা পত্র লিখেচে। সে আসচে ২৫শে জানুয়ারী কল্‌কাতায়। কি আনন্দ যে হল! এখন যদি আসে তবে তো! তার কথার কোন ঠিক নেই।

Eddington-এর বক্তৃতায় সেনেটে বড় কড়া ব্যবস্থা ছিল। ও দুদিন খুব ভিড় ছিল বলে এ ব্যবস্থা এরা করেচে। দিনগুলো বড় ব্যস্ততা ও engagement-এর মধ্যে দিয়ে কাটচে। Dr. Fisher-এর সঙ্গে সত্যেন বোসের তর্কযুদ্ধ সেদিন বেশ উপভোগ করা গেল বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজ সকালে সজনীর বাড়ি থেকে সাড়ে ন'টার সময় আসচি, দেখি খুব ভিড় সেনেটে। ঢুকে দেখি লর্ড হারবার্ট স্যামুয়েলের বক্তৃতা হচ্চে, বিষয় 'Basis of Philosophy', Sir James Jeans সভাপতিত্ব করচেন—তারপর জিন্‌স্‌কে ভলান্টীয়ারেরা ঘিরে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে—ওদিকে বক্তৃতা-মঞ্চে লর্ড স্যামুয়েলকে বহুলোক ঘিরেচে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরে, অটোগ্রাফের জন্যে। জিন্‌স্ অনেকক্ষণ মোটরে বসে ডাঃ কমল মুখার্জ্জির সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলবার পরে মোটর থেকে নেমে লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড স্যামুয়েলকে বল্লেন—I will see you after lunch, এইটুকু মাত্র আমার কানে গেল। তারপর লর্ড স্যামুয়েল গবর্নরের মোটরে চলে গেলেন। বহু লোক জড় হয়েছিল সেনেটের সামনের রাস্তায় এঁদের দেখবার জন্যে।

দুটো বিষয়ে দুটো অদ্ভুত গোলযোগ ঘটল দিন কয়েকের মধ্যে, তাই সেটা এখানে লিখে

রাখলাম। প্রথম কথাটা আগে বলি। ১৯১৩ সালে যখন আমি বনগাঁয়ে বিধুবাবুর ওখানে থাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, তখন নতুন 'ভারতবর্ষ' বেরুল। মন্মথবাবু মোক্তার আমাকে তখন 'ভারতবর্ষ' পড়তে দিতেন। 'ভারতবর্ষ-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নতুন লেখকের গল্প পড়ে অল্প বয়সেই মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, এমনধারা লেখক তো কখনো দেখি নি—কত তো গল্প পড়েছি। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েচে, যাক্।

গত রবিবার সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করচি অনেকে—এমন সময় অপূর্ব্বর ছেলে অরুণ একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা হাতে দিয়ে বল্লে—শরৎবাবু মারা গিয়েচেন, এই যে কাগজ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কাগজখানায় বেরিয়েচে, রবিবারে তিনি বেলা দশটার সময় মারা গিয়েচেন।

কি যোগাযোগ তাই ভাবি। কত জায়গায় বেড়ালুম, কত দেশে গেলুম, কত লোকের বৈঠকখানায় বসলুম—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কোথায় পেলুম—না সেই বনগাঁয়ে, সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায়, যে আমায় অত বছর আগে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল!

ভাববার কথা নয়?

এইবার অন্যটার কথা বলি। সেটা ঘটলো আজ এখুনি, এই সন্ধ্যার সময়।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে দিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সে এখনও আছে বেঁচে, তবে ওখানকার হোটেল সে আজ ১৫।১৬ বছর উঠিয়ে দিয়েচে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখাশোনা হয়।

এখন এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দ্দিন—হাতে নেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম—কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে। জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি, চাটগাঁ, কুমিল্লা, ভাগলপুর, মুঙ্গের নানাস্থানে—কোথায় বা না গিয়েচি চাকরি নিয়ে? বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে আবার যখন এইখানেই চাকরি নিলুম, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় সুন্দর ঠাকুরের হোটেলের ঘরটা প্রায়ই চোখে পড়ত। ভাবতুম পুরোনো দুর্দ্দিনের কথা। ওই ঘরটায় সেদিন আমার সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো—না ভেবে পারিনে।

আজ একটা বালিশের খোলে তুলো ভর্ত্তি করার দরকার হল। পাটনায় বক্তৃতা আছে শনিবার, সেখানে যেতে হবে, অথচ বালিশ নেই। মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে এক জায়গায় একটা তুলোর দোকান। দোকানে বসে তুলো ভর্ত্তি করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে নজর করে দেখলুম এটা সেই পুরোনো দিনের সুন্দর ঠাকুরের সেই হোটেলের ঘরটা। আজ সেখানে তুলোর দোকান হয়েচে।

মনে পড়ল এও জানুয়ারী মাস এবং ১৯১৯ সালের পরে আজ এই প্রথম আবার সেই ঘরটাতে ঢুকে বসলুম। তারপর ফিরে আসচি হঠাৎ মনে পড়ল বালিশের খোলটা সুপ্রভা তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। কি অভাবনীয় যোগাযোগ।

কাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেন অত্যন্ত দেরিতে এল। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি। একে তো বেজায় শীত, তার ওপর কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে দূর মাঠের মাথায়। ট্রেনের জানালা খুলে সেই শীতের মধ্যেও হাঁ করে চেয়ে আছি। সৌভাগ্যের বিষয় একটা কামরা আমরা একেবারে খালি পেয়েছিলুম, অরবিন্দ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক (অত্যন্ত সুপুরুষ লোক, আমি অমন সুপুরুষ খুব কমই দেখেচি) সপরিবারে পশ্চিমের দিকে যাচ্চেন, তাঁরাই কেবল ছিলেন আমার কামরাতে, আর কেউ নয়। একখানা পুরোনো ডায়েরী ছিল আমার কাছে বাবার, তাতে পড়ে দেখা যায় —বাবা ১২৮৭ সালের দিকে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে এই পাটনা, মুঙ্গের, আগ্রাতে এসেছিলেন।

ভোর হল শিমূলতলা স্টেশনে। আর বছর যখন পাটনা আসি, আমি, সজনী, নীরদ, ব্রজেনদা—ভোর হয়েছিল কিউল স্টেশনে। অরবিন্দবাবুটি অতি ভদ্রলোক, আমাকে খাবার খেতে দিয়ে বল্লেন—একটু মিষ্টিমুখ করুন। অথচ তিনি আমায় জানেন পর্যান্ত না।

রৌদ্র উঠল কিউলে। বিহারের দূরবিপর্সী প্রান্তর, অড়রের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেত, খোলার বাড়িওয়ালা গ্রাম, চালে চালে বসতি, ইঁদারা, ফণি-মনসার ঝোপ, মহিষের দল আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। শিমূলতলায় পাহাড়ের শোভা যদিও তেমন কিছু দেখলুম না, তবুও শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সাঁওতাল পরগণার উচ্চাবচ প্রান্তর ও ছোটখাটো পাহাড়রাজি দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গেলুম যে ঘুম কিছুতেই এল না।

পাটনা স্টেশনে মণি ও কলেজের ছাত্রেরা নামিয়ে নিতে এসেচে। তার আগে বক্তিয়ারপুর স্টেশনে কালা ও পশুপতি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল দেখা করবার জন্যে। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হল। মণিদের বাড়ি আসবার কালে মোটরটা বড় ঘুরে এল—কারণ এক জায়গায় রাস্তায় পিচ্‌ দেওয়া হয়েচে নতুন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লে, এ জায়গা ভাল লাগচে না, বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করেচে, ওর কি ভাল লাগে এসব জায়গা?

মণিদের ছাদের ওপরে দুপুরের নীল আকাশের তলায় বসে এই অংশ লিখচি। সুপ্রভাকে একটা চিঠি দেব। দূরে তালের সারির মাথায় অনেকটা দূর দেখা যাচ্চে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে সুদূর বাংলার একটি সজ্‌নে ফুল বিছানো পল্লীপথের কথা মনে পড়চে, একটি সরলা পল্লী বালিকা এ সময়ে কি করচে সে কথাও ভাবচি।

ছাদের ওপর যোগীনবাবুর দুই নাতনী খেলতে এসেচে আর বলচে—

চু কপাটি আইয়া
যাকে পাবে ভাইয়া···

এ কি রকম খেলার ছড়া? বাংলাদেশে তো এ ছড়া কোন ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি!

পাটনা কলেজের হলে মিটিং। সেখানে অনেকদিন পরে অমরবাবুকে দেখে বড় আনন্দ পেলুম। সেই ভাগলপুরের অমরবাবু! ইনি শুনলুম এখন এখানে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী, কিছুদিন আগে এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্‌ ছিলেন। তারাশঙ্করও উপস্থিত ছিল, ও আজকাল এখানেই থাকে মামার বাড়িতে। সভায় টেবিলে বাবার পুরোনো ডায়েরীখানা পড়ে দেখছিলুম তিনি পাটনায় এসেছিলেন কবে। ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়ে সভা থেকে উঠতে হল, তারাশঙ্করকে সভাপতির আসনে বসিয়ে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমরবাবু। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার পিছু পিছু এসে বল্লেন—একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে, আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ,

আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটি দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোকে দুঃখিত।··· একটি ছেলে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে, একবার দুবার। একবার যখন করলে, তখন আমি ওর দিকে চাই নি। আবার যখন করলে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলুম। বল্লুম—তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ও বল্লে—বাড়ি ভাগলপুরে। আমি নবীন গাঙ্গুলীর নাতি। তখন তো আমি অবাক্। ওদের বাড়ি কত গিয়েচি ভাগলপুরে থাকতে সে কথা বলি। তিনকড়িকে চেন? বলতেই বল্লে—হাঁ, তিনি আমার মেসোমশায়।

অমরবাবুর মোটরে মণিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম মণিদের বাড়িতে। ইন্দু যে কোথায় ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে, খুকু যে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে ভুগচে, কেবল এই সব কথা মনে পড়ে: মণির বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে অমরবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের দিনের গল্প করি। মোটরে আসতে আসতে তিনি মণিকে ক্ষীরোদবাবুর অশরীরীরূপে ঘরে উপস্থিত থাকার সেই পেটেন্ট গল্পটি করলেন। আমি তো শুনে অবাক যে গত বছরের সেই সুদর্শন যুবক প্রীতি সেনই ক্ষীরোদবাবুর ছেলে। কি সব অভাবনীয় যোগাযোগ! এবার প্রীতি সেনকে না দেখে দুঃখিত হয়েচি।

অমরবাবুর গাড়িতেই স্টেশনে এলুম। মণি শেষ পর্য্যন্ত রইল। কত পুরোনো দিনের গল্প হল অমরবাবুর সঙ্গে। ওর সাদর আলিঙ্গনটি বড় বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্রেনে বক্তিয়ারপুর নেমে কালীদের বাড়ি এসে দেখি সে কোথায় থিয়েটারের রিহার্সেলে গিয়েচে। একটু পরেই এল। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প হল। ঠিক হল কাল রাজগীর যাওয়া হবে সকালের ট্রেনে।

কালী ও কালীর মামাশ্বশুর আমার সঙ্গেই ছিল। শো স্টেশনের একটা জায়গা দেখিয়ে কালী বল্লে—ওখানে আমাদের 'রসচক্র' সভা হয়েছিল, আমি একটা কবিতা পড়লুম। আমি বল্লুম—তুমি কবিতা লেখো নাকি? বল্লে—শোনাব এখন। বাড়িতে আছে। আহা, ওরা সভা-সমিতিতে যেতে পারে না, এক-আধটু হলে কি খুশিই হয়।

Ignominy thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো!

চেরো, হরনৌৎ—এই সব স্টেশনের নাম। অপকৃষ্ট ও নোংরা বিহারের বস্তি। ধুলো, ধুলো—সর্ব্বত্র ধুলো। ধুলো-পড়া পেঁড়া, খোয়া ক্ষীর (এদেশে বলে মেওয়া) ও তিলুয়া বিক্রী হচ্চে দোকানে। এক ঘরের দেওয়ালের গায়ে আর এক ঘর বাড়ি তুলেচে।

শো স্টেশনে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ বলে একজন হিন্দি গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হল। লোকটিকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার মত লোক এ সব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময়ে তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করে-ছিলেন।

রাজগীরের শৈলমালা দূর থেকে ধোঁয়ার মত দেখা গেল। কিছু পরেই বিহার-শরিফ্ ও নালন্দা। নালন্দা থেকে ট্রেন ছাড়লে দূর থেকে স্তূপ ও বাড়িঘর দেখা গেল। এবার আর নালন্দা যাওয়ার সময় হল না।

রাজগীর নেমে পাহাড় জঙ্গলের পথে সোন ভাণ্ডার গুহায় চলে গেলুম। বুদ্ধের চরণরজপূত এই স্থান। ঐ গুহায় বুদ্ধদেব সমাধিস্থ ছিলেন, পাশের গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ ধ্যানস্থ ছিলেন।

এই পাহাড়টার নামই গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূটের ওপরে কাঁটাগাছপালা ঠেলে অনেকটা উঠলুম। এক জায়গায় পাথর ঠেস্ দিয়ে যুৎ করে বসলুম। ঠিক দুপুর, নির্মেঘ, নীল আকাশ। দূরে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা খোদিত একটা স্তূপ বা চৈত্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আমি সেটা দেখতে গেলুম, কালী পাথরের নুড়ি কুড়ুতে লাগল। আমি চৈত্যটি দেখে ফিরবার সময় বাঁশবনের ছায়ায় ঝরণার স্রোতের ধারে খানিকক্ষণ বসলুম। ওরা ততক্ষণে চলে গিয়েচে। এখানেই সেই করন্ত বেণুবন, যেখানে বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ সূত্র বিবৃত করেন আনন্দকে। কালের কুয়াসায় সব ঢেকে মুছে একাকার হয়ে গিয়েচে···কোথায় কি আজ! আড়াই হাজার বছর আগেকার মত বেণুবন কিন্তু রাজগীরের উপত্যকায় অজস্র। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হল। তারপর আমি একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে ছায়ায় বসে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম—হঠাৎ মনে পড়ল আজ গোপালনগরের হাট, বেলা তিনটে, সাড়ে-তিনটে—এতক্ষণ বটতলা দিয়ে কত লোক হাটে চলেচে।

ফিরবার পথে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে এসেচে বড় বড় মাঠে। একজন চৈনিক লামা আর একজন লামাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে কি একটা বাজনা বাজাচ্চে ট্যাং ট্যাং করে, আর কেবল ঘাড় নীচু করে প্রণাম করচে। সে ভারী সুন্দর দৃশ্য! ট্রেন ছেড়ে গেলেও অনেকদূর পর্য্যন্ত বাজাতে বাজাতে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে এল।

বক্তিয়ারপুর পৌঁছে একটি ছোকরা তার কবিতা শোনাতে বসল। গাড়িতে তার লেখা কবিতা দু'তিনটা শোনালে। সাহিত্যপ্রীতি ওদের বেশ প্রশংসনীয়—তবে দূর বিহারের দেহাতে কে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে আর কে-ই বা ওদের কবিতা ছাপাচ্ছে!

রাত্রের ট্রেনেই কল্‌কাতা রওনা হলুম, দানাপুর এক্সপ্রেসে। সারা রাত্রি ঘুম এল না। একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—উঠে দেখি জসিডি স্টেশন। তারপর আবার শুয়ে পড়লুম—ভাঙা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইচে, জানালা দিয়ে মুখ বার করলে মুখে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটে। কুয়াসা হয়েচে, বনগুলো যেন ঠিক ইসমাইলপুরের সেই বন—অনেক রাত্রে উঠে এই শীতের সময় ইসমাইলপুর কাছারীতে ঠিক যেমন বন দেখতুম, তেমনি দেখাচ্চে।

পাটনা থেকে এসে মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। মধ্যে সুপ্রভা কলকাতা এল ওর মা-বাবার সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে 'মুক্তি' দেখতে গেলুম 'চিত্রা'তে। ভাল লাগল না কারো, সেবা ও রবি ছিল সঙ্গে। তারপর আমার পড়ে গেল বনগ্রামে সাহিত্য-সম্মেলনের হুজুগ। বিশ্বনাথ এখানে খুব যাতায়াত করলে। খগেন মিত্র মহাশয় সভাপতি হয়ে গেলেন এখান থেকে, রমাপ্রসন্ন ও গৌর পাল গেল, খুব হৈ হৈ কাণ্ড হয়ে গেল সরস্বতী পূজোর সপ্তাহে। সাহিত্য-সম্মেলন থেকে আমায় আবার দিলে একটা মানপত্র ও অভিনন্দন।

পরের সপ্তাহেই পড়ে গেল কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলন। আমি ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেলুম। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, কোকিল ডাকচে, শীত যদিও বেশ, কিন্তু বসন্তের আমেজ দিয়েচে। বাড়ি গেলুম, পাড়ায় কেউই নেই এক ন'দি ছাড়া। নিজের খড়ের ঘরটিতে দুপুরে শুয়ে খুব ঘুম দিই। আগের রাত্রে যতীনকাকার মেয়ে উষার গিয়েচে বিয়ে। তখনও বরযাত্রীরা রয়েচে। যতীনকাকার মেয়ের বিয়ে দেখচি চিরকাল। ঐ একই চণ্ডীমণ্ডপে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে গাছে গাছে পাকা কুল খেয়ে বেড়াই। ভূষণ জেলের ছেলের জমিতে খেজুর গাছটা ঠেস দিয়ে বসে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক অধ্যায় লিখি। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দুর

বাড়িতে সেদিনকার মিটিং ও আমার মানপত্র দেওয়া সম্বন্ধে খুব কথাবার্ত্তা হল। ইন্দু বল্লে—আজ যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকতেন!

সকালে টুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলার টুকো খেলত আমার ছোট বোন মণির সঙ্গে। সে আজ ১৫।১৬ বছর পরে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেচে। এসে আমায় নমস্কার করলে—ওর মুখ ভুলেই গিয়েছিলুম—এখন দেখে মনে হল—হাঁ, এ মেয়েকে আগে দেখেছিলুম বটে।

পরদিন সকালে নটার ট্রেনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে গেলুম। গাছে গাছে শিমুলফুল ফুটে লাল হয়ে আছে। সজনী, অমল বোস, সুনীতি বসু, প্রবোধ সান্যাল, বিজয়লাল সকলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর স্টেশনে দেখা। অতুল গুপ্ত ও যামিনী গাঙ্গুলী একখানা মোটরে আসছিলেন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাতেই আমায় উঠিয়ে দিলেন। মনোমোহন ঘোষের যে বাড়িতে আজকাল কলেজিয়েট স্কুল, ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢুকেই দেখি প্রবোধ সান্যাল বসে খাচ্চে। আমি ও ইউনিভার্সিটির প্রিয়রঞ্জনবাবু একসঙ্গে খেতে বসে গেলুম। খেয়েই সভাস্থলে যাই। প্রমথ চৌধুরী সভাপতি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাটমন্দিরে সভা বসেচে। কখনও এর আগে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকিনি—যদিও এর আগে বাল্যকালে একবার কৃষ্ণনগর এসেছি। তার অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। আর বছর-দুই আগে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে এসেছিলুম আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে, সে কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণনগরে বাবার সেই মা—আমাদের আলুভাতে ভাত খাওয়ানো—আমার হতাদর—কত কথাই মনে পড়ে। সেই আর এই! সে গল্প আর একদিন করব।

কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাত্রে রাণাঘাটে এসে খগেনমামার বাড়িতে রইলুম—তাও সেই বাল্যে ওদের বাড়ি শুয়েছিলুম, আর কখনও থাকিনি। একটা সরস্বতীঠাকুর বিসর্জ্জন দিতে গেল শোভাযাত্রা করে অনেক রাত্রে। বেজায় শীত পড়ল রাত্রে!

পরদিন এলুম এগারোটার ট্রেনে গোপালনগরে। স্টেশনে আবার খগেন মিত্র ও প্রভাত-কিরণ বসুর সঙ্গে দেখা। রেস্তোরাঁতে বসে চা খেতে খেতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল অনেকক্ষণ।

দেশে গিয়ে বেশ লাগল। তখনি ন'দির কাছে একটু তেল চেয়ে নিয়ে নদীতে স্নান করে এলুম। ওপাড়ার সেই কুমুরণী ক্ষার কাচছে। শুক্‌নো ফুল পড়ে আছে কত বনসিমতলার ঘাটে। পরশু কতক্ষণ ঘাটে বসেছিলুম, বনের কুল পেকেচে একটা ডালে, দরিদ্র পল্লীজননী আর কি দিয়েই বা আদর করবেন? তবুও কত স্মৃতি জড়ানো রয়েচে এই বনসিমতলার ঘাটের সঙ্গে! খুকু ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করত নেয়ে উঠে—এই তো সেদিনও।

সেদিন এসে খুব ঘুমুলাম দুপুরে। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। চড়কতলায় এসে বসলুম, মুসলমান মাস্টারটি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে পড়েচে অম্‌নি। চাচা এসে আগুন করলে ও বক্‌ বক্‌ শুরু করলে। ইন্দু রাত্রে একটি বিদেশী পথিক সেদিন কেমন করে শিউেতলার মাঠে বেঘোরে মারা গিয়েছিল—সে গল্প করলে। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পরদিন সকালে সীতানাথ জেলের নৌকাতে বনগাঁয়ে চলে এলুম। ভেবেছিলুম খুকুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব—কিন্তু ঘটে উঠল না। রাত্রে খুব চমৎকার জ্যোৎস্নায় মন্মথবাবুর বাড়ি বসে হরিবাবু, যতীনদা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া গেল। বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নীর প্রসাদ পাওয়া গেল।

সেখান থেকে এসে কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে।

নগেন বাগচীদের যে বাড়িটাতে থাকতুম—অনেক দিন সে বাড়ির সে ঘরটার পথ বন্ধ ছিল। আজ ফুলির ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরটার সে বারান্দাতে গিয়ে বসি। এইখানেই আমার মা মারা যান। তারপর কতকাল এ বাড়িটাতে আসিই নি। এইখানেই বালাক কবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সতেরো বছর আগে—যে আমায় প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

ফিরে এসে ফুলিদের উঠোনে মাচাতলার উনুনে ওরা পরোটা ভাজতে বসল—আমি একখানা বেলে দিতে গেলুম—হল না। ফুলি ও বৌমা তো হেসেই কুটিপাটি। তারপর বৌমা বেলে দিতে লাগল—আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। সুন্দর লেবুফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

জ্যোৎস্নার মধ্যে কাল রাত্রেই কলকাতায় ফিরি। বেগুন আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল একেবারে মেস্ পর্য্যন্ত। কত ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এ দিনগুলো কাটল!··· না?···

সাধে কি বলি ভগবানের দান এ জীবন, যে জানে ঠিক মত এর স্বাদ গ্রহণ করতে, সে জানে এ কি মধু!

আর বছর ঠিক এইদিনে পুরী যাওয়া হল না বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবার ঠিক এব দিনেই বেশ কাটল। শনিবার সুপ্রভা আসবে বলে পত্র পেলুম, বিকেলে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ পেলুম তাতে জানা গেল ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠেছে। দেখা করতে গেলুম ও তারপর কার্জন পার্কে বেড়াতে গেলুম ওকে নিয়ে। পরের দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে ইডেন গার্ডেনে খানিকটা বসে কত গল্প করলুম। কিন্তু সকলের চেয়ে আনন্দ হল ওকে তুলে দিতে গিয়ে স্টেশনে। কেউ জানত না যে আমি স্টেশনে যাব—আমি একটি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম। ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেলেও কতকক্ষণ বেঞ্চিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কত ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতি! ভাবুকতা জীবনের খুব বড় একটা সম্পদ। এ যার নেই, সে সত্যিই দরিদ্র। টাকায় কি করে?

শেয়ালদ' স্টেশনে আমার কল্যকার সেই দশ মিনিটের দাম অর্থে নিরূপিত হবার নয়।

বসন্তটা এমনভাবে ভাল করে দেখিনি অনেকদিন। শিবরাত্রির ছুটিতে এবার গেলুম বারাকপুরে। কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে চালকীর মুসলমান পাড়ার ওই কাঁচা রাস্তাটার ধারে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের! তার ওপর নদীর ওপারে, ঠিক গাজিতলার পথের বাঁকে একটা চারা শিমুলগাছে ফুল ফুটেচে, আমি যখন বারাকপুরে যাচ্চি তখন দুপুর রোদ। কি অদ্ভুত যে দেখাতে লাগল সেই ঝম্ ঝম্ দুপুরে ওপারের সেই ফুলে ভর্ত্তি শিমুলচারাটা! অপ্রত্যাশিতভাবে গিয়ে দেখি খুকুরা ওখানেই আছে। অনেক দিন পরে এখানে ওদের পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল। আমি ন'দিদিদের রান্নাঘরের দাওয়ায় জল খেতে গিয়েচি, ও দাঁড়িয়ে আছে পুঁটিদিদিদের উঠোনে। বল্লুম—কি রে! তারপর ওদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম। দুপুরে ওদের রান্নাঘরে বসে পোলাও বিষয়ে একদিন বল্লুম। শিবরাত্রির দিন ন'দিদিদের ঘরে ওদের কাছে শিবরাত্রি ব্রতকথা শোনালুম। ট্যাংরার মাঠে ইন্দুর সঙ্গে একদিন কুল খেতে গেলুম—বড় খোলা মাঠ, দিক্‌চক্রবাল বড় দূরবিসর্পী, একটা ঢিবির কাছে বসে সেদিন সূর্য্যাস্ত দেখলুম। ঘেঁটুফুল এখনও খুব ফুটেচে। গণেশ মুচি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েচে, ট্যাংরার ধারে গরু চরাচ্ছিল। লেবুতলার ওই পথে অনেকদিন কেউ আসেনি, যখন রোয়াকে বসে থাকি, এইদিন দেখলাম নীল

শাড়ি পরে আসতে ওই পথটাতে বহুদিন পরে!

গত শনিবার সাউথ গড়িয়া গ্রামে বেড়াতে গেলাম বোধহয় পনেরো বছর পরে। ভূতনাথ এখানে থাকতে আমি এখানে এসেছিলুম, সে কি আজকার কথা? বড় রোদ পড়েচে, বারোটার ট্রেনে ওখান থেকে রাজপুর এলুম। ছুলিদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনের তলায় কেমন ছোট ছোট ঘেঁটুগাছ। বেশ লাগে ওই বাঁশবনের মধ্যের জায়গাটা।

আজ গিয়েছিলুম নীরদবাবুদের মোটরে গড়িয়া গ্রামের একটা ভাঙা শিবমন্দিরের ধারে। জ্যোৎস্না উঠেচে খুব, ভাঙা মন্দির আর একটি প্রাচীন বটগাছ—পটভূমিকা বেশ চমৎকার। বেশ লাগল আজ জ্যোৎস্নাটা। কতক্ষণ বসে গল্প করলুম।

গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে আরম্ভ করে কি ঘোরাই গেল ক'দিন! প্রথম তো শুক্রবার আসাম মেলে রংপুর রওনা হলুম সেখানে সারস্বত-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। দুপুরের রোদ বেশ বাড়চে—পথে পথে ঘেঁটুফুলের শোভা—সারা পথেই ঘেঁটুফুল দেখতে দেখতে চলেছি। নৈহাটির কাছাকাছি এসে মনে হল আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশী দূর নয়—সোজা গেলে হয়তো বিশ মাইলের মধ্যে। এই দুপুর রোদে আমাদের পাড়ার সবাই যে যার ঘরে ঘুম দিচ্চে হয়তো। রাণাঘাট স্টেশনে ইসাহাক মাস্টার উঠল ট্রেনে, ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গল্প করতে করতে গেল। ক্রমে বেলা পড়তে লাগল। আমি দূরে এক গ্রামের একটি মেয়ের জীবনযাত্রার ছবি দেখি এই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্নে, হয়তো তাদের শিউলিতলা দিয়ে পাড়া বেড়াতে চলেছিল, হয়তো নিজেদের দাওয়ায় বসে গল্প করে, কি বই পড়ে। কোথায় সার্কাস হয়েছিল। সার্কাস উঠে গিয়েচে আজ ৩।৪ মাস—বলে, একবার ভেবেছিলুম খুব বেড়িয়ে আসা যাক্ সার্কাসে—তা সার্কাস গেল উঠে। ওদের কথা দুঃখ হয় ভাবলে। শিলং মেলে সুধাংশু ডাক্তারের দাদা হিমাংশুর সঙ্গে দেখা, সে থাকে কুড়িগ্রামে। চমৎকার জ্যোৎস্না রাত—এবার আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল এই পক্ষের জ্যোৎস্নাটুকু নিংড়ে খালি করে উপভোগ করব। রংপুর স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে প্রবোধবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠলুম। গিয়ে শুনি ওঁরা আমার স্টেশনে নিতে এসেছিলেন, কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি নাকি। পরদিন সকালে সভার অধিবেশন হল টাউন হলে। প্রিন্সিপ্যাল ডি. এন. মল্লিকের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কলকাতা ছাড়বার পরে তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয় নি—সে আজ চোদ্দ-পনেরো বছরের কথা। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েচে—এখন এখানে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সভার পর দুপুরবেলা প্রবোধবাবুর সঙ্গে মোটরে বার হয়ে কলেজ বেড়িয়ে এলাম। অত বড় কলেজের বাড়িটা বাংলাদেশের অন্ত কোন কলেজে নেই বলেই আমার ধারণা। ছাদে উঠে দুপুরবেলা চারিদিকে চেয়ে বেশ লাগল। কলেজ কমপাউণ্ড খুব ফাঁকা। তাজহাট রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের বড় বৈঠকখানায় আমরা সবাই বসে রইলুম—অনেকগুলো ভারী সুন্দর হাতীর দাঁতের চেয়ার দেখলুম—যেমন অনেক বছর আগে আগরতলার রাজপ্রাসাদে দেখেছিলুম—আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স—প্রায় আজ চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। আবার বিকেলে টাউন হলে সভায় আসবার আগে মাহিগঞ্জে ৺রবি মৈত্রের বাড়ি যাওয়া গেল। রবি থাকতে কতবার আসতে বলেছিল, কখনো যাওয়া হয় নি, আজ সে নেই ভেবে কষ্ট হল। রবির দুই দাদাকে দেখতে অনেকটা তারই মত যেন। মাহিগঞ্জ থেকে আসতে পথের দুধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ—এখানে 'চোৎরা গাছ' বলে—বিছুটি গাছ, পাতা গায়ে লাগলে সাংঘাতিক জ্বলে।

বৈকালে সভার সময়ে যখন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, আমি, জনৈক অধ্যাপক অমূল্য

বসু টাউন হলের সামনে মাঠে ঘাসের ওপরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বসেছিলুম—আমি তো দূরের আকাশ দিয়ে পূর্ব্বদিকে সব সময়ই চেয়ে। কতদূরে কোথায় কে কি করচে, সেই চিন্তাতেই ভরপুর। সভান্তে জ্যোৎস্নারাত্রে রায় বাহাদুর বসন্ত ভৌমিকের বাড়ি চা-পার্টি। খুব গোলাপ ফুটেচে বসন্তবাবুর বাগানে। তিনি আমাকে তাঁর পড়ার ঘর দেখালেন—বেশ সাজানো, আর অনেক বই আছে। এদেশে ঘর তৈরী করার পদ্ধতি আমার বেশ সুদৃশ্য লাগল। প্রবোধবাবুর বাড়িতেও আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করে বসন্তবাবু মজ্‌লিশ জমিয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে আবার সভা। দুপুরে একটু ঘুমুই। বৈকালের দিকে শহরের কয়েকটি গণ্যমান্য ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বৈকালে সভার সময় মোটর থেকে নেমেই দেখি ভিড়ের মধ্যে থেকে জেলি ও পাগ্‌লা আমাদের গাঁয়ের দেখা করতে ছুটে এল। ওরা এখানে লালমনিরহাটে রেলে কাজ করে, আমি এখানে এসেচি শুনে লালমনিরহাট থেকে দেখা করতে এসেচে। সভার পরে প্রবোধবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্টেশনে রওনা হলুম। শহরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমায় তুলে দিতে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, পূর্ব্বদিকের আকাশও খুব উজ্জ্বল। গরম একেবারেই নেই। পার্ব্বতীপুরে গাড়ি বদল করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মা দেখে বড় ভাল লাগল। ভোর হল রাণাঘাট স্টেশনে—তখনও আকাশে নক্ষত্র রয়েচে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান করে বসে আছি, এমন সময় নীরদবাবুর ড্রাইভার এসে খবর দিলে গাড়ি এসেচে। নীরদবাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমার সেই সঙ্গে যেতে হবে। তখনি জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডি পৌঁছলো। পথে খড়্গপুরের পরে উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুম এল না চোখে।

বহুদিন পরে আবার নামলুম গালুডি—আজ বছর তিন-চার আসিনি—১৯৩৪ সালের পুজোর পর আর কখনো আসিনি। তবে সে গালুডি এখন অনেক বদলে গিয়েচে। নেকড়েডুংরি পাহাড়টা ছাড়া, তার নীচেকার সে চমৎকার শালচারার জঙ্গলটা অদৃশ্য। কে পাথর কেটে নিয়ে যাচ্চে পাহাড়টা থেকে, রোজ সকালে একদল গরুর গাড়ি এসে পাথর কেটে বোঝাই করে নিয়ে যায়—পাহাড়টা এবার গেল। এদিকে কারো জ্ঞান নেই যে ওটা চলে গেলে গালুডির একটা beauty spot চলে যাবে।

অপরাহ্নে সুবর্ণরেখা পার হয়ে কুমীরমুড়ি গ্রামের জঙ্গলে বসে রইলুম কতক্ষণ। প্রথমে যাচ্ছিলুম রাখা মাইন্‌স্‌-এ। কিন্তু বেলা গিয়েচে দেখে ভরসা হল না। এক জায়গায় ধাতুপ ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম—কাছেই একখানি বড় পাথর। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটা গোলগোলি ফুলের গাছে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। সেখানে ঢুকে দেখি বনে লতানে পলাশ গাছে পলাশ ফুটেচে, তা ছাড়া এক রকম বন যুঁই-এর মত কি ফুল ফুটেচে কামিনী ফুল গাছের মত গাছে। মোরাম্ ছড়ানো মাটি—ঠিক যেন কয়লার টুকরো ছড়ানো পড়ে রয়েচে। বসে বসে মনে হল কাল ঠিক এ সময় রংপুরে টাউনহলের ক্লাবঘরে বসে চা খাচ্চি—আর আজ এ সময় সুবর্ণরেখার ধারের বনে! কোথায় ছিলুম কোথায় এসেচি! চাঁদ উঠেছে ঠিক সেই গোলগোলি ফুলগাছের পেছনে। প্রকাণ্ড গাছটা—আমাদের দেশের একটা মাঝারি গোছের আমড়া গাছের মত। ফুলগুলো অনেকটা দূর থেকে দেখতে সূর্য্যমুখী ফুলের মত। কতক্ষণ বসে রইলুম, তারপর জ্যোৎস্না ফুটবার পূর্ব্বেই লতানো পলাশের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডি চলে এলুম।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না। বাংলার বাইরে ভিন্ন এ ধরণের ছায়াহীন অদ্ভুত ধরণের জ্যোৎস্না বড় একটা দেখা যায় না। বাদলবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে চোখ ফেরানো যায় না যেন—জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে যদিও ; তবুও কি তার চেহারা!

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। চা খেয়ে ওপারের বনে বেড়াতে যাওয়ার পূর্ব্বে গালুডির হাটে বেড়াতে গেলুম। ১৯৩৪ সালের গুডফ্রাইডের ছুটির পরে এই হাট আমি আর কখনো দেখিনি। সেই পুরানো দিনের মত টোমাটো, শুটকি মাছ, মহুয়ার তেল, বাজে লাড্ডু আর তেলের খাবার বিক্রী করচে। সাঁওতাল মেয়েরা গল্প করচে, পাঁচগ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ করচে। কাল ঠিক এই সময়ে কিন্তু রংপুরের সভাতে বসে আছি।

পরদিন ভোর ছ'টাতে আমরা চারখানা গরুর গাড়ি করে দীঘাগড়া পাথর খাদানে রওনা হই। প্রথমে তো যাবার রাস্তা এরা ভুল করলে। ফুলকাল ও বনকাটি দিয়ে না গিয়ে প্রায় চলে গেল ঘাটশিলার কাছাকাছি। কালাঝোর পাহাড়টা প্রায় সেখানে শেষ হয়েচে। বাদল-বাবু কেবলই বলে, এখনো পথটা আসেনি, আরও আছে। এমনি করে অনেকটা গিয়ে তারপর বাঁ-ধারে পথ পাওয়া গেল। ঝাঁপড়ি শোল বলে একটা সাঁওতালি গ্রামের প্রান্তে গাছতলায় সবাই শতরঞ্চি বিছিয়ে চা খেতে বসা গেল। মেয়েরা চা করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়া দত্ত খাবার দিলেন সবাইকে। বেলা ন'টা। সামনে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে ঘন বন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের গ্রামের এক পল্লীবালিকা এতক্ষণ বকুলতলায় কি করচে মনে হল। চা খাওয়া শেষ করে একটা সাঁওতাল ছোকরার সঙ্গে দেখা। আমি তখন গরুর গাড়ি ছেড়ে একটু এগিয়ে চলেছি। সে বল্লে—দীঘার চেয়ে বাসাডেরার বন খুব বেশী। কিছু পয়সার লোভে সে আমাদের বাসাডেরা নিয়ে যেতে রাজী হল। নীরদবাবু কেবলই কালকার জ্যোৎস্নারাত্রির কথা বলছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি আমার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন আর একদিন জ্যোৎস্নায় আমরা আবার এখানে আসব। বনের শোভা বড় সুন্দর। প্রথম বসন্তে শৈলসানুর বনে অজস্র গোলগোলি ফুলের গাছে ফুল ফুটেচে, পলাশ ফুটেচে, সাদা সাদা এক ধরণের ফুল, গাড়োয়ানেরা বললে, বুরুরা। লোহাজালির ফুলে বেশ সুগন্ধ—আর যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরীর তো কথাই নেই—সুবাসে দুপুরের বাতাস মাতিয়েচে। বনের মধ্যে একটু কুয়া এক জায়গায়, সাঁওতালেরা জল নেয়। আমরা সেই কুয়ার জল খেয়ে নিলাম। ডাইনে বেঁকে বনের মধ্যে বুরুডি গ্রাম। একটা পাথরের কারখানাতে পাথরের গেলাস, থালা, বাটি, খোরা তৈরী হচ্ছে, মেয়েরা নেমে কারখানা দেখতে গেলেন—আমরাও গেলুম সঙ্গে। বেলা সাড়ে দশটা। খুকু এতক্ষণ ওদের রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে রাঁধতে বসেচে। ক্রমশঃ বন গভীর হয়ে এল। পথের ধারে বন্য হস্তীর পদচিহ্ন গাড়োয়ানেরা দেখালে। গাইড্ ছোকরা বল্লে, বনে খুব মজুর আছে। মজুর? মজুর কি? একজন গাড়োয়ান্ বল্লে, বাবু, আপনারা যাকে ময়ূর বলেন। এ বনে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ, লতার মত জড়িয়ে উঠেছে অন্য বড় গাছের গায়ে—ফুল ফুটে রয়েচে। গোলগোলি গাছটা এ বনে তত দেখচিনে। এক-স্থানে উঁচু ঘাট, অনেকটা শিলং-সিলেট্ রোডের মত, ডাইনে নীচু খাদ—গরুর গাড়ি খুব কষ্টে উঠতে লাগল। বাসাডেরা গ্রামের চারিধারেই পাহাড়, মধ্যে একটা উপত্যকায় একটি সাঁওতালি বস্তি। গ্রামের লোকেরা আমাদের গাড়ির দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখচে। বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে কি একটা বেগুনি রংয়ের বড় ফুলগাছ দেখলুম জঙ্গলে—খুব জঙ্গল এদিকটাতে। এখানে ঝাটি-ঝর্ণা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গল আরও অনেক বেশী। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ী ঝর্ণা তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। বাসাডেরা

গ্রাম ছাড়িয়ে এমন হল যে জল কোথাও পাওয়া যায় না—আমি একটি উপলাকীর্ণ শুষ্ক নদী খাতের পাশের জঙ্গলে একটা মোটা লতার উপর উঠে বসে রইলুম। একটু পরে গাইড্ এসে জলের সন্ধান দিলে। পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে এক জায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করেচে। আমি সাঁতার দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করলুম। মেয়েরা রান্না চড়িয়ে দিলেন। আমি ও কনক ডান দিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর বেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকের পাহাড়-গুলো চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেই বন। বনে আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে, এখনও এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্ছে। একটা শিবগাছের রেণু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এমনি সাদা হয়ে গেল। নামবার সময় মসৃণ পাথরখানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম—অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কনক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে কনকের ভয় হয়ে গিয়েছিল। আরও নেমে এসে তবে সেই জলাশয় ও সেই প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা, যেখানে মেয়েরা রান্না করবেন। নেমে এসে দেখি রান্না হয়ে গিয়েচে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে ও বিশ্রাম করতে বেলা গেল। রওনা হবার সময়ে দেখি আমার পায়ের আঙুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুণ দস্তুরমত ব্যথা হয়েচে। সুতরাং গরুর গাড়িতে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে এমন সুন্দর অপরাহ্ণ নষ্ট করে ফেলতে হল বাধ্য হয়ে—কেবল পাহাড়ের ঘাট পার হয়ে ঘন জঙ্গলের পথে খানিকটা খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। পথে জ্যোৎস্না উঠল। এক জায়গায় বনের মধ্যে গাছতলায় আমরা শতরঞ্জি পেতে বসে চা করে খেলাম, গল্পসল্প করলাম। তারপর ক্রমেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আর সেই বনভূমি, অজস্র গোলগোলি ও পলাশ যেখানে ফুটে রয়েচে, যদিও জ্যোৎস্না রাত্রে এমন ফুল আদৌ দেখা যাচ্চে না। বন-কাটি নামে একটা খুব বড় সাঁওতালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শাল-বনের পাশ কাটিয়ে রাত এগারোটার সময়ে গালুডি এলাম। আমরা যখন এলুম, তখন মেল ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল স্টেশনে।

পরদিন দোল। ভিক্টোরিয়া দত্তদের বাড়ি রং খেলা হল—আমি শালমঞ্জরী ভেঙে নিয়ে আজ প্রায় চার বৎসরের পরে বলরাম সায়েবের ঘাটে নাইতে গেলাম। বিষ্ণু প্রধান নাইচে, দোল খেলার রং সাবান দিয়ে তুলে ফেলচে। স্নান করবার সময়ে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য আর সেই একটা গাছের আঁকা-বাঁকা সীমারেখা যেন ঠিক একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে বেড়াতে গেলুম। একটা গাছ ঠেস দিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু বেশী হাঁটতে হয় নি। কালকার গাড়োয়ান সুজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চুবাবুর বাংলোর আমাদের পুরোনো চাকর কেষ্ট। সুজন আমায় গাড়িতে উঠিয়ে নিলে—তারা পাথর আনতে যাচ্চে সুবর্ণরেখার ওপারে।

কতক্ষণ বসে থাকার পরে চাঁদ উঠল। ছোট শাল-চারার জঙ্গল—অপূর্ব্ব শোভা হল চাঁদের আলোতে! কতক্ষণ জঙ্গলে এখানে ওখানে বসি, কখনও বা শুক্‌নো শাল পাতার রাশির ওপর শুই। সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে কতক্ষণ ওপারের পাহাড়ের আলোর মালার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে নদীখাতের শুক্‌নো বালির রাশি চক্‌চক্ করচে, দূরে মৌভাণ্ডার-এর আলো—ডাইনে টাটার আলো। ওপারের জঙ্গলের রেখা মুসাবনীর দিকে বিস্তৃত—অল্পক্ষণের জন্যে মনে হল ঠিক যেন ইসমাইলপুরে ঘোড়া করে জ্যোৎস্নারাত্রে বনঝাউয়ের বনের পাশ দিয়ে

কাছারী ফিরচি ভাগলপুর থেকে। বাড়ি ফিরে এসে দেখি গালুডি সুদ্ধ মেয়ে পুরুষ একত্র হয়েচে—দোলের ভোজ হচ্চে, মাংস পোলাও কত কি আয়োজন। আমায় দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল—Leader-এর এ কি ব্যাপার! এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন ?···ইত্যাদি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত বারোটায় রাঁচী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই। আজ এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে জেগে বসে থেকে জ্যোৎস্নাময়ী মুক্ত প্রান্তর ও দূরবর্ত্তী শৈলমালার কি শোভাই যে দেখলুম, তা বর্ণনা করতে গেলেই ছোট হয়ে পড়ে। সে মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে বোঝাবার না। রাত্রে সারারাতই জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের শোভা দেখতে দেখতে এলাম। খড়্গপুর ছাড়িয়ে একটু ঘুমিয়েছিলাম।

সেদিনই স্কুলের পর ভাটপাড়া গেলাম। রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে ঘোষ-পাড়ায় দোল দেখতে গেলুম—সঙ্গে ছোট মামীমা ও মাসীমা। বাল্যদিনে গরিফা হয়ে হালিশহর হেঁটে দু'একবার গিয়েছি, সে অনেককালের কথা। তারপর কতকাল পরে আবার গরিফা দেখলুম, হাজিনগর মিল দেখলুম, হালিশহরে পাম্প-ওয়ালা বাঁধা ঘাট ও ৺ঈশান মিত্রের বাড়ি দেখলুম। হালিশহরের বাজারের সেই সব সুপরিচিত গলি ও রাস্তা দেখতে দেখতে বাস্ ও কাঁচড়াপাড়া ছাড়িয়ে রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় ঘোষপাড়ার মেলাস্থানে পৌঁছে গেলাম। মেলার স্থান, ডালিমতলা ইত্যাদি হয়ে পালেদের বাড়ির মধ্যে গেলুম, গোপাল পাল সেখানে মোহান্ত সেজে বসে যাত্রীদের কাছে পয়সা আদায় করচে। নলে পালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—সে এক সাহার কাপড় সংক্রান্ত কি মোকদ্দমার মীমাংসা আমায় করতে দিলে। আমি বল্লুম—ও সব এখন পারব না।

মামার বাড়ি গিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের ওপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্ করচে ছাদের ওপরে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজত—সে সব ঘর বেড়িয়ে এলুম। খুকুদের বাড়ির ছাদের মত—এই তো সবে রাত দশটা—হয়তো ন'দিদিদের বাড়ি সবাই গল্প করচে, কি তাস খেলচে। ছোট মামীমা চা করচে, আমরা গল্প করতে করতে চা পান করলুম। পটলমামার এক ছোট মেয়ে বেড়াতে এল। রাত এগারোটার সময় মেয়েদের আলাপ শেষ হল, সবাই মিলে আবার এলুম দোলতলায়। কোথায় কাল এ সময়ে গালুডিতে দোলের ভোজ চলচে, দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোর শৈলমালা ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্চে—আর আজ কোথায় কোন পুরোনো স্মৃতি জড়ানো রাজ্যের বুকের মধ্যে এসে পড়েছি! রাত অনেক হয়েচে। শান্তিদের দোকানে গিয়ে ওকে জাগিয়ে কদ্‌মা কিনে সবাই ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠলুম। রাত দুটোতে ভাটপাড়া পৌঁছাই।

ভাটপাড়া থেকে এলুম শুক্রবার সকালে, শনিবার গেলুম বনগাঁ। এই সপ্তাহটা অদ্ভুত ধরনের বেড়ানো হল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। বনগাঁ পৌঁছেই চলে গেলুম খয়রামারির মাঠে ও রাজনগরের বটতলাটাতে। মনে পড়ল আজ যখন বটতলায় ঝুরি ঠেস্ দিয়ে বসে, সেদিন এমনি সময় কুমীরমুড়ির জঙ্গলে সুবর্ণরেখার ওপারে ঠিক এমনি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলুম—কিংবা তারও আগের দিন বাসাডেরার বন্য পথ দিয়ে গরুর গাড়ি করে গালুডি ফিরচি। ওখানে কতক্ষণ বসে তারপর মাঠের মধ্যে এসে বসলুম। হু হু হাওয়া বইচে, রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুর চলে গেলুম। খুকু রান্নাঘরে রাঁধচে, বেলা দশটা, আমি ইন্দুদের বাড়ি একটু বেড়িয়ে তারপর খুকুদের রান্নাঘরে গিয়ে ডাকচি, ও খুড়ীমা, খুড়ীমা!—খুকু

আমায় দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েচে। বল্লে—আপনি কখন এলেন? বললুম, এই তো খানিক আগে আসচি। দুজনে গল্প করচি, তখন খুড়ীমা এলেন। আমি একটু পরে বরোজপোতার বাঁশবনে ঘেঁটুফুলের বন দেখে স্নান করতে গেলুম আমাদের ঘাটে। তিত্তিরাজ ফলের বীচির গন্ধ, মাটির গন্ধ, শুক্‌নো পাতা ও ডালের গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, কঞ্চির গন্ধ—নানা প্রকার জটিল ও বহুদিনের সুপরিচিত, বহুদিনের কত পুরোনো-কথা-মনে-আনিয়ে দেওয়া গন্ধের সমাবেশ। তাই আমাদের ঘাটে স্নান করে উঠে বকুলতলাটা দিয়ে যখন আসি, মন যেন এক মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে বাল্যদিনে চলে গেল বাল্যদিনের পরিচিত গন্ধে। গালুডি ও সিংভূমের বনের সঙ্গে কোন স্মৃতি নেই কাজেই তা রুক্ষ ও বন্য—বাংলাদেশের এই প্রকৃতি মায়ের মত নিতান্ত আপন, নিতান্ত ঘরোয়া এর প্রতি ভঙ্গিটি আমার পরিচিত ও প্রিয়।

চলে আসবার সময়—সন্ধ্যার গাড়িতে চলে এলুম—খুকু ওদের দাওয়ার পৈঠেতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। চুমরি বাগানে কি অজস্র ঘেঁটুবন, আর কি তার মিষ্টি গন্ধ! আমার মনে ভারী আনন্দ, আর তার সঙ্গে ঘেঁটুফুলের গন্ধটা মিশে আনন্দ ঘনীভূত করে তুললে। বেলা পড়ে এসেচে, হাট থেকে লোক ফিরচে। নানা রকম গাছ, লতাপাতার সুগন্ধ বেরুচ্চে—শুক্‌নো জিনিসের গন্ধই বেশী, শুক্‌নো ফল, শুক্‌নো মাটি, শুক্‌নো রড়া-ফলের বীজ, শুক্‌নো ডাল পাতা—এই সব গন্ধ।

রাত সাড়ে দশটায় এসে কলকাতায় পৌঁছাই, গত শুক্রবার রংপুর যাওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা রকম বেড়ানোর অভিজ্ঞতা এ সপ্তাহে যা হল, সচরাচর ঘটে না। রংপুর থেকে এসেই গালুডি ও বাসাডেরার জঙ্গল—অমনি সেখান থেকে ফিরেই পুরোনো বাল্যদিনের হালিশহর, শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, বলদেকাটা বাগ ও কাঁচড়াপাড়ার মধ্যে দিয়ে ঘোষপাড়ার দোল ও মুরারিপুরের বাড়ির ছাদে জ্যোৎস্নারাত্রে বসে চা খাওয়া—অমনি সেখান থেকে পরদিন রাজনগরের বটতলা ও বরোজপোতার বাঁশবন ও ঘেঁটুবন, এ সত্যিই অতি দুর্লভ আনন্দ!

প্রায় একমাস লিখিনি। অনেক রকম ব্যাপার গেল মধ্যে। একদিন রাজপুর রিপন লাইব্রেরীর উৎসবে কৃষ্ণধন দে, অপূর্ব্ব বাগচি, রমাপ্রসন্ন ও গৌরকে নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। ভাঙা রাসমঞ্চে বসে ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন খুব আনন্দ করা গিয়েছিল। মাচাতলায় বসে ফুলির সঙ্গে অনেক গল্প করি। ফুলিদের বাড়ি আবার ওরা চা খেলে। জ্যোৎস্নারাত্রে ওদের বাড়ির সামনে মাঠে বসে বেশ লাগছিল।

তারপর ইস্টারের ছুটির আগে একটা শনিবারে বনগ্রামে গেলুম এবং ছোটমামার ছেলের পৈতের জন্যে বৈকালের ট্রেনে রানাঘাট হয়ে এলুম। সেদিনটাতে নিজের মনের চিন্তা নিয়ে ভারী আনন্দ পেয়েছিলুম। মামার বাড়িতেও সন্ধ্যার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হল।

ইস্টারের ছুটিটাও এবার বেশ কেটেচে। খুকুরা ওখানে আছে। আমি বসে কাগজ দেখতুম, খুকু এসে ডাকত ওদের উঠোন থেকে—বলত, এদিকে আসুন না? গিয়ে গল্প করতুম। ওদের রান্নাঘরে বসে কত গল্প করেচি।

বনগাঁয়ের সরকারী ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী একদিন গ্রামোফোন নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ি হাজির। খুব গান হল। খুকুরা ছাদ থেকে শুনলে।

আমি ও ইন্দু জ্যোৎস্নারাত্রে রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম—একদিন তেঁতুলের নৌকোতে পার হয়ে ওপারের উলুটি বাচড়ায় বসে কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি।

খুকু একদিন বল্লে—চা খাওয়াব, সন্দেবেলা আসবেন। গেলুম সন্দেবেলা, কিন্তু সেদিন কি

একটা কাজ পড়াতে চা খাওয়া আর হল না।

সেদিন মরগাঙের ধারে বেলেডাঙায় পাঠশালার নীচে গিয়ে বসেছিলুম ইন্দুর সঙ্গে। ইস্টার-মনডের দিন রম্ভাদেবী দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে টাওয়ার হোটেলে খুব গল্প-গুজব করি। তিনি তাঁর হাতে আঁকা ছবি একখানা দিলেন আমায়।

আজ বহুদিন পরে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদের বাড়ি। বাল্যে এখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখের শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে কোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। প্রসন্নের মা মারা গিয়েছেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাথম বুড়ী এখনও বেঁচে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এসেচি। বেশ লাগচে এবার। ছুটি হবার দুদিন আগেই এসেছিলুম, বনগাঁয়ে প্রথমদিন দুপুরবেলা খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে বিল্বফুলের সুগন্ধ আর দুপুরের খর রৌদ্র, নীল আকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে একঘেয়ে কলকাতার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসেচি। দু'দিন পরেই বারাকপুর এলুম, খুকু এখানেই আছে, সে সকালে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে—বনসিমতলার ঘাটে আবার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা নাইবার সময়ে, আজ দুপুরে যখন ঝড় উঠল, ও এলো ছুটে আম কুড়ুতে, আমি বিল্‌-বিলের ধারের আম গাছটার দুটো আম ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম—দুটো মোটে পেয়েছিল—দুটোই দিয়ে দিল আমাকে। স্নান করে এসে রোয়াকে দাঁড়াতেই ছুটে ওদের সামনের উঠোনে এসে জিগ্যেস করলে—বনগাঁয়ে যে বিয়েতে গিয়েছিলেন—বর কেমন হল তাদের ?···এসব ১৯৩৪-৩৫ সালের সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ মনে এনে দেয়।

সত্যিই এবার ভারী ভাল লাগচে এখানে এসে। একদিন কুঠীরে মাঠে বৈকালে বেড়াতে গিয়েচি, দেখি দুজন লোক খাঁচা নিয়ে ফাঁদ পেতে ডাক পাখী আর গুড়গুড়ি পাখী ধরচে। গুড়গুড়ি পাখী ডাকে কেমন সুন্দর! আমি ও-ডাক অনেক শুনেচি, কিন্তু ও যে গুড়গুড়ি পাখীর ডাক তা জানতুম না।

কাল বৈকালে আদিত্যবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বিকেলে গেলুম বনগাঁ। সঙ্গে ইন্দুর ছেলে গুটুকে গেল। চাল্‌কীপাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কি চমৎকার গ্রাম্য-ছবি—চাষার মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্চে, কেউ বা কাঁথা সেলাই করচে ঘরের দাওয়ায় বসে। সারা পথ বেশ ঝড়ের মত হাওয়া—দুপুরের অসহ্য গুমটের পরে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চাঁপাবেড়ের কাছে ভীষণ মেঘ ও কালবৈশাখীর ঝড়। ডালপালা, ধুলোকুটো উড়িয়ে নিয়ে আসচে—পথ দেখবার জো নেই—ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। আমি একটা শিশু-গাছের গুঁড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে বসি। বাসায় পৌঁছে ওকে কিছু খাবার খাওয়ালুম। মন্মথ-বাবুর লিচুতলায় আড্ডায় খুব গল্প করে আদিত্যবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাই। গরমে কিন্তু রাত্রে ঘুম হল না। জলপাইগুড়ি ছাত্র-সমিতি থেকে সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েচি, কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

আজ সকালে দুজনে দিব্য হেঁটে বারাকপুর এলুম। পথে চালকি দিদির বাড়ি গেলুম।

দিদি যত্ন করে বেলের পানা, চা, ক্ষীর, কাঁটাল খাওয়ালেন।

বাড়ি আসবার একটু পরেই নামল বৃষ্টি। সেই থেকেই বাদলা চলচে—এখন বেলা পাঁচটা, বৃষ্টি গুঁড়িগুঁড়ি পড়চে। কাল গিয়েচে যেমন অসহ্য গরম, আজ তেমনি ঠাণ্ডা।

সুপ্রভাকে পত্র দিয়েচি, তার চিঠিও এরই মধ্যে পাব আশা করচি। ইতিমধ্যে পিরোজপুর

থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেচে, তারই কি করা যায় ভাবচি। সভাসমিতি করে বেড়ানো এ সময়টা মোটেই ভাল লাগে না।

আজ সকালে গোপালনগরে গিয়ে অনেকগুলো চিঠি ডাকে দিলুম। বাড়ি এসে আমতলার চেয়ার পেতে বসে অনেকদিন পরে Cleopetra পড়চি, এমন সময় খুকু আমার কাছ দিয়ে ন'দিদিদের বাড়ি থেকে গেল। ইচ্ছে করেই গেল, কারণ সুপ্রভাকে চিঠি লিখতে চাইনি। সেই রাগটা নরম করাতে যে এল, এটি বেশ বোঝাই যায়। ওদের দাওয়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলে।

বিকালে আমি The Croxley Master বলে Conan Doyle-এর একটা গল্প পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। উঠতে আর পারিনে—এমন কৌতূহল। Conan Doyle ছোট গল্পে ভালো শিল্পী ছিলেন। তাঁর A Struggle of 15 এবং আরও দু'একটা গল্পের মধ্যে দেখেছি, বড় শিল্পীর কৌশল বর্ত্তমান। এত খুঁটিনাটি বর্ণনার ওপর দখল (অদ্ভুত দখল!) নিম্নশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামান্য একটু আধটু সেকেলে claptrap টেক্‌নিক্ আছে—তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারপর কুঠীর মাঠ দিয়ে আইনদ্দির বাড়ির পেছনকার উঁচু মরাগাঙের পাড় পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে খানিকটা বসে রইলুম। বেলা একেবারে গিয়েচে। সেই যে রাখাল ছোঁড়া আমায় তামাক খাওয়াত, গত কার্ত্তিক মাসে যখন কুঠীর পেছনের বন-ঝোপের ধারে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম—সেই ছোক্‌রা দেখি পুলের নীচের ঘাট থেকে নেয়ে উঠচে। বল্লে—ভাল আছেন দাদাবাবু? কবে এলেন?

একটু পরে প্রমথ ও তার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে গোপালনগর থেকে ফিরচে। সে বনগাঁ স্কুলের মাস্টার। তার জানবার একমাত্র দরকার দেখলুম ওদের স্কুলের ছেলেরা বাংলায় কত নম্বর পেয়েচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেলেডাঙার গোয়ালাদের দোকানে বসে একটু গল্প করে মাঠের মধ্যে দিয়ে এসে যখন আমাদের ঘাটে নাইতে নামলুম—তখন অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েচে। সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপারে। এপারের ঘন অন্ধকার বন-ঝোপে কি জোনাকি পোকার মেলা!

ফিরে এসে খুকুদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম—হীরাবাঈ ও কেশরীবাঈ-এর গানের সম্বন্ধে, 'Life of Emile Zola' ফিল্ম সম্বন্ধে। খুকু বল্লে—সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখেছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে?

আমি তখনই বুঝতে পেরেচি, ও 'A Tale of Two Cities'-এর কথা বলচে।

বল্লুম—কথাগুলো কি? 'I am the life and the Resurrection. He who believeth in Me'—এই পর্য্যন্ত বলতে বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—ঠিক।

বল্লুম—পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো নয়—গিলোটিনে যখন ওদের প্রাণদণ্ড হচ্ছে—সে সময়।

ও বল্লে—ঠিক, এবার সব মনে হয়েচে।

মনে এবার কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা।

কাল পচার সঙ্গে বিকেলে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যখন বেলেডাঙার কামার

দোকান পর্যান্ত গিয়েছি, আইনদ্দির চাচা ডাক দিলে।

—কি চাচা, কেমন আছ ?

চাচা বিদ্যাসুন্দর ও মহাভারত দিব্যি মুখস্থ বলে গেল। বল্লে, একখানা বিদ্যাসুন্দর আমার ছেল, কে যে নিয়ে গেল !

তারপর আমরা গিয়ে কলাতলার দোয়াতে বসলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। অনেকখানি জল আছে। জলের একধারে ফুল ফোটা হিঞ্চের ক্ষেত। জলের ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাস। বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা জায়গা। দূরে বট-অশ্বত্থের সারি।

আজ বৈকালে কলাতলার দোয়াতে বেড়াতে গেলুম। চমৎকার ঝিঙের ফুল ফুটেচে। অনেকক্ষণ কাটালুম বৈকালে—এদের সকলের কথাই মনে হল। ঘর সংক্রান্ত একটা গোলমাল হয়েচে, মটকা কাল ঝড়ে উড়ে গিয়েচে—ভগবান এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

অনেকগুলো চিঠি নানা জায়গা থেকে আজ এসেচে। প্রকাশকদের নিকট থেকে, সভা-সমিতি সংক্রান্ত ইত্যাদি। সুপ্রভার চিঠিও ছিল। কলাতলার দোয়াতে জলের ধারে বসে কত কথা মনে এল। রেণুর একখানা পত্রও পেয়েছি আজ অনেকদিন পরে। চাটগাঁয়ে গিয়েছিলুম সেই কতদিন আগে—এখন আমাদের দেশের এই খেজুরের কাঁদিভরা খেজুর গাছ, ওল গাছ, ঝিঙের ক্ষেত, ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের গাছ, ওপারে আরামডাঙ্গার বাঁশবনে অস্তসূর্য্যের হলুদে রোদের দিকে চেয়ে সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

গোপালনগর যাচ্চি, দারিঘাটার পুল থেকে বাঁওড়ের ওপারের কি একটা গাছ, অনেকখানি নীল আকাশ—দেখে মনে হল এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পিছনে যে শক্তি আছেন, সেই শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখে সাড়া দেন এবং benevolent নিশ্চয়ই—ওবেলা একটা বিশেষ ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। মনে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগলো এই কথাটি ভেবে। বস্তুতঃ এই ভাগবতী শক্তি—যে মুহূর্ত্তে আমরা জীবনের পথে মেনে নেব—এর বাস্তবতা অনুভব করব—সেই মুহূর্ত্তে আমরা আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করব।

সন্ধ্যার পরে ইন্দুদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। ফণিকাকা ছিল বসে—১৩০৫ সালে রামচাঁদ মারা যান, সে কথা হল। যুগলকাকার মা আর সরোজিনী পিসীদের, ত্রিনয়নী পিসীমা (তখন বালিকা) ফণিকাকাদের বাড়ি থাকত সারাদিন, খেত—কারণ খুব গরীব তখন ওরা—সেইসব গল্প শুনলুম।

রোয়াকে বসেচি। তারা ভরা আকাশ। গভীর রাত্রি। পাশের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে। আবার সেই সক্রিয়, হৃদয়বান, (পার্থিব ভাষায়) benevolent শক্তির কথা মনে এল। এই শক্তিই ভগবান। যে মনে মনে একে মানে, এই শক্তির বাস্তবতা অনুভব করে প্রাণে প্রাণে, সে সকল বিপদ, দুঃখ, সংকীর্ণতা, মলিনতাকে জয় করে।

বৈকালে সাজিতলার ঘাটে টিনের চালায় আমি আর পচা গিয়ে বসলুম। সারাদিন ঝড় চলচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসচে।

বাল্যে আমি আর ভারত এমন দিনে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে দিগম্বর পাটনীর খেয়া নৌকোতে মাধবপুরের হাটুরে লোকদের পার করতুম—সে কথা মনে পড়ল। একবার আমার পাঠশালার সহপাঠী বন্ধু পার্ব্বতী আর তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কি আনন্দের দিনই গিয়েচে!

শম্ভু কি করে মারা গেল ইন্দু সেই গল্প করছিল। ওখান থেকে উঠে আমরা কুঠীর মাঠের দিকে গেলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে মেঘান্ধকার আকাশের নীচে এপার ওপারের শ্যামল মুক্ত মাঠ ও বনানীর, ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কি শোভা! পচাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাব না—কথা বলে সব মাটি করে দেয়।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সকাল থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে বিরাম নেই। খুড়ীমা এলেন বৃষ্টি মাথায় চা নিয়ে। বল্লেন—খুকু করেচে, বলছিল, বিভূতিদা'কে একদিন চা করে খাওয়াব বলেছিলাম, তা আজ করি। একটু পরে চায়ের বাটি ওদের বাড়ী দিতে গিয়েচি, খুকু বল্লে—জল খাবেন না? মা জিগ্যেস করল। অর্থাৎ মুড়ি দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে তাই জল খাব কিনা জিগ্যেস করচে। জলের ঘটি ওর কাছেই ছিল, নিয়ে জল খেলাম। তারপর গোপালনগর এলাম 'আরণ্যক'-এর প্রুফ্ ডাকে দিতে। মাঝের গাঁয়ের জিতেন সাধু দেখি তেরোখানা মোটর নিয়ে চলেচেন। চালকীর জিতেনদা' একখানা মোটরে ছিলেন—সেখানায় দেখি মোটেই স্থান নেই। কাজেই তখন রেল লাইন দিয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল রাস্তা চলে গেলুম। পূর্ব্ব দিকের আকাশ চমৎকার নীল দেখতে হয়েচে। আমি স্টেশনে পৌঁছেচি, অন্ধকারও নামল। অমূল্যবাবুদের বাড়ি গিয়ে সারারাত জাগা, বিজয় মুখুজ্যে আর অনাথ বোসের গান হল। রাত চারটে যখন বেজেচে তখন বীরেন সামনের একটা বাড়ির দোতলায় শোয়াতে নিয়ে গেল আমায়। তখন ঘুম হওয়া সম্ভব নয়, একটু পরেই ফর্সা হয়ে গেল। আমি মিনুদের বাড়ি চলে এলুম। সেখানে ওরা ছাড়লে না—খাওয়া-দাওয়া করিয়ে তবে ছেড়ে দেয় বেলা দুটোর পরে। আড়াইটার ট্রেনে জিতেন ঠাকুরের দলবলের সঙ্গে গোপালনগরে নামি। ওরা মোটরে কলকাতা চলে গেল। তারপর নামল ঘোর বৃষ্টি। আমি এখানে ওখানে বসে গল্প করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এলুম। খুড়ীমা ডাকছেন ও-বাড়ি থেকে, বিভূতি এলে নাকি? বল্লুম—হ্যাঁ খুড়ীমা। তারপরে ওদের ওখানে ঘরে গিয়ে কাল রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করি।

সকালে বিশেষ কাজে গোয়াড়ী যেতে হয়েছিল। একটা বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা হোল। আজ প্রায় ৩৩ বছর পরে আমাদের বাল্যের চাটুয্যে বাড়ির ঠাকুরমায়ের নাতনী লীলাদিদির সঙ্গে দেখা হল। গোয়াড়ীর মধ্যে এক সময়ে যদু চাটুয্যে বিখ্যাত উকিল ছিলেন, লীলাদিদির সঙ্গে তাঁর বড়ছেলে হরি চাটুয্যের বিবাহ হয়েছিল। লীলাদিদি এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন —আমি ৩৩ বছর পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম, বছর সাতেক বয়স তখন। লীলাদি কড়ায় করে মাছ ভাজছিলেন—সেকথা আমার মনে আছে। এখন তিনি বৃদ্ধা।

কাল ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি যদুবাবুর বাড়ির পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি কিছুই নেই। চাকরে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা বসে আছেন—এই বৃদ্ধা যে ৩৩ বছর পূর্ব্বের সেই সুন্দরী লীলাদিদি (এখনও আমার একটু একটু মনে আছে বাল্যে দৃষ্ট তাঁর সে অপূর্ব্ব রূপ), তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত।

লীলাদিদির এক ছোট বোন, তার নাম যোগমায়া—ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। লীলাদিদিই বল্লেন—যোগমায়া আমার মেজমেয়ের বয়সী। সুতরাং যোগমায়া লীলা-দিদির চেয়ে অনেক ছোট। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল যোগমায়া। খুকুদের বাড়িতে বাঁশের ও থলের দোলায় করে খেলা করেছিলুম মনে আছে। কার কাছে যেন শুনে-ছিলুম—সেও আজ ১৫।২০ বছর আগে, যে যোগমায়া মারা গিয়েচে। মনে দুঃখ হয়েছিল।

কাল হঠাৎ লীলাদিদির কাছে যোগমায়ার নাম করতেই তিনি বল্লেন—যোগমায়াও এখানে আছে, খোড়োর ধারে তার বাসা।

আমি তো অবাক।

সেই যোগমায়া!···বিশ বছর আগে শুনেছিলুম যে মরে গিয়েচে—আজ বিশ বছর ধরেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যোগমায়া নেই। সে যদি হঠাৎ আজ বেঁচে আছে শোনা যায় তবে সেটা যেন পুনর্জ্জন্মের মত রহস্যময় শোনায়।

যোগমায়ার সঙ্গে দেখা করা কিন্তু ঘটে উঠল না। ট্রেনের সময় ছিল না। লীলাদি চা ও খাবার খাওয়ালেন। দেখা করে বিদায় নিলুম।

এই তো গোয়াড়ী—একদিন দেখা করব যোগমায়ার সঙ্গে।

সুপ্রভার পত্র শ্যামাচরণদাদা দিলে হাজারির দোকানে, আমি তখন স্টেশনে যাচ্ছি। ট্রেনে পত্রখানা পড়তে পড়তে গেলুম। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল পত্রখানা পড়ে।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল, কারণ অনেকদিন পরে মেঘ দূর হয়ে রৌদ্র উঠেছিল। খুকু কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের শিউলিতলায় বন্দী করলে। বল্লে, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্ট হয়, না? আমি বল্লুম—সময়ের সার বর্ত্তমান। ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে!

বৈকালে পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে পচার সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়ে সুন্দরপুরের কাছাকাছি গেলুম বেড়াতে—এক জায়গায় জলের ধারে দুজনে বসে ওর পঞ্চানন মামা কি করে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল সে গল্প শুনি। এক গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে ছিল পরমা সুন্দরী, তার বাপকে ওদের সে বখাটে মামা শোনালে যে পচাদের বিষয়ের আট আনার অংশীদার। বিয়ে হয়ে গেল—তারপর মেয়েটার কি দুর্দ্দশা! গল্পটা শুনে মনে বড়ই কষ্ট হল।

জলের ধারে ঝিঙের ফুল ফুটেচে। পরিষ্কার আকাশ, খেজুর গাছে গাছে স্বর্ণবর্ণ খেজুরের কাঁদি। একপাশে সবুজ উলুটি বাচ্‌ড়া বড় বড় বট-অশ্বত্থ, শিমুলগাছ। ওর মুখে গল্প শুনি আর ওবেলার মনের সে আনন্দটা আবার মনে আনবার চেষ্টা করি। কত গাছ, লতা মোটা —একটাতে কেমন দুলবার সুবিধে আছে। বিল্বপুষ্পের বাস এখনও আছে দু-একটা গাছে। বাঁওড়ের ওপারে কি সুন্দর ইন্দ্রনীল রংয়ের আকাশ হয়েচে!

আইনদ্দি চাচার বাড়ি এসে বসি। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে আইনদ্দির বাড়ির একটা যোগ আছে। চাচা বসে খালুই বুনচে। ওর সেই নাতি বসে বসে গল্প করতে লাগল। বেশ ছেলেটি। আমি বসে বসে ওপারের বট-অশ্বত্থের সারির দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার সবুজ বনশোভা, কত কথা মনে আসে, সুপ্রভার কথা, সে লিখেচে, এবার আর দেখা হবে কবে? সে কথা।

দেখা ওর সঙ্গে করব শ্রাবণ মাসে, ঠিক করেই রেখেছি। সে সময় চেরাপুঞ্জিতে আনারস খুব সস্তা হবে, সে সময় চেরাপুঞ্জির বাজারের সেই খাসিয়া মেয়েটার দোকান থেকে আর বছরের মত আর একটা গোটা আনারস কিনে খেতে পারব, সে সময় যাব শিলং।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন অপূর্ব্ব দিনগুলো কাটচে, এমন সত্যিই অনেক দিন কাটেনি। সেবারের বড়দিনকেও ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, রসের ও আনন্দের অভিনবত্বে ও প্রাচুর্য্যে।

এদিন বিকেলে পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে বেরুলে কেবল বাজে বকে।

প্রকৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ নিরিবিলি চুপচাপ বসে চিন্তায় আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একাই গিয়ে মরাগাঙের উঁচু পাড়ে আইনদ্দির বাড়ির পিছন দিকে রাস্তার ধারে বসলুম। সঙ্গে সুপ্রভার চিঠিখানা ছিল। ডাইনে মরাগাঙের বাঁকে বাঁশঝাড় ও নতুন পাড়ার গোয়ালাদের বাড়ি, ওপারে আরামডাঙায় ঝিঙেফুল দু'একটা ঝিঙে ক্ষেত পেছনে একটা কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে, খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর—সত্যিকার ট্রপিক্যাল দেশের দৃশ্য! কলকাতা থেকে কত দূরে, কত নিভৃত, শান্ত পল্লী অঞ্চল আমাদের এ দেশ—কেমন একটা অপরূপ শান্তি মাখানো। ভগবান যে Romance ও poetry-র উৎসমূল, তাঁর মধ্যে যে শুধুই poetry ও Romance এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদি খেজুর, ওই বেগুনী রংএর জলকচুরির ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তাঁর মধ্যে কল্পনারূপে একদিন নিহিত ছিল। "কল্পনা সৃষ্টি বীজঞ্চ"। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা:"—কালিদাস কবি হলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। আমরা সকল কবিই অল্প-বিস্তর ভাবে দার্শনিক তো বটেই। অনেক সময় তাঁরা যা দেখেন দার্শনিকেরাও তা দেখতে পান না।

এখানে ক'দিন ভয়ানক বর্ষা চলচে। সকালে উঠে বেড়াতে বার হয়েচি মাছিনপুর বলে একটা গ্রামের দিকে। পাশে একটা ছোট খাল। বাঙাল মাঝিরা নৌকো চালাচ্চে। নারিকেল সুপারির বাগান চারিদিকে প্রত্যেক লোকের বাড়ির উঠানে, ঝুপসি বনে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে মাটি। টিনের চালা-ওয়ালা দরমার বেড়া দেওয়া সব ঘর—তার বাইরে টিনের সাইনবোর্ড ঝুলচে, "মোজাহার আলি মোক্তার" কিংবা "আজাদ আলি, বি-এল, প্লীডার।" বাড়ির পাশে ছোট ছোট ডোবা মত পুকুর—সুপুরির বাগানটা দিয়ে ঘেরা বেড়ার আবরু। আবর্জ্জনা, পচা-পাতার জঞ্জাল বাড়ির পাশেই, নীচু আর্দ্র উঠোনে বা মেজেতে। এক জায়গায় লেখা আছে 'রসিক-লাল সেন নায়েবের বাসা'। তারপর একটা সরু খালের ধারে ধারে নারিকেল সুপুরির ছায়ায় ছায়ায় কতদূর বেড়াতে গেলুম, ফিরে এসে একটা কাঠের পুলের ওপরে বসলুম। দুটি ছোট ছোট মেয়ে মাছ ধরচে। কতক্ষণ পুলটাতে বসে রইলুম। কি বিশ্রী জায়গা এই পিরোজপুর! পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে যদি কেউ বলে তুমি এখানে এক বছর থাক—তা আমি কখনো থাকিনে। এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? রত্না দেবী ও তাঁর স্বামী সত্যিই বড় কষ্টে থাকেন, অমন আমুদে লোক বেশী দেখা যায় না। রত্নাদেবী বড় গল্পপ্রিয়—দিনরাত মুখের বিরাম নেই। আর কি সেবাযত্ন ক'দিন? নিত্য নতুন খাবার তৈরী হচ্চে আমায় খাওয়ানোর জন্যে। বৈকালে বার-লাইব্রেরিতে মিটিং হল, আমার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা করা গেল। জ্যোৎস্নারাত্রে বাইরে বসে গল্প করি রত্নাদেবীর সঙ্গে।

পিরোজপুর থেকে এসে মনে কোথায় একটা অযুক্তির দৈন্য ছিল। সেখানকার সেই নারকোল সুপুরি বনের ঝুপ্‌সি ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে উঠোন আর সুপুরির বাস্‌লোর আবরুর কথা, সেই রসিকলাল সেন নায়েবের বাসার কথা মনে হলেই মনে একটা অস্বস্তি আসত। আমাদের দেশে আসবার সময় ঝিকরগাছা ঘাটে পৌঁছেই মনে হল স্বদেশে পৌঁছে গেচি। নাভারনের কাছে যশোর রোড ও বিলিতী চট্‌কার ছায়া দেখে মনে হল আমরা একেবারে বাড়ি পৌঁছে গেচি। বাড়ি এলুম ন'টার গাড়িতে। এসেই খুকুর সঙ্গে দেখা। ও দেখি ওদের দাওয়ায় বেড়াচ্চে, আমায় দেখে প্রথমটা পিছু হটে সরে গেল, তারপরই চিনতে পেরে

ছুটে এল। পিরোজপুরের গল্প হল অনেকক্ষণ। ওর জন্যে যে কেক্ পাঠিয়েছিল তা দিয়ে এলুম।

পরদিন এল সুধীরবাবুরা। ওদের নিয়ে হৈ হৈ করে দিন কেটে গেল। মোটরখানা ওদের রইল আমাদের আমতলায়। আমাদের ঘাটে স্নান করিয়ে আনলুম সবাইকে। নদীতে স্নান করে সব খুব খুশি।

ওরা চলে গেল বৈকালে। পরদিন এল কালী চক্রবর্ত্তীর ঘোড়া আমাকে সিমলে নিয়ে যাবার জন্যে—অনেকদিন পরে ঘোড়ায় চড়া গেল। গোপালনগর স্টেশনের কাছে ছাতি সারিয়ে নিলুম —তারপর গণেশপুরের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠের রাস্তায় নেমে সোজা হাতীবাঁধা বিলের পাশ দিয়ে চললুম। কত গাছপালা, বটতলা, ঝোপঝাপ পার হয়ে যে চলেচি! আসবার সময়েও তাই। তখন বৈকালের ছায়া পড়ে এসেচে, হাতীবাঁধা বিলের চমৎকার শোভা হয়েচে—কতদূর জুড়ে প্রশান্ত চক্রবালরেখা দূরত্বের কুয়াসায় অস্পষ্ট। হে ভগবান, আমি আপনার এই মুক্ত রূপের উপাসক। যদি কখনো আসেন, তবে এই রূপেই আসবেন। নভোনীলিমা যেখানে মেঘলেশশূন্য, দিকচক্রবাল যেখানে মুক্ত, উদার—ধরার অরুণোদয় যেখানে নিবিড় রাগরক্ত, সে রূপেই আপনি দেখা দিন—রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা থেকে আমার মুক্তি দেন যেন।

সিমলে থেকে ফিরে যখন নদীতে যাচ্ছি গা ধুতে—বেলা খুব পড়ে গিয়েচে, ছায়ানিবিড় হয়েচে বাঁশবন। খুকু ওদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাট থেকে ফিরচে, বাঁশবনের পথে দেখা ঠিক পুঁটিদিদিদের বাড়ি থেকে নেমেই। ওরা সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়াতে যাচ্চে, বল্লুম—চলে আয়। ও আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে গেল, কি সুন্দর হাসতে পারে! এক তরুণ মুখের প্রসন্ন হাসিতে সারাদিনের মানসিক দৈন্য যেন এক নিমেষে ঘুচে গেল।

গিরীনদাদাদের কলাবাগানের মাঠে কতক্ষণ বসলুম, আকাশ রঙীন্ মেঘ-স্তূপে ভরা—সবুজ মাধবপুরের চর, বাঁশবনের ঢুলুনি কেমন সুন্দর! কত বছর চলে যাবে, ঐ বনসিমতলার ঘাটে অনাগত দিনের তরুণীবধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটি অপূর্ব্ব প্রণয়-কাহিনী—হয়তো কেউ কখনো বলবে, ছিল এরা দুজন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামের স্নিগ্ধ বসন্ত দিনের বাতাসে তার মূর্চ্ছনা থেকে যাবে।

সকালে যখন বসে লিখচি, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, একটু পরেই এল বৃষ্টি। একবার দেখি খুকু বিলবিলে থেকে উঠে গেল, কিন্তু বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিল, তাই চেয়ে দেখল না এদিকে। স্নান সেরে এসে যখন গেল, তখন বোধ হয় মনে পড়ল, তাই চেয়ে হেসে গেল। কালোর সঙ্গে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে উঠে বসেচি, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেলেডাঙায় কুটুমবাড়ি যাচ্চে। আমার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করে গেল। স্নান করতে জলে নেমে দেখি ভারী চমৎকার দৃশ্য ওপারের মাধবপুরের সবুজ উলুবনের চরে। দুপুরে যখন ঘরে শুয়ে আছি, তখন খুব বৃষ্টি এল। বৈকালে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙার জলে—আবার ওবেলার সেই বেলেডাঙার ছেলেটার সঙ্গে দেখা। নদীজলে স্নান করে আনন্দ হল, জ্যোৎস্না এসে পড়েচে নদীজলে। চমৎকার দেখাচ্চে।

রোয়াকে খুব জ্যোৎস্না। চেয়ার পেতে বসেচি, খুকু ডাকলে—প্রথমে ওদের শিউলিতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসচে হি হি করে, তারপর ডাকলে—বল্লে, আসুন না? গিয়ে বসেচি, ও উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এল শুনে বলচে—আমিও ছ'ঘরে যাব। মা এখানে থাকবে। আপনি আর সেখানে যেতে পারবেন না, মজা হবে।

বল্লুম—মজা বেরিয়ে যাবে। বুঝবি তখন।

বল্লে—তা বটে।

বসে গল্প করচি, একবার বৃষ্টি এল। আমার চেয়ার পাতা রয়েচে রোয়াকে, উঠতে যাচ্চি, ও উঠতে দেবে না। বল্লে—বসুন, বসুন, বৃষ্টি ঐ থেমে গেল। বল্লে, কা'ল অত সকালে উঠে গেলেন কেন? বল্লুম—পাঁচু কাকার ছেলের আশীর্ব্বাদ হচ্ছিল, তাই। একটা ছোট গল্প বলতে বল্লে। কিন্তু সাধক-দাদার বাড়িতে একজন গায়ক এসেছিল, তার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হল বলে চলে এলুম।

বনগাঁয়ে যেতে হল নৌকোতে পচা রায় ও তাদের দুই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। বার-লাইব্রেরীতে প্রফুল্লের কাছে বিশেষ দরকার ছিল, সেখান থেকে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে মন্মথবাবুর লিচুতলা ক্লাবে বসে পিরোজপুর ভ্রমণের গল্প করি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর নৌকো ছাড়া হল। মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেচে, ঝিরঝিরে বাতাস, পচা বেশ নানারকম গল্প করতে করতে এল। সুখপুকুরের ঘাট থেকে সয়ারামকে উঠিয়ে নেওয়া হল।

খুকু আজ এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ওদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে। আমি তখন স্নান করে এসে সবে বসেচি, ঝম্‌ঝম্ রোদে ও খাড়া দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে, আমিও রোয়াকে চেয়ার পেতে বসে রইলুম। একবার দুপুরের পরে খুড়োদের বাড়ির দিক থেকে এল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। তারপর আমি Cleopetra পড়ে, তাতেই মশগুল হয়ে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙায় বড় বটতলা ছাড়িয়ে সুন্দরপুরের পথে। রাত্রে খুকুদের দাওয়ায় বসে Cleopetra-র ইতিহাস বলি। ওর ভারী ভাল লেগেচে। বললে,—আজ এত দেরি করে এলেন যে? বল্লুম—খুড়ো এসে বসে গল্প করছিল, তা কি করি? পরদিনও Cleopetra-র গল্প শুনে খুকু ভারী খুশি, হেসে বলচে—আহা, বলবার কি ভঙ্গি! কচুকাটা করচে! ওর হাসি আর থামে না যখন বলেচি হারম্যাকিস্ কি করে মার্ক এণ্টনির সেনাপতিদের Caesar-এর দলে যোগ দেওয়ালে।

সন্ধ্যার জলে নেমে বড়সিমতলার ঘাটের দিকে চেয়ে, পয়লা আষাঢ়ের নবনীলনীরদমালার দিকে চেয়ে ওপারের শ্যামমাধবপুরের চরের দিকে চেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠল। এই বনসিমতলার ঘাট কত ভাবে সার্থক হল!

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটির মত আনন্দ কোনবার হয়নি।

বনসিমতলার ঘাট থেকে যখন স্নান করে আসচি, গুয়োথলী আমগাছটার তলায় মাথা মুছবার জন্যে দাঁড়িয়েচি, ঘন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অস্তমেঘের রাঙা আভা ভূষণ জেলের জমির একটা ময়নাকাঁটা গাছের গুঁড়িতে পড়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে!

বাদলা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মশা বেড়ে গেচে। বিলবিলে জলে টইটুম্বুর, বকুলগাছ ও আমগাছগুলোর ভিজে ভিজে কালো গুঁড়ি, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে। এই আর্দ্র, মশকসঙ্কুল, অতি নিরানন্দ স্থান কিন্তু অপূর্ব্ব কবিতাময়। অন্ততঃ আমার কাছে এ সমস্তটা মিলে এক অফুরন্ত, চিরনূতন কবিতা।

বসে পড়চি রোয়াকে, চেয়ারটা বুড়োদের বাড়ির দিকে ফেরানো, হঠাৎ যেন মনে হল বিলবিলের জলে ঝপ করে একটা আম পড়ল। তাকিয়ে দেখচি, আর একটা ঝুপ করে শব্দ হল। তারপর আবার একটা।

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবচি এত আম পড়চে কোথা থেকে, তখন দেখি কে যেন বিলবিলের ও ঘাট থেকে কি একটা ডাল ছুঁড়ে জলে মারচে।

আমি চেয়ে দেখতেই খুকু হাসতে হাসতে উঠে এল—বল্লে, কবির তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে কি

খারাপ কাজই করেচি।

···সুন্দর কবিতা।

কিংবা এ যদি কবিতা না হয়; তবে কবিতা কি, তা আমার জানা নেই।

যেখানে জীবন, যেখানে আনন্দ, যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও নবীনতা—তাই Testament of Beauty—কবিতা।

একদিন বিকেলের দিকে মেঘের সৌন্দর্য্য ভারী চমৎকার ফুটচে সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে। পচা রায় মাছ ধরতে বসেচে কুঠীর নীচে—তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করি। আর এপার ওপারের শ্যামল সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে দেখি—কয়টি উলুবন, খেজুর গাছ, পটল ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত, শান্ত কালো নদীজল, কাঁটাশেওলার দাম, নলে জেলের ডিঙি-নৌকা—ওপরে নীল আকাশ, রাঙা মেঘ—সব সুদ্ধ মিলিয়ে চমৎকার ছবি।

আজ দিনটা বেশ চমৎকার। সারা ছুটির মধ্যে এমন পরিষ্কার দিন আসে নি। বল্লার ডাঙনের কাছে একটা চারা শিমুল গাছ আছে, তার চারিপাশে সবুজ কচি ঘাস বন, নিকটে উলুখড়ের রাশি রাশি ফুল ফুটেচে, ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। রৌদ্রে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে বেশ মজা। স্নান করে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেক গল্পগুজব করলে। বিকেলে কি চমৎকার রোদ! এমন রোদ এবার সারা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিনি। পচা রায় মাছ ধরতে গেল। কুঠীর নীচেই জলের ধারে ঘন বন, তার মধ্যে ঢুকে খানিকটা বসি। এমন ঘন বন যে এদিকে আছে তা জানা ছিল না আমার। জলের ধারে কতক্ষণ বসে গল্প করি পচার সঙ্গে। আকাশের বড় বড় মেঘস্তূপ ক্রমে রাঙা হয়ে এল বেলা পড়লে। আমি উঠে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। এদিকের মাঠ ওদিকের চেয়ে অনেক ভালো। কুঠীর নীচে সেই জলাটার চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। আমাদের ঘাটের ওপরে ডাক্তারদের কলাবাগানে একদল গোয়ালা গরু চরাতে এসে রান্নাবাড়া করচে। তাদের কাছে বসে খানিকটা গল্প করলুম। ওদের বাড়ি ঝিকরগাছার কাছে। ও-দেশ জলে ডুবে গিয়েচে বলে এখানে গরু চরাতে এসেচে।

আজ আকাশের রং অদ্ভুত রকমের নীল, এমন নীল রং সেই আর বছর আষাঢ় মাসের পরে আর কখনো দেখিনি, বৃষ্টি-ধৌত আকাশ না হলে এমন নীল রং বুঝি ফোটে না। মদের নেশার মত কেমন নেশা লাগিয়ে দিল এই আকাশের নীল রংটা। রোদের রং হয়েচে অদ্ভুত—প্রখর সাদা নয়, যেন হলদে ধরনের। গাছপালা ঘাসের রং যেন হয়েচে হলদে। আমাদের ঘাটে নাইতে যাবার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে দূরের বাঁশবন, কাঁদি কাঁদি খেজুর ঝোলানো খেজুর গাছ, অন্যান্য গাছগুলোর রৌদ্রালোকিত পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে। আমাদের ঘাটের ধারে ফুলভর্ত্তি বাব্‌লা গাছ, সাদা-ডানা প্রজাপতি উড়চে—সে দৃশ্যটা মনে অপূর্ব্ব ভাব নিয়ে এল। এই নীল আকাশ থাকবে আরও ষাট বছর পরে, এই বনসিমতলার ঘাট থাকবে তখনও, ওপারের চরে এমনি উলুর ফুল ফুটবে, এমনি সাঁইবাবলার পত্রশীর্ষ বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলে সূর্য্যের আলোর দিকে খাড়া হয়ে রইবে, কত অনাগত তরুণী বধূরা জলসিক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত করে ঘাটের পথে যাওয়া আসা করবে। আমি তখন আর থাকব না এ গ্রামে জানি—তবুও আমার কথা গাঁয়ের এমনি আষাঢ় দিনের হাওয়ায়, নির্ম্মল নীল আকাশের আনন্দের মধ্যে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, সেই দূর ভবিষ্যতের কথা মনে হয়ে

চলমান জগতের রূপ আমার মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনলে।

আজ সন্ধ্যায় কি অপূর্ব্ব শ্রী! অস্তমান সূর্য্যের রঙে সমস্ত মাঠ, বন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—সারা পৃথিবীটা কি অপরূপ শিল্প তাই ভাবি। আকাশের রং নীল নয়—সে কি রং তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন—ওরকম রং-এর কি নাম তা আমার জানা নেই। সন্ধ্যায় নদীজলে নেমে স্নান তো যেন দৈনন্দিন উপাসনা।

আজ এখানে বেড়াবার শেষ দিন। কারণ কাল শুঁটোর বিয়েতে যদি বরযাত্রীদের সঙ্গে যেতে হয়, তবে কাল আর আসতে পারব না। পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব, তার একটু আগে খুকু উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল, তাতে হয়ে গেল একটু দেরি। আমি পচাদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে নেই। গাজিতলায় পথে সে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, তাকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে গেলুম বেলেডাঙার বাঁধের মাথায়। কতক্ষণ সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মরাগাঙের ওপারের চর, খেজুর গাছ, বাঁশবন, জলি ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে পচা রায়ের সঙ্গে গল্প করি। বেলা যখন যায় যায়, তখন উঠে আইনদ্দির বাড়িতে এসে দেখি সে বাড়ি নেই। বেলেডাঙার স্কুলের ওপর কতক্ষণ বসে রইলাম শ্যামল সবুজের বন্যার দিকে চেয়ে! কি দিগন্তপ্রসারী ধান-ক্ষেত, বট-অশ্বত্থের বীথি, নতিডাঙার গ্রামপ্রান্তর, বাঁশবনের সারি, কি বিচিত্র মেঘস্তূপ নীল আকাশে! সন্ধ্যা প্রায় যখন হয়ে এল, তারপরে আমরা ওখান থেকে উঠে আসি। পচা একটা কলার বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করলে। আমি বনসিমতলার ঘাটে এসে নাইলুম। আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে, বনের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; অন্তদিনের চেয়ে আজ বেলা গিয়েচে। সন্ধ্যায় খুকুদের বাড়ি বসে অনেক রকম গল্প করলুম, তারপর উঠে গেলুম পাঁচু-কাকাদের বাড়ি, ওদের বাড়ি কাল বিয়ে, অনেক কুটুম্ব-কুটুম্বিনী এসেচে—পাঁচুকাকার ভাই কণিকাকা এসেচেন জলপাইগুড়ি থেকে—একবার সব দেখাশুনো করে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাওয়া দরকার।

আজ চলে যাব। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে ঘুম ভেঙে উঠলুম—তারপর বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে। বেজায় গুমট গরম, আকাশে সাদা মেঘ। একটু পরে পাঁচুকাকার ছেলে শুঁটো বিয়ে করে নববধূ নিয়ে গ্রামে ঢুকল। সানাই বাজচে, ঢোল-বাজনার শব্দ শুনে কল্যাণী, খুড়ীমা, খুকু এরা সেজেগুজে ছুটল। আমতলায় দেখি সব চলেচে। খুকু একবার চেয়ে দেখলে আমার দিকে। ঐ ঘোড়ার গাড়িতেই আমি চলে এলুম বনগাঁ স্টেশনে। সারা পথ ট্রেনে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল কি অপূর্ব্ব সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটিই আজ শেষ হয়ে গেল!

কলকাতায় এসে কদিন বড় ব্যস্ত ছিলুম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছি—সাঁতরাগাছি ও রাজপুরেও গিয়েছিলুম। পরশু হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে উষা এসেছিল—দেখা করতে এসেছিল মেসে। আমি তখন সবে চুল কাটতে বসেচি। তাড়াতাড়ি যেতেও পারিনে—বসতে বলে যত শীঘ্র হয় চুল ছেঁটে দেখা করে এলুম। উষার নির্দ্দেশমত বালিগঞ্জে গেলুম দুপুরের পর। অনেকগুলি মহিলা ছিলেন সেখানে—সাহিত্যিক আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে—সকাল থেকে বার হয়ে বিকেলের দিকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ি গেলুম রেডিওর বক্তৃতার নকল-টিকে আনতে। কাল রাত্রে রাজপুরে বেগুন, আমি ও স্থুলির দুই ছেলে এক মশারীর মধ্যে

শুয়ে প্রাণ যায় আর কি গরমে আর মশায়! সারারাত চোখের পাতা বোজেনি!

এরই মধ্যে একদিন আয়েলীর সঙ্গে দেখা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গত মঙ্গলবারে। আমি আয়েলীর কথা বলচি নীরদবাবুদের বাড়ি, যে ওই একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দেখা হবে না—কারণ ওর মা ওকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েচে। হঠাৎ সেদিন প্রবাসী অফিসে গিয়েচি, সেখানে দেখা ডাঃ প্রমথ রায়ের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনি। অনেকক্ষণ ওখানে থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প হল পুরোনো দিনের—যখন 'শনিবারের চিঠি' আপিস ছিল মানিকতলায়। প্রমথ এখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—ভারী বন্ধুবৎসল, ছেড়ে দিতে আর চায় না।

প্রমথ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। আমি কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলরের লিস্ট দিতে গেলুম নীরদবাবুর বাড়ি—সেখানে ড্রয়িংরুমে ঢুকবার আগেই মেমসাহেবের গলা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবচি কোন্ মেমসাহেব এখানে এল! ঢুকেই দেখি আয়েলী ও মিসেস এণ্টনি বসে। আয়েলীও আমায় দেখে খুব খুশি হল—ওরা সিঙ্গাপুর থেকে দু'একদিন হল এসেচে শুনলুম। এখন কলকাতাতেই থাকবে। ভারী আনন্দ পেলাম ওকে দেখে—আয়েলী বড় ভালো মেয়ে। ও এখানে পড়ত লা মার্টিনিয়ারে। এতদিন পড়া বন্ধ ছিল, সেইজন্যেই ওর মা মিসেস্ এণ্টনি ওকে আর ওর ছোট ভাই পিটিকে এখানে এনেচে।

কাল বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের ওখানে রাত্রে ছিল নিমন্ত্রণ। মিসেস্ দে বলে যে মহিলাটির সঙ্গে উষার ওখানে সেদিন দেখা হয়েছিল—তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতে আমার আলাপ হয় তাঁর খুব ইচ্ছা। ভদ্রলোকটির নাম কে সি দে—কিরণচন্দ্র দে। কাল সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বাড়ি অনেকক্ষণ কাটানো গেল। বড় অমায়িক লোক স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। ভূরিভোজন হল অবিশ্যি, আইসক্রীম পর্য্যন্ত বাদ গেল না। মনীষা সেনগুপ্তা বলে একটি মেয়ে উপস্থিত ছিল, মেয়েটি ছেলেমানুষ। এবার বি-এ অনার্সে ইংরিজীতে প্রথম হয়েচে, কিন্তু এত লাজুক ও মুখচোরা—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে বললুম। সবাই পড়চে—মেয়েটি লজ্জায় একেবারে দুমড়ে পড়ল—কিছুতেই পড়বে না। তারপর মিসেস্ দে অনেক করে একটা ছোট কবিতা পড়ালেন।

বেশ কাটল সন্ধ্যাটি, সাহিত্যিক আলোচনাতে, গল্পে, আবৃত্তিতে, খাওয়া-দাওয়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরশু ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসে গিয়েছিলুম। কলকাতার মধ্যে অমন চৎমকার ফাঁকা জায়গা বেশী দেখিনি। ওর সন্ধান পেয়ে মনে আনন্দ হল। নীল আকাশ, ফাঁকা সবুজ মাঠ, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মার্ব্বেল চূড়াটা দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের পটভূমিতে, যেন আকাশে ভাসচে বলে মনে হচ্ছে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গা, সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরগুলি জল ছুঁয়েচে। জলের ধারে নাটা ঝোপ, কালকাসুন্দা ও বনবেড়ালী—ঠিক যেন পাড়াগাঁ। অথচ জলের ধারে ছোট বড় ছায়াতরু, সেখানে বেঞ্চি ফেলা রয়েচে—সত্যিই বড় ভালো জায়গা—অথচ বেশ নির্জ্জন—খুব লোকজন বা মোটরগাড়ির ভিড় নেই।

বাড়ি এসেই সেদিন উষার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। সুরেশবাবু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বড় যদিও, কিন্তু ভাগলপুরে থাকবার সময়ে মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সীর মত। অমরবাবুর বাড়ির আড্ডাতে দিনের পর দিন আমাদের কত চা-পানের

মজলিশ বসত। সুরেশবাবু একজন ভালো শিকারীও ছিলেন। শিকারের গল্প করে জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বাবারিঘাটে আমি স্টীমার থেকে নামচি—আজিমগঞ্জ থেকে আসচি অনেককাল পরে ভাগলপুরে—সেই স্টিমারে সুরেশবাবুও আসচেন—উনি তখন বনেলি রাজ স্টেটের এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার—আমায় দেখে বল্লেন—এই যে ম্যানেজারবাবু, কোথা থেকে আসচেন? আর কি সে হাসি, কি সে মনখোলা বন্ধুত্বের স্পর্শ!

পরশু বাড়ি ফিরে উষার চিঠিতে জানলুম সুরেশবাবু আর ইহলোকে নেই। উষারা যেদিন এখান থেকে গেল মজঃফরপুরে, তার পরদিনই সুরেশবাবু মারা গিয়েচেন বলে উষা লিখেচে। অত্যন্ত দুঃখ হয়েচে চিঠিখানা পড়ে। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য্য পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্ দিন মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়া হয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম। ভারী আনন্দ পেলাম বসে কথা কয়ে ওঁর সঙ্গে। বললুম—মাঠে যান এখনও? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?…বল্লুম—ফিলজফার আসেন? বল্লেন—রোজ আসেন, তোমার কথা যে সেদিন বলছিলেন, তুমি আর যাও না কেন? তারপর আলামোহন দাস বলে একজন বড় ব্যবসায়ীর গল্প করতে লাগলেন—তিনি নাকি প্রথম জীবনে মুড়ি-মুড়কি বিক্রি করতেন। এখন ক্রোড়পতি লোক। চার-পাঁচটা মিল আছে।

বললেন—গ্রিন্ বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরে যাব গ্রিন্ বোটে করে ইছামতী দিয়ে।

বললুম—বেশ, আসুন না!

অনেকদিন পরে বুড়োর সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পেলুম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।

গত শুক্রবার অর্থাৎ ২৯শে জুলাই গ্রীষ্মের ছুটির পরে প্রথম বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারী ভালো লেগেচে এবার। খুকুদের দাওয়ায় বসে ক'দিনই সন্ধ্যার সময় কত গল্পগুজব করি। ওরা একদিন খাওয়ালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুকু রান্নাঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এল। আমি গেলেই শতরঞ্চিখানা ঘরের মধ্যে থেকে এনে বড় করে পেতে দেবে—আর ওর মা বলবে, ছোট করে পাত। ছোট করে পাত। কালিঘাটা বেড়াতে গেলুম পচা রায়ের সঙ্গে। রবিবার হাটে গেলুম। বকুলতলা দিয়ে হাট করে ফিরি। খুকু দাঁড়িয়ে আছে, আমি বলচি, খুড়ীমা, কাউকে তো দেখতে পাচ্চি নে? ও বলচে, কেন হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্চেন না? তাড়াতে পারলে তো সব বাঁচেন!

আমি তারপর নদীর জলের একেবারে ধারে গিয়ে বসলুম। লম্বা শীষ্ ও ফুল ফুটেচে, এপারে ঘন সবুজ গাছপালা, নদীর জল আবর্ত্ত করে ঘুরচে—বেশ লাগচে। দিলীপের সঙ্গে সেদিনকার সেই তর্ক মনে পড়ল। থিয়েটার রোডে ওর বাড়ি বসে তর্ক করেছিলুম ওর বই নিয়ে। একজন চাষা আজ হাট থেকে ফিরবার পথে গল্প করছিল—নতা যদি বেশি হয়েচে, তবে আর ঝিঙে তাতে ফলবে না। তার সেই গল্পটা মনে করচি। এই গ্রামের সত্যিকার জীবন—মাটির সঙ্গে সব সময়েই এদের যোগ। মাটির সঙ্গে যোগ হারালে, গাছপালার সঙ্গে যোগ হারালে এরা বাঁচবে না।

বড় বড় বাঁশঝাড়, কত কি বৃক্ষলতা, ষাট বছর পরে যখন আমি থাকব না, তখনও ওরা

থাকবে, হয়তো খুকুও অতি বৃদ্ধা অবস্থায় থাকতে পারে। তখনও ইছামতীতে এমনি ঘোলার ঢল নামবে, বনসিমতলার ঘাটে নতুন মেয়েছেলে কত ফুল নিতে আসবে, হাসবে, খেলবে, জল ছুঁড়বে—যেমন একদিন আমরাও করেছিলুম।

খুকুদের হাসাতুম 'ভাল কি মন্দ? মন্দ হইলে তো গন্ধ হইত' এই কথাটা পূর্ব্ববঙ্গের সুরে বলে। এবার গিয়ে মনে হল এমন বর্ষা-সজল দিনের গভীর আনন্দ কোন বছর এর আগে পাই নি। এ যেন একটা স্বপ্নের মত কেটে গেল—এত সুন্দর সকাল-সন্ধ্যা!

ফাল্গুন মাসে যখন শালমঞ্জরী নিয়ে গিয়েছিলুম, বা যেবার গিয়ে দেখি উড়েরা তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গিয়ে ভাত খাচ্ছে, সেসব দিনের ঘটনা তো এখন পুরোনো মনে হয়—Fresh, ever young! দিনগুলির মধ্যে তাজা আনন্দ তো থাকা চাই-ই, আনন্দের নব নব সৃষ্টি স্রষ্টামনের প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়।

এই সব দিনের সঙ্গে দশ-বিশ বছর আগেকার পুরোনো, ছাতা-পড়া, ভঙ্গুর দিনগুলির যদি প্রতিযোগিতা হয়, তবে স্মৃতির ও আশার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে না। তা হেরে যেতে বাধ্য। সেইজন্যেই সেই সব অসহায়, নিরপরাধ, নিরুপায় দিনগুলির জন্যে মমতা আসে।

নিজের ঘরে বারাকপুরে সেদিন শুয়েচি, শুক্রবার রাত্রে। শুন্‌চি ন'দিদিদের ঘরে খুব গল্প ও হাসির শব্দ। বোধহয় খুকু কোন গল্প করচে ওদের কাছে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে ১৯২৪ সাল থেকে, আজ ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই গল্প তো শুনে আস্‌চি—এ একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে একরাত্রে বারাকপুরের খড়ের ঘরে নির্জ্জন রাত্রে শুয়ে সে অভিজ্ঞতাটি হঠাৎ হওয়াতে খানিকটা এমন অবাস্তব বলে মনে হল যে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চৈতন্যটাকে এর মাটিতে নামিয়ে এনে তবে সে অভিজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করতে পারলুম।

তারপর আর একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অনেক রাত্রে চৌকিদার হাঁকতে বেরিয়ে আমার ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখচে। আমি বল্লুম—কিরে, ভাল আছিস? চৌকিদার বল্লে—হাঁ বাবু, আছি। কবে আলেন বাবু?

তারপর, সে নিজের নিমোনিয়া হয়েছিল, সে গল্প বলতে শুরু করলে। আমার তখন সত্যই মনে হল আমি এই গ্রামেরই লোক—থাকি প্রবাসে কলকাতায়। আসলে আমার বাড়ি এখানেই। সে যে কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি! গ্রামের মাটির সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সেই গভীর রাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেল সুরেন চৌকিদারের একটা কথায়—বাবু বাড়ি আলেন কবে?

রবিবার (১৫ই শ্রাবণ) হাট করতে গিয়ে গোপালনগরের দোকানে দোকানে বেড়িয়েও ঠিক ওই রকম অনুভূতি হল। একজন লোকে তো বল্লে—আপনি কি সেই থেকেই বাড়ি আছেন?

বর্ষা-সজল প্রাতে সোমবারে হেঁটে বনগাঁ এসেও কি তৃপ্তি! ওদের উঠোনে খুকু দাঁড়িয়ে রইল। যখন আসি দরজার কাছেও দাঁড়াল একবার।

বনগাঁয়ে খয়রামারির মাঠে যেখানে সেই মটরলতার ঝোপ, সেখানে-এ বছর প্রথম বেড়াতে গেলুম এদিন। ছোট এড়াঞ্চির জঙ্গল বড্ড বেশী বেড়েচে।

সত্যিই, অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছিলুম দেশে গিয়ে এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ দিনে। শুক্রবার দিন ছিল ১৩ই শ্রাবণ, আমার ছেলেবেলার ওই দিনটি আমার কাছে ছিল একটা বড় উৎসবের দিন, মনসার ভাসান বসত ওই দিনটিতে, আর তিন চার দিন ধরে চলত জেলেপাড়ায় পুরোনো

মনসাতলায়। বন্ধ মটরলতার সবুজ ফলের খোলো যখন দুলত ঝোপে ঝোপে এই শ্রাবণ মাসে, তখনকার দিনগুলির সঙ্গে মনসার ভাসানের সুরেন জেলের নাচ আর গান জড়িয়ে রয়েচে আমার মনে—কতকাল পরে আবার সেই তেরই শ্রাবণ, সেই মনসার ভাসানের উৎসবের সময় বাড়ি গিয়েছি, ঝোপে ঝোপে তেমনি দুলচে মটরলতার কচি সবুজ ফল, মেয়েরা তেমনি নতুন শাড়ি পরে নাগ পঞ্চমীর উৎসবে যোগ দিতে চলেছে নৈবিত্তির রেকাবি হাতে—কেমন করে বাল্যের সেই স্বপ্নজগতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম অতর্কিতে! কিন্তু স্বপ্ন সেটা নয়, কারণ খুকু ছিল। আর হলই বা স্বপ্ন, জীবনের কতখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া তা কি সবাই জানে?

বাংলা দেশের মর্ম্মকাহিনী লুকোনো আছে এই সব নিভৃত পল্লী প্রান্তের আম-বকুল-বাঁশ-বনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন বাংলার কথা শোনাবার জন্যে তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই সব শান্ত উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম্য জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। খ্যাতি-যশের জন্যে বা টাকার জন্যে কেউ লেখে না জানি—Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all—প্রত্যেক আর্টিস্টের মনে রাখা উচিত।

হাঁ, পচা রায়ের সঙ্গে শনিবারের বিকেলে (১৪ই শ্রাবণ) কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গিয়েছিলুম—কি অজস্র সোঁদালি ফুল কুঠীর মাঠের প্রায় প্রত্যেক গাছে! আমি তো অবাক, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সোঁদালি ফুল জীবনে তো কখনো দেখিনি।

ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো কারো গায়ে পড়ে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ যাকে তুমি ভালবাসচো অত করে, সে তোমার ওই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণ যদি করতে না পারে, তবে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট করে ফেলে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে?

যারা বলে, "এ তো স্বার্থপর ভালবাসা হল"—শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ইত্যাদি—এ সব কথার কোন মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়াও যায় না। এখানে এই কথায় খুব গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেয়ে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেলে তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction, তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকে ভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া বালাই বলে ভাবি। তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারব না। সে যত গভীরভাবে আমায় ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—তত আমি ভাবব আমার দিকে ঝুঁকচে, বিরক্ত হয়ে উঠব। সে প্রাণপণে ভালবাসচে, অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চে না—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ার যে সত্যিকার অপূর্ব্ব অনুভূতি যা এ ধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এ রকম ভালবাসা এ ক্ষেত্রে না দেখানোই ভালো।

ভালবাসা জিনিসটা দেওয়া নেওয়ার, আমি যে অর্থে ভালবাসা ব্যবহার করচি সে অর্থে।

যারা ভালবাসা কি কখনো জানে না, সত্যিকার ভালবাসা কি কখনো পায় নি—তারা 'নিঃস্বার্থ' ইত্যাদি বাজে কথা ব্যবহার করে।. ভালবাসা মনের এক অদ্ভুত রসায়ন—উভয় মনের সমান যোগ ভিন্ন এ দিব্য, অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয়, দুর্লভ রসায়ন তৈরী হয় না। যে হতভাগ্য এ আস্বাদ করে নি—সে শাস্ত্র থেকে, দর্শন থেকে, পাজিপুঁথি থেকে বড় বড় নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ায় গিয়ে—কিন্তু যে জীবনে এর আস্বাদ পেয়েছে সে জানে, ওসব লম্বা লম্বা কত অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা, অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ভগবান এইজন্যই বোধহয় মানুষকে ধরা দেন না—অনেক সাধনা যে করে সে তাঁর ধরা দেওয়ার মূল্য দেয়—সহজভাবে ভগবান আমাদের গায়ে এসে ঢলে পড়লে, তাঁর চেয়ে মহকুমার তুলসী দারোগার বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের কাছে বেশী দাঁড়াত।

ওপরের কথা যে বলা হল এটা কিন্তু ভালবাসার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়—অত্যন্ত প্রাইমারী স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার চেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভালো জানে না, সে অবস্থায় কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে পড়াও ভাবে না—তখন দুজনেই দুজনের কাছে খানিকটা রহস্যমণ্ডিত থাকে কিনা—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখন দেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানা রকম চেষ্টা করেও যখন তার মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে না বরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিও।

[এই ডায়েরীটা লিখলাম কেন ? কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু সেটা আজ আর লিখলুম না।]

বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম অনুকূলবাবুর নিমন্ত্রণে। কি অমায়িক ভদ্রলোক ! কি আতিথেয়তা ও সৌজন্য ! সত্যি, অমন ব্যবহার, অমন একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতার আবহাওয়া কতকাল ভোগ করিনি !

বিষ্ণুপুরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরগুলি আমার মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগিয়েচে। প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান এখন লালবাঁধ বলে প্রকাণ্ড দীঘির একপাশে বসানো আছে। অনুকূলবাবুর কাছারীর জনৈক পেয়াদা আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালে। জোড়াবাংলা বলে একটি মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে আমি ও অনুকূলবাবু বসে রইলুম সূর্য্যাস্তের সময়ে। বড় ভালো লাগল।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মাটি রাঙা, সব শাল ও কেঁদো বন—বড় চমৎকার দৃশ্য, কাঁকুরে মাটি, কাদা নেই—খটখটে শুকনো।

দেখি ফিরবার সময়ে দূরপ্রসারী সবুজ মাঠের প্রান্তে দিকচক্রবালের শোভায় বৈকালের দিকে কত কথাই মনে এল ! দূরে আমার গ্রাম—আজ রবিবার, এতক্ষণে সকলে হাটে যাচ্চে। যুগল ময়রার দোকানের সামনে ফণিকাকা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায় করচে—এই ছবিই কেবল যেন মনের চোখে ভাসছিল।

বন্যার জল অতি ভীষণভাবে আমাদের গ্রামের চারিদিক ঘিরচে। আজই সকালে চালকী থেকে এখানে এসেচি। প্রথমে মধু পাগলা (আদাড়ি জেলেনীর নাতি) মাছ ধরচে পাকা রাস্তার ধারে। সে পথ দেখিয়ে দিলে। সাজিতলার বাঁকে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যেন পদ্মা কি সমুদ্রের

মত। থৈ থৈ করচে জলরাশি। আমাদের পাড়ায় রামপদর ঘরে বন্যাপীড়িত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েচে। ন'দিদি তেল দিলে—আমাদের বাড়ির পিছনে শ্যামাচরণ দাদাদের চারা গাবতলায় স্নান করলাম। বরোজপোতার ডোবা দিয়ে তর তর করে স্রোত চলেচে। ইন্দু রায়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলের নৌকো করে খুকুদের চারা আমবাগান দিয়ে গেলুম বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ি। সেখানে একটু গল্প করে এপারে এলুম। বট অশ্বত্থের শ্যামবীথির কি শোভা! সর্ব্বত্র জল, বটতলায় সাঁতার-জল, কিন্তু অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে বটে!

চড়কতলার বাগানে নৌকো চড়ে গোসাঁই বাড়ির রাস্তা দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে নামলুম। হেঁটে সাড়ে তিনটার সময় বনগাঁ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুকুদের বাসায় বসে গল্প করি।

পূর্ণিমার রাত্রে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, সজনী, আমি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সুবল একসঙ্গে বম্বে মেলে খড়্গপুর এলুম। হাওড়া স্টেশনে প্রথমেই হাসির ব্যাপার। একজন উঠে বল্লে, আপনারা কে লণ্ডন যাবেন? আমরা তো হেসে বাঁচিনে। যাচ্চি মেদিনীপুর বলে কে যাবে লণ্ডনে! সজনী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!

খড়্গপুর নেমে মোটরে মেদিনীপুর গেলাম কাঁসাই নদী পার হয়ে। S.D.O. ধীরেনবাবু এসেছিল আমাদের নামিয়ে নিতে। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন সভাপতি, তিনি ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ এক গাড়িতে গেলেন—আমি, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর এক গাড়িতে।

গিয়েই জ্ঞান চৌধুরী উকিলের বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ। প্রায় আশি জন লোক নিমন্ত্রিত। ডিনারের পরে ধীরেনবাবুর বাড়িতে আমরা অতিথি হয়ে রইলুম।

সকালে সভা হল। রাধাকৃষ্ণণ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আমি সে সময় একটা তেঁতুল গাছতলার ছায়ায় বসেছিলুম। তারপর দেবপ্রসাদবাবু ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে নাড়াজোল রাজার গোপপ্রাসাদ দেখে পুরোনো গোপপ্রাসাদে একটা প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বেশ সুন্দর জায়গা এই গোপ, খুব উঁচু মালভূমির মত স্থান, সেগুন ও কেলিকদম্বের বন, বেশ ভাল লাগল। ওখান থেকে কাঁসাই নদীর এনিকাট্ দেখতে গিয়ে আমাদের ফটো নেওয়া হল।

ধীরেনবাবুর বাড়ি দুপুরে ব্রজেনবাবু, সজনী সবারই নিমন্ত্রণ। বৈকালে আবার মিটিং—তারপর বার হয়ে ঝুণু দাশগুপ্ত বলে একটি মেয়ের গান শুনতে যাওয়া গেল ওদের বাড়িতে। ঝুণুর বাবা এখানকার D. S. P.

রাত্রি দুটোর ট্রেনে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম, ধীরেনবাবু ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

মহালয়ার আগের সোমবারে রেজেষ্ট্রি আপিসে বারাকপুরের বাড়িটা রেজেষ্ট্রি করে নিলাম। রামপদ ও পুঁটিদিদি এসেছিল। মহালয়ার দিন খুকু ও খুড়ীমাকে কলকাতায় আনলুম। অন্নপূর্ণার ঘাটে নেমে মদনমোহন ঠাকুর দেখে, Zoo, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও রূপবাণী দেখে রাত দশটার গাড়িতে ওদের নিয়ে ফিরলুম। সেই শনিবারে আবার বাড়ি গেলুম—খুকুদের বাসায় রাত্রে খেয়ে সকালে চালকী। ইন্দু এল। তার সঙ্গে বারাকপুর যাই। এখনও বন্যার জল থৈ থৈ করচে। সমুদ্রের মত। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

• •

একমাসে অনেক ঘটনা ঘট্‌ল। আমি গালুডি গেলুম পুজোর ছুটিতে, সেখান থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলুম। বারাকপুর গিয়ে আট-নয় দিন ছিলুম। বড় নির্জ্জন, বিশেষ করে আমাদের

পাডাটা। সেখান থেকে রোজ মাছ ধরা দেখতে যেতুম নদীর ধারে। ইন্দু মাছ ধরত—ওর একটা জাঁড় আছে, সেটাতে রোজ মাছ পড়বেই পড়বে। গুটুকে থাকত। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল। সম্প্রতি কালীপুজোর আগে কলকাতায় এসেচি।

চূড়ামণি যোগ গেল গত সপ্তাহে। রাত তিনটের সময় উঠে জগন্নাথ ঘাটে ও তারাসুন্দরী পার্কে গিয়ে ভলান্টিয়ারী করলুম। কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে যেতে লাগল, তাদের যথাস্থানে পাঠালুম। আমাদের স্কুলের রামচন্দ্র দত্ত তার সেবা-সমিতির সেক্রেটারী, সে-ই আমায় যেতে বলেছিল।

সকালে ফিরে বনগাঁ গেলুম। খুকুদের বাসায় গিয়ে দেখি খুড়ীমা গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন—খুকুর সঙ্গে গল্প-গুজব করলুম, প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, খাওয়া-দাওয়া করলুম ওখানে।

সম্প্রতি নুটু চাকরি পেয়ে কাল রাত্রে বেলডাঙ্গা চলে গেল। জাঙ্গিপাড়ার বৃন্দাবনবাবু অনেক দিন পরে এসেছিলেন—কাল তাঁর সঙ্গে বসে অনেক কথা হয়, অনেক কাজ করা গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলুম, পরশু এসেছি। প্রথমে খুকুদের নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা সেই দিনই এসেচে। ও ঘর ঝাঁট দিতে এল আমার ঘরে—কত গল্প হল। রাত্রে অন্নদা-শঙ্করের স্ত্রী লীলার গল্প ও চিরপ্রভা সেনের গল্প করলুম। ভোরে উঠে চাল্‌কী। সেখান থেকে বারাকপুর ইন্দুদের বাড়ি। হরিপদদাদা সেখানে উপস্থিত, সে কাঠের ব্যবসা করচে। ইন্দু গল্প-গুজব করলে, সে কচুগাছ পুঁতছিল। আমার বাড়ি গিয়ে চাবি খুলে জিনিসপত্র রেখে স্নান করতে গেলুম। অনেকদিন পরে কুঠীর মাঠে ভূষণের ক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে ভারী আনন্দ হল। তবে বন্যার জলে ছোট এড়াঞ্চির গাছ সব মরে গিয়েছে দেখলুম। স্নান করে বাড়ি গিয়ে রোয়াকে বসে লিখলুম হোটেলের গল্পটা। গুট্‌কে এল—সে ভারি খুশি আমি যাওয়াতে। তাকে নিয়ে বিকেলে হাটে যাই। বিজনের ডাক্তারখানায় গল্প করলুম, নুটুর চাকরির কথা বলি। তারপর মাছ কিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে চাল্‌কী এলুম। পথে লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলুম এক-জন লোককে দিয়ে। বনের মধ্যে সাঁইকাটাতে কতক্ষণ বসে। চাল্‌কী এসে তারাপদর সঙ্গে গল্প—দিদির বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ কথা বলি। সকালে উঠে লিখি। দুপুরের পরে বনগাঁ খুকু-দের বাসায় এলুম। খুকু একটু পরে এসে বল্লে—একেবারে গা ধুয়ে এলুম—আপনার পাল্লায় পড়লে আর তো যেতে পারব না। তারপর কমলের চিঠি, সুপ্রভার কবিতা পড়লে। বেলা পড়ে এল। বল্লে—চলুন, ছাদে যাই, দেখিয়ে আনি। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বল-লুম। মেরী এণ্টয়নেট ছবির গল্প করি। নিস্তব্ধ বৈকাল, ছায়া পড়ে আসচে খয়রামারির দিকে। বেশ লাগল। চোদ্দ বছর বয়সে কি দেখেছিল সে সম্বন্ধে কথা। তারপর চা খেয়ে ওখান থেকে বার হয়ে শিচুতলায় এলুম। আগের দিন যখন রাত্রে থাকি, বেরুবার সময় বল্লে—সকাল করে আসবেন, দেরি করবেন না। শিচুতলায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা, রাত আটটার ট্রেনে কলকাতা।

আজ নীরদবাবুর বাড়িতে সোমনাথবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হল। তারপর পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম। বেশ লাগছিল শহরের এই জনস্রোত। মেট্রোর সামনে খুব ভিড়, **Marie Antoinete** ছবি দেখানো হচ্ছে, নর্ম্মা শিয়ারার নেমেচে প্রধান ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস, কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।

পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা। কেউ নেই আমরা। সাধনা বোস প্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয়তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউ জানে না। জীবনে চিত্র-নাট্যপটে কত অদ্ভুত পরিবর্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে। গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।

এই তো জীবন—এই যাওয়া, এই আসা, এই পরিবর্তন। দেখতে বেশ লাগে।

আমি সবটা মিলিয়ে দেখি—একটি চমৎকার সিনেমার ছবি।

এই খুকু, এই সুপ্রভা, বনসিমতলার ঘাট, আমি—কে কোথায় মিলিয়ে যাব।

হুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ। জাহ্নবীকে আনতে গিয়েছিলুম—খুকু-দের বাড়িতে গেলুম, কতক্ষণ গল্প করার পর বাইরে জ্যোৎস্না উঠেচে দেখে বাইরে এলুম—ও বল্লে, ছাদে চলুন। ছাদে গেলুম, খুড়ীমা এল না দেখে ও বল্লে—মা এল না। দুজনে কত গল্প করলুম, নতুন ব্লাউজের গল্প, কি করে সেটা ছিঁড়ে গেল তাই নিয়ে হাসাহাসি। পরদিন দুপুরে গিয়েচি, কত গল্প, কেবল বলে, 'বসুন বসুন'। তারপর গাড়ি এসেচে, জাহ্নবীকে নিয়ে যাচ্চি, ও দেখি ছাদের ওপরে উঠেচে। আমি ওদের বাড়ি যাচ্চি দেখে নেমে এল। বাইরের দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। তারপরেই পান হাতে করে এল। চায়ের কাপ যে আলমারিতে থাকে, সেখান থেকে টাকা দিলে। ও খুঁজে পায় না—আমি খুঁজে বার করলুম।

সারাপথ ট্রেনে কি আনন্দেই গেলুম। আনন্দেই ভোর। সে আনন্দের ভাবনা আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্না-ভরা গত রাত্রির ছাদে কথা, ইছামতীর দৃশ্য, ওর সেই নতুন ব্লাউজের গল্প কেবলই মনে হয়।

মামার বাড়ি যাবার আগে জাহ্নবীদের কলকাতা নিয়ে ঘোরালুম। মামার বাড়ি গেলুম সন্ধ্যার সময়। ভোর রাত্রে দধি-মঙ্গল হল। তখনও ঘুম ভেঙে উঠেই কি সুন্দর ভাবনা! আনন্দের চিন্তাতেই ভোর। সারাদিন ওই একই চিন্তা। অন্য চিন্তাই নেই। সেই রাত্রি, সেই জ্যোৎস্না-ভরা ছাদ, সেই ব্লাউজের গল্পের স্মৃতি। বিয়ে হয়ে গেল। তার পরদিন এক রকম কাটল। শুক্রবারে বৌ-ভাত। খুব জাঁক-জমকেই বৌ-ভাত হল। বিভূতির মা এলেন, বিষ্ণু এল বারাকপুর থেকে। শনিবার ওদের নিয়ে আবার বনগাঁ। আবার কত কথা, কত গল্প। ও বল্লে, যা কিছু শিখেছি আপনারই জন্যে, আপনি কত বিদ্বান, আমি তো কিছুই জানিনে কি করে যে আপনার সঙ্গে এমন হল! দেখুন, সংসারের কোন কাজে মন বসাতে পারিনে—মন হু হু করে, কেবল ওই সব কথা ভাবি।

আমি দেখলুম—আমারও তো ওই রোগ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! বল্লে, কোথাও তার আগে নিয়ে চলুন। জীবনে অনেক বেড়াব কিন্তু আপনার সাহচর্য্য তো আর পাব না।···

ভগবানের অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ দান এই জীবনের অমৃত-ধারা। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে তা অনুভব করচি—আজ সাত বছর ধরে, ১৯৩৪ সাল থেকে। এর তুলনা নেই। এ আনন্দের বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা নেই। কতকাল চলে যাবে—তখন খুকুও থাকবে না, আমিও থাকব না—কে জানবে ইছামতী তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালি-বকুল গাছের নিবিড় ছায়ার ছায়ায়, কত হেমন্তের দিনের সন্ধ্যায়, কত শীতের দিনের জ্যোৎস্নায় দুটি প্রাণীর মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল!

আকাশে তার বার্ত্তা লেখা থাকবে, সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটির বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত

যুগের প্রণয়ীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।

কাল বৈকালে বিশ্বনাথ ও আমি বৈকালের ট্রেনে এলাম। এসেই সারারাত মিউজিক কনফারেন্সে গান শুনেচি। এসেচি রাত চারটার সময় বিখ্যাত কেশরী বাঈ ও বরোদার লছমী বাঈয়ের গান শুনে। বেনারসের পুরস্কার মিশ্র ও বিলায়তুর সানাই বাজনা সত্যিকার উপভোগ করবার জিনিস। কেশরী বাঈ যখন বসন্ত-বাহার আলাপ আরম্ভ করলে তখন আমাতে যেন আমি নেই মনে হল—যেন শৈশবে আমাদের গ্রামে শতমধুর বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলুম এক মুহূর্তে। কত মধুর অপরাহ্ণের ছায়ায় অতীত দিনের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে আমার অতি প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান যেন অস্পষ্ট হয়ে এল—বুঝলুম না কোনটা অতীত, আর কোনটা বর্ত্তমান। কেবল এইটুকু বুঝলুম, গান শুনতে শুনতে আমার মন আরও একজনের জন্তে খুব খারাপ হয়ে উঠল—আজই তাকে ছেড়ে এসেচি, কেবলই মনে হচ্ছিল এত মেয়ের মধ্যে কন্ফারেন্সের সভায়, আমার যেন কেবল তার কথাই মনে পড়েচে, অবশ্য সেই বয়সের মেয়ে দেখলে। এবার বড়দিনের ছুটি কি আনন্দেই কেটেচে—ওকে নানা রকম গল্প করে ও কত রকমের কথা বলে। সে সব এমন চমৎকার যে সারা বড়দিনের ছুটি কেমন যেন নেশার মত আনন্দের ঘোরে কেটেচে। সকালে দেখা করতে যেতুম—একদিন 'বাজার করব' বলে তাড়াতাড়ি করচি, বল্লে—কেন এখুনি যাবেন? বল্লুম—বাজার না করলে বাড়িতে বকবে জাহ্নবী। ও বল্লে—আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্তে কত বকুনি সহ্য করেচি মার কাছে! আপনার তো ছোট বোনের বকুনি!

খুড়ীমা দুদিন ভাগবত শুনতে গেলেন—আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করলুম কত ধরণের। বেশ কাটল ছুটিটা। কোন ছুটি এত আনন্দে কেটেচে কিনা এর আগে বলতে পারি নে। ভালবাসার প্রকৃত রূপ কি তার কতটা যে বুঝলুম!

হাওড়া টাউন হলে ওঁরা আমায় এক সম্বর্দ্ধনা করে মানপত্র দিয়েছিল ছুটির আগেই, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আশীষ গুপ্তের মোটরে রাজপুরে ফুলিদের ওখানে গিয়েছিলুম, সেও বড়দিনের আগে। ১৯৩৮ সালটা সর্বদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।

এবারকারের আর একটি চমৎকার ঘটনা, ভাগলপুরে স্থরেন গাঙ্গুলী মশায়ের সেই চেকভের Cook's Wedding বইখানা—যা পড়ে মুঙ্গেরে কোম্পানীর বাগানে, বড় বাসায় গঙ্গার ধারে আজ চোদ্দ বছর আগে কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছিলুম—তা পড়লাম বসে—সেই বইখানাই (স্থরেন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে এনেছি, বইখানা শরৎচন্দ্রের) বারাকপুরের বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লুম। আশ্চর্য্য—না!

সুপ্রভা এবার একটা ভালো ক্যালেণ্ডার পাঠিয়েচে।

মনে আছে এই শীতকালে পাটনার ডিস্ট্রিক্ট জজের বাড়ি গঙ্গার ধারে বেঠোফোনের মিউজিক শুনতে গিয়েছিলুম গ্রামোফোন রেকর্ডে, নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে সকাল বেলা। ওপারে ধু ধু গঙ্গার চর, শীতের নদী, বড় বটগাছটা—আমাকে কেবলই মনে এনে দিয়েছিল একটি মেয়ের কথা। সে যেন কোথায় দূরে আছে, শিউলি বকুলের ছায়ায় ছায়ায় তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুপুরে, সকালে, বৈকালে, সন্ধ্যায় ছায়া ঘন হয়ে যখন নামে। যখন চা-পার্টি বসল পাটনায় গবর্নমেণ্ট উকিলের বাড়ি সন্ধ্যাবেলা—তখনও রাঙা রোদ মাখানো বাইরের গাছপালার দিকে চেয়ে ওর কথাই ভেবেচি। আর কি আনন্দেই মন ভরে উঠত!

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হল পরশু, সরস্বতী পুজোর দিন। সজনীবাবু, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর সবাই গিয়েছিল আমার বাসায়। সজনীবাবুর সঙ্গে খুকুর দেখা করিয়ে দিলাম। দুলুর মা, মাধব ঘোষাল, রমাপ্রসন্ন, গৌরবাবু, সব সকালে গিয়েছিল মোটরে। ওদের নিয়ে গেলুম বারাকপুরে। খুকুদের বাসায় চা খেয়ে গেল সবাই। বারাকপুরের আমার ঘরের মধ্যে বসল। ইন্দুদের বাড়ি সব গেল চা খেতে। আমাদের পুরোনো ভিটে দেখলে। মায়ের কড়াখানা দেখলে—তারপর বরোজপোতার বাঁশবাগানে গিয়ে সবাই পড়ল শুয়ে। কিছুক্ষণ পরে মোটর মেয়েদের নিয়ে এসে পৌঁছল। দুলুর মা আর খুকু দেখি বাঁশবাগান দিয়ে চলেচে নদীর ঘাটে। দুলুর মা বাঁশবাগানে এসে দাঁড়াল। তারপর আমরা যখন নদীর ঘাটে যাচ্চি, তখন দেখি খুকু আর দুলুর মা আর উমা আসচে। আমরা কুঠীর মাঠে গেলুম, ভাঙা কুঠীটা দেখলুম। তারপর মেয়েদের রেখে প্রথম আমরা এলুম বনগাঁয়ে। মেয়েরা পরে এলেন। সজনী, ব্রজেনদাকে নিয়ে গেলুম খুকুদের বাড়ি। খুকুর সঙ্গে কথা হল। তারপরে বিরাট সাহিত্য-সম্মেলন স্কুলের হলে। সত্যবাবুর পার্টির পরে সবাইকে রওনা করে দিয়ে খুকুদের বাড়ি এসে গল্প করলুম। খুকু কাছের চেয়ারে বসে কাদম্বরী পড়লে। ও আর আমি দুজনে গ্রামে কেমন বেড়ালুম।

বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনে তারাশঙ্করদের বাড়ি এসে ক'দিন বেশ কাটালুম। কাল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে বীরভূমের উদার, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। জ্যোৎস্নালোকিত মাঠের মধ্যে বসে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমাদের যে অভাব পূরণ হয়, তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করেচে। এই কথাটাই লাভপুরে এসে পর্য্যন্ত মনে হয়েচে—বিশেষ করে কাল ওই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বসে দূর দিগন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তালীবনের দিকে চেয়ে চেয়ে—আজ স্তব্ধ রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই কথাই মনে হয়েচে বা কাল নির্ম্মলশিববাবুদের বাড়ির পেছনে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একা বসে ওর যে ছবিটি মনে এসেচে সেটি হচ্চে—এই শনিবার, ছাদে দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়িখানা সাগ্রহদৃষ্টিতে দেখচে।

মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। তারপর সে চলে গেল। একদিন আমার মেসে এল সকালে প্রীতি সেন বলে একটি মেয়ের সঙ্গে। ওকে শেয়ালদ' স্টেশনে তুলে দিয়ে এলুম। তারপর বাড়ি গিয়ে খুকুদের সঙ্গে এসব গল্প করি। খুড়ীমার অসুখ হয়েচে। খুকু ও আমি বসে অনেক গল্প করি। মনোরমা ও তার বরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর গেলুম। প্রচুর আমের বউল হয়েচে দেশে, বউলের ঘন গন্ধ সর্ব্বত্র। ন'দিদির সঙ্গে গল্প করি। কিশোর বোষ্টম রোয়াকটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। বরোজ-পোতার বাঁশবনে ডোবার ওপারে কি চমৎকার একটা চারা শিমুল গাছে শিমুল ফুল ফুটেচে। শ্যামাচরণদা'র সঙ্গে গল্প করি। খুকুদের বাড়ির দিকে কেউ নেই—যেন শূন্য! খুকুর কাছে সে গল্প করি দুপুরে গিয়ে। খুকু বলে, 'বসুন, জিরিয়ে যাবেন।' তারপর মাধব ঘোষাল একদিন তার বৌদিদি, মাসীমাকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়ে বাঁশবনে বসল—মায়ের কড়াখানা দেখে এল। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একদিন Salt Lake দেখতে গেলুম।

পরশু গিয়েছিলুম ছুটুর কর্ম্মস্থলে বেলডাঙা। আজ ফিরেচি। কাল এমনি সময় মাসীমা,

বৌমাকে নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার ধারে ঠিক যেন ইসমাইলপুরের মত মনে হল। তারপর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে ভাবলুম!

আজ ফিরেচি তিনটের ট্রেনে। দুপুর রোদে সারাপথ ঘুমিয়েচি—তবে, বীরনগরের কাছে ঘেঁটুফুল দেখেচি খুব। দূরে এই ফাগুন দুপুরে একটি মাত্র গ্রাম এত গ্রামের মধ্যে, যেখানে একটি মাত্র মেয়ের কথা মনে হয়। শিউলিতলায় ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল কমিটির মিটিং ছিল, মিটিংএর পর স্কুলের ছাদ থেকে বড় অনুভূতি হল অনেক দিন পরে। 'জনতার মাঝে জনগণপতি' গানটি বহুদিন পরে গাইলুম—সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি আবার মনের মধ্যে ফিরে পেলুম। তখন খুকু ছিল না—যখন গাইতুম পঞ্চানন মামাকে পড়াবার সময়ে।

ট্রামে আসতে আসতে ভাবছিলুম, সেই যে নাগপঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে বারাকপুরে গিয়েছিলুম, খুকুদের বাড়ি যেতুম, ওদের হাসাতুম, 'ছোড় দি, ভাল কি মন্দ' বলে—তারপর যেন আর কখনো বারাকপুর যাইনি—ওকে আর দেখিওনি। ও চলে যেন কাছ দিয়ে, আমি হাত বাড়িয়ে চালের বাতা থেকে কাপড়ের ফালি পাড়তুম—ও বলত, মা রেখেচে তুলে, হাত দেবেন না। তারপর যেন এই দীর্ঘ সাত-আট মাস ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

খুকু একরকম ঠেলেই বারাকপুরে পাঠালে এবার। মহরম ও দোলের ছুটি আর বছর কেটেছিল গালুডি, এবার বনগাঁ। খুব আনন্দে কাটিয়েচি। চারদিন খুকু ও আমি একবার সকালে একবার সন্ধ্যায় বসে গল্প করতুম। একদিন ওকে নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার Radio talk-টা পড়ে শোনালুম।

ঝম্‌ঝম্ দুপুরে গেলুম বারাকপুরে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের কি সুগন্ধ! বিশেষ করে চাল্‌কী আর বনগাঁ থেকে বার হয়েই। চাল্‌কী মুসলমান পাড়ার মধ্যে, গাজিতলার রাস্তায় বাঁশবনে একা চুপ করে মাঝের বাড়িখানার সামনে বসে রইলুম। বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলুম। কোকিল ডাকচে অনবরত। সেদিন মাধব ঘোষালেরা মোটরে বেড়াতে এসে ওর বৌদিদি ও মাসীমাকে নিয়ে এই বরোজপোতার বাঁশবনে বসেছিল।

কাল শনিবার বেলডাঙা গিয়েছিলুম হুটুর কাছে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের শোভা যা দেখলুম, তাতে মন মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই ফুলটা বেশী আছে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে এবং রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইনের দু-ধারে, আর আছে বীরনগরে স্টেশনের সামনের মাঠে। কেমন একটা মিষ্টি অথচ ঈষৎ তেতো গন্ধ বার হয় ফুল থেকে! মুর্শিদাবাদ লাইনে ঘেঁটুফুল নেই, বেলডাঙা ছাড়িয়ে বহরমপুরের পথে কিছু আছে, আর আছে 'পাগলাচণ্ডী' বলে স্টেশনের কাছে।

সন্ধ্যার আগেই বেলডাঙা থেকে ফিরলুম মামীমাদের নিয়ে, সারাপথ দূরে একটি গ্রামের ঘেঁটুফুলের বনের কথা চিন্তা করেচি, তার বনসিমতলার ঘাট, তার শিউলিতলা, আমতলা এই বসন্তে কি মধুর হয়েচে! একটি মেয়ের কথা মনে হয় ঝম্‌ঝম্ দুপুরে তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধের মধ্যে, সে শিউলিতলার পথ দিয়ে লেবুতলার পাশ দিয়ে আমতলার উঠানে আসচে চুপি চুপি! ...এ একটা ছবি, যা এ সময় বড় মনে আসে...

•

গত শনিবারের আগের শনিবার মাধব ঘোষাল একটা গ্রামোফোন দিলে। তাই নিয়ে বনগাঁ গেলুম। খুকুকে খুব গান শোনালুম, 'খনা' ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম ওদের সকলকেই।

খুকু একখানা পাপোশ বুনেছে দড়ির। সেখানা আমায় হাসিমুখে নিয়ে এসে দেখাতে লাগল—দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—দেখুন, কেমন বুনেছি, ভালো না?

—বেশ ভালো, চমৎকার।

—না সত্যি বলুন।

—না না, বেশ।

তবুও যায় না। পাপোশখানা হাতে নিয়ে সাগ্রহ মুখে দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

তার সেই হাসি-হাসি মুখখানা বেশ মনে পড়ছে এখনও। সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানা।

গতকাল রামনবমীর হাফ্ ছুটি পেয়ে রাজপুরে ফুলিদের বাড়ি গেলুম। ওরা সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে আছে। অনেকদিন পরে সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে গেলুম। সেই পুকুরধারটিতে কতকাল পরে আবার দাঁড়ালুম। আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হয় এই পুকুর-পাড়ের ঐ দেবদারু গাছটা দেখে। কি অপূর্ব্ব ভাবই হত মনে!

এই শনিবারে (২রা) বাড়ি গিয়ে মুখুজ্যেদের ওখানে খুব গ্রামোফোন বাজানো গেল। গত ঈস্টারের ছুটিতে খুকুকে গ্রামোফোন শোনাব বলে বনগাঁয়ের ডাক্তারবাবুকে কত বলে ব্যারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিলুম। এবার ও নিজেই একটা গ্রামোফোন পেয়েচে মাধব ঘোষালের কাছ থেকে। আমার রেকর্ড চেয়ে আনতে বলেছিল। ওরাও দেখি, দিলীপ রায়ের আর বছরের ভাল গান 'এই পৃথিবীর পথের পরে' প্রভৃতি ভাল গানগুলো পেয়েচে। সেদিন রবিবারে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আমায় উঠতে দেয় না—কেবল বলে—"এইটে শুনে যান না! লাইলি মজ্নুর পালাটা শুনে যান।" বহু লোক এসেচে, চা করচে খুব, আর বলচে—"রবিবার দিনটাই কি সব যত ভিড়! অন্য দিনও তো আসলে পারত গান শুনতে।" ওর জন্যে প্রাণপণে ঘুরে রেকর্ড সংগ্রহ করেচে ওর দাদা, বনগাঁর সব জায়গা ঘুরেচে! আমায় বলেছিল—আমিও অপূর্ব্ববাবুর বাড়ি থেকে, দেবাশীষের কাছ থেকে, গণপতিবাবুকে বলে নানা জায়গা থেকে অনেক রেকর্ড যোগাড় করেচি। বীণা চৌধুরীর গান, দিলীপের, জ্ঞান গোঁসাই-এর গান ইত্যাদি। ভারী উৎসাহ লেগেচে রেকর্ড সংগ্রহ নিয়ে ও গান বাজানো নিয়ে। সেদিন বল্লে—এবার টিপ আনবেন আমার জন্যে!

বল্লুম—বেশ।

—আর কি আনবেন?

—বল না।

—কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

—যেও, ভালই তো।

—টিপ আনবেন ঠিক।

মধ্যে গেলুম রাজসাহী নওগাঁ। রাত্রে মোটর নিয়ে গেলুম মহাদেবপুর জমিদার বাড়ি। সেখান থেকে পাহাড়পুর। প্রায় সত্তর মাইল মোটরে বেড়ানো গেল। এ শনিবারে বনগাঁ গিয়েচি—পান্নারা নিয়ে গেল বাসে। যখন যাচ্ছি তখন খুকু দেখি জানলার কাছে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্চে। সকালে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল—আমায় বল্লে, টিপ ফুরিয়ে গিয়েচে, টিপ আনবেন কিন্তু।

আজ একুশ বছর পরে বারাকপুরে কালীর সঙ্গে বেলডাঙা বেড়াতে গিয়ে মরগাঙের ধারে সেই উঁচু জায়গাটাতে বসলুম। ১৯১৮ সালের যে মাসে প্রথম শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে বসে গল্প করেছিলুম। আজ আবার এত বৎসর পরে ওর সঙ্গে মরগাঙের ধারে বসেচি সেই মে মাসেই। জীবনের কত ঘটনা তারপর ঘটে গেল—গৌরী এখানে এল, তাকে নিয়ে পানিতরে গেলুম—সে মারা গেল—তারপর জব্বলপুর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, আবার কলকাতা, ভাগলপুর—আবার কলকাতা, (১৯৩৩—৩৯)—কত কি, কত কি। আবার এতকাল পরে ও এসেচে, ওর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে এসেচি বেলডাঙায়। ওর সঙ্গে অনেক গল্প করে আইনদ্দির বাড়ি গিয়ে দুজনে বসি। ওবেলা আমগাছে পরগাছা হয়েছিল তাই তুলে এনেছিলুম। খুকু তাই পরে এসে দেখালে কেমন দেখাচ্চে।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—এতদিন পরে বেশ লাগচে। আবার শুরু হয়েচে শিউলি-তলার উঠোনে আসা-যাওয়া—নারকোল গাছের পাতায় লণ্ঠনের আলো পড়া—সেই সব প্রতি বছরের মত।

বিকেলে একটা সোঁদালি গাছে ঠেস্ দিয়ে কুঠীর মাঠে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তারপর বনসিমতলার ঘাটে এসে দেখি খুকু ঘাট থেকে পথে উঠেচে। খুড়ীমা তখনও জলে। ওরা উঠে চলে গেল, আদাড়ি এসে নামল জলে। আজ কি চমৎকার কালবৈশাখীর কালো মেঘ করে এল কাঁচিকাটার দিকে। জলে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপরে শিমুলতলায় এসে দেখি উত্তর মাঠে কালবৈশাখী আরও নিবিড় হয়ে আসচে। কত কথা মনে করিয়ে দেয় এই বারাকপুরের কালবৈশাখী—এমন আর কোথাও যেন দেখিনি। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসা সার্থক এই কাল-বৈশাখীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায় বলে। বারাকপুরে আজকাল জীবনটা নানা সুখেদুঃখে হর্ষবেদনায় স্পন্দমান, পুরোনো দিনের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—তাই হয়েছিল কিন্তু দিনকতক, ১৯২৩—১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত। অদ্ভুত ধরনের জীবন্ত দিন আজকাল—তবে বোধহয় এইবার যেন আরও বেশী। পরশু সুপ্রভার পত্র পেয়েচি—রত্নাদেবীর চিঠিতে তিনি লিখচেন তাঁদের ওখানে যেতে। দেখি কতদূর কি হয়।

আজ সকালে যখন কুঠীর মাঠে গিয়েচি, তখনই দূরে কোথাও আকাশের কোলে মেঘ ডাকচে। কি সোঁদালি ফুলে-ভরা মাঠের শোভা! ওপাড়ার ঘাটে যখন নেমেচি জলে, তখন মেঘের কি শোভা! ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওলট-পালট খেতে খেতে মাধবপুরের মাঠের দিকে উড়ে চলেছে—তারপরেই এল ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। খানিক পরে উঠল রোদ। খুকু ওই অত বেলায় উঠে যাচ্চে ন'দিদির বাড়ি থেকে—আমি বলতেই হেসে চলে গেল। তারপর সারাদিনের মধ্যে কতবার এল গেল—নানা ছুতোয়। আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছি—দুবার এসে খানিকক্ষণ করে রইল। বলে—এক পা এগিয়ে যাই তো দু' পা পিছুই। কেন তা কি জানি। সে কথাটা ওদের দাওয়া থেকে নেমে ছুটে এসে আমতলায় বলে চলে গেল। বিকেলে গোপাল-নগর থেকে এসেচি—ও অমনি এল শিউলিতলায়। খানিকটা পরে নাপিত-বৌ আসাতে আমি চলে গেলুম গা ধুতে। ভূষণ মাঝির জমির ওপারে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—সে দিকে চেয়ে আমার কি আনন্দ—এমন অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি কোথাও হয় না কেন তাই ভাবি। জলে গা ধুতে নেমেও যেন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বনসিমতলার ঘাট, এককালি চাঁদ আকাশে,

কুঁচ-কাঁটার জঙ্গল—ঘাটে স্নানরত খুকুর দিদি—বিশেষতঃ ঘাটের পথে—এই সব মিলে কি আনন্দই এল মনে! অপূর্ব্ব আনন্দে কাটচে গ্রীষ্মের ছুটিটা। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আজ না জানি কি ঘটবে। খুকু থাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্চে। আনন্দের উৎসমূল তো ওই-ই।

আজ ভারী চমৎকার কালবৈশাখী হয়ে গেল বিকেলটাতে। কালবৈশাখীর যে অপূর্ব্ব প্রকাশ এখন সন্ধ্যার কিছু আগে। একটা চাপা রাঙা মেঘ হয়েচে এমন অপরূপ। কাল চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েচি। সে লিখেচে—বাবা আপনি একবার এখানে চলে আসুন। লিখতে লিখতে মেঘটা অতি অপরূপ রাঙা রং ধরেচে। ব্যারাকপুরে এবার অতি সুন্দর কাটচে —তবে ঝড়-বৃষ্টি অতি কম—ক'দিন তো বেশ গরম গেল।

আমি আর কালী, কুঠীর গাছে ডুমুর পাড়লুম। তারপর বেলডাঙা যেতে যেতে ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় পেলুম। ঘোষেদের দোকানের মধ্যে আমি, কালী, আইনদ্দির নাতি আর দোকানদার মহু ঘোষ। ঝড়ের বেগে দোচালা জীর্ণ ঘর উড়ে যায় আর কি—সবাই মিলে বাঁশ ধরে থাকি—তবে রক্ষা হয়। তারপর দেখি বড় অশ্বত্থ গাছটা পড়ে গিয়েচে। আমার নারকোল গাছটাও পড়েচে। খুকুরা নারকোল কুড়িয়ে রেখেচে সব। খুকু সন্ধ্যার সময় আমায় লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বল্লে, আজ খুব ভালো গল্পের দিন। যাবেন না আমাদের বাড়ি? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমায় নিতে আসে—ছুতো করে ন'দিদিদের বাড়ি আসে আমায় নিয়ে যেতে। যাবার সময় বলে—যাবেন কি?

আর বিকেলের দিকে অপূর্ব্ব কাজল মেঘ করে এল—থমকে রইল, বৃষ্টি হয় না। খুকু আজ সকাল থেকে কতবার যে এল! আমি বেলডাঙার বেড়াতে গেলুম, পুলের এধারে ঘাসের ওপরে বসি। খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি খেজুর, শিমুল বাঁশ বনের মাথায় কালো কাজল মেঘ (খুকুকে দুপুরে বলছিলুম আমতলায় যখন সে দিলীপ রায়ের 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' বইখানা দিতে এল—তুই বলতিস—কা-লো-কাজল মেঘ) সব সুদ্ধ মিলে বড় অপূর্ব্ব লাগল।

এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজের শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেছে। পৃথিবীর উর্দ্ধে এই শ্যামল মেঘ-স্তূপ যেমন শান্ত, স্থির তেমনি নির্ব্বিকার। মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি। সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরে এলুম—খুকু মনোরমার মার সঙ্গে বাঁশতলার পথে ঘাটে যাচ্চে। তাকেও এই উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেব।

আজ দিনটি সব দিক দিয়ে ভারী চমৎকার। বেশ মেঘ করে এল, ঘন আমতলায় চেয়ার পেতে বসে দাওয়ার কোণে দণ্ডায়মান খুকুর সঙ্গে কথা বলচি। দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকে কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমি ও গুটকে মোল্লাহাটি কুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অত্যুন্নত খেজুর গাছ, জলি ধানের ক্ষেত পথের দু পাশে, একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে। ফিরবার পথে খুব আমরুল পাড়লুম দুধারের গাছ থেকে। বেলা পাঁচটায় সময় ফিরে রোয়াকে এসে বসেচি, খুকু

এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

আজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েচি, অপরূপ নীল মেঘ ওপারের চরের ওপরে ঝুলে পড়েচে। তাড়াতাড়ি এসে খুকুকে ডাকলুম—খুকু, খুকু, উঠে মেঘের অপূর্ব্ব রূপ দেখে যা—ও ঘুম ভেঙে উঠে ঘুম-চোখে মশারীর বাইরে মুখ বার করে বলল, আজ এত কাল পরে বর্ষা নামল বোধ হয়। পথঘাটে কালো এত ধুলো—যে একখানা গরুর গাড়ি গেলে ধুলোয় সর্ব্বাঙ্গ ভরে যায়। শেষ জ্যৈষ্ঠে এমন শুকনো খট্‌খটে রাস্তা, এমন ধুলো কখনো দেখিনি। আজও ধুলো ভেজেনি পথের। এ বৃষ্টিতে দিনটা ঠাণ্ডা হল মাত্র।

এবার গ্রীষ্মে ছুটির প্রতিদিনটি যে আনন্দ বহন করে আনে, তা মনের আয়ুকে যেন বাড়িয়ে দিয়েচে। দেহের যৌবনের ন্যায় মনের একটা যৌবন আছে, মনের যৌবন চায় নব আনন্দ, নব নব ভাবরাজি, আশা, উৎসাহ, সৌন্দর্য্যময় চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি, বিরাটত্বের স্বরূপ উপলব্ধি। এবারকার মত সোঁদালি ফুলের মেলা, তুঁত ফুলের ও বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ অন্তবার দেখা যায় নি, কারণ এবার ঝড়-বৃষ্টি বাদলা নেই বল্লেই হয়—খুকু এখানেই আছে, সে সর্ব্বদাই আসচে, গল্প করচে, গোপালনগরে বারোয়ারীর যাত্রা হবে, আমার বাল্যবন্ধু কালী অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছিল, এই সব নানা কারণে গ্রীষ্মের ছুটিতে এমন আমোদ অনেক দিন হয় নি। খুকু এই সবে ন'দিদির ঘর খুলবার ছুতো করে এসে গল্প করে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে। এই সব বিরাট আকাশের তলে, বন-গাছের ছায়ায় যে সব সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র প্রবাহ চলেচে—তার সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েচি যেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম আসি বারাকপুরে, এটি ১৯৩৯ সাল। এই এগারো বছর কি চমৎকার কাটল! কত বর্ষার শ্যামল-মেদুর আকাশ, কত হেমন্ত-জ্যোৎস্না রাত্রি, কত শীতের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা নানা অনুভূতিতে মধুর হয়ে উঠল। আমার জীবনের ১৯২৯-১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই যে সময়টা চমৎকার সময়।

ছুটি ফুরিয়ে এল। আর দশ-এগার দিন। কিন্তু এবার যেমন বৃষ্টি একদিনও হয়নি—ব্যাঙ-ডাকানি বর্ষা, সারারাত ধরে বৃষ্টি-ঝড়; সে সব হয়নি বা নাইবার সময়ে ঘাটের পথে খাপরা কুচির ওপর দিয়ে জলের তোড় চলে যায়—কেঁচোর দল জলে বুকে হেঁটে যায় এ-ও এবার হয়নি। মাস ফুরিয়েচে। হাজ্‌রী পাগলার মাকে সেদিন পর্য্যন্ত আমবাগানে আম কুড়ুতে দেখেচি—আজকাল আর দেখিনে।

ক'দিন বারোয়ারির আসরে গোপালনগরে গণেশ অপেরা পার্টির গান হল। রোজ শুনতে যেতুম—একদিন তো বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে নেমে যাত্রা শুনে রাত দু'টোতে ফিরি। শেষদিন যাত্রা হল হাজারি প্রামাণিকদের বাড়ি। সুধীরদা, জিতেন, আমি—তাস খেলা হল সন্ধ্যাবেলা। কারণ খুব মেঘ ছিল আকাশে, টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে যাত্রা আরম্ভ হতে পারেনি।

ছুটি শেষ হয়ে এল প্রায়। বাঁশবনে পিপুল লতার বন দেখা দিয়েছে। ভেদ্‌লা ঘাসের কুচো, সাদা ফুল মাঠে অজস্র ফুটতে শুরু করেচে। কোকিলের ডাক অনেক কমে এসেচে—তবে বৌ-কথা-কও ডাকচে বেশী। এই যে লিখচি, জানালার উপরে বসে—হরি রায়ের বড় খেজুর গাছটা থেকে ভাঁসা খেজুরের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আজ ও-বেলা খুকুকে একটা কবিতা লিখে শোনালুম সকালে।

আজও সকালে বাঁওড়ের ধারের বট-অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেলডাঙা পর্য্যন্ত গিয়েচি।

ছুতোর ঘাটার কাছে দেখি, রাখাল বাড়ুয্যের স্ত্রী স্নান করে আসচেন। বল্লুম, ও খুড়ীমা, আপনার ভাই চলে গিয়েচে? উনি বল্লেন, সে তো সেদিনই গিয়েচে। আমিও যাব। এদেশে আবার মানুষে বাস করে? বল্লুম, কেন, এদেশের ওপর হঠাৎ অত চটে গেলেন যে! কোথায় যাবেন? বল্লেন, ভাইয়েদের কাছে চলে যাব। তারপর ওঁর ভাইদের গুণ-কাহিনী আমার কাছে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত এড়িয়ে খানিকটা এসে দেখি পথের ধারে পাতাল-কেঁড়ে হয়ে আছে। আদাড়ির নাতি মধুকে ডাকলুম, সেও বল্লে,—এগুলো পাতাল-কেঁড়ে। তারপর ভেজা ঘাসের শয্যায় মাঠের মধ্যে গামছা পেতে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। বেশ লাগে! স্নান করে বড় আনন্দ পেলুম আজ—নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি যেন কাকের চোখের মত স্বচ্ছ! বাড়ি এসে শুনি ওগুলো নাকি পাতাল-কেঁড়ে নয়।

সকালে ভাণ্ডারখোলা গেলুম, কাকার মেয়ে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল গুটকে। রাস্তা বেজায় খারাপ—যাবার সময় রোদ ছিল খুব—পাল্লা ছাড়িয়ে বড় মাঠ—গাছপালা কম—কেবল একটা বড় বটগাছ আছে—হরিশপুরের মধ্যেও গাছ নেই—ভাণ্ডারখোলা গিয়ে পৌছুলাম বেলা তখন দশটা। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে আগে একবার গিয়েছিলুম, দেবব্রতের কথা ভাবতুম তখন। শৈলর সঙ্গে দেখা হল—অনেক দুঃখ করলে সে। ভাইয়েরা দেখে না, নিয়ে যায় না। আসবার সময় বাড়ির বাইরে তেঁতুল-তলার পথে দাঁড়িয়ে রইল—প্রণাম করে বল্লে, আপনি এসেচেন বড় শান্তি হয়েচে আমার। আমি যদি মরেও যাই—আমার মেয়ে দুটোকে দেখবেন আপনারা। বড় কষ্ট হল মেয়েটাকে দেখে—ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, খুব অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু ওর কপালক্রমে অল্প বয়সে বিধবা হল—এখন ভাসুর-দেওরেরা ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে আসবার সময় হরিশপুর ছাড়িয়েই কালো কাজল মেঘ বারাকপুরের দিকে জুড়ে যাচ্ছে—মাদেলার বিলের ওপর দিয়ে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটা বটগাছতলায় আশ্রয় নিলুম—ততক্ষণে বসে 'War and peace' পড়লুম গাছতলায়। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামল।

রাস্তায় হয়ে গেল ভয়ানক কাদা। পথ হাঁটা যায় না—কেবল পা পিছলে যাচ্ছে।

কাউকে পাড়ায় বলে যাইনি। এসে রোয়াকে বসেচি—খুকু ন'দিদিদের ঘরে কলের গান বাজিয়ে পাড়ার মেয়েদের শোনাচ্ছিল—নন্দর মার মুখে শুনলে আমি এসেচি। বার হয়ে এসে চুপি চুপি বললে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—ভাণ্ডারখোলা।

ও গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর খুড়ীমা ঘাটে গেলে, ও এসে অনেকক্ষণ রইল। বল্লে,—মাকে পঞ্চাশবার জিগ্যেস করেচি,—মা, বিভূতিদা গেল কোথায়? একবার ভাবলুম বনগাঁ! কিন্তু বলে যেতেন তাহলে।

এই দিনই খুকু রাত্রে প্রস্তাব করলে কোথাও বেড়ানো যায় কি না। বল্লে, নৌকোয় করে বনগাঁ ওরা যাবে ৫ই আষাঢ়। তারপর সব ঠিক করা হবে। খুব উৎসাহ মনে।

একদিন সকালে পা মচ্‌কে গিয়ে ব্যথায় সারাদিন কষ্ট। কোথাও নড়তে চড়তে পারিনি। রাত্রে গোপাল ভাত দিয়ে গেল আমার বাড়ি।

এদিন নৌকো করে খুড়ীমা, আমি এবং খুকু বনগাঁ এলুম সন্ধ্যার সময়। বনুসিমতলার ঘাট থেকে বিকেলে আমরা বিদায় নিলাম, ও রেকর্ডের বাক্স বইচে, বল্লাম—রেকর্ডগুলো দে।

ও বল্লে—আচ্ছা, খোঁড়া পীর! থাক—আমিই বইচি!

গল্প করতে করতে আর কলের গান বাজাতে বাজাতে নদীর ওপর দিয়ে আসা গেল। এক একটা নৌকো আসে, আর বলি, খুকু, ভদ্রলোকের নৌকো আসচে—একটা ভালো গান দে।

ও ওমনি (এই পর্য্যন্ত লিখে রেখেছিলুম, তারপর তিনমাস বড় ঝঞ্ঝাটে কাটল বলে লিখতে পারিনি, আজ আবার লিখচি পূজোর ছুটির মধ্যে, আজ ১৪ই অক্টোবর) একখানা ভালো রেকর্ড দেয়। এমনি করে বনগাঁ এসে পৌছানো গেল। সেই রাত্রে লণ্ঠন ধরে আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি—আর কুলিতে জিনিস বয়ে নিয়ে যায় খুকুদের বাসায়।

তার পরদিনের পরের দিন আমরা এলুম কলকাতায়—সেখানে থেকে আসাম মেলে রওনা। পদ্মার পুল দেখে খুকু খুব খুশি। পার্ব্বতীপুর স্টেশনে আমরা প্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেলুম। রাত্রিতে খুকু কেবল আমায় জাগায় আর বলে দেখুন দেখুন—কত বড় নদী চলে গেল।

সকালে নেমে গৌহাটি। তখনই মোটর বাসে বশিষ্ঠ আশ্রম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে থেকে দুপুরে পাহাড়ে উঠি। সেইদিনই আমরা রওনা হই। বিকেলে পাণ্ডুঘাটে একটা খাবারের দোকানে খাওয়ার সময় খুকু বল্লে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরা বিল দেবে তো! কথাটা আমার বড় ভালো লাগল। এরা আবার খাবার দোকানে বিল দেয় নাকি!

সকালে পার্ব্বতীপুরে আবার চা খেলুম সকলে। সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে বনগাঁ।

খুকুর বিয়ে হল এই দিনে। আমি বিকেলের গাড়িতে বনগাঁ গেলুম। আমার হাতে ছিল একখানা 'লিপিকা', আমার কাগজ নতুন বার হয়েচে। সেখানা ওর হাতে নিয়ে গিয়ে দিলুম। ও এল বাইরের ঘরে। বল্লে—এত দেরিতে এলেন যে বড়! বিবাহ চুকে গেলে রাত তিনটের মেলে কলকাতা এলুম।

এদিন পাবনা গেলুম সভাপতিত্ব করতে। আর বছর এই দিনে নাগপঞ্চমীর দিন বাড়ি গিয়েছিলুম—খুকুর বাড়ি খেয়েছিলুম সেকথা মনে পড়ল। সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে নতুন মেজ বৌদিদির সঙ্গে আলাপ হয়। মেজ-বৌদিদির দুই বোন গান করলে বেশ।

খুকুর পত্র পেলুম মানকুণ্ডু থেকে। ও লিখেচে যেতে। বিকেলের গাড়িতে মানকুণ্ডু গেলুম। আমি, দেবু ও খুকু বেড়াতে গেলুম খাঁ-দের বাগানে। খুব যত্ন করলে। অনেক কথা বল্লে। তার পরদিন চলে এলাম।

৺পূজার ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। বনগাঁতেই ছিলুম সারা ছুটি। খুকুও আছে বনগাঁয়ে। ওদের বাড়ি প্রায়ই দুবেলা বেড়াতে যাই। একদিন যাইনি, সেদিন সপ্তমী পূজোর দিন, হাজারির বাড়ি গোপালনগর গেলুম বেড়াতে। অল্পদিন হল বর্ষা থেমেচে, শ্যামলী লতায় ফুল ধরেচে, আরও নানা বনফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে। আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। হাজারি ওখানে খেতে বল্লে। সুধীরদা, জিতেন, আমি, বিজন—সবাই মিলে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে একদিন রাত্রে বারাকপুরের বাড়িতে যে লোকটি আমায় কবিতা শুনিয়েছিল, সেই কুণ্ডুমশায় আমাকে নিভৃতে ডেকে তার নতুন লেখা কবিতা শোনালে। গৌর কলুর দোকানে বসে অল্পক্ষণ গল্প করি। এসব জায়গায় আসিনি আজ চার মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটির পর আর আসিনি। এসব জায়গায় যেন বারাকপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের ছুটির আব-হাওয়া মাখানো, খুকু মাখানো, বকুলতলা মাখানো—আমার হাট করে নিয়ে যাওয়া, "ও খুকু,

হাট নিয়ে যা, খুড়ীমা কোথায় ?" সেই সব দিনের শত স্মৃতি জড়ানো গৌর কলুর দোকানের সঙ্গে। ফিরবার পথে গাজিতলায় ভাঙনের ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। ওই দূরে বন-সিমতলার ঘাট, কে একটি ছোট মেয়ে যেন এখনও স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে বনসিমতলার ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চকিত নয়নে পিছন দিকে চাইলে। বনগাঁয়ে ফিরে সার্ব্বজনীন পূজার আরতি দেখতে গিয়েছি প্রফুল্লদের বাড়ি। আজ দুবেলাই খুকুদের বাড়ি যাইনি। একটু পরে ভিড়ের মধ্যে খুকু এসে দাঁড়াল, চারিদিকে চেয়ে দেখলে—তারপর চৌকির ওপর উঠে ঠাকুর দেখতে লাগল আর মাঝে মাঝে এদিকে চাইচে। বেজায় রাগ করেচে আজ সারাদিন যাইনি বলে। পরদিন সকালে ভয়ানক অনুযোগ ও অভিমানের পালা।

তারপর একদিন নকফুল হরিপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নৌকো করে নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম—আমি, মন্মথদা, বিভূতি। আমাদের ঘাটে নেমে গুটকেকে ডাকতে গেলুম, আমি, বিভূতি ও মন্মথদা। গুটকে ইন্দুর ছেলে, গরীব বাপ, ভাবলুম নিয়ে যাই, ভালো-মন্দটা খেতে পাবে এখন। গিয়ে শুনি তার জ্বর।

সন্ধ্যার সময় নকফুল থেকে যখন ফিরচি, তখন দেখি দেবু একখানা নৌকো থেকে বলচে—ও বিভূতিদা।···দুজনে বেড়াতে বার হয়েচ মহাষ্টমীর দিনটা!

বনগাঁতেই ছিলুম। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে যেতুম। একদিন গিয়েছিলুম চাল্‌কী। নরেনদা এসে নিমন্ত্রণ করেছিল। অজস্র বন-ভারার ফুল ফুটেচে বনে ঝোপে, ছাতিম ফুল ফুটেচে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার দরুন পথঘাট খট্‌ খট্‌ করচে শুকনো, বেশ লাগল। চাল্‌কীতে খেয়ে দেয়ে গেলুম বারাকপুর। আমার রোয়াকে চেয়ার পেতে বসলুম সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। মনে হল এক্ষুনি খুকু যেন আঁচল উড়িয়ে আসচে পাশের বাড়ির শিউলিতলা থেকে। আর তার সঙ্গে ওভাবে জীবনে কখনই হয়তো দেখা হবে না। আর কোনদিন সে আঁচল উড়িয়ে পাশের উঠোনের পথটি চেয়ে আসবে না আগের মত। মনে পড়ল ওদের উঠোনের ওই বড় শিউলি গাছটায় ফুল ফুটত এই পুজোর সময়—আমি বসে বসে এইখানে 'আইভান্‌হো'র অনুবাদ করতুম, আমার কাছে রোজ সন্ধে-বেলা আসাই চাই ওর—ভোটের গাড়িতে নানা ছুতো করে আমার বনগাঁ থেকে আসা—সেসব দিনের কথা কোনদিন ভোলা যাবে না। তারপর ঘাটের ধারে গুটকের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে গেলুম। সতুকাকা, ইন্দু, শ্যামাচরণদা মাছ ধরচে। ইন্দু গল্প করতে করতে পাকা রাস্তায় এল। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বাড়িতে শুয়ে থেকে মন্মথদার বাড়ি এসে চা খেলুম। তারপর ক্রমে ক্রমে ওখানে খুব আড্ডা হত। সন্ধ্যে-বেলা খুকুদের বাড়ি যেতুম—ও গ্রামোফোন বাজালে একদিন। আমার জন্যে জরদার কৌটো এনে বল্লে—পারতি খাবেন। পারতি ?

তারপর গত শনিবারে বনগাঁ থেকে চলে এলুম কলকাতা এবং সেইরাত্রেই ঘাটশীলা রওনা হই। ঘাটশীলার বাড়িটা বেশ হয়েচে। কমল খুব যত্ন করলে। যেদিন সকালে গেলুম ঘাট-শীলা—সেদিনই দুপুরের গাড়িতে গালুডি গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি। শ্যামবাবুর সঙ্গে গেলুম আর বছর যে ঘরে জ্বর হয়ে পড়ে থাকতুম, সেই ঘরটা। চিত্তবাবুর বাড়িতে পার্টি হল খুব। মেয়েরা যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়ালেন, অটোগ্রাফ খাতায় সই করিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার ছায়ায় কালাঝোর ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি গম্ভীর দেখাচ্ছে। পশুপতিবাবু ও কমল বেড়াতে এল আমার বাসায়। আমি রোজ সুবর্ণরেখার তীরের চারা শাল ও ভেন্দবনের মধ্যে রাঙামাটির ওপর দুপুর রোদে চুপ করে বসে থাকতুম। এই বেড়ানোর আনন্দটা যেখানে নেই সেখানে আমার ভাল লাগে না। গালুডি আগে এমনি ছিল, আজকাল সেখানে না আছে বন, না আছে

নির্জ্জনতা।

পশুপতিবাবু, হুটু ও আমি কমলদের বাড়ির সামনের শালবনটাতে বসে অনেক গল্প করি। পেছনের শালবনেও গিয়েছিলুম—আমি একটা গাছে উঠে বসলুম—কমল হাসতে লাগল। বৈকালে সুবর্ণরেখার তীরে একটা বড় শিলার ওপর সবাই মিলে গিয়ে বসলুম। দুটি মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে—একটি কোথাকার স্কুলের মাস্টারনী, বেশ গান গাইলে।

পরদিন আবার গেলুম গালুডি। মহুলিয়ার হাট, সোমবার সেদিন। মহুলিয়ার হাট দেখতে গেলুম। নানা গ্রাম থেকে সাঁওতাল মেয়েরা সব জড় হয়েচে, মাথার চুলে ফুল গুঁজেচে, দিব্যি নিটোল কালো চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। আমি মুক্ত শিলায় বসে বসে ভাবছিলুম অনেক দূরের একটি মেয়ের কথা। যখন শ্যামবাবুর বাড়িতে সেই কোণের ঘরটাতে বসে চা খাই, তখনও মনে হয়েচে অনেকদিন পরে কার্ত্তিক মাসে চূড়ামণি যোগের দিন ওদের বাড়ি গেলুম। যেখানে বন্যায় ছিল এক বুক জল—সেখানে এখন শুকনো খটখটে। ও চা দিতে গিয়ে বলেছিল—এই কাপ না এই ভাঁড় ?

অনেক রাত্রের গাড়িতে নেমে ঘাটশীলা বাংলোতে একা আসচি। তারাভরা অন্ধকার আকাশ—শালবনের মাথায় বৃহস্পতি জ্বলচে। অনেক দূরে এক নদীর ধারে তেতলা বাড়ি ছিল একটা, বহুদিন আগের কথা। হয়তো এখন সেখানে কেউ থাকে না।···গৌরী। অনেকদিন পরে ওর কথা মনে হল।

ভাবলুম কাল আবার এই কাঁকর মাটি ছেড়ে বাড়ি যাব। বনময় যে ফুলের সুগন্ধ ও শ্যামলীলতার ফুলের গন্ধ পাব ! কলকাতা এলুম—আমার সঙ্গে চন্দননগরের সেই মেয়ে দুটি। কাল যাব বনগাঁ। ভাবচি হাজারির বাড়ি যাব। কালীপুজোর দিনটা। বেশ কাটল পুজোর ছুটিটা। ওবেলা মাধব বলেচে রেকর্ড দেবে খুকুর জন্যে। ওর জন্যে কিছু টিপও নিতে হবে।

আবার এই ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিলুম। খুকু ওখানেই আছে। রোজই যেতুম ওর ওখানে। আসবার দিন অনেক কথা বল্লে। আজ মন্মথদের বাড়িতে কার্ত্তিক পুজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম প্রতি বৎসরের মত। সেখানে অরুণ বল্লে, এলাহাবাদে উঁষার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল—আমার নাম করেচে উঁষা। বনগাঁয়ে ভূপেনের সঙ্গে একদিন বিভূতি ও আমি রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল—গত ডায়েরী লেখবার পরে। বনগাঁর বাসা উঠিয়ে দিয়েচি—এখন ঘাটশীলাতেই আমার বাড়ি। সেখানে হুটু, বৌমা, খোকা, খুকী সকলেই রয়েচে। ষোড়শীবাবু বলে বনগাঁয়ে একজন আবগারী বিভাগের ইন্‌সপেক্টর এসেচে—অতি ভদ্রলোক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে গিয়েচে। কালু বলে সে বাড়ির একটি ছেলে ঘাটশীলা যাবার সময় আমার যথেষ্ট সাহায্য করেচে।

সুপ্রভা এসেছিল। তার পত্র পেয়ে গত সপ্তাহে দেওঘর যাই। কি যত্নই করলে ও ! আমার হাতটা ছিঁড়ে গিয়েছিল—কাছে বসে বসে সেলাই করলে, ওর এ রকম সেবাযত্ন পাওয়ার সুযোগ কখনো ঘটেনি জীবনে।

তারপর ওর কথা বড় মনে হচ্ছে। ক'দিন মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভেবেচি। খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি সেই পুজোর ছুটির পর থেকে—বোধ হয় আর দেখা হবেও না, কারণ বনগাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগই আর রইল না।

এক মাসে আরও কি পরিবর্ত্তন। সুপ্রভাকে কি দুঃখই দিলুম। আজও সে একখানা চিঠি পেয়েচে আমার। তার কথা সর্ব্বদাই মনে হচ্চে। শিলং একবার যেতে হবে শীগগির। গত সরস্বতী পুজোর দিন ঘাটশীলা গিয়ে তিনু, শান্ত, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠলুম সুবর্ণরেখা পার হয়ে।

ভোরে ডাকলে এসে হরবাবু। তারপর মোটরে আমরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব, আমি, রমাপ্রসন্ন, তিনু ও বাসু গেলাম বনগাঁ। অজিতবাবুর বাড়ি চা খাবার সময়ে S.D.O.ও মুন্সেফ এবং মনোজ বসু সেখানে। তারপর ঘেঁটুফুল ফোটার পথের মধ্যে দিয়ে আমরা বনগাঁ গেলুম। একবার মনে হল যেন আমার বাসা আছে এখানে—জাহ্নবী রান্না করচে, স্নান করে গিয়েই খাব।

বারাকপুর এলুম। পঞ্চবটীতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই ফণিকাকা, খাঁদু, হরিপদদা এল। এদের দেখে কষ্ট হয়। কি সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই পড়ে রয়েচে। পূর্ণতর জীবন অনুভব করলে না। ফণিকাকা বল্লে—আজ গোপালনগরে বড় মারামারি হবে ভোট নিয়ে—দেখতে যাবে না। As if I care for votes! আমার বাড়ি গিয়ে ওরা বসল—তারপর নদীর ধারে যেতে ওরা সব মায়ের কড়াখানা দেখলে। সত্য কি শুভক্ষণে কড়াখানা কেনা হয়েছিল! আজ কত বছর হয়ে গেল। কত লোক দেখে গেল ওখানা।

বনসিমতলায় ওরা বসল, আমি ও রমাপ্রসন্ন বনের মধ্যে তুঁততলায় বসলুম। সুপ্রভার পত্রখানা পড়লুম—ইস্টারে শিলং যেতে লিখেচে। সত্যি, কি ভালো মেয়ে ও!

ভুষণ মাঝি ঘাটে নাইচে। স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলুম। তারপর এলুম বাড়ি, খুকুদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার দাঁড়াই। কতবার এমনি ঘেঁটুফুল-ফোটা চৈত্র দিনে বনগাঁ থেকে দুপুর রোদে বারাকপুর হেঁটে এসে ওকে ডেকেচি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে—আজ কোথায় কে? সব শূন্য।

ইন্দু এসে গল্প করলে, আমাদের সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেল। তারপর আমরা মোটরে গোপালনগরে এসে দুর্গা ময়রার দোকানে লুচি ভাজিয়ে খেলুম। আজ হাটবার, তবে ভোটের জন্তে অমৃত কাকা, চালকীর বিভূতি সবাই যাচ্ছে। হরিহর সিং তার দোকানে ডাকলে। মনে পড়ল গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাণ্ডারকোলা থেকে ফিরবার দিনে এর দোকানে বসেছিলাম। আর বসলুম এই।

তখনি বনগাঁ—সেখান থেকে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। এই ছ'ঘরের পথেও এই চৈত্র মাসে এই তিনটের সময় কত গিয়েচি। পাটবাড়িতে কতক্ষণ বসে আবার বনগাঁ।

মন্মথবাবুর বাড় সেই বিকেলে সেই রকম বসে সুপ্রভার গল্প করি। সুপ্রভার প্রশংসা শতমুখে করেও আমি যেন ফুরোতে পারিনে।

পথে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা রাণাঘাট গেটের কাছে—আমি ডাকলুম, তিনি চাইলেন, কথা হল না। মুন্সেফ সস্ত্রীক মোটরে যাচ্চে—চেয়ে হাসলে।

সুপ্রভার পত্রখানা কাল রাত্রে লিখেছিলুম—বনগাঁ থেকে টিকিট কিনে সকালে পোস্ট করেচি ওবেলা।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে কাগজ আনব। সেদিন ইউনিভার্সিটির মিটিং-এ অজয় ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলাপ হল। প্রমথ, বিজয়, পরিমল, গোপাল হালদার আমরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে একটা

চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাই। সেই দিনই রাত ন'টার কমলরাণীর নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে 'বিশ বছর আগে' দেখে এলুম রঙমহলে। মন্মথ রায়ও একদিন 'কুমকুম' দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েচে এই দেড় মাসের মধ্যে। সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে ঈস্টারে শিলং গেলুম। সেখানে জর্জ্জিনা ও সেবা প্রথমে এসে বল্লে, সুপ্রভা ছুটিতে মিরালী চলে গিয়েচে। তারপর হাসতে হাসতে সুপ্রভা এল। ক'দিন খুব বেড়ানো গেল। ওখান থেকে চলে আসার কিছুদিন পরে ঘাটশীলা গেলুম—এবং সেখান থেকে এসে ঢাকা গেলুম রেডিওতে বক্তৃতা দিতে। রম্ভা দেবীর বাবার বাড়ি গিয়ে উঠলুম। বেশ কাটল সেখানে। ইতিমধ্যে সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গেল গত ১৫ই বৈশাখ। আমি গত শনিবারের সাহিত্য-বাসর উপলক্ষ্যে মুন্সেফবাবুর বাড়িতে গেলুম। মায়া ও কল্যাণী ছাড়লে না—ওদের বাড়িতে রইলুম। রাত্রে ওদের ছাদে গল্প। পরদিন আমাদের পুরোনো বাসায় গেলুম। সেই জানলার ধারে দাঁড়াই। পাঁচী এসেচে, দেখা হল।

আজ দেশ থেকে ফিরলুম। ঘাটশীলা যাব গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে গেল। খুকু বনগাঁয়ে এসেছিল অনেকদিন পরে, ওর সঙ্গে দেখা হল দু'তিনদিনের জন্তে। কল্যাণী খুব সেবাযত্ন করেছিল। গ্রীষ্মের ছুটিটা এবার কি আনন্দেই কাটল! রোজ নদীজলে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! বিশেষ করে একদিন অনেক রাত্রে বনগাঁ খুকুদের বাড়ি থেকে ফিরে। আর একদিন কুঠীর মাঠের আঘাটার পাশে নেমে। সেই রকম আম কুড়ুচ্চে পাগলার মা, হাজারী—আজও দেখে এসেচি। এখনও খুব আম। এবার আদৌ বৃষ্টি হয়নি। আজ আষাঢ় মাস, দেশের পথে সর্ব্বত্র ধুলো, খানা-ডোবা সব শুকনো, ভীষণ গরম, এমন কখনো দেখিনি। সুপ্রভা লুকিয়ে পত্র লিখেছিল, বেলডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ির পিছনে বসে তা পড়েছিলুম—আর চিঠি লিখেছিল জর্জ্জিনা। কাল ন'দি চলে গেল গোপালনগর স্টেশনে কলকাতার গাড়িতে,খুকুর সঙ্গে ওরা যাবে মানকুণ্ডু। কাল খুকুও চলে গেল বনগাঁ থেকে। পরশু সাব্‌ডেপুটি অজিত বসু, মুন্সেফ্ হরিবাবু, সবাই গিয়ে ছিলেন আমার বাড়িতে। আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখলেন। তেঁতুল গাছের ওপর আমায় বসিয়ে ফটো নিলেন। বাবার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হল।

কাল সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে বেলডাঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসবার পর কুঠীর মাঠের আঘাটায় স্নান করে ফিরচি, আমাদের বাড়ির পেছনের বাঁশবনে কোথাও জ্যোৎস্না, কোথাও জোনাকির ঝাঁক জলচে—থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। এক অদৃষ্ট অনুভূতি! আবার যেন আমি বালক হয়ে গিয়েচি, এইমাত্র ভরতদের সঙ্গে সলতেখাগি আমতলাটার ময়না গাছের ধারে আম কুড়িয়ে ফিরচি—সারা গাঁ আমার শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী বদলেচে—জ্যেঠাইমা, সইমা, হরিকাকা—সেই সময়ের মনোভাব—সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, অথচ কি মহার্ঘ আনন্দ···তা বর্ণনা করা যায় না—সে এক জগৎ—যেমন এবার আমি বিলবিলের ধারে বসে বসে কত মেয়েদের জলে ওঠা নামা করতে দেখতুম, ওরা কাপড় কাচছে, বাসন মাজচে, পরস্পরের সঙ্গে গল্প করচে —ওদের এই এক জগৎ···the little pool in the woods—বেশ নামটি দিয়েচি ওই বিলবিলের ডোবাটার। ও নিয়ে একটা গল্প লিখব। এরা এই ক্ষুদ্র জগতে সবাই কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে—এর বেশী এরা চায়ও না, বোঝেও না কিন্তু। পাগলার মা আম কুড়িয়ে সন্তুষ্ট, নেলির মা থালা থালা আমসত্ত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট, হরিপদদা গাঁয়ের মোড়লী করে সন্তুষ্ট। এর বেশী

এরা কিছু চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। কাল ঘাটশীলা থেকে ফিরেচি। সঙ্গে ছিল হরিবোলার ছেলে মাদার। ও ফিরে গেল দেশে। ঘাটশীলায় বড় গরম পড়েছিল, দুদিন কেবল বৃষ্টি হয়েছিল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতুম গালুডি রোডে সেই শাল বনটার মধ্যে, সেখান থেকে বনমাটির পথ যেখান দিয়ে পার হয়ে গেল সেই উঁচু জায়গায়। দূরের দিক্‌চক্রবালে নীল শৈলশ্রেণী মুক্ত ভূপৃষ্ঠের আভাস এনে মনকে বন্ধনশূন্য করে দিত অপরাহ্নের ছায়াভরা আকাশতলে, সেখানে বসে বসে সুপ্রভার চিঠি, খুকুর চিঠি পড়তুম। কোথায় রায়গড়, কোথায় মিরালী, সে এখন হয়তো এই বিকেলে বসে চুল বাঁধছে, এমনি সব কত ছবি মনে পড়ত। একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি এল, রাস্তার ধারের ছোট্ট সাঁকোর মধ্যে ঢুকে অতি কষ্টে বৃষ্টির ধারা থেকে নিজেকে রক্ষা করি।

পরশু বসে ছিলুম কত রাত পর্য্যন্ত ফুলডুংরি পাহাড়ের নীচে। একে একে দুটি একটি করে কত তারা উঠল অন্ধকার আকাশে—আমি যেন বিরহী তরুণ দেবতা, যুগান্তের পর্ব্বত শিখরে বসে কত জন্মের প্রণয়িনীর কথা ভাবচি।

কোথায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরে বনসিম তলার ঘাট, সেখানে যে বালিকা ছিল, সে আর সেভাবে কখনো ও ঘাটে থাকবে না—কত বছর চলে যাবে, বালিকার দেহে নামবে জরা, কত-কাল পরে বৃদ্ধা যখন একা একা ঘটি হাতে ঘাটের পাড় বেয়ে উঠবে, তখন সে কি ভাববে না তার অতীত কৈশোরের কথা—কত প্রণয়-লীলার স্থান—বনসিমতলার ঘাটটার কথা!

গৌরীর কথা মনে হল। অনেক দূরে আর এক গ্রাম্য নদী, তার ধারে একটা দোতলা বাড়ি—কতকাল আগে সেখানে যে মেয়েটি ছিল, তার দেহের নশ্বর রেণু হয়তো ওই নদী-তীরের মৃত্তিকাতেই মিশিয়ে আছে এই কুড়ি বছর। সে জীবনে কিছুই পায়নি—সে বঞ্চিতার কথা আজ এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনে এল।

আর এক বঞ্চিতা হতভাগী মিনতি। ওকে কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু ওর নাম শুনেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওর দুঃখ দূর হোক।

কিন্তু সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যে চির-জীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করব? ওর জন্যে মন যে কি ব্যাকুল হয়েচে আজ ক'দিনই। নির্জ্জনে বসলেই ওর কথা সারা মন জুড়ে থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করাই চাই, মন বড় ব্যাকুল হয়েচে দেখবার জন্যে।

কাল বনগাঁ থেকে এলাম। অজিতবাবুর বদলি উপলক্ষে সাহিত্যসভা ছিল। অজিতবাবু লিখেছিলেন, যাবার সময়ে আসবেন। ক'দিন বেশ কাটল। এবার ওদের পাড়াসুদ্ধ সকলে ডেকে ডেকে আনন্দ করলে, গল্প করলে। সুনীতিদিদি, খুকুর মা সবাই। বাস্তবিক মেয়েরা কি ভালো তাই ভাবি! ওদের মধ্যে খারাপও আছে জানি, নিজেই তার অনেক পরিচয় অনেক জায়গায় পাইনি কি আর? কিন্তু ভালো যখন হয় ওরা তখন তার তুলনা পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরী, সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, অন্নপূর্ণা—এদের প্রত্যেককে আমি জেনেচি—এরা দেবীর মত।

কি যত্ন-আদর করত সুপ্রভা! তার কথা আজকাল সর্ব্বদা মনে আছে। ভোলা কি যায়? না তা সম্ভব? এই তো জীবন!

কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবাপ্রবৃত্তি আরম্ভ করে নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল-ঢাকা পেতে, পরিপাটী করে

পান সেজে, বিছানা করে কেমন করে রাখত! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ 'চম্পক জাগো জাগো' গানটার এক কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়ল। সেই ঈস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হোস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেচে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সে উঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়ব—জজ্জিনা ঘন ঘন ঘরে ঢুকচে, বায় হচ্ছে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটা শোনাও না। গানটা সে গাইলে। আমি বসে বহুদূরের কোন্ পাইনবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। সুপ্রভা—পাইনবন, লুম্ শিলং-এর মেঘাবৃত শিখরদেশ।

কল্যাণী ছেলেমানুষ কিনা, বলচে—আপনি চলে গেলে আমি বিছানা বাইরের ঘর থেকে উঠিয়ে ফেলব। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সেবার ছোট মামাকেও শুতে দিইনি—বলি, ছোট মামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি তুলব। এই সময় গৌরীকে এনেছিলুম বারাকপুরে ১৯১৮ সালে। কতকাল আগে। সেই বাঁশ-বাগানে নিভৃত সন্ধ্যা নামত, বর্ষার দিনে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ত, বেশ মনে আছে। 'বানের জলে দেশ ভেসেছে, রাখাল ছেলে তুই কোথা' গানটা করতুম ইছামতী থেকে স্নান করে উঠে সকালে।

সময়ের দীর্ঘ বীথিপথ বেয়ে কত এল কত গেল! গৌরী···১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুর। রজনী মামার সঙ্গে বসে তাসখেলা হরিপদ দাসের চণ্ডীমণ্ডপে। "বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে তুই কোথা, রাঘব বোয়াল মাছের সাথে সুখ-দুঃখের কই কথা"···এই গানটা ছিল দিনরাত আমার মুখে। আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে সকাল বেলা বর্ষা-স্নাত ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে আসতে (যে ঝোপ থেকে এ বছর সুপ্রভার চিঠির জন্যে কত বনমল্লিকা তুলেছি এবং যে ঘাটটার নাম অনেক দিন পরে হয়েছিল বনসিমতলার ঘাট) ওই গানটা গাইতুম।

তারপর সে সব দিন চলে গেল। অনেক মাস কেটে গেল। তারপর আবার বহু লোকের ভিড় গেল লেগে।

কত লোক এল। তাদের কথা মনে হয় আজ। এসেচে, কিন্তু ওদের মধ্যে চলে যায় নি কেউ—আছে সবাই। অন্নপূর্ণা আছে, সুপ্রভা আছে, খুকু আছে। অদ্ভুতভাবে এরা সব এসেছিল। যায়নি কেউই। মন থেকে নয়, বার থেকেও নয়।

১৯৪০ সালে তাই আজ ১৯১৮ সালের কথা ভাবচি। আজ সুপ্রভার পত্র পেলাম। কত ভালো মেয়ে সে, আজও মনে রেখেচে। আর বছরে এ সময়ে মনে বড় কষ্ট ছিল।

জীবনের মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি হর্ষোজ্জ্বল, হাসি অশ্রু ছলছল দিন আসে, যাদের কথা চিরকাল মনে তো থাকেই, এমন কি একটু নির্জ্জনে একমনে ভাবলে সেদিনের অনুভূতিগুলো পর্য্যন্ত এখনি আবার মনে আসে—অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আসে, যেমন সেদিনের বিস্মৃত গন্ধরাজি আবার আঘ্রাণ করি, আবার সে সব দিনের জীবনের কুশীলবদের চোখের সামনে দেখতে পাই।

এই রকম দিন আমার জীবনে যেগুলি এসেচে—তা চিন্তা করে দেখলুম কাল বসে। গোলমালে ওদের কথা মনে না থাকলেও দু'দশ বছর অন্তর মনে আসে হঠাৎ। সে সব দিনের আর একটা মজা আছে, তারা মস্ত বড় আশার বাণী, অজানার আনন্দ নিয়ে আসে—একটা কিছু যেন ঘটবে, দিনগুলি বৃথায় যাবে না—একটা এমন কিছু ঘটবে, যা জীবনে কখনো ঘটে নি

—মনে হয়।

তারপর দেখা যায় কিছুই ঘটল না—দিনগুলো চলে গেল, কিন্তু আনন্দ রেখে গেল, স্মৃতি রেখে গেল।

যেমন প্রথম যাত্রার দল আমাদের গাঁয়ে এসেছিল আমার বাল্যকালে, নলে নাপিতের বাড়ি সন্ধ্যাবেলার আমার বলেছিল 'তুমি যাবে খোকা ?' সেই সন্ধ্যা, সেই সুশ্রী যাত্রাদলের নটের দল—সে কথা জীবনে আর কখনো ভুললাম না। ভুললাম না মানে ভুলেই তো থাকি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একমনে বসে ভাবলেই আবার মনে হয়।···

সুরেনের যখন পৈতে হয়, তুধুমামা থাকত, আমি দণ্ডী ঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসেবা করাতুম—সেই একদিন যুগলকাকাদের বাড়িতে বাল্যে এমন ক'দিন কেটেচে বেশ মনে হয়—সুবাসিনীর সামনে. যখন আমি অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম বাল্যে, বকুলতলায় খেলা করতুম, নাগ পঞ্চমীর দিন ভরত ও আমি মনসাতলায় গিয়েছিলুম।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। আর তেমন কোন দিনের কথা আমার মনে হয় না। এল গৌরী, ওকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে প্রথম যখন বারাকপুরে আনলুম, আষাঢ় ও প্রথম শ্রাবণের সেই দিনগুলির কথা···রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীর ভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে, মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী, তখন সে মাত্র চৌদ্দ বছরের বালিকা—এই ছবিটি, এই দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, চিরদিন—চিরদিন মনে থাকবে।

সে গেল চলে। দিনগুলি নিরানন্দময় হয়ে গেল, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রহরগুলি মৃত।

আনন্দ পেলাম চাটগাঁর মণিদের বাড়ি গিয়ে। মণির সঙ্গে বসে গল্প করতুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম, ওই দিনগুলি।

ওখান থেকে গিয়ে এসে বিভূতিদের বাড়ি এলাম। ও দিনগুলোর মধ্যে আমার মনে আছে, আমার জ্বর হল, কামাই করলাম দিনকতক, গেলাম না—বিভূতিকে ফোন করলাম, ঐ একদিন।

ভাগলপুরে এমন অনেকদিন গিয়েচে ইসমাইলপুর ছিরায়। পুরোনো কথা ভাবতাম শ্রাবণ মাসে রাসের সময় বড় বাসায় বসে, রঘুনাথবাবুর ঠাকুরবাড়িতে হেমেন রায় এসে নিয়ে গেল, আমি Koith-এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা পড়তুম—কিংবা আমি Astronomy পড়তুম ভাদ্র মাসে বাইরের ঘরে শুয়ে, বীরভূমের সেই পণ্ডিতটা এসে গল্প করত—সেই সব দিন ভারি চমৎকার কেটেচে।

একখানা বই হয় এ সব দিনের আনন্দের কথা লিখলে—নতুন টেক্‌নিকে, নতুন ভাবে লিখতে হয়—একখানা ভালো উপন্যাস হয়।

তারপর এল খুকু। তার সাহচর্য্যে যে দিন কেটেচে—তার মধ্যে যখন আমি 'আইভ্যানহো' অনুবাদ করছিলুম, শিউলি গাছে ফুল ফুটত—সেই দিনগুলি আর বনগাঁয়ে ছাদে বেড়ানোর দিনটি, আর গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বারাকপুরে গ্রামোফোন নিয়ে কাটানোর দিনগুলির কথা ভুললে চলবে না। চিরকাল মনে থাকবে এগুলিও।

সুপ্রভার সঙ্গেও এমন অনেকদিন আনন্দে কেটেচে। বিশেষ করে এবার সেপ্টেম্বরে ও ইস্টারের ছুটিতে শিলংএ বেড়াতে যাওয়ার দিনগুলি। অনেক দিনের কথা হয়তো ভুলে যাব—কিন্তু শিলংএ যাপিত গত ইস্টারের ছুটির দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর সর্ব্বশেষে এবার যে অজিতবাবু বনগাঁ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—কল্যাণীদের বাড়ি রইলাম আমি—কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভালো লেগেছে, সুপ্রভা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের মধ্যে এ ধরণের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখি নি আমি। কল্যাণী যখন শচীনবাবুদের বাড়ির সামনের পুকুরঘাটে বসে রইল—সে কথাই আমার মনে পড়ে এখনও।

এই তো সবে সেদিন। আর এক সপ্তাহ পুরল। এই দিনটি আবার কত কাল আগেরকার বলে মনে হবে একদিন। একদিনের ডায়েরিটা পড়ে অবাক হয়ে ভাবব সেইদিনের সুপ্রভা, সেদিনের কল্যাণী, সেদিনের খুকু—কতকালের হয়ে গেছে!

বাসা বদলে বহু বছর পরে আবার ৪১, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের এ দিকটাতে এলুম। অনেকদিন আগে এদিকটাতেই ছিলাম—আবার সেদিকেই এলুম। মন কেমন বড় খারাপ হয়ে গেল বিকেলে, অনেক পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত পুরোনো কথা সব মনে পড়ল। বাবার জন্যে মন যেন কেমন করে উঠল, আর করে উঠল সুপ্রভার জন্যে। বারবেলা ক্লাবে যাবার আগে এই কথা কতবার মনে হল, সুপ্রভা আজ এতক্ষণ আমার চিঠি পেয়েছে।

বনগাঁ থেকে আজই এলুম। এই শ্রাবণ মাস, আজ ১লা, মটরলতা দোলানো খয়রামারির মাঠের সেই ঝোপটায় অন্য অন্য বছরের মত কালও বেড়াতে গেলুম। এ বছর সব বদলে গিয়েচে। সুপ্রভা নেই, খুকু নেই, জাহ্নবী নেই, বনগাঁর বাসা নেই, ৪১নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সে মেস নেই।

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই শ্রাবণ মাসে বারাকপুর যাওয়া, খুকুদের দাওয়ায় বসে নলে নাপিতের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া, খুকুর কত কথাবার্ত্তা—The apple tree, the singing and the gold!—কোথাও কি চলে গিয়েচে!

এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েচে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটি আবার কোথা থেকে এসে জুটল বল তো! কোথায় ছিল ও আর বছর এমন সময়? অথচ এ বছর ওদের বাড়ির সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েচে—যেন কত কালের আলাপ! আমি কলকাতায় আসি-না-আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমায় আসতে দেবে না—এই মধুর শাসনটুকু করত সুপ্রভা, করত খুকু—আবার এ এল কোথা থেকে কে বলবে!

কাল (২৯শে জুলাই) আবার বনগাঁ থেকে এলুম। এবারও ওদের ওখানেই ছিলুম গিয়ে। কল্যাণীর যত্ন সমানই। কাল কিছুতেই আসতে দেবে না কলকাতায়—সোমবার থাকব, মঙ্গলবার থাকতে হবে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই—মন্মথদা কিম্বা মুন্সেফের বাড়ি গিয়ে যে একটু গল্প করব, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।

—গা ছুঁয়ে বলে যান ঠিক সাতটায় সময় আসবেন! যদি না আসেন তবে আমি কিন্তু মরে যাব! তাতেই বা কি, আমি মরে গেলে, জগতের কার কি ক্ষতি!

মুন্সেফবাবুর বাড়ি গিয়ে দুবেলা আড্ডা দিই। বার্ণিয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা হল।

আবার ১১ই আগস্ট বনগাঁ থেকে এলুম। বেলুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল, তা ছাড়া ছিল মাসিক সাহিত্য-বাসর। মায়াও ছিল এবার, গল্প-গুজবে বেশ কাটল। নদীতে ঘোলা এসেচে, *এদিন যখন স্নান করতে গেলুম তখন জল খুব ঘোলা।*

কল্যাণীর আসবার কথা বলে এলুম কলকাতায়।

কাল শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আর বছর তো সারা বর্ষাকাল ও শরৎকাল দেখে যাই নি। গোপালনগরের বাজারে প্রথমেই গুট্‌কের সঙ্গে দেখা। শ্যামাচরণদাদা দেখি বাজারে আসচে, তার মুখে শুনলুম কালী এসেচে। ভাদ্র মাসের বৈকাল, শুকনো পথ-ঘাট, বৃষ্টি নেই এবার, আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। বাড়ি গিয়ে দেখি বলা বোষ্টম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। আমি ইছামতীর ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম, ঘোলা জল ঘাসভরা মাঠ ছুঁয়েচে। ওপারের মাঠে ঘঁাড়া ঝোপে সন্ধ্যার ছায়া নামল, আকাশে কত রকম রঙিন রঙের খেলা দেখা গেল, আমি জলে নেমে স্নান করলাম।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে—পাকা তালের গন্ধ পাওয়া যাচ্চে শ্যামাচরণদাদাদের বাগান থেকে। একটা তাল পড়ার শব্দ পেলুম। বাড়ি এসে খানিকটা বসে আছি, মনে হচ্ছে খুকু যেন এবার এল বিলবিলের ধারের পথটা দিয়ে। এবার ওদিকে বড় বন। সন্ধ্যার পরে খুব জ্যোৎস্না উঠল। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না শুধু কোজাগরী পূর্ণিমার কথা মনে এনে দেয়, আর মনে আনে খুকুর কথা, ন'দিদিদের বাড়ি থেকে এসে আমার উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গল্প করত! কালী এসেচে, ওদের বাড়ি কতক্ষণ কালীর সঙ্গে, সুপ্রভার সঙ্গে গল্প করলুম। সুপ্রভার বিষয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করল।

আজ রবিবার সকালে কালী ও আমি প্রথমে গিয়ে বসলুম বাঁওড়ের ধারে ছুতোরঘাটার বটতলায়। কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বনঝোপ দেখে বাঁচলাম। এ সব না দেখে আমি থাকতে পারিনে—সকালের বাতাসে নাটাকাঁটা ফুলের সুগন্ধ, বনটিয়া ডাকচে, কলামোচা পাখী ঝোপের মাথায় খেলা করচে। সইমা যাচ্ছেন নাইতে,আমায়বল্লেন—কবে এলে বিভূতি? তাঁর সঙ্গে গল্প হল খানিকক্ষণ। তারপর আমি আর কালী বেলডাঙা হয়ে মরগাঙের ধারে বাবলা তলায় কতক্ষণ বসলুম, কালী ঘোড়া কুড়োলে, কুঠীর মাঠের জলার ধারে একটা নিবিড় ঝোপে দুজনে বসলুম। আর সব জায়গাতেই সুপ্রভার পত্রখানা পড়চি—একবার, দুবার কতবার যে পড়া হল! দুজনে আবার আমাদের ঘাটে নাইতে এলুম, কালী সিট্‌কি জালে চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরলে। আমি যখন রোয়াকে বসে থাকি, তখন যেন আবার মনে হল খুকু আসচে ···এখুনি তেলাকুচো ঝোপের আড়ালে গিয়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে সে আসবে···

ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে কালীর বাড়ি গেলুম। ওরা হাটে গেল, আমি আমাদের ঘাটে এসে বসলুম—ওখান থেকে নৌকো করে কুঠীর মাঠে এসে ঘাসের ওপর বনসিম ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা আবার পড়ি। সুপ্রভা কোথায় কতদূরে আজ।

কল্যাণী···ওর কথাও মনে হয়। এরা সব চলে গেল, তাই ভগবান যেন এই স্নেহময়ী মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার দু' শনিবার পরে তবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলা যাব। সুপ্রভাকে লিখেচি সেদিন সেখানে পত্র দিতে।

সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসব। হাট থেকে বৃদ্ধ মুসলমানেরা ফিরচে আমাদের গাঁয়ে। কারো মাথায় ধামা, কারো মাথায় ঝুড়ি। সবাই জিগ্যেস করে—বাবু কবে আলেন? আরামডাঙার আবদুল, দুটুর ময়া—সবাই। গোপালনগর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসলুম। কত নক্ষত্র উঠেচে—আজ সারাদিন পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র। বনগাঁয়ের কাছে ট্রেন আসতেই কল্যাণীর কথা মনে হল। একবার মনে হল নেমে ওর সঙ্গে দেখা করে কাল ট্রেনে যাব। *যেসে এসে সেবার পত্র পেলুম।*

এবার ভাল লেগেচে বাঁওড়ের ধারে বটতলায় বসা, কুঠীর মাঠে ছায়াস্নিগ্ধ ঝোপটি, মরগাঙের

পাতা, এবেলার বনসিম ঝোপের ছায়ায় ঘাসের মাঠে বসা, সুপ্রভার চিঠি পড়া, কল্যাণী ও খুকুর চিন্তা। আর কলকাতার রাত্রির সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাল কত রাত পর্যন্ত চড়কতলার মাঠে ছিলাম ; ফণি কাকা, গজন, কালো পাঁচু, ফকিরচাঁদ সবাই গল্প করলুম। কাল রাত্রে জেলেপাড়ায় কৃষ্ণ-যাত্রা হবার কথা ছিল, সকলে জিগ্যেস করচে—কখন বসবে যাত্রা ? ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ। খুব রাত্রে নাকি যাত্রা হয়েছিল—দেখতে পেলে না বলে আজ সকালে পিসীমা ও ন'দিদির কি দুঃখ!

খুকুর স্মৃতি সারা বারাকপুরকে, তার মাঠ, ঘাট, নদীর তীর সব আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এবার গিয়ে বুঝলুম। নদীর ধারে সুপ্রভার, কারণ চিরকাল নদীর ধারে বসে সুপ্রভার পত্র পড়া আমার অভ্যাস।

অনেকদিন পরে ভাদ্রমাসে বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারি আনন্দ নিয়ে ফিরলুম। কালী এসেচে, তাই আরও আনন্দ। সুপ্রভার অমন সুন্দর পত্রখানা সে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। যে পৃথিবীতে সুপ্রভা আছে, সেখানে আমার ভাবনা কি ? তারপর কল্যাণী যেখানে আছে, সেখানেই বা ভাবনা কি ?

আমি যেটাকে মটরলতা বলতুম, কাল বেলডাঙা যেতে বটতলার পথে কালী ওটাকে বল্লে—বড় গোয়ালে লতা। কিন্তু বড় গোয়ালে লতার ফল হয় সাদা, আর এক রকমের লতা আছে খাঁজকাটা আঙুরের পাতার মত দেখতে, আঙুরের মতই থোলো বাঁধে।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্ছি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে, কি যাচ্চে, এই ধরণের একটা উদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটি আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা কত কি মনে আসে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিন সে কি উৎসব···সেও এই ভাদ্রমাসে। পিসীমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু।

১৯৩৭ সালেও ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখনও খুকু গ্রামে ছিল না।

আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র জগৎটাতে ওরা বেশ আছে, কৃষ্ণ-যাত্রা শুনচে, দলাদলি করচে, গোপালনগরে হাট করচে, নদীতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে, চড়কতলায় বসে রাত্রে আড্ডা দিচ্চে—বেশ আছে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়িতে এসেচি। বাড়ি এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কি ভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend—ভারি আনন্দ হয়েচে ওর চিঠি পেয়ে। পরদিন সকালে উঠে কমলদের বাড়ি গেলুম—কমল মাছের শিঙাড়া ও চা খাওয়ালে। বৈকালে বাঁধের পেছনে শালবনে দিব্যি সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ঘাসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা—রোদ রাঙা হয়ে আসচে, মিষ্টি শরতের রোদ—মনে পড়ল সুপ্রভার কথা···কতদূরে আছে শিলংএ, কি করছে এখন তাই ভাবি! সুবর্ণরেখার ওপরকার পাহাড়-শ্রেণী বড় চমৎকার দেখাচ্চে। আর মনে হল খুকুর কথা, কল্যাণীর কথা। যাদের যাদের ভালবাসি, এ অপূর্ব্ব অপরাহ্ণে সকলের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে ভট্টচাজ সাহেবের বাড়ি সভা হল—বৌমা, উমা ওরাও গেল। অনেক রাত্রে আবার মোটরেই ফিরে এলুম।

গত রবিবার ঠিক এই বৈকাল বেলা বারাকপুরে—নদীর ধারে বনসিমতলার ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার চিঠি পড়চি, কালীও এসেচে অনেকদিন পরে—ওর সঙ্গে গল্প করচি—সে কথা

মনে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে আমি বাসাভেল্লা ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানীর পথটা দিয়ে ফুলডুংরির পেছন দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললুম। মেঘান্ধকার সকাল, সজল হাওয়া বইচে, দু ধারে বন সবুজ হয়ে উঠেচে বর্ষায়, পাথরগুলো কালো দেখাচ্ছে গাছপালার তলায়। সেবার সেখানে ভিক্টোরিয়া দত্ত, আমি, নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবীর চা খেয়েছিলুম, সেই উঁচু পাহাড়ের কাটিংটা দিয়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে সোজা চললুম—দুধারে কি নিবিড় বন, পাথরের স্তূপ ছড়ানো, বড় একটা বটগাছ। এটা যেখানে নীচু হয়ে গেল, তার বাঁ দিকে একটা নিবিড় কুঞ্জবন ও লতাবিতান—বসবার ইচ্ছে থাকলেও বসতে পারলুম না, বেলা হয়ে গেল। একটা পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে (দুধারে কি শোভা সেখানে!) ওপারে গেলুম। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সুঁড়ি পথ ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখি সেই ঝর্ণাটা রাস্তা আটকেচে। আর না গিয়ে সেই ঝর্ণার ধারে যেখান দিয়ে খুব তোড়ে জলটা বইচে কুলুকুলু শব্দে—সেখানে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইলুম। সুপ্রভার ও কল্যাণীর চিঠি দুখানা সেই ঘন বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে জনহীন আরণ্য প্রকৃতির নীরবতার মধ্যে বসে কতবার পড়ি। হাতীর ভয় করছিল বড়। এ সময় বুনো হাতীর সময়।

বৃষ্টি এল। একটা পথিক লোক কাছে এসে বসল। ও বল্লে—এখানে হাতীর ভয় নেই—তবে সকাল সকাল চলে যান বাবু।

কুরুডির পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেই ঝর্ণাটা পার হয়ে চলে এলুম। একটা ছোট ফর্সা মেয়ে কপালে সিঁদুর দিয়েচে—আমি যেমন বললুম, "তোর নাম কি খুকি?" অমনি ছুটে পালাল।

আমি কত কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এসে ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা ধরলুম। বড় বৃষ্টি পড়চে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ ঘুরে ঘুরে উড়চে পাহাড়ের চূড়ায় নীল বনরেখাকে বেষ্টন করে। বেলা দুটোর সময় ঘাটশিলায় পৌঁছলুম—বৌমা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধের জলে স্নান সেরে এসে খেয়ে সকলকে উদ্ধার করলুম।

দুপুরে খুব ঘুমুই। তুলসীবাবু মোটর নিয়ে এসে ফিরে গেল। রাত্রে বিজুবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। অমরবাবু ও বাসার চাকর বিনোদ রাত ১২টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

অনেককাল আগে এই সময় আমি আজমাবাদের কাছারীতে ছিলুম ভাগলপুরে।

জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়িতে যে রকম ছিল ১২ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব?

আজ ১১ই ভাদ্র। কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ল। আবার এই সময়ে এমন বর্ষার দিনে আমি আজমাবাদ কাছারীতেও ছিলুম। এ সময় আমি এক পয়সার খড়িমাটি কিনে কত আগ্রহ নিয়ে ট্রেনে চলেছি।

পুজোর ছুটি এসে গেল। মধ্যে G. B. Association থেকে আমায় একটা অভিনন্দন দিলে—পশুপতিবাবু, জ্যোৎস্না বৌমা, শৈলদা, তারাশঙ্কর—আরও অনেকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। এবার বড় লিখবার তাগিদ, কাল রাত্রে একটা গল্প লেখা শেষ হয়েচে—আজ থেকে লেখা বন্ধ। এবার রাঁচি হতে সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এসেচে। এবার চাটগাঁ যাবার ইচ্ছেও আছে।

আজকাল শরতের বৈকালে স্কুলের ছাদ থেকে কিম্বা পথে যাবার সময়ে দূর আকাশের দিকে

চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা—বিশেষতঃ পুজোর সময়কার কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করতেন—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পুজোর সময় আমাদের কাপড় হল না—(বালকবালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকা পয়সা থাকত না—১৯১৩ সালের পুজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠান নি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে-সব কথা মনে আসে কেবলই।

সুপ্রভার চিঠি আজও আসে নি, মন সেজন্যে ব্যস্ত আছে। এরকম তো কখনও হয় না!

খুকুর জন্যেও গত একমাস রোজই ভাবি—হয়তো পুজোর সময় দেখা হবে, নয়তো হবে না—কত ভাবে এর কথা যে মনে হয়। বারবেলা ক্লাবে অভিনন্দনের দিন গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-ভরা ছাদে ওর মুখখানি মনে হয়ে মন কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল! তারপর মনে হয়েছিল সুপ্রভার কথা—কল্যাণীর কথা।

কি জানি কারও সঙ্গে দেখা হবে কি না। রেণু লিখেচে অবিশ্যি করে যাবার জন্যে এবার। দেখি কি হয়।

৺পুজো ফুরিয়ে গেল। ঘাটশিলাতে ছিলুম সপ্তমী পর্য্যন্ত। সেখানে গিয়েই সুপ্রভার হাতের একখানা রুমাল পেলুম। ক'দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল ঘাটশিলায়। তুলসীবাবুর গাড়িতে সপ্তমীর দিন বৌমা, নীরদবাবু, রেখা, সুবর্ণ দেবী সবাই মিলে মৌভাণ্ডার আরতি দেখতে যাওয়া গেল। বেশী শীত পড়েছিল, সেখানে বাঁধের পাশে শালবনে বেড়াতে যেতুম—কি চমৎকার লাগত। মহাষ্টমীর দিনে দুপুরের গাড়িতে আমি আর কমল কলকাতায় এলুম। গত পুজার কত কথা মনে হয়! জাহ্নবী নেই এ বছর। আর বছর কত প্রসাদ খাওয়া বনগাঁয়ে, ভেবে কি কষ্ট হয়! খুকুর কথাও মনে হয়েছিল সপ্তমীর আরতির সময়—সেদিন দুপুরে গালুডিতে নীরদবাবুর বাড়ির বটতলায় পাথরে ঠেস্ দিয়ে বসে কেবল সুপ্রভা, সুপ্রভা—ও, কি ভাবেই ওর কষ্ট মনে হয়েছিল সেদিন। সেই দুপুরের রোদে কালাজোর পাহাড়ের দিকে থেকে সুপ্রভা—খুকু—এদের কথন ভেবেচি।

বনগাঁয়ে এসে খুব আমোদ করা গেল। আর বছরের মত এবারও প্রফুল্লদের বাড়িতে সার্ব্বজনীন পুজো দেখলুম। একদিন বারাকপুরে গেলুম কল্যাণী ও নব—ওদের নিয়ে। বনসিমতলার ঘাটে ওরা সবাই বনসিমের ফুল তুললে—গান করলে আমার বাড়ি বসে ন'দিদি, মেজখুড়ীমার সামনে। তারপর ওরা হরিপদদার বাড়ি গেল। ফিরে এসেই সেদিন আবার বিজয়া সম্মেলন গেল প্রফুল্লর বাড়ি। আজ বনগাঁ থেকে এলুম—রাত্রে চাটগাঁ থেকে ময়মনসিং হয়ে। কতকাল ধরে পশ্চিমে যাই নি—বারো-তেরো বছর আগে। কেবলই যাচ্চি, অথচ পুব দিকে।

খুকু আসে নি, যদিও আসবার কথা ছিল।

এইমাত্র সকালের ট্রেনে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাই নি। রম্ভা দেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো শহরের বাড়িতে নেই ভেবে ওঁর ওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ি—অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় সাততলার ওপর থেকে —কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ি গিয়ে দেখা করলুম।

রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণ ধরে কত গল্প হল। সুপ্রভার কথা উঠল—খুকুর কথা উঠল। আসবার দিন ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদী পার হবার সময় ট্রেনে সুপ্রভার কথা আমার কি ভীষণভাবেই মনে এসেছিল। যাবার দিন সব গ্রামের ছায়ায় সুপুরি বনের ছায়ায় কল্যাণীকে কতবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ কতকাল থেকে—সুপ্রভা, সেবা, রেণু, কল্যাণী, মায়া—সবাই পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে। ওদের টানেই কতবার এখানে এলুম। সারাদিন কল্যাণী আর কল্যাণী···কত গ্রামে ওকে কল্পনা করলুম—বিদ্যাময়ী কলেজের হোস্টেল দেখে মনে হল এখানে ওরা ছিল। রত্না দেবীর সাততলার একদিন গানের আসর হল—কোজাগরী পূর্ণিমা সেদিন। গোপালবাবু গান গাইলে—কবীরের ও মীরার ভজন। আমার মনে হল তাদের কথা, যারা আনন্দ চেয়েও পায় নি—কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পেয়ে তাতেই খুশি হয়ে জীবন কাটিয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল গঙ্গাস্নান করতে, সেকথা—খুকু ডাকবাংলোর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল—কল্যাণীরা সেদিন ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুরে বেড়াতে গিয়েছিল—সে সব কথা। চোখে যেন জল এসে পড়ে। আমি ছোটবেলা থেকে কত আনন্দই পেলুম—কিন্তু আমার পরিবারের আর কেউ অত আনন্দ কোনদিন কল্পনাও করলে না। কক্সবাজারের তরুণী বধূ গাড়িতে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকলুম! পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে ভিন্ন এভাবে কেউ আলাপ করত না।

রেণু, কল্যাণী ও খুকুর সঙ্গে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। ওদের সীতাকুণ্ডু গ্রামে যে বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে উঠলুম। মধুর মা বলে একজন ব্রাহ্মণ বিধবা আমাদের আদর-যত্ন করলেন। সুপুরির গুঁড়ির সাঁকো দিয়ে পার হয়ে রেণু ও আমি অতি কষ্টে মধুর মার বাড়ি গিয়ে পৌঁছুই। আমি তামাক খাচ্ছি হুঁকোয় (মধুর মা সেজে দিল) দেখে রেণু তো হেসেই অস্থির। বুজু তার ক্যামেরাতে সেই অবস্থায় আমার ফটো নিলে। আরও অনেক ফটো নেওয়া হল পাহাড়ে উঠবার পথে। রেণু কেবল বলে—আপনার জন্যে আমার ভয়। আমি বলি—আর কোন ভয় নেই—চল উঠে। কি সুন্দর দৃশ্য, কি শ্যামল বনানী, বিরাট বন-স্পতিদের ভিড়। শম্ভুনাথের মন্দিরের কাছে রেণু, কল্যাণী ওরকে চঞ্চু জল খেয়ে নিল। যেমন আমি বলি চঞ্চু, রেণু অমনি বলে, 'বাহির হইল! চঞ্চলা বাহির হইল!' অর্থাৎ আমার গ্রাম্য-জীবনের লেখক হবার সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটির কথা। একটা গাছের ফটো নিতে গিয়ে ওদের ঝোঁকে ধরলে। ঝোঁক অবশ্যি আমাকেও ধরেছিল। আসবার পথে ওরা তেঁতুল পাড়লে একটা গাছ থেকে—তারপর ওদের বাড়ি এসে সবাই ভাত খাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা। রেণু বল্লে—আপনার সঙ্গে এ সম্পর্ক আর কখনও জীবনে পাব না! কত গল্প করতে করতে রাত্রি ন'টার সময় চাটগাঁ এলুম। রত্না দেবী খাবার করে নিয়ে বসে আছেন—ভাগ্যে আজ সীতাকুণ্ডে থাকি নি!

তার পরদিন সকালে উঠে কেশব জিনিস নিয়ে স্টেশনে এল। রেণুর বই কেশবের হাতে দিয়ে দিলুম। চন্দ্রনাথের পাহাড় ধুম স্টেশন থেকে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে একে-বারে হিমালয় পর্য্যন্ত। কি নিবিড় ঘন বনানী পাহাড়ের মাথায়। ওই একটা বিভিন্ন জগৎ যেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া স্টেশনে আসবার সময় মনে হল অনেক আগে একবার এ পথে গিয়েছিলুম—তখন আমার কি ছিল? এখন কত কে আছে—সুপ্রভা আছে, কল্যাণী আছে, খুকু আছে। ময়মনসিং স্টেশনে আসবার আগে এল বৃষ্টি। আজ কিন্তু ময়মনসিং স্টেশন ছাড়তেই গারো পাহাড় বেশ দেখা যায়—বিত্তাগঞ্জ বলে একটা স্টেশন থেকে চমৎকার দেখা গেল!

স্টীমারে যখন পার হচ্চি, ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিংনা বলে একটা স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়াল। আমি কল্পনা করলুম সন্ধ্যায় নেমে আমি অনেকদিন পরে যেন কল্যাণীদের বাড়ি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হরেন ঘোষ আমার সঙ্গে ময়মনসিং স্টেশনে দেখা করলে। আবার বিদ্যাময়ী হোস্টেলটা ভাল করে দেখলুম। মায়া ও কল্যাণী এখানে পড়ত। হরেন ঘোষকে রমা দেবীর দেওয়া খাবার খাওয়ালুম। সিরাজগঞ্জে ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভেঙে একেবারে দেখি ঈশ্বরদি। তারপরেই ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি রাণাঘাট। ভোর হবার দেরি নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি নৈহাটি। দেশে এসে গিয়েচি। স্টীমারের এঞ্জিনের কল প্রতিবারই দেখি—এবারও দেখলুম। পুজোতে খুব বেড়ানো গেল এবার। ঘাটশিলা, বনগাঁ, বারাকপুর, চাটগাঁ, ময়মনসিং—বহু জায়গা। কলকাতায় নেমে দেখি শ্রাবণ মাসের মত মেঘাচ্ছন্ন দিনটা। বৃষ্টিও বেশ নামল দুপুরে। আজই বনগাঁ হয়ে বারাকপুর যাব।

আনন্দের বিষয় এই যে, ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হয়ে চাটগাঁ থেকে যখন কলকাতায় ফিরি, তখন আমি ৪১নং মীর্জাপুরের যে দিকের মেসটায় থাকতুম—এবারেও সেইখানে এসে উঠেচি।

আজ স্কুল খুলেচে। বনগাঁ থেকে এলুম। আগের লেখাটা লিখবার পরে বারাকপুরে দু'দিন ছিলুম। আমার উঠোনের গাছে খুব শিউলিফুল ফুটেচে। খুকুর কথা কেবলই মনে হল সেখানে গিয়ে। কুঠীর মাঠে যেখানে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, সেখানটাতে বসে কতক্ষণ কাটালুম। নৌকো করে বিকেলে খুকুর মার সঙ্গে বনগাঁ আসবার সময় মনে পড়ল—১৯৩৯ সালের আষাঢ় মাসে খুকুর মা, খুকু এবং আমি বনগাঁয়ে এসেছিলুম। কল্যাণীর সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে গেলুম ঘাটশিলা। সেখানে এল বিভূতি মুখুজ্যে। তাঁকে নিয়ে ভট্‌চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি। প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়িতে মেয়েদের পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হল। সেই রাত্রেই রাঁচি রওনা হই বিভূতিকে নিয়ে। মুরী জংশন থেকে রাঁচি যাওয়ার রেলপথের দু'ধারে অরণ্য সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। পরদিন রাঁচি থেকে অনেকগুলি মেয়ে ও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে গেলুম। জোনাতে সন্ধ্যার আগে একখানা পাথরে বসে কত কি ভাবলুম। হুড্রুর চেয়ে জোনা ভালো লাগলো। কি জনহীন নিস্তব্ধতা চারিদিকের! মেয়েদের আসতে দেরি হতে লাগল, আমি ও বিভূতি ঘাসের উপর শতরঞ্চ পেতে শুয়ে রইলুম কতক্ষণ। সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, গৌরী—সবার কথাই মনে হয়। ওদের সবাইকে আমার প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি মনে মনে। সুপ্রভার চিঠি পেয়েছি রাঁচি এসেই। জোনাতে সে চিঠিখানা আমার পকেটে। জঙ্গলের মধ্যে বসে কতবার পড়ি। কল্যাণীর চিঠিখানাও। রাঁচি শহরটি বেশ সুন্দর! সুনির্ম্মল বসু ওখানে বেড়াতে গিয়েচে, তার সঙ্গে একদিন মাঠের ধারে বেড়াতে গেলুম। রাঁচি থেকে ফিরে ঘাটশিলা এসে দেখি ছোটমামা এবং টুটুর শ্বশুর সেখানে। কমল একদিন বেড়াতে এল। চলে এলুম কলকাতা। সেইদিন ছিল সকালে হাওড়ার পুল খোলা। স্টীমারে গঙ্গা পার হই। ন'টার ট্রেনে মানকুণ্ড। খুকু আমাকে দেখে কি খুশি! কত গল্প, কত কথা। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে এসে বসল। এতদিন পরে ও স্বীকার করলে, ছাদ থেকে রাঙা গামছা ও-ই উড়িয়েছিল। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। দেখে কষ্ট হল বড়। আসবার সময় বল্লে—চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি দাঁড়িয়েই রইল। সুপ্রভার কথা কত হল। কল্যাণীর কথাও

বল্লুম। সেই দিনই রাত সাড়ে আটটার ট্রেনে বনগাঁ। 'বঙ্গশ্রী'র সুধাংশু যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে গল্প করি আমার ভ্রমণের। বনগাঁ পৌছে সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে চললুম। বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুম দিচ্চে। সুনীতিদের বাড়ি এসে বসলুম। সুধীরবাবু গিয়ে ডেকে তুল্লে। পরে একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম পিক্‌নিক করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে বনসিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে। গ্রামের ঝি-বৌয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়িতে বসে গান করলে। সব এল শুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ি গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়ির পিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জ্বল্‌জ্বল্ করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। ঘাট-বাঁওড়ের এপারে জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল! একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনি ও নীল রংএর আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল চিরে প্রজ্বলন্ত হাউইবাজির মত জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল।

সুন্দর কাটল এবার পুজোর ছুটি। গাড়িতে গাড়িতে কাটল সারা ছুটিটা। কোথায় চাটগাঁ, কোথায় রঁাচি। আজ ফিরেচি কলকাতায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ থেকে।

জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ওপরের ওটা লিখবার পরে। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়ে পাহাড়-জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরণের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলগোলি ফুল (coclo sperma Govripium) ফুটেচে তামাপাহাড়ে। দুজনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়। তারপর ঝর্ণার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম, তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিবরাত্রির ছুটিতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুলডুংরিতে। চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকার পরে ফিরে গেলুম।

গত মঙ্গলবারে ওকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়েছিলুম। ও মায়ের ভাঙা কড়াখানার ওপরে ফুল দিলে, বড় ভালো লাগল আমার। বেশ মেয়ে কল্যাণী।

আমরা কুঠীর মাঠে গিয়ে কুল পাড়লুম সবাই মিলে। গুটকে, ইন্দু রায়, সত্য সবাই ছিল। সন্ধ্যার সময় চলে এলুম।

কাল ছিল স্কুলের ছুটি। সকাল বেলা বনগাঁ থেকে বেরুলাম আমি, কল্যাণী, বেণু ও যাদু। বসন্তে ঘেঁটুফুল দেখব এই ছিল আশা, প্রথমে গেলুম চাঁপাবেড়ের রাস্তার ধারের পুকুর পাড়ে। সেখান থেকে শুকনো পুকুরটার মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম ওপারে। তারপর গ্রামের পথে একটা তিত্তিরাজ গাছের তলায় ঘেঁটুবনের ধারে চাদর পেতে বসলুম। তিত্তিরাজের ফল পেকে ফেটে আছে গাছে—কেমন গন্ধ।

যেতে যেতে চড়কতলার বনের একটা অংশের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বেতগাছ ও কয়েক প্রকার নতুন ধরনের গাছপালা দেখলুম। একটা কাঙালীদের বাড়ি কুল পেড়ে খেলাম। তামাক সেজে দিলে।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। ওখান থেকে সোজা হেঁটে এলুম চালকী। পথে কত ঘেঁটুবনের শোভা—উঁচু পুকুরের পাড়টাতে চালকীর। ছেলেবেলায় যেখানে বসে কলের গান শুনেছিলুম, সেই দালানটা ভাঙা অবস্থায় দেখলুম। মিত্তেদের বাড়ির ওপর দিয়ে জাহ্নবীর বাড়ি এলুম। জাহ্নবীর ঘরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে দাঁড়ালুম। কতদিন পরে আবার দাঁড়ালুম এসে জাহ্নবীর ঘরে।

ওরা ডাব খাওয়ালে, ভাত খাওয়ালে। দুপুরের পরে সকলে হেঁটে চলে এলুম বনগাঁ। চাঁপাবেড়ের পথে এল বৃষ্টি। একটা গাছের খোড়লে সবাই ঢুকে বসি। বৃষ্টি গেল কেটে খানিকটা পরে।

বেলা চারটাতে বনগাঁ ফিরি।

কাল জাহ্নবীর বনগাঁর বাসায় গিয়েচি, পাঁচী ডেকে নিয়ে গিয়ে চা করে দিলে, পায়েস খাওয়ালে। অনেকদিন পরে ওদের বাড়িতে গেলুম।

তার আগে মানকুণ্ডু খুকুর সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন। খুকু পুকুরের ধার দিয়ে আমাকে আসতে দেখেই ছুটে এল। ছাড়তে চাইলে না—তখুনি চা করে, খাবার করে খাওয়ালে।

গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কাম্নু, বেণু সব বেরিয়ে চাঁপাবেড়ের ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম—ওরা সব খাবার তৈরী করে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠের বনের ছায়ায় বসলুম। সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকচে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুম সেদিন। সাহিত্য-সম্মেলন তার পরদিন। গজেন, হরিপদদা ও খুকু এল—ওদের চা ও খাবার খেতে দিলুম।

নববর্ষের আজ প্রথম দিন। গত বর্ষে অনেক ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রভার বিবাহ ও আমার বিবাহ তাদের মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনা। পূর্ব্বের জীবন একেবারে বদলে গিয়েচে।

আজ বনগাঁ থেকে এলুম রাত ন'টার ট্রেনে। কাল বারাকপুরে চড়ক দেখতে গিয়েছিলুম অনেক দিন পরে। আমি, গুট্‌কে ও নন্টু—তিন জনে যাই। অনেকদিন আগের মত চড়কতলার কাদামাটি দেখলুম। শিবের জন্যে ধান ছড়ানো। বাড়ির পেছনে বাঁশতলায় বেড়াতে গিয়ে তেমনি শুকনো ফলের বীজের বন্ধ, পাখীর ডাক। তেমনি কোকিল ডাকচে—যেন গোটা জীবনটা সামনে পড়ে আছে মনে হল। বাবা ও মাও যেন আছেন!

বার্ণপুরে সাহিত্য-সম্মেলনে ও-সপ্তাহে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একদিন ওরা মোটর নিয়ে রতিবাটি কয়লার খাদ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। জীবনে এই প্রথম কয়লার খাদ দেখা হল, বিভূতি মুখুয্যেও সঙ্গে ছিল।

১লা বৈশাখ খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল আজ বনগাঁয়ে। দুটি লোক হাটে গাছ-চাপা পড়ে মারা গেল।

কচা মারা গিয়েচে, বারাকপুরে গিয়ে সকলের মুখে সে বিবরণ শুনলাম। বড়ই শোচনীয় মৃত্যু।

কতদিন পরে আবার দেখলুম চড়ক—সেই কথাই বার বার মনে হচ্চে—এমন ধরণের লাঠি খেলা সেই দেখতুম বাল্যকালে, আবার কতকাল পরে যেন মনে দেশের আমাদের ঘরবাড়ি ঠিক তেমনি আছে, তেমনি পক্ষী-কাকলী-মুখরিত, শুকনো ফলের বীজের গন্ধামোদিত আমার বাল্য-

দিনগুলি। বাবা যেন এখনও বসে গান গাইচেন আমাদের ঘরের দাওয়ায়—আবার কবে যাত্রা বসবে—সেই আনন্দে দিনরাত চোখে নেই ঘুম।

তার অনেকদিন পরে, মনে আছে যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই—সেই শেষ বার কাদামাটির সময় চড়কতলার রৌদ্রে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, পরের বছর আসি নি—থার্ড ইয়ারে এসেছিলুম, কিন্তু সে কথা মনে নেই। আজ কত বছর পরে আবার এলুম সেই কাদামাটি দেখতে।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে। অনেক কিছু ঘটে গেল গ্রীষ্মের ছুটিতে। দার্জ্জিলিং গিয়েছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে—সেখানে অবজারভেটরি হিল থেকে নামচি—সুপ্রভা ও সেবার সঙ্গে দেখা। সুপ্রভার বাবাও ছিলেন। একদিন ওদের হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর সেদিনই ঘুম থেকে আমি হেঁটে আসচি জলাপাহাড় রোড হয়ে—দেখি নীচে থেকে কে ডাকাডাকি করচে। চেয়ে দেখি সেবা ও বিপুল দাঁড়িয়ে। নেমে এলুম। কালিম্পং রোডের মোড়ে গাড়ির মধ্যে সুপ্রভা বসে আছে। পান দিলে খেতে। গল্প করে তখনি জলাপাহাড় রোড ধরে চলে এলুম দার্জ্জিলিং-এ। পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব। কি হিমারণ্যের শোভা! কত কি ফুল ফুটে রয়েচে। অনেক ফুল তুলে আনলুম কল্যাণীর জন্যে। M. S. M. আপিসে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করলুম, সেদিন ট্রেনে যে সন্দেশ দিয়েছিল কড়াপাকের। কল্যাণী ধর্ম্মশালায় শুয়ে আছে—তাকে নিয়ে গিয়ে উঠলুম অকল্যাণ্ড রোডে। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং-এর দৃশ্য কি সুন্দর দেখা যায়—বিশেষ করে আলো জ্বালবার দৃশ্য। নামবার দিন তরাইএর ঘন অন্ধকার অরণ্য ও অসংখ্য জলপ্রপাত আমার মনে পূর্ব্ব-দৃষ্ট কত দৃশ্যকে তুচ্ছ করে দিলে। বনগাঁ এসে একদিন বারাকপুর গিয়েছিলুম। ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করলুম, হাজারি সিংয়ের দোকানে বসে রেজিনা গুহের গল্প হল। হাজারি সিং বল্লে—সে দেখ নি তোমরা, সাক্ষাৎ সরস্বতী! অথচ ও কখনো নিজেই দেখে নি। হাডাক জিকের গল্পও হল—যেমনি আজ গত ১৫।১৬ বছর কি তারও বেশি হয়ে আসচে। গাড়ি পাঠিয়ে ওঁরা জামাইষষ্ঠীতে নিয়ে গেলেন। তারপর ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ প্রশান্ত মহলানবীশ, কাননবালা ও মিসেস্ মহলানবীশ গেলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে গেলেন বারাকপুরে। আমার রোয়াকে গিয়ে বসলেন। শ্যামাচরণদা চা ও খাবারের ব্যবস্থা করলে।

আমি আষাঢ় মাসে একদিন গেলুম পাটশিমলে। পথে ভীষণ কাদা—বলদে-ঘোঁড়ামারি এক গ্রাম্য পাঠশালার বসে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে জল খেয়ে আবার রওনা হই। একটা বটগাছের তলায় বসি। তারপর আসসিংড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে জামাদা বিলের আগাড়ের সেই শিকড়-তোলা বটগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। পাটশিমলে পৌঁছে পিসীমার মুখে কত পুরোনো কথা শুনি। পেছনের বাঁওড়ে বর্ষার দিনে হিজল গাছের ঘাটে কত তৃপ্তি! সন্ধ্যাবেলা ডাঙা-উঁচু বনের মধ্যে দিয়ে প্যাটাডাঙির দিকে হাজরাতলার ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই জামগাছের শেকড়টাতে বসলুম। তার পরদিন আবার সেই পথেই ফিরি।

ঘাটশিলাতেও গিয়েছিলুম দ্বিজুবাবুর ওখানে, সন্ধ্যায় বসে রোজ গল্প হত। একদিন খুব বর্ষা। সন্ধ্যার আগে আমি সুনীলদের বাড়িতে এক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফিরবার সময়ে নদীর ধারের পথ হয়েই ফিরলুম। এক জায়গায় নাবাল জমিতে অনেকখানি জল বেধেছিল। বৌমা ও উমাকে নিয়ে একদিন ফুলডুংরির পেছনকার শালবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর কুরচি ফুল ফুটেচে বনে। একটা ঝর্ণা বর্ষার জলে ভরপুর, এঁকে বেঁকে চলেচে বনের মধ্যে দিয়ে। ফুলডুংরি পাহাড়ে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। একদিন

ঘন বর্ষার সন্ধ্যার সময় একা কতক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে বসে ভাবলুম এ ফুলডুংরি কতদিনের। পলাশীর যুদ্ধের দিনেও এমনি ছিল, আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনও এমনি ছিল, বুদ্ধদেব যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন তখনও এমনি ছিল, যখন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বর্ত্তমান, যেদিন সম্রাট টুটেনখামেনের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—সেদিনও এই ফুলডুংরি এমনই ছিল, আজ যার ওপর ধলভূম রাজার পার্ক তৈরী হচ্চে।

বনগাঁয়ে এবার খুকু ছিল অনেকদিন। সেই ১৯৩৯ সালের খুকু আর নেই। প্রায়ই সন্ধ্যার কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম। ও গেল ৪ঠা আষাঢ়, সেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে ওদের ছাদে বসে গল্পগুজব করা গেল। সন্তও ছিল, রামদাসের মেয়ে।

খয়রামারি শ্মশানের পাশে মন্মথদা, যতীনদা, বিভূতিকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতুম। ওটা নতুন আবিষ্কার। ইছামতীর জলে স্নান করে কি তৃপ্তিই পেতুম। এবারে কি ভীষণ গরম গেল। নেয়ে তৃপ্তি নেই ঘাটশিলায়। ইছামতীতে সন্ধ্যার সময়েও নাইতুম। শরীর যেন জুড়িয়ে যেত ঘাটশিলার পরে দেশে এসে। ঘাটশিলাতে নাইবার কি কষ্টই গেল ক'দিন। একে গরম, তাতে ভাল করে স্নান করবার মত পুকুর নেই। দ্বিজুবাবুর পুকুরের ঘোলা জলে একদিন নেয়েছিলুম।

যতীনদাকে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা খুব বলতাম। Jean's ও Eddington-এর Astronomy টা এ ছুটিতে খুব পড়া গিয়েচে ও আলোচনা করাও গিয়েচে। রোজ তিনটের সময় কল্যাণীকে লুকিয়ে ও তার বকুনি সহ্য করেও ওদের আড্ডায় চলে যেতুম। যতীনদা দেখতুম বসে আছে। দুজনে আরম্ভ করতুম গ্রহ-নক্ষত্রের গল্প। কল্যাণী সন্ধ্যার সময় পারতপক্ষে বেরুতে দিত না। অন্ধকারে পালালে ছুটে গিয়ে ধরে আনত। ছাদে শুতাম প্রায়ই গরমে। মাঝরাত্রিতে দুজনে নেমে আসতাম। সকালে খুকুর বাড়ি যেতামই।

ভালো কথা রেণুর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল এই ছুটিতে। যেদিন ঘাটশিলা যাই, তার আগের রাত্রে। বিভূতি মুখুয্যে, মনোজ এবং আমি বনগাঁ এলুম। গোপাল নিয়োগীর বাসায় যেতে ফুলির ছেলের সঙ্গে দেখা, সে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। সেখানে ফুলির মার কাছে রেণুর ঠিকানা নিয়ে চলে গেলাম ক্যাম্বেলের সামনে দেখা করতে। রেণুই এসে দোর খুলে দিলে। খুব খুশি আমায় দেখে। সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গেল। একখানা চিঠিও দিয়েছিল পুরী থেকে—ছুটু নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলাতে—বৌমা ছিলেন।

চমৎকার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ি আড্ডা দিতে গেলুম সজনী, মোহিতদা, বিভূতি মুখুয্যে ও আমি। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অনেক রাত পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করে ফিরলুম। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস্ সাহেবও সেদিন সেখানে ছিল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। বহুকাল পরে আজ আমার বহুকালের পরিচিত আবাস ৪১, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেস ছেড়েচি। সেই হরিনাভি স্কুলের থেকে আজ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ওই মেসটাতে ছিলাম। এতকাল পরে আজ ছেড়ে অন্যত্র আসতে হল, কারণ মেসটা গেল উঠে। বিভূতি, দেবব্রত, খুকু, সুপ্রভা, রেণু—কত লোকের সঙ্গে ও-মেসের স্মৃতি সুখেদুঃখে ছিল জড়ানো।

গত রবিবার ৬ই জুলাই নড়াইল সাহিত্য-সম্মেলনে আমি ছিলুম সভাপতি—বনগাঁ থেকে যতীনদা, মন্মথদা, মিতে এদের নিয়ে গিয়েছিলুম। সিঙ্গে স্টেশনে নেমে একটা দোকানে খাবার তৈরী করতে বলে আমরা ভৈরবের ওপরে কাঠের পুলে গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাঞ্ছানিধি বলে জনৈক উড়িয়া ওপারে জঙ্গলবাধাল গ্রামে থাকে—সে তার মনিবের কত নিন্দে করলে। তারপর ময়রার দোকানে এসে লুচি সন্দেশ খেয়ে একখানা এক ঘোড়ার গাড়িতে এলুম আক্রার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো করে ক' বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে জ্যোৎস্নারাত্রি ভাল করেই উপভোগ করা গেল। মিতে ও আমি নৌকোর ছই-এর ওপর গিয়ে বসে যতীনদাকে বার বার ডেকে ও ছইয়ে ঘা মেরে তার ঘুমের ব্যাঘাত করছিলাম। ভোরে পিয়েরের খালের ধারে নৌকো লাগল। সেখান থেকে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলুম রতনগঞ্জ। একটা দোকানে খেলুম খাবার। তারপর টাকুরে নৌকোতে উঠে, নড়াইল গিয়ে অজিতবাবুর বাসায় গিয়ে হাজির হই বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে। বৈকালে সভা সেরে চা-পার্টিতে স্থানীয় S.D.O. মুন্সেফ প্রভৃতির সঙ্গে গল্প। একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেলুম টাউন হলে—তারপর অনেক রাত্রে খেয়ে গোরুর গাড়িতে রওনা। বেশ জ্যোৎস্না-রাত্রি। খুব ঘন ঘন বন, বেত ঝোপ পথের ধারে। আবার পিয়েরের খালে নৌকোয় উঠলুম। যতীনদাকে সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করে তোলা গেল, কেন অজিতবাবুর সামনে ভাড়া চেয়েছিল, এই কথা বলে। রাত্রে নৌকো থেকে পড়ে যাবার মত হয়েছিল যতীনদা। ভোরে আক্রার ঘাট থেকে হেঁটে সিঙ্গে স্টেশন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে স্নান করে নিয়ে চা ও সন্দেশ খাওয়া গেল। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ এসে নামলাম। কল্যাণী খুব খুশি। আহা, আসবার সময় রসমুণ্ডি নিয়ে আমার হয়ে ঝগড়া করে বকুনি খেলো রেণু খুকুর কাছে। আমায় বল্লে—আমার মরা মুখ দেখবেন, আজ যদি যাবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মত চলেই তো আসতে হল।

সামনের রবিবারে নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবী, পশুপতিবাবু যাবে মোটরে বনগাঁ picnic করতে—সম্ভবত চালকী বিভূতিদের বাড়ি হবে রান্নাবান্না।

জীবন আবার কি ভাবে কোনদিক থেকে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল তাই ভাবি। ৪১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে সেই পুরোনো ঘর আমার জন্যে রেখে দিয়ে ওরা আমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলে—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হল না। মেসের মায়া এবার কাটাতে হবে—কল্যাণী খুব ধরেচে এবার ওকে নিয়ে বাসা করতে হবেই। ভেবেচি কলকাতা ছেড়ে বারাকপুরে থাকব। গ্রামের জীবন, ইছামতীর ঘোলা জল, মটরলতার দুলুনি—কতকাল ভোগ করি নি। জীবনে কোনদিনই গৃহস্থ হয়ে বারাকপুরে থাকি নি। এবার গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবার বড় আগ্রহ হয়েচে। জীবনে যা কখনো হয়নি—এবার তা করেই দেখি। কেন! মুক্ত ও স্বাধীন জীবন দুদিন দেখি কাটিয়ে।

কাল রবিবারে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবীরা এলেন বনগাঁ। আমি, কল্যাণী, মায়াদি, বেলু সবাই মোটরে চালকী বিভূতির বাড়ি গিয়ে বসা গেল। ডাব খেলাম। তারপর সুধাংশুদের বাড়ির রান্নাঘরে খিচুড়ি রান্না হল। ইতিমধ্যে যূথিকা দেবী ও পশুপতিবাবু গিয়ে হাজির। সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া ও গল্প করা গেল। জাহ্নবীর ঘরে ওদের নিয়ে গেলাম—বেচারী জাহ্নবী যদি আজ থাকত! ওর অদৃষ্ট নিয়ে ও এসেছিল—চলে গেল নিজের অদৃষ্ট নিয়েই।

গোপালনগরের হাটে সবার সঙ্গে দেখা। কল্যাণী, মায়াদি, সুবর্ণ দেবী সবাই হাট করচে। গজেন, ফণিকাকা, নলে নাপিত, শুটকে, শ্যামাচরণদা—সবাই দেখলে। শ্যামাচরণদা সুবর্ণ

দেবীদের হাট করে দিলে। আমরা আবার ফিরে এলুম বনগাঁ। সেখান থেকে চা খেয়ে ওরা চলে গেল। কল্যাণীকে আজকাল বড় ভালো লাগচে। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ছাড়ে না—যেমন এসেচি কলকাতায় অমনি এক চিঠি—এ শনিবার না এলে মরে যাব। বড় ভালবাসে।

আজ একটি মহা স্মরণীয় দিন বাঙালীর। সকালে উঠে লেখাপড়া করচি, বিশ্ব বিশ্বাস এসে বল্লে, রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তখনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চলে গেলুম। বেজায় ভিড় —ঢোকা যায় না। সেখানে গিয়ে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ মারা যান নি, তবে অবস্থা খারাপ। ওখান থেকে এসে স্কুলে গেলুম। স্কুলে শুনলাম তিনি মারা গিয়েছেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময়। স্কুল তখুনি বন্ধ হল। আমি ও অবনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, স্কুলের ছেলের দল কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরীশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে বিরাট শবযাত্রার জনতা আমাদের ঠেলে নিয়ে চলল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেয়ে। রমেন সেনের ভাই সুরেশের সঙ্গে আগের দিন প্রমোদবাবুর বাড়ি দেখা হয়েছিল—আমরা হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে যাই নীরদবাবুকে। সে আর আমি কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে দিয়ে সেনেটের সামনে এসে আবার পুষ্পমালা শোভিত শবাধারের দর্শন পেলুম। পরলোকগত মহামানবের মুখখানি একবার মাত্র দেখবার সুযোগ পেলুম সেনেটের সামনে। তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্ম্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জনম লভি—

অনেকদিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুরে ফিরেছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।

কল্যাণীকে শবাধারের শ্বেত-পদ্ম দিলুম, সে শুনে খুব দুঃখিত হল। তারপর হরিদার মেয়ের বিয়েতে গেলুম তাঁর বাড়ি। খেতে বসে খুব বৃষ্টি এল।

তারপর ক'দিন ছিলাম বনগাঁ। খুকু এল অসুস্থ অবস্থায়। রাত্রে কল্যাণীকে নিয়ে দেখা করতে গেলুম ওর সঙ্গে। আবার পরদিন নিশিদার বাড়িতে বৌভাত তাঁর ছেলের। সেখানেও গেলুম—যাবার আগে খুকুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করলুম।

কিন্তু মনে কেমন যেন একটা শূন্যতা—রবীন্দ্রনাথ নেই! একথা যেন ভাবতেও পারা যাচ্চে না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে এখানে এলো বিভূতি, মন্মথদা। ওদের নিয়ে প্রথমে গেলাম শিবপুর লাইব্রেরীতে—তারপর রাত ন'টার ট্রেনে রওনা হয়ে নামলাম গালুডিতে। ভোরের দিকে সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে শাল-জঙ্গলের পথে উঠলুম এসে কারখানার চিমনিটার কাছে। কতকালের পরিত্যক্ত তামার কারখানা—লোকও নেই, জনও নেই। গুররা নদীতে স্নান সেরে সবাই মিলে পিয়ালতলার শিলাখণ্ডে বসে জলযোগ সম্পন্ন করলুম—তারপর তামাপাহাড় পার হয়ে নীলঝর্ণার নামলুম। সেখান দিয়ে আসবার পথে একটা ঝর্ণার জল পান করে আমরা একটা ছোট্ট দোকানে কিছু চিঁড়ে ও চা কিনি। একটি ছোট্ট মেয়ে দোকানে ছিল, সে চা'র জল গরম করে দিলে। তারপর ঘন বনের পথে হেঁটে পাটকিটা গ্রামে পৌঁছে গেলুম। গ্রামের বাইরে যে ছোট্ট ঝর্ণাটি, সেখানে বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার হেঁটে রাণীঝর্ণার পাহাড় পার হয়ে ওপরে উঠলুম—দূরে সুবর্ণরেখা আবার দেখা যাচ্ছে—বেলা তখন তিনটে।

মুশাবনী রোডে নেমে কেঁদাড়ি গ্রামে পল্লীকবি বিষ্ণুদাসের বাড়ি এলুম। তারপর চা খেয়ে ভিস্থর্ণা পার হয়ে আমরা সুবর্ণরেখার খেয়া ঘাটে ডোঙায় নদী পার হলাম। ভট্টাচার্য্য সাহেবের বাংলোয় বসে গল্প করে ঘাটশিলার বাড়ি এলুম। রাত্রে সেখানে বিধায়ক, কমল, অমর প্রভৃতির সঙ্গে খাওয়া গেল।

পরদিন সকালের ট্রেনে চলে আসি কলকাতায় ও রাত সাড়ে-আটটার ট্রেনে বনগাঁ। কল্যাণীর সঙ্গে ভ্রমণের গল্প করি। খুকু এখানে এসেচে, তার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি একদিন কল্যাণীকে নিয়ে ছাদে বসে।

এবার পূজোর ছুটি কাছে এসেচে। কি ভীষণ পরিশ্রম গিয়েচে—গ্রীষ্মের পরে এই ক'টা মাস—বিশেষ করে গত এক মাস। সর্ব্বদা লেখা আর লেখা।···খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই! রোজ ভোরে উঠে কলঘরে যাই স্নান করতে, তখন ভাল করে অন্ধকার কাটে না, পাশের বাড়ির রান্নাঘরে আলো জ্বলে—এসে সেই যে লিখতে বসি—একবারে দশটা। আর তিনটি দিন পরে ছুটি—কাল দুপুরের পর থেকে খাটুনির অবসান হয়েচে। সব লেখা দিয়ে দিয়েচি—হাতে আর কোন কাজ নেই। আজ তো একেবারেই ছুটি। ওবেলা বিদ্যাসাগর কলেজে Study Circle-এ এক বক্তৃতা আছে—তাহলেই হয়ে গেল।

পূজোর পরে ছেড়েই দেব স্কুল। অবকাশ ও অবসরে ভাল ভাবে লেখা যাবে। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। ঘড়ি-ধরা সময় অনন্তকে কি করেই আটকেচে! বিশ্বের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সময় অতি তুচ্ছ—কিছুই না—আমার মেসের ছোট্ট ঘরটিতে সাড়ে ন'টা যেই বাজল আমার হাতঘড়িতে—অমনি সময় গেল ফুরিয়ে। আমি জীবনে অবকাশ ভোগ করতে চাই এবার—আর চাই বারাকপুরে ছেলেবেলার মত বাস করতে দু'দিন। দেখি এসব সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা!

বনগাঁ যাই নি অনেকদিন। ও শুক্রবারে যশোরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের শোকসভা ছিল। মনোজ, মহীতোষদা, আমি ও নীরদবাবু গিয়েছিলুম। আমি ও সুরেন ডাক্তার উঠেছিলুম অবিশ্যি বনগাঁ থেকে। সভাতে কল্যাণীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার জ্বর হয়েছিল বলে নিয়ে যেতে পারি নি। সভার পরে মণি মজুমদারের বাড়ি আমরা আহারাদি করলুম ও গিরীনদার সঙ্গে দেখা করে রাত্রের মেলে কলকাতা ফিরি—তারপর আর বনগাঁ যাওয়া ঘটে নি।

পূজো এসে গিয়েচে। কলকাতা থেকে শুক্রবার বনগাঁ যাব মহালয়ার ছুটিতে—পরের সোমবারে স্কুল হয়ে পূজোর ছুটি হয়ে যাবে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে।

মনে আজ কেমন আনন্দ, এমন ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দের দিন জীবনে ক'টাই বা আসে? আজ পূজোর আগে মহালয়ার ছুটি। সোমবারে একেবারে ছুটি হচ্চে পূজোর। অনেকদিন বনগাঁ যাই নি—আজ ও-বেলা যেতে পারব ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে। গতকাল সকালে যশোর থেকে এসেচি সাহিত্য-সম্মেলন করে—বনগাঁ যখনই ট্রেনখানা গেল তখনই যেন মনে হল নেমে পড়ি। অনেকদিন পরে ইছামতী দেখলুম সেদিন। এমন আনন্দের দিনে পেছনে যদি বহু নিরানন্দপূর্ণ দিন না থাকে, তবে এমন দিন কখনই হতে পারে না। নিরানন্দের কঠিন, ধূসর মরুভূমি পার না হয়ে এলে আনন্দের মরুদ্বীপে পৌঁছুনো যায় না—দস্যুবৃত্তি করে যে আনন্দ লুটতে আসবে—রোজ যারা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়—আনন্দ খুঁজে বেড়ানোই যাদের পেশা—তারা সত্যকার আনন্দ কি বস্তু—তার সন্ধান রাখে না। আনন্দের পেছনে আছে সংযম, ভোগের

অভাব, আনন্দের দৈন্য—এসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে এসে তবে প্রকৃত আনন্দ রসের সন্ধান মেলে। আমি জীবনে অনেকবার ঐ ধরণের আনন্দ ভরা দিনের আস্বাদ করেচি—যেমন এক-দিন জাঙ্গিপাড়ায়—যখন বিজয় জ্যোৎস্নারাত্রে একটা হেনাফুলের ডাল হাতে নিয়ে দেখা করলে—তারপর ইসমাইলপুরে সেই অপূর্ব্ব আনন্দের দিন—অনেককাল পরে যখন কলকাতায় আসব সদরের হুকুম পেলুম—সেই বাঁকে সিং, সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ কাশবনের প্রান্তে আমাদের খড়ের কাছারী ঘর! এখনও চোখের সামনে দেখচি।

অবকাশ পেলে ইসমাইলপুর অঞ্চলে একবার যেতে হবে—এ বছরই যাব ভেবেচি।

৮পূজার ছুটি হল আজ—আজই বনগাঁ থেকে এসেচি—কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়েচে হয় তো। কাল সে বলেছিল, যাবেন না খয়রামারি বেড়াতে বিকেলে, কিছুতেই যাবেন না। 'যেতে নাহি দিব'—কিন্তু ও বলে ছোট মেয়ের মত জোর করে, আমি ওর কোন কথাই রাখি নে, ওর কথা ঠেলে জোর করে চলে যাই। ও আবার বলে তবুও, বোঝে না যে ওর কথা রাখচি নে—অন্য মেয়ে হলে অভিমান করে আর বলে না। কিন্তু রোজই বলে, রোজই কথা অবহেলা করি—অথচ ও বলতে ছাড়ে না একদিনও—সেই পুরোনো সুরে 'যেতে নাহি দিব'—ও বড় সরলা! অমন সরলা মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি।

আজ ছুটি হলে শুনলুম স্কুলে শারদীয় উৎসব হবে। কিন্তু সে উৎসবে আমি থাকতে পারি নি—বড় দেরি হয়ে গেল বলে যোগ দিতে পারলুম না।

এলুম এম. সি. সরকার, মিত্র ও ঘোষ, 'দেশ' আপিস, ফুলুর মায়ের বাড়ি, ক্ষিতীশ ভট্চাজের 'মাসপয়লা' আপিস ও তারপর বাসা।

কল্যাণীর কথা কিন্তু বড় মনে হচ্চে আজ সারাদিন। তার চোখে জল দেখে এসেচি ভোরবেলা।

বারাকপুরে গ্রাম্যজীবন কিছুদিনের জন্যে যাপন করবার বড় ইচ্ছে—কত দিন যে এ ধরণের জীবন কাটাই নি—মাটির সঙ্গে যোগ থেকে···গ্রাম্য গৃহস্থ সেজে। আবার সেই শৈশবের জগৎটা আবিষ্কার করব—এই মনে আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে, এই শরৎ-কালের দুপুরে গাছপালায়, ঘুঘুর ডাকে কি যেন মায়া মেশানো ছিল—বনভূমি যেন স্বপ্নমাখা, ১৯৩৪ সালের দোলের সময়েও আমি তেমনি স্বপ্নমাখা দেখেছি বনভূমিকে—মাত্র সাত বছর আগে। কিন্তু শহরের কলকোলাহলময় ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে স্মৃতি আমার মনে ক্ষীণ হয়ে আসচে, যে জীবনকে ভুলে যাচ্চি, আবার সে জীবনকে আস্বাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েচি—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আমার তা করতে হবে। অন্য লোকে সে কথা কি বুঝবে?

কল্যাণী কাল বলছিল আর বছরের মত—আমার গা ছুঁয়ে বলে যান, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন!

তা এলুম না। ওর মনে দুঃখ হল। পা ছুঁয়ে বল্লে, তাই যদি না করা যায়, তবে মানুষ মরে যায় জানেন? এও আপনি করলেন! লোকের জীবন-মরণটাও দেখলেন না? এই সন্ধ্যায় সেকথা ভেবে মনে কষ্ট হচ্চে—ওর কথাটা শুনলেই হোত ছাই। মিথ্যে ওর মনে কেন কষ্ট দেওয়া?

ওর তরুণ মনের স্নেহ ও আগ্রহকে বার বার করে ঠেলে গেলাম অবহেলায়—তবুও ও বোঝে না, মনে কিছু ভাবে না—আবার সেই রকমই বলে।

কাছের মসজিদে আজান দিচ্চে। ক'দিন খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে আজানের শব্দ শুনে

ভাবলুম—এবার রাত ভোর হয়ে এসেচে। আর সে কি আনন্দ! সেই নীচের কলতলার গিয়ে স্নান করে আসব।

৺পুজোর ছুটি আজ শেষ হয়ে স্কুল খুলেচে। আজ এসেচি বনগাঁ থেকে। পরশু ঘাটশিলা থেকে যাই বারাকপুরে। মহাষ্টমীর দিন কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাব পূর্ব্ব থেকেই ঠিক ছিল—সপ্তমীর দিন নকফুলে জয়গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে পরদিন সকালেই রওনা। শেষরাত্রে ঘাটশিলা পৌছব। মেসে ওকে নিয়ে এসে দেখি দার্জ্জিলিং-এ দেখা সেই ছেলেটি ও স্কুলের দুটি ছাত্র উপস্থিত। ওদের সাথে গল্পগুজব করে কেটে গেল সময়টা। তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি নিয়ে গেলুম। তারা জলটল খাওয়ালে। ফিরেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পরে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরলুম। মিতে আছে ওখানে—শেষরাত্রে আমাকে ঘাটশিলা পৌছুতেই সে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর ভোর হতেই বেড়াতে বেরুই আমরা।

গালুডিতে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাবার দিন যথেষ্ট আমোদ পেয়েছিলাম—আর আমোদ পেয়েছিলাম নোয়ামুণ্ডি লাইনে বেড়াতে যাবার দিন। গালুডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নীরদবাবু, মিস্ দাস, প্রোফেসর বিশ্বাস সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' অভিনয় হল। তারপর ঘাটশিলার ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়িতে একদিন পার্টি উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেদিনও খুব আনন্দ করা গেল!

নোয়ামুণ্ডি যাবার দিন ভোররাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে মিতে ও আমি ঘাটশিলা থেকে প্রথমে যাই টাটা। সেখান থেকে একখানা Special Train ধরে চাঁইবাসা। চাঁইবাসা বেশ সুন্দর জায়গা—অনেক এ্যাকোসিয়া গাছ রাস্তার দুধারে। বাজারে বড় বড় আতা বিক্রি হচ্চে, আমরা দু'তিন পয়সার আতা কিনে রাস্তার সাঁকোতে বসে পেট ভরে খেলুম—তারপর রেল লাইন ধরে স্টেশনে হাজির। ঝিনকিপানি স্টেশনে থৈ থৈ করচে মুক্ত দিগন্ত—অমন মুক্তরূপা ভূমিশ্রী আমি বড় ভালবাসি—বেশী দেখি নি অমন দৃশ্য—এটা নিশ্চয়ই। কেন্দপোসি ছাড়িয়ে দুধারে বিজন অরণ্যভূমি, বনে সহস্র টগর (micalia champak) ফুলের গাছ—আর শেফালী—কি একটা ফুলের ঘন সুগন্ধে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রতি মুহূর্ত্তটি রেলের কামরা আমোদ করে রেখেচে। নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে বন আরও বেশী—সত্যিই সে বনের শোভা ও গাম্ভীর্য্য মনে অন্য ভাব জাগায়—তা শুধু কমনীয় সৌন্দর্য্যের ভাব নয়—যা জাগায় বাংলাদেশের বনঝোপ, সে যেন চৌতালের ধ্রুপদ—মনে গম্ভীর ভাব জাগায়। ফিল্মের অভিনেত্রীর হালকা প্রেমের মিষ্টি সুরের গান নয়—ফৈয়াজ খাঁর মালকোষ কিংবা পুরিয়া। গাম্ভীর্য্য আছে, উদাত্ত ভাব জাগায়—অথচ মিষ্টত্ব বলতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে তা কম।

যখন ফিরি তখন চারিধারে লৌহ-প্রস্তরের ছড়াছড়ি দেখে ভগবান সম্বন্ধে বড় একটা অদ্ভুত ভাব মনে এসেছিল—পদার্থ, নক্ষত্র জগৎ, বিশ্বের বিরাটত্ব প্রভৃতি নিয়ে। জঙ্গলের মাথায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা, মাঝ-আকাশে বৃহস্পতি। রাত ১২টার ট্রেনে ঘাটশিলা এসে নামলুম।

তারপর আর একদিন গালুডি যেতে হল নীরদবাবুর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে। সেদিন মিতে, মিতের স্ত্রী, বৌমা, কল্যাণী সবাই গিয়েছিল। পশুপতিবাবুর স্ত্রীকে সেখানে দেখলুম। খুব খাওয়া-দাওয়া হল।

আসবার আগের দিন সৌরীন মুখুয্যের ভাইপো এসে বল্লে—ধারাগিরি আমরা যাব কি না। আমি ফুলডুংরি পাহাড়ের কোলে গালুডি রোডের ধারে যে আম গাছ, ওখানে বসে রইলুম—

ছেলেটি এসে আমায় খবর দিলে। গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা তিনখানা গাড়ি করে সবাই মিলে (বৌমা ও হুটু তখন ওখানে নয়) রওনা হই। ধারাগিরির পথের শোভা, বিশেষতঃ পাশটার শোভা দেখে আমার দার্জ্জিলিং অকল্যাণ্ড রোডের কথা মনে পড়ল। তবে অকল্যাণ্ড রোড শহরের মধ্যে—আর এর চারিধারে শ্বাপদ অধ্যুষিত বিজন আরণ্যভূমি—এই যা পার্থক্য। সেখানে ঝর্ণার ধারে বসে কল্যাণী যখন রান্না করচে—তখন আমি 'পথের দাবী' পড়চি। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগল যে গত ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে থাকতে সুরেন গাঙ্গুলীর পল্লী-ভবনে বসে আমি প্রথম 'পথের দাবী' পড়ি। সেও বিহারে, এবারও পড়লাম বিহারে। তখন এও জানতুম না আমায় আবার বিয়ে করতে হবে। জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান কে কবে দিতে পেরেচে ?

খাওয়া-দাওয়ার পরে কল্যাণী, উমা, আমি ও সৌরীনবাবুর ভাইপো পাহাড়ে উঠে ধারাগিরি ঝর্ণার ওপরের অংশে গিয়ে কতক্ষণ বসলুম। ফিরবার পথে শালবনে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল !

গত সোমবারে ওখান থেকে তুপুরের ট্রেনে রওনা হয়ে মেসে এলুম সন্ধ্যার সময়। নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার তু'দিন বন্ধ। সময় নষ্ট করি কেন ? তখুনি ট্রেনের খোঁজে শেয়ালদ' গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ছাড়ছে। তাতে উঠে চলে গেলুম রাণাঘাট—খিনুদের বাড়ি গিয়ে উঠি। তারা চা খাওয়ালে। খিনু অনেকক্ষণ গল্প করলে। পরদিন ভোরের ট্রেনে গোপাল-নগরে এসে নামলুম—নিজের দেশের মাটিতে পা দিতেই যেন শরীর শিউরে উঠল। সেই আবাল্য পরিচিত প্রথম কার্ত্তিকের বনঝোপের সুগন্ধ, বনমরচে লতায় থোকা থোকা ফুল ফোটা, সেই স্নিগ্ধ হেমন্তের ছায়া। গোপালনগর বাজারে রায় সাহেব হাজারি প্রথমে ডাক দিলে, তারপর পাঁচু পরামাণিকের দোকানে সেই কুণ্ডুমশায়—যুগল ময়রার দোকানে বসে টাটকা তেলেভাজা কচুরী কিনে খেলুম—বিষ্ণু জল দিলে খেতে। বাড়ি আসতে আটটা বেজে গেল। বুড়ী পিসীমার বাড়ি ন'দি বসে গল্প করচে—ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি—ঘাটশিলা ও কল্যাণীর পাহাড়ে ওঠার গল্প হয়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ নদীজলের স্নেহস্পর্শে যেন সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। নদীর তীরে বন-ঝোপের কি মায়া, বনসিমলতার ঝোপের কি ঘন ছায়া, থোকা থোকা বেগুনি রংয়ের বনসিমলতার ফুল ফুটেছে—বনমরচে ফুলের সুবাস সর্ব্বত্র। মন ভরে গেল আনন্দে, এমন আনন্দ আর কোথাও পাই নি মুক্ত কণ্ঠে তা স্বীকার করি। বাল্যের কত স্মৃতি মিশিয়ে আছে এই সুবাসের সঙ্গে—তা কত গভীর, কত করুণ ! জিতেন কামারের বাড়িতে সুরপতি মিস্ত্রী রোয়াক গাঁথচে—সেখানে ইন্দু রায় নিয়ে গিয়ে বসালে পরদিন সকালে। মুচুকুন্দ চাঁপার তলায় পণ্ডিত, গঞ্জন, মনো রায়, ফণি কাকা মিটিং বসিয়েচে। সেখানে এলো হাজারি ঘোষের জামাই লালমোহন। তার সঙ্গে ওরা স্কুলের মাস্টার বরখাস্ত করা নিয়ে বাধালে ঝগড়া। আমি সরে পড়লুম বেগতিক দেখে। বৈকালে নৌকোয় গুটকে ও আমি বনগাঁ এলুম—যেন জাহ্নবীর বাসা এখনো আছে—ছুটির পরে সেখানে যাচ্চি। লিচুতলায় এসে মনোজ, জয়কৃষ্ণ, যতীনদার সঙ্গে বসে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করি। বিকেলে শুধু ছিলুম সরোজ ও আমি, মন্মথদাও। সন্ধ্যা-বেলায় গোপালদা, যতীনদা, জয়কৃষ্ণ, মনোজ, মন্মথদা ও বিনয়দা। খুব জ্যোৎস্না। কাল গেল ৺জগদ্ধাত্রী পূজা। আজ সকালে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এসেচি। আজ বৃহস্পতিবার, এই মাত্র বারবেলা থেকে এলুম—আর কেউ ছিল না, রাম, বুদ্ধদেববাবু ও আমি।

এইমাত্র ঘাটশিলা থেকে এলুম ফিরে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ব্যারাকপুর গিয়েছিলুম আবার। ফুটো স্টেশনে এসেছিল—ছটা ডিম নিয়ে রাঁধতে দিলুম মাস্তুকে বাড়ি পৌছে। খুব

জ্যোৎস্না। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে ন'দির সঙ্গে একটু বসে গল্প করি। শিউলি ফুলের সুবাসের সঙ্গে বনমরচে ফুলের গন্ধ মিশিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি মধুর করে তুলেচে শত অতীত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনে। কণি রায়ের পরিবারবর্গ থাকে বন্ধুদের বাড়ি। কতদিন পরে ওদের বাড়ি বসে চা খেলুম। তারপর গদা কামারের বাড়ি গিয়ে ইন্দু, গজন, অমূল্য কামার প্রভৃতির সঙ্গে গান করি ও শুনি। পরদিন সকালে হয়তো বনগাঁ থেকে সবাই পিক্‌নিক্ করতে আসবে। ন'দি ও বুড়ী পিসীমার সঙ্গে গল্প করি মাদুরের দাওয়ায়। পরদিন সকালে এলো খোকা ও সুরেন। স্নান সেরে বন-মরচে ফুলের সুগন্ধের মধ্যে রইলুম বসে কতক্ষণ। তারপর চলে আসি বনগাঁ।

শুক্রবার মন্মথদার আড্ডা।

আজ ফিরচি ঘাটশিলা থেকে এইমাত্র। গত রবিবারে আবার ধারাগিরি গিয়েছিলুম—মিতেরা ও আমরা। এবার pass-এর নীচে সেই খরস্রোতার খাদ থেকে কুলুকুলু নদীজলের সঙ্গীত আমাদের কানে মধু বর্ষণ করলে। বন্য পিটুলিয়া, শিউলি—আরও কত কি বন্য ফুল ফুটেচে বনে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে গ্রাম ঝর্ণার কাছে আমরা চা খাচ্চি বসে—এমন সময় হুটু আর সুরেশ সাইকেলে করে এসে যোগ দিলে আমাদের সঙ্গে। তারপর ধারাগিরি পৌঁছে কল্যাণী, মিতের বৌ ওরা চড়ালে খিচুড়ি—আমরা উঠলুম পাহাড়ে—মিতে ও আমি। ওপরের সেই দুরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম ধারাগিরির স্রোত ধরে আরও নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা—বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব্ব। মিতে একমনে শুনতে লাগল। কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্ব্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরুঝর্ণার শিখী-নৃত্য—জ্যোৎস্নারাত্রে শিলাখণ্ডে ময়ুর-ময়ুরীর নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরা বাস করেন এ বনে। এসে খিচুড়ি খাওয়ার পূর্ব্বে ঝর্ণায় স্নান সমাপন করি। তারপর খাওয়া সেরে গরুর গাড়িতে রওনা। আবার সেই ঘাটটা সন্ধ্যার ছায়ায় অতিক্রম করি। ঘন বন নীচে, হাতী তাড়াবার জন্যে স্থানে স্থানে গাছের ওপরে মাচা। ভাত রেঁধে খাচ্চে বনের মধ্যে। আমরা আগে আগে—মিতেদের গাড়ি পেছনে। মিতে সকলের পিছনে হেঁটে আসচে। কল্যাণীর সঙ্গে আমি আসচি। হুটু ও সুরেশ সাইকেলে সবার পেছনে। দ্বিতীয় ঝর্ণা পার হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্রমে নক্ষত্র উঠল—ছায়াপথ জম্ জম্ করতে লাগল। এখানে ওখানে উল্কা খসে পড়তে লাগল। রাত ন'টায় আমরা বাড়ি ফিরে ওবেলার রান্না খিচুড়ি খাই। উমা ও শান্তি এবার যায় নি।

মধ্যে আবার ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। সাদা পাথরের স্তূপটার ওপরে বসে কল্যাণীকে নিয়ে গল্প করেছিলুম জ্যোৎস্নারাত্রে। তবে এবার বিশেষ দূর কোথাও বেড়ানো হয় নি—মিতের সঙ্গে ফুলডুংরির নীচের বনটায় একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বসেছিলাম। গত সপ্তাহে গিয়েছিলুম বনগাঁ, বাড়ি বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর হুটু মুন্সেফ যে বাসায় থাকত—সেই বাসাটায়।

কাল রাত্রে শৈলজার 'নন্দিনী' বইখানা দেখে এলাম। বাঙালীর মনে যে কান্নার ফোয়ারা যোগাতে পারবে, সেই হাততালি পাবে। এ ছবিখানাতেও অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের প্যাঁচ কষে দর্শকের চোখে জল আনার যথেষ্ট সুব্যবস্থা। তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েচে ছবিখানা, এটা বলতেই হবে। কথাবার্ত্তাও স্বাভাবিক। সুকৃতি ও আমি গিয়েছিলাম 'রূপবাণী'তে, শৈলজা আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলে, গল্প করলে অনেকক্ষণ কাছে বসে। ছবি ভাঙলে

বাসে চলে এলুম। মিতে কাল বিকেলে এসেছিল, আজ ঘাটশিলা এতক্ষণ গিয়ে পৌঁছেচে।

আজ কোন কাজ ছিল না, ওবেলা বসে বসে পরীক্ষার কাগজগুলো দেখলুম স্কুলের (Class) ছেলেদের—তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল গৌর পালের সঙ্গে। স্কুল ও কলকাতা দুইই ছাড়ব শিগগির। যেখানে যা আগে আগে করতাম—তা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্চি। যেমন, আজ এবেলা গেলুম সাঁতরাগাছি ননীর বাড়ি, জতু নেই, তার মার সঙ্গে বার হয়ে গিয়েচে। ননীর কাছে বসে বসে ঘাটশিলা ও কল্যাণীর গল্প করলুম, ধারাগিরির বর্ণনা করলুম—মাস্টার মশাইও ছিলেন। তিনি আবার কোথায় যাত্রা হচ্চে বলে উঠে চলে গেলেন—আমরা বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করি, কল্যাণীর চিঠি ওকে পড়িয়ে শোনাতে হল। ননী বড় প্রকৃতিরসিক, বল্লে—আমি ঘাটশিলা যাব বেড়াতে। আমি ওকে যেতে বলেচি।

একটা নতুন জীবনের শুরু। এখনও চাকরিতে আছি, কিন্তু ১লা জানুয়ারী ১৯৪২ থেকে চাকরি ছেড়ে দেব। সেটা কাগজে কলমে অবিশ্যি, আসলে ছেড়েই দিয়েচি। বেশ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ এখন থেকেই পাচ্চি। ঘাটশিলাতে এসেচি—কলকাতা থেকে আসবার সময় জাপানী বোমার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে ইণ্টার ক্লাসে একটু জায়গা করে নিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জায়গা পাব না—সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটব।

অনেক পরে মেস্ ছেড়ে দিলুম এবার। রাত্রে আমার এক ছাত্র এসে মেসেই শুয়ে রইল—শেষ রাত্রে উঠে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের মধ্যেই দু'খানা রিকশা করে ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো গেল। ১৯২৩ সালে কলকাতার মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ঢুকেছিলাম—সেই থেকে ওই একই মেসে, একই অঞ্চলে কাটিয়েচি। কতকাল পরে মেসের জীবন ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বহুদিনের পুরোনো কাগজপত্র বিক্রি করে ফেললাম। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি! পুরোনো কাগজপত্রের ওপর মায়াবশতই তাদের এতদিন ছাড়তে পারি নি—আজ জাপানী বোমার হিড়িকে যে সেগুলো ছেড়ে এলুম তা নয়—আনবার জায়গা নেই—এনে ঘাটশিলায় এই ছোট বাড়িতে রাখি কোথায়?

রোজ সকালে শালবনে এসে বসে লেখাপড়া করি। মিতেরা এখানে ছিল, ভয় পেয়ে চলে গিয়েচে। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেচে, দিগন্তনীল শৈলশ্রেণী ও প্রান্তরে অপূর্ব্ব শোভা। এই সব পরিপূর্ণ আকাশের মধ্যে দিয়ে চমৎকার ভাবে উপভোগ করি—অবশ্য অবকাশের সময় এখনও ঠিক আসে নি—কারণ এ সময় তো বড়দিনের ছুটি আছেই—চাকরি যে ছেড়ে দিয়েচি—সে জ্ঞানটা এখনও এসে পৌঁছয় নি মনে। তার ওপর জাপানী বোমার ভয়। মৌভাণ্ডার কারখানা আছে—সবাই বলচে, এখানে কি বোমা না পড়ে যায়!

অনেকদিন পরে আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বন্ধু কল্যাণীর সঙ্গে সেদিন দেখা হল নদীর ধারে স্বামীজীর আশ্রমে। তাকে বাড়ি নিয়ে এসে চা খাইয়ে দিলাম। বিকেলে তার পরদিন ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম 'বিজয় কুটির' পর্য্যন্ত ও ফুটুর ডাক্তারখানা।

দেশে এসে বহুদিন পরে বারাকপুরে বাড়ি সারিয়ে বাস করচি। বৈশাখ মাসের প্রথমে এখানে এলুম—এর আগে চালকীতে ছিলাম। বেশ লাগচে—গোপালনগরে স্কুল-মাস্টারি করি। রোজ মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে আসি। বেশ লাগে।

আজ সকালে প্রায় দু'মাস পরে এই ডায়েরী লিখচি। ক'দিন খুব বর্ষা গেল—আজ পরিষ্কার আকাশে ঝল্‌মলে রোদ। আকাশের কি অপূর্ব্ব নীল রং। আমি রোয়াকের ঠেস্ বেঞ্চিটাতে বসে লিখচি। সবুজ গাছপালার ডালের ওপরে অয়স্কান্ত মণির মত উজ্জ্বল নীল আকাশ। আজ 'অনুবর্ত্তন' বইখানা লেখা শেষ করে কপি পাঠিয়ে দিলাম।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম দিন দশ-বারো। রোজ ফুলডুংরিতে বেড়াতে যেতুম। একদিন শালবনের মধ্যেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবোধবাবু একদিন এসে রাখা-মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। সুবর্ণরেখা পার হয়ে ধনকরি পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বসলুম, কি অদ্ভুত শোভা। হেঁটে গালুডি এলুম, প্রোফেসর বিশ্বাসের বাড়ি খেয়ে চলে এলুম বাড়ি।

বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর। অস্তদিগন্তের নানা রঙে রঙিন মেঘস্তূপ ভরা আকাশ যখন মাধবপুরের চরের ওপর ঝুঁকে থাকে, তখন সত্যই অদ্ভুত শোভা হয়।

এ সময় এখানে আর এক দৃশ্য। বিলবিলের জলে সকালে ন'দিদি কাপড় কাচচে, খয়ের-খাগী গাছে কাঁঠাল পাড়া হচ্চে খুড়ীমাদের, সাদা সাদা তেলাকুচো ফুল ফুটেচে খুকুদের লেবু গাছটায়, আমার ঠেস্ বেঞ্চির পাশে—বেশ পরিচিত দৃশ্য। তবে এ সময় আষাঢ় মাসের ২১শে পর্য্যন্ত কখনো বারাকপুরে আসি নি। ১৭৷১৮ই আষাঢ় চলে যাই ফি-বছর। ১৯২৮ সালে কেবল ছিলাম—তারপর আর থাকি নি। যে বছর বোর্ডিংয়ে যাই, তার আগের বছর ছিলাম। বারাকপুরে বর্ষা দিন যাপনের সৌভাগ্য এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয় নি।

গৌরীর কথা কাল রাত্রে মনে পড়ল। কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম। এই সময় আমরা কি করতাম, কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মামের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।

কল্যাণীকে কোলাঘাটে নিয়ে যাব সামনের শনিবারে। ও এখন চার-পাঁচ মাস সেখানে থাকবে।

অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। বাল্যদিনের পরে এই আবার। এখানে সংসার করচি বহুদিন পরে। নতুন সংসার নতুন ঘরকন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। এখন আমি জীবনে দর্শকমাত্র নই, জনৈক অভিনেতাও বটে।

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্নমাধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্ম্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছ স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম
ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট
থেকে সিক্তদেহে, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জ্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।